সুফিবাদ-এজিদি ইসলাম ও ১২ ইমাম

– খাদেমুল ইসলাম
ডা. এ. এন. এম. এ মোমিন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
সুফি ও সুফিবাদ। সুফিবাদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট, সুফিবাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। আল্লামা রুমির দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ মানবের তথা সুফির বিশদ ব্যাখ্যা, আল্লাহ্‌র খলিফা হিসাবে রাসূল (সা.) এর রাষ্ট্রনীতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পবিত্র কুরআনের আলোকে রাসূল (সা.) এর ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ্‌র আইনের সার্বভৌমত্ব, আদল, সকল মানুষের প্রতি সুবিচার, মানুষের মধ্যে সাম্য, সৎ কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের জবাবদিহিতা, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে পরামর্শ বা আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তথা সীমিত গণতন্ত্র, সৎ কাজে আনুগত্য, পদক্ষমতা ও প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা বা লোভ নিষিদ্ধ, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ এর অধিকার।
এ প্রসঙ্গে কুরআনের নির্দেশ, এ পরিস্থিতিতে একজন প্রকৃত ঈমানদারের করণীয় সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর নির্দেশ।

তৃতীয় অধ্যায়
সুফিবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, ধর্ম-রাজনীতিতে বিপর্যয়, রাষ্ট্র প্রধান নিয়োগের পদ্ধতি পরিবর্তন, খলিফার জীবনধারা পরিবর্তন, বায়তুল মালের মালিকানার প্রকৃতির পরিবর্তন, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ, শুরা বা আলোচনা ভিত্তিক সরকারের অবসান, বংশীয় এবং উগ্র আরব জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রধান্য, রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহ্‌র আইনের সার্বভৌমত্বের অবসান, সরকারী কর্মকর্তাদের অন্যায় আচরণে শাস্তি প্রদান থেকে অব্যাহতি।

চতুর্থ অধ্যায়
রাজতেন্ত্রর সাথে আহলে বাইত তথা আল্লাহ্‌র নির্বাচিত অলি-আল্লাহ্‌দের বিরোধের মৌলিক কারণ, রাসূল (সা.) এর প্রকৃত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকার হিসাবে হযরত আলী (আ.) এর মর্যাদার রাষ্ট্রীয় অস্বীকৃতি, মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক-ধর্মীয় দর্শনের মতবিরোধ, কুরআনের ব্যাখ্যায় মত পার্থক্য ঐশী জ্ঞান বাদ দিয়ে জ্ঞানের বিভিন্ন উৎসের উপর গুরুত্ব আরোপ, কুরআনের আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী আয়াতের বাখ্যাজনিত জটিলতা, আল্লাহ্‌র গুণাবলী বিষয়ক জটিলতা।

পঞ্চম অধ্যায়

কারবালার যুদ্ধের পর ইসলাম ধর্ম-রাজনীতিতে ব্যাপক বিচ্যুতি ও বিপর্যয়, উমাইয়া খলিফাদের ক্ষমতা গ্রহণের আইনগত ভিত্তি, উমাইয়া শাসকদের বিচার ব্যবস্থা, উমাইয়াদের ধর্মীয় বিশ্বাস, মরজিয়া মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, মরজিয়া মতবাদ সম্পর্কে ইমাম হাসান (আ.)।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

উমাইয়ায় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ভ্রষ্টাচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, উমাইয়া রাজত্ব খোদায়ী গজব, উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে আহলে বাইত হযরত যায়েদ (আ.) এর ধর্মযুদ্ধ, হযরত যায়েদ (আ.) এর জ্ঞান, গরীমা ও কুরআন গবেষণা, আব্বাসীয়দের মিথ্যাচার, প্রতারণা, শ্বেত সন্ত্রাস ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল, আব্বাসীয়দের ক্ষমতা লাভের আইনগত ভিত্তি।

সপ্তম অধ্যায়

আব্বাসীয় খলিফাদের শরীয়ত বিরোধী জীবন যাত্রা, আব্বাসীয়দের বিচার ব্যবস্থা। আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে আহলে বাইতে রাসূলদের জিহাদ আব্বাসীয় ধর্মমত একটি পর্যালোচনা, মাযহাব সৃষ্টির ইতিবৃত্ত।

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামের ইতিহাসে রাসূল (সা.) এর ওফাত, খলিফা নির্বাচন, রাসূল (সা.) এ জানাজা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা। রাসূল (সা.) এর অন্তিম অসিয়ত লেখার বিবরণ।

নবুয়ত রেসালত ইমামত বেলায়ত

পৃ-৬১-৬৮

নবম অধ্যায়

রাসূল (সা.) এর মতে ফিকাহ্ এর সংজ্ঞা, ঈমান, আক্বিদা, আমল, যেসব কাজ করলে ঈমান ধ্বংস হয়, হাদিস, (পৃ-৮৪-৮৮), অসত্য, জাল হাদিসের মাধ্যমে রাসূল (সা.) কে কুরআন অমান্যকারী হিসাবে উপস্থাপন, কুরআনের বক্তব্য নির্দেশ বিরোধী হাদিস, মাযহাব সৃষ্টি একটি পর্যালোচনা।

দশম অধ্যায়

ইমাম আলী বিন-আবি তালিব (আ.), মুয়াবিয়ার সাথে পত্রালাপ, মুয়াবিয়ার প্রধান উপদেষ্টার আমর ইবনুল আস এর নিকট আলী (আ.) এর পত্র, আদম সৃষ্টির বিবরণ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবী-রাসূল প্রেরণ, আলেমগণের মতবিরোধিতা/মতাভেদ সম্পর্কে মওলা আলী (আ.), জাল হাদিস সম্পর্কে হযরত আলী, মুসলমানদের সাথে আলী (আ.) এর যুদ্ধ, হযরত আলী ও খারেজী।

একাদশ অধ্যায়

ইসলামের ভিত্তি সম্পর্কে হযরত আলী (আ.), ঈমান ও কুফরের শক্তি ও শাখা-প্রশাখা, কুফরের শক্তি ও শাখা-প্রশাখা, রাসূল (সা.) এর জন্য আত্ম উৎসর্গীকৃত ও স্থলাভিষিক্ত হযরত আলী, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সেনানায়কদের একজন হযরত আলী। খন্দকের যুদ্ধ, খায়বর যুদ্ধ, তিন খলিফার আমলে হযরত আলী, আবু বকর (রা.) খিলাফতকাল, হযরত ওমর (রা.) এর খিলাফত কাল, হযরত ওসমান (রা.) শাসনকালে, হযরত আলীর কেরামত, অস্তগামী সূর্যের পূর্ণ উদয় হযরত আলীর (আ.) মর্যাদা অস্বীকারকারীর খোদায়ী শাস্তি। ফোরাত নদীতে বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণ, হযরত আলীর শাহাদাত।

দ্বাদশ অধ্যায়

হযরত ইমাম হাসান (আ.), রাসূল (সা.) এর পুত্র হাসান, হযরত হাসান (আ.) সম্পর্কে কুরআন, হাসান (আ.) এর ইমামত মান্য করা, তাকে ভালবাসা ও তার মর্যাদা স্বীকার করা, কুরআন মোতাবেক বাধ্যতামূলক, হযরত ইমাম হাসান (আ.) এর সাথে মুয়াবিয়ার পত্রালাপ, হযরত ইমাম হাসান (আ.) এর সাথে মুয়াবিয়ার চুক্তি; ইমাম হাসান হযরত আলী (আ) জ্ঞানের উত্তরাধিকারী, ইমাম হাসান (আ.), কাছে করা রোম সম্রাটের প্রশ্ন, ভাগ্য বনাম স্বাধীন ইচ্ছা সম্পর্কে হযরত ইমাম হাসান (আ.) এর হাদিস বর্ণনাকারী ইমাম হাসান (আ.), রাসূল (সা.) এর সাক্ষী হযরত ইমাম হাসান (আ.), বিচারক হযরত হাসান (আ.), মহাবীর হযরত ইমাম হাসান (আ.) হযরত হাসানের

পরহেজকারী ও ইবাদত, ইমাম হাসান (আ.) এর মেধা, দয়া, বিনয় ও মহানুভবতা, হযরত হাসান (আ.) এর কেরামত, হযরত হাসান (আ.) এর শাহাদত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হযরত ইমাম হোসাইন (আ.), ইমাম হোসাইন এর বিশেষ মর্যাদা, ইমাম হোসাইন এর জন্ম সম্পর্কে আল কুরআন, হোসাইন, রাসূল (আ.) এর পুত্র, ইমাম হোসাইন সম্পর্কে আল কুরআন, হোসাইনকে ভালবাসা ও মান্য করা ফরজ, কুরআনের ব্যাখ্যা আল্লাহ্তালার এখতিয়ারভুক্ত, হযরত ইমাম হোসাইন (সা.) এর আন্দোলন, রোমান সম্রাটের প্রশ্নাবলীর উত্তরে ইমাম হোসাইন (আ.), ইমাম হিসাবে কুফাবাসীদের উদ্দেশে হোসাইন (আ.) এর দিকনির্দেশনা, ইমাম হোসাইন (আ.) এর কেরামত, কুফাবাসীদের প্রতি ইমাম হোসাইনের পত্র, ইমাম হোসাইন (আ.) শাহাদত, কারবালায় হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) মাজার নির্মাণ ও ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

চতুর্দশ অধ্যায়

হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন (আ.), বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন, বন্দী ইমাম জয়নাল আবেদীন (আ.) ইয়াজীদের দরবারে বন্দী ইমাম (আ.), ইয়াজীদের সামনে সিরিয়ার জামে মসজিদের ইমাম জয়নাল আবেদীনের ঐতিহাসিক ভাষণ। সমকালীন জালেম খলিফাদের সাথে ইমাম, ইমাম জয়নাল আবেদীনের মর্যাদা সম্পর্কে ফারাযদাক এর কবিতা, ইমাম জয়নাল আবেদীনের কেরামতি, হযরত খিযির (আ.) এর সাথে বাক্যালাপ, জয়নাল আবেদীন ও খলিফা আবদুল মালেক, ইমামের দোয়া কবুল, জয়নাল আবেদীন (আ.) ইমাম হিসাবে নিয়োগের বিবরণ। সমাজ সংস্কারক ইমাম জয়নাল আবেদীন, ইমাম জয়নাল আবেদীনের শাহাদাত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইমাম বাকের (আ.), রাসূল (সা.) এর দৃষ্টিতে ইমাম বাকের (আ.), উমাইয়া ,শাসক ও ইমাম বাকের (আ.), আলী বিরোধীতা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ও রাসূল বিরোধী, অর্থনীতিবিদ ইমাম বাকের (আ.), ইমাম বাকের এর কেরামত, ইমাম বাকের এর শাহাদাত।

ইমাম জাফর সাদেক (আ.), জালেম শাহী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে ইমামের নীরব বিপ্লব, খলিফা মনসুরের নিয়োজিত গভর্নরের সম্মুখে ইমাম সাদিক (আ.), আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসার শ্রেণী বিভাগ ও ইমাম মান্য করার গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম সাদিক (আ.), সুফিবাদের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইমাম সাদিক (আ.), ইমাম জাফর সাদিকের কেরামত, শাহাদাত।

৬ষ্ঠদশ অধ্যায়

হযরত মুসা কাজিম (আ.), আব্বাসীয় খিলাফত ও ইমাম মুসা কাজিম, ইমাম মুসা কাজিমের (আ.) বন্দী জীবন, খলিফা হারুনের সাথে ইমাম মুসা কাজিম এর সাথে ইমামগণ যে রাসূলের সন্তান এ বিষয়ক বিতর্ক, হযরত মুসা কাজিমের কেরামত। হযরত মুসা কাযিম (আ.) এর শাহাদাত।

হযরত ইমাম আলী রেজা (আ.), খলিফা মামুন কর্তৃক ইমাম আলী রেজাকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগ, হযরত ইমাম রেজা (আ.) এর হাতে আব্বসীয়দের বাইয়াত গ্রহণ, ইমাম রেজা ও খলিফা মামুনের ঈদের নামায বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে ইমাম আলী রেজার তাত্ত্বিক আলোচনা, ইমাম রেজা (আ.) এর কেরামত, শাহাদাত।

সপ্তদশ অধ্যায়

ইমাম মোহাম্মদ ইবনে আলী ত্বকী আল জাওয়াদ, ইমাম ত্বর্কীর ইমামত, ইমাম ত্বকীর কেরামত, ইমাম ত্বকীর শাহাদাত, হযরত ইমাম আবু হাসান আলী আননাকী আল হাদী, ইমাম আলী নকী আল হাদীর বাল্যকালে ইমাম হওয়া, ইমাম হাদীর বাণীতে ইমামতের যোগ্যতা। ইমাম নকী (আ.) উপর সমসাময়িক আব্বাসীয় খলিফাদের জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতন, সামারায় ইমাম হাদী (আ.) এর বন্দী জীবন, ইমাম হাদী (আ.) এর কেরামত, ইমাম হাদীর শাহাদাত।

অষ্টদশ অধ্যায়

হযরত ইমাম হাসান আসকারী, ইমামের সাথে সমকালীন খলিফাদের আচরণ ইমাম আসকারী (আ.) এর কেরামত, ইমাম হাসান আসকারীর শাহাদাত, হযরত ইমাম মাহাদী (আ.)।

ঊনবিংশ অধ্যায়

নবুয়ত-রেসালত, খেলাফত, ইমামত ও বেলায়েত উলিল আমর, অলি-মুর্শিদ, হাদী বা পীরকে মান্য করার ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা, পৃ-৬৮, অলি আল্লাহ্ ও মুর্শিদ, মহাজ্ঞানী বা জ্ঞানের খনি, আল্লাহ্ ভালবাসেন, আল্লাহ্ ভালবাসেন না, সুফিদের সাথে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীনদের বিরোধ, সুফি সাধক ও ত্বরীকা।

আশরারে হাকিকি, তাওহিদ তত্ত্ব বা খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি এর বর্ণিত রাসূল (সা.) এর হাদিসের আলোকে এজিদি ইসলাম ও সুফি ইসলামের পার্থক্য। কলেমা তাইয়্যেবার হাকীকত, আলম-ই-নাসুত, আলম-ই-মালাকুত, আলম-ই-জাবরুত, আলম-ই-হাহুত, নামাজের হাকিকত, পূর্ববর্তী নবীগণের সালাত, ইসলামী, শরীয়তে সালাত। রোজার হাকিকত, জাকাতের হাকীকত, হজ্বের হাকিকত, হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকীকে লিখিত হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তী (রহঃ) পত্রাবলী-১, পত্র-২, পত্র-৩, পত্র-৪, প্রথম ফায়দা, দ্বিতীয় ফায়দা তৃতীয় ফায়দা, চতুর্থ ফায়দা, পঞ্চম ফায়দা, ৬ষ্ঠ ফায়দা, সপ্তম ফায়দা, অষ্টম ফায়দা, পত্র-৫, পত্র-৬ ও পত্র-৭
'সালাত বনাম নামাজ'।

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

লেখকের কথা

মহান বিশ্ব পালক আল্লাহ্‌তালার প্রশংসা করি। তিনি আদি-অন্তে ও গোপনে-প্রকাশ্যে চির বিরাজমান। আল্লাহ্‌তালা বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন, এর ভারসাম্য দান করেছেন তার পরিমাপ ও পরিমাণ স্থির করে তার অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় পথের (হেদায়তের) সন্ধান দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তালার সুনির্বাচিত প্রেরিত নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দরূদ ও সালাম জানাই। যাঁর উপস্থাপিত ও প্রদর্শিত পথের অনুসারীগণ সত্যিকারের পথের সন্ধান ও যার অনুসরণ হতে বিচ্যুত হলে তাকে পথভ্রষ্ট ও ধ্বংস হতে হয়। যিনি সত্যভাজন, সাংসারিক বিলাস বসনের ঊর্ধ্বে থেকে পরম আল্লাহ্‌তালাকেই প্রত্যাশা ও কামনা করেছেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি চেয়েছেন। যার আগমনে জগতে সত্যের প্রকাশ ঘটেছে ও মিথ্যার অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ দরূদ, পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও গভীর শ্রদ্ধা জানাই। এই নবীর মহান আহলে বাইত বা বংশধর যাদেরকে "মুয়াদ্দাত" তথা মান্যতা নিঃশর্ত, অকৃত্রিম ও আমৃত্যু ভালবাসা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ অবশ্য পালনীয় (ফরজ) বলে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে: আমি ইহার (ধর্ম শিক্ষা দেয়ার) বিনিময়ে তোমাদের নিকট হইতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য "মোয়াদ্দাত" আমার নিকটজনের ভালবাসা ব্যতীত অন্যকোন প্রতিদান চাহি না। যে উত্তম কাজ করে আমি তাহার জন্য ইহাতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ্ ক্ষমতাশীল, গুণগ্রাহী (শুরা:২৩)। অতঃপর সাহাবা, বিশ্বস্ত সহচর অনুগামী (তাবেঈন) বা অনুবর্তীদের প্রতিও অভিবাদন জানাই। যাঁরা কায়মনবাক্যে সততা ও দৃঢ়তার সাথে স্বীয় প্রভু নির্দেশিত পথ ও পন্থা অনুসরণ করেছেন।

মহা প্রেমময় আল্লাহ্‌তালা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতিকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন, তাঁর আদরের সৃষ্টি মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণের জন্য অসংখ্য, অগণিত, বস্তু, দ্রব্য সম্ভার তার চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেছেন। চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, দিবারাত্রি, আলো বাতাস, আকাশের মেঘমালা ও ভারি বর্ষণ, পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, গাছপালা এবং নানা ধরণের আহার্য দ্রব্য তিনি মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে ভালবাসার নিদর্শন হিসাবে মানব জীবনের সকল উপায়-উপকরণ সহজলভ্য করেছেন। মহান আল্লাহ্‌তালা এই বিশ্বকে এক গভীর, রহস্যময়, জটিল ও অতি সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই প্রচ্ছন্ন পদ্ধতি এ কারণেই অবলম্বন করা হয়েছে যেন আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রখর জ্ঞান ও বুদ্ধি বলে তার

সৃষ্টিকর্তাকে অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করে। আর আল্লাহ্‌কে জানার এই প্রক্রিয়াই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। মহান স্রষ্টার ভূমিকা, মান মর্যাদা, দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলেই তার পার্থিব জীবন সে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। মহান কৌশলী বিশ্ব প্রতিপালক মানুষকে বৃহত্তর রহস্যের অংশ হিসাবে আল্লাহ্‌তালাকে একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক প্রভু, শাসক, জ্ঞান করে তাঁর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। আবার তিনি তাকে বিপরীত কর্মপন্থা গ্রহণ করারও পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। এই দুটি পথের যে কোন একটি পথে চলার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তালা প্রত্যেক জাতি, সম্প্রদায়ের কাছে তাদের নিজস্ব ভাষায় নবী-রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ্‌তালার সঠিক পরিচয়, ক্ষমতা, বিশ্ব সৃষ্টি রহস্য ও পার্থিব জীবন-যাপন করার উপায় পন্থা, বিধি-নিষেধ শিক্ষা দিয়েছেন। এইসব নবী রাসূলের শিক্ষাই মানব সমাজে ধর্ম হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। সঠিকপথে চলার যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তার সাথে সংগতি রেখে মহান আল্লাহ্‌তালা এই পথে চলার বিভিন্ন উপকারিতা ও মঙ্গলময় দিক বর্ণনা করে তাকে এই পথে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ (Motivate) করেছেন। অপর দিকে ভ্রান্ত পথে চলার ভয়াবহ পরিনাম সম্পর্কে অবহিত করে সে পথে চলা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন। কোন ক্ষেত্রেই বল প্রয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অর্থাৎ মানব জাতিকে আল্লাহ্‌তালা এক প্রকার স্বাধীনতা (Limited Autonomy) দান করেছেন। এই কারণেই মানুষ কোন খারাপ কাজ করলেই তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্‌ তাকে পাকড়াও করেন না। কারণ তা করা হলে তা হতো প্রদত্ত স্বাধীনতার সাথে অসংগতিপূর্ণ কার্যক্রম। মানব ইতিহাসের সকল যুগে ও সমাজে খোদার পথে আহ্বান জানানোর জন্য কোন নবী রাসূল বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত অবশ্যই বিদ্যমান থেকেছেন। এই পরম্পরা ও খোদার পথে মানুষকে আহ্বানের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা একটি অপরিহার্য ব্যাপার যার প্রয়োজন অতীতে ছিল, বর্তমানে রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। কারণ মানবজাতির কাছে এই ঐশ্বরিক পথ নির্দেশনা প্রদান হলো একটি আল্লাহ্‌র ওয়াদা। ইরশাদ হচ্ছে: আমি বললাম, তোমরা সকলেই (আদম, হাওয়া ও শয়তান) এই স্থান হইতে নামিয়া যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ (হেদায়েত) আসিবে তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবেনা (সূরা বাকারা: ৩৮)। কিন্তু মানব জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক সত্য এই যে, আল্লাহ্‌তালা মানুষকে যে জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার সে করে না, বা করতে জানে না। ফলে তার ভয়াবহ পরিনাম মানুষকে ভোগ করতে হয়। তাছাড়া মানুষের মধ্যে ফিতনা, ফাসাদ সৃষ্টি ও খুন খারাবি করার ভয়াবহ প্রবণতা ও অন্যান্য দুর্বলতা রয়েছে। এ কারণেই মানুষ তার বৃদ্ধিবৃত্তিকে চিন্তা-ভাবনা করে সব সময় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনা। উপরন্তু তার জ্ঞান ও চিন্তার জগত ক্ষুদ্র ও সীমিত। চিন্তার এক পর্যায়ে তার গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে, মানবজাতির অনেক চিন্তানায়ক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নবী-রাসূলের মূল শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে নিজ সীমিত জ্ঞান বুদ্ধি-অনুযায়ী ও মানবীয় দুর্বলতা নিয়ে যেসব ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে নিত্য নতুন চিন্তাধারা দর্শন ও মতবাদ আবিস্কার করেছেন তা মানুষের জীবনে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অকল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি।

পবিত্র কুরআনে আমাদের ভাষায় রাজনৈতিক-ধর্মীয়-নেতৃত্ব (Religo-Political Leadership) এর একীভূত করণের বিষয়টি সর্বপ্রথম হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, "এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তাহার প্রতিপালক কয়েকটি কথা (নির্দেশ) দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেগুলি সে পূর্ণ করিয়াছিল, আল্লাহ্‌ বলিলেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করিয়াছি। সে বলিল, আমার বংশধরগণের মধ্য হইতেও, আল্লাহ্‌ বলিলেন, আমার প্রতিশ্রুতি (নিয়োগ) যালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নহে (সূরা বাকারা: ১২৪)।

ইবরাহিমের সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব তথা নেতৃত্বের বিষয়টিও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে। এরশাদ হচ্ছে: অথবা আল্লাহ্‌ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যাহা দিয়াছেন সেজন্য কি তাহারা তাহাদিগকে ঈর্ষা করে। আমি ইবরাহীমের বংশধরগণকে তো কিতাব ও হিকমত প্রদান করিয়াছি এবং তাহাদিগকে বিশাল রাজ্য দান করিয়াছি" (সূরা নিসা: ৫৪)।

উল্লেখ্য ইবরাহীমের বংশধরদের প্রতি আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহ প্রদানের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়েও ইবরাহীমের পুত্র ইসহাকের বংশধরগণ অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ ও ইসমাঈলের সন্তানগণ অর্থাৎ মুসলমানগণ বিশ্বের নেতৃত্বের অধিকারী হয়েছে। ইবরাহীম (আ.) এর সন্তানগণের প্রতি ঈর্ষা তথা প্রতিহিংসা একটি অপরিহার্য বিষয়। এ কারণেই রাসূল (সা.) এর নিকট যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই বাণী প্রচার করার জন্য নির্দেশ আসে "হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রচার কর; যদি না কর তবে তো তুমি তাঁহার বার্তা প্রচার করিলে না। আল্লাহ্‌ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কাফিরদের সৎপথে পরিচালিত করেন না, (সূরা মায়েদা: ৬৭)।

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা, তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত এই হুকুম যা প্রচার করার জন্য রাসূল (সা.) কে বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যার গুরুত্ব এতই যে, যা উম্মাহ্কে জানানো না হলে নবুওয়ত ও রেসালতের সমস্ত শিক্ষা অকার্যকর বা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আবার খোদায়ী এই নির্দেশটি এতটাই স্পর্শকাতর যে, তা প্রচার ও বাস্তবায়ন করতে গেলে এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে রাসূলের অনিষ্টের আশংকা রয়েছে। আবার এটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না করা হলে উম্মাহ্ আল্লাহ্র বিবেচনায় কাফের বা খোদাদ্রোহী হিসাবে বিবেচিত হবে। তাই মানবীয় বিবেক, বুদ্ধি জ্ঞান, বিবেচনা, নীতি ও কৌতুহল এ কথা জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য যে, এই নির্দেশনাটি কি? যে কারণে আল্লাহ্তালা এ বিষয়টিকে এত গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছেন। আর তাই এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা প্রত্যেক ইমানদার নর-নারীদের জন্য ফরজ বা অবশ্য পালনীয়।

পবিত্র কুরআনের বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ, সহীহ্ হাদিস, নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামী ধর্ম সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ১০ জিলহজ্ব বিদায় হজ্বের ভাষণের পর রাসূল (সা.) মক্কা মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে গাদীরে খুম নামক স্থানে আল্লাহ্র উপর্যুক্ত নির্দেশক্রমে যাত্রা বিরতি করে এই আয়াত নাযিলের পটভূমি, আল্লাহ্র নির্দেশনা ও তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন, যে হুকুম এ মুহূর্তে আমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে আমি যদি সেটা না পৌঁছে দিই তবে আমি যেন রেসালতের কোন কিছুই পৌঁছাইনি বলে প্রতীয়মান হবে। সেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ এ নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন যে, তিনি আমাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করবেন। আর আল্লাহ্র সত্তাই দয়াময়।

হে উপস্থিত জনতা, যা কিছু তিনি নাযিল করেছেন, সেগুলো পৌঁছে দেয়াতে আমি কোন কার্পণ্য করিনি। আর এখন আমি এ আয়াতের শানে নুজুলও তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে ব্যক্ত করছি। এর আগে জিবরাইল (আ.) আমার নিকট এ হুকুমটি তিনবার নিয়ে এসেছেন। যে, আমি যেন এ স্থানে দাঁড়িয়ে যাবতীয় কালো ও সাদাকে এ সংবাদ দেই যে, আলী ইবনে আবি তালেব হলো আমার ভাই, আমার ওয়াসী (উত্তরাধীকারী)। আমার খলিফা ও আমার পরবর্তী ইমাম। আমার সঙ্গে তার মর্যাদা ও সম্পর্ক ঠিক তদ্রূপ যেমন নবী মুসার (আ.) সঙ্গে হারুনের ছিল। পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, আমার পরে আর কেউ নবী হবে না। আল্লাহ্ ও আমার পরে আলী (রা.) তোমাদের অলি (অভিভাবক/নেতা/প্রশাসক/প্রিয়জন ও সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্ব)।

হে লোক সকল, জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ অবশ্যই আলীকে তোমাদের জন্য এমন অছি ও ইমাম মনোনীত করে দিয়েছেন, যার আনুগত্য করা মুহাজির ও আনসার এবং তাদের প্রতি বাধ্যতামূলক, যারা উত্তম কাজে তাদেরকে অনুসরণ করে এবং তাদের প্রতিও যারা জঙ্গলে বাস করে আর তাদের প্রতিও যারা শহরে বাস করে। আর প্রত্যেকের প্রতিও প্রত্যেক আরবের প্রতি ও প্রত্যেক অনাবরের প্রতি, প্রত্যেক স্বাধীনের প্রতি ও প্রত্যেক সাদার প্রতি এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতিও আবশ্যক যারা আল্লাহ্র একত্ববাদের উপর ইমান রাখে। আলীরই (রা.) নির্দেশ জারী হবে, তার কথা মান্য করা ওয়াজিব হবে, তারই আদেশ কার্যকরী হবে। যে তার প্রতি বিরোধীতা করবে তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ (গজব) আসবে। রহমতের হকদার সেই হবে, যে তাকে অনুসরণ করবে এবং যে তার প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করবে। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ মাগফিরাতের যোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন এবং ঐ ব্যক্তিকে যে আলীর কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে।

হে জনমণ্ডলী, এটাই হলো শেষ অবস্থা আর শেষবারের ন্যায় সুযোগ যে, আমি সবার সামনে নিজের স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করছি। তার কথা শুনো ও আনুগত্য করো এবং নিজ প্রভুর হুকুম মান্য করো, যেহেতু আল্লাহ্ই তোমাদের ইলাহ ও অলি, যে তোমাদের স্পষ্টাকারে কথা বলে, তারপর যিনি তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহ্র হুকুম অনুসারে আলী ও তোমাদের অলি ও ইমাম। অতঃপর কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমার ইমামত আমার বংশধারায় জারি থাকবে যা আলীর বংশধারা থেকে হবে। এই ধারাবাহিকতা ঐ দিন পর্যন্ত জারি থাকবে যখন তোমরা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সামনে আখেরাতে হাজির হবে।

হে লোক সকল! (আলী), সে হলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইমাম। আর আল্লাহ্ এমন কোন ব্যক্তির তওবা কবুল করবেন না, যে তাঁর ইমামতকে অস্বীকার করবে আর কাম্মিনকালেও তাকে মাফ করবেন না। আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমনই হবে, যে ব্যক্তি আলীর বিরোধিতা করবে, তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন যে তাকে চিরকালের জন্য কঠিন আযাব দিবেন। কাজেই তোমরা তার বিরোধিতা করা থেকে বাঁচো, যাতে ঐ আগুনে ঝাঁপিয়ে না পড়ো যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। আর তা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

"হে উপস্থিত জনতা, আলীকে শ্রেষ্ঠ জানো, সে আমার পরে কি পুরুষ, কি নারী সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাদের কারণেই আল্লাহ্তালা রিজিক নাযিল করে থাকেন, যার দ্বারা সমস্ত মাখলুকের জীবন বাঁচে। যে ব্যক্তি আমার এই কথাকে রদ করবে সে হবে

অভিশপ্ত। যদিও তার ধারণা মতে না হয়। জেনে নাও যে, জিবরাইল আমিন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আমাকে খবর দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে, যে আলীর সঙ্গে শত্রুতা করবে এবং তাকে বন্ধু বলে গণ্য করবে না তার প্রতি আমার লানতও গজব নাজিল হবে।

হে উপস্থিত জনতা, এ হচ্ছে আলী, আমার ভাই ও আমার ওয়াসী আর আমার জ্ঞান ভাণ্ডারের দরজা এবং আমার উম্মতের প্রতি ও আল্লাহ্‌র কিতাবের ব্যাখ্যার প্রতি, আমার খলিফা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানকারী আর যে যাবতীয় বিষয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন সেগুলোর প্রতি আমলকারী, আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে যুদ্ধকারী, আল্লাহ্‌র রাসূলের খলিফা, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বন্ধুত্বকারী, তাঁর অবাধ্য থেকে বাধা প্রদানকারী, মুমেনদের আমীর, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানোর দিক নির্দেশক আর আল্লাহ্‌র হুকুমের যারা আনুগত্য ভঙ্গ করেছে, যারা বিপথগামী এবং ধর্মের উপলব্ধিতে যাঁরা ব্যর্থ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী।

হে মানব সকল, এ আলী ও আমার সন্তানদের মধ্য থেকে যারা মাসুম (নিষ্পাপ), তারা সকলেই সিকলে আসগার (হালকা ও জনবিশিষ্ট) আর কুরআন হলো সিকলে আকবর (ভারী ওজন বিশিষ্ট) আর এদের মধ্যকার প্রত্যেকেই হলো আপন সঙ্গীর অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানদানকারী এবং তার প্রতি আনুকুল্য প্রদর্শনকারী। এদুটো কখনোই আলাদা হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার নিকট পৌঁছবে। এরা হলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তারা আমিন (সত্যবাদী) এবং আল্লাহ্‌র জমিনে তারই মনোনীত হাকিম (শাসক)। বুঝে নাও যে, আমার এ ভাই ব্যতীত অন্য কেউ আমীরুল মুমেনিন হবে না এবং আমার পরে সে ছাড়া অপর কারো মুমিনদের নেতৃত্ব করা জায়েজ হবে না।

হে জনমণ্ডলী, আমি তোমাদের জন্য হাকীকতকে (মূল সত্যকে) সুস্পষ্টরুপে ব্যক্ত করলাম আর তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম। এখন থেকে এই আলী তোমাদের বুঝিয়ে বলবে। জেনে নাও যে, আমার ভাষণ সমাপ্ত হওয়ার পর আমি তোমাদের আহ্বান জানাবো আলীর হাতে বাইয়াত তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য এবং সেটার স্বীকারোক্তি ঘোষণা করার জন্য, যেন তার হাত আমার পরে তার হাতে রাখবে। জেনে নাও যে, আমি আল্লাহ্‌র বাইয়াত করেছি আর আলী স্বয়ং আমার বাইয়াত করেছে আর আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে তার বাইয়াত তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি, এরপর যে বাইয়াত ভঙ্গ করবে তার ক্ষতি তার নিজেরই বংশের প্রতি বর্তাবে যেন আমিরুল মুমিনিন আলীর পরে আর তার পরে যারা ইমাম হবে তাদের ব্যাপারে তোমাদের নিকট হতে হাতে রেখে বাইয়াত গ্রহণ করে নেই। কিয়ামত পর্যন্ত সকল ইমাম আমার এবং আলী থেকে হবে।"

এই নীতির ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে শাসন ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য ঘোষণা করলেন আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে Theocracy ঐশীতন্ত্র, দিব্যতন্ত্র বা ধর্মরাজ্য বলা হয়। এই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ্‌র মনোনীত রাষ্ট্র প্রধান, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কিতাব অর্থাৎ শাসনতন্ত্রের অধীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। রাসূল (সা.) এই নিয়োগ ও মনোনয়নের বিষয়টি রাসূলের (সা.) সম্মুখে সবাই মেনে নেয় এবং এ কারণে হযরত আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.) হযরত আলীকে অভিনন্দন জানান। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওফাতের পর দৃশ্যপট সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়। হযরত আলীর ইমামত, খেলাফত ও বাইয়াত এর বিষয়টি পাশ কাটিয়ে এক ধরণের ভোটাভুটির মাধ্যমে আবু বকরকে (রা.) খলিফা নির্বাচন করা হয় বলে প্রচার করা হয়ে আসছে এবং হযরত আলী (আ.) কে আবু বকর (রা.) এর খিলাফত মান্য করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে আবু বকর (রা.) এই তথাকথিত সর্বসাধারণের মতামত তথা এজমার নীতি পরিত্যাগপূর্বক রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষমতা বলে তিনি হযরত ওমর (রা.) কে খলিফা নিয়োগ করেন। হযরত ওমর (রা.) ও অনুরূপভাবে একটি নির্বাচনী কমিটির মাধ্যমে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কুরআন, রাসূলের (সা.) নির্দেশ বা জনমতের কোন গুরুত্ব দেয়া হয় নাই। এই নির্বাচনী কমিটির প্রধান আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (যিনি ওসমান (রা.) এর বোনের স্বামী ছিলেন) তিনি হযরত আলীকে (আ.) খলিফা নিয়োগের শর্ত হিসাবে কুরআন, হাদিস ও পূর্ববর্তী দুই খলিফা কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন আইন কানুন বিধি বিধান তা যদি শরীয়ত বিরোধীও হয় তা মানতে বাধ্য করার প্রস্তাব দেন। হযরত আলী এই শর্ত প্রত্যাখ্যান করায় এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, শর্তটি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিরোধী ছিল।

এসব খলিফা নিয়োগের ব্যাপারে হযরত আলী (আ.)'র অনুভূতি ও বক্তব্য নিম্নরূপ: সাবধান! আল্লাহ্‌র কসম আবু কোহ্‌ফার পুত্র (আবু বকর) নিজেকে এটা দ্বারা (খিলাফত) ভূষিত করেছিলেন এবং তিনি নিশ্চিতরূপে জানতেন যে এটার সঙ্গে আমার অবস্থান চাক্কির মধ্যবর্তী পেরেক থেকে যাতার অবস্থানের ন্যায় পানির স্রোত আমা থেকেই প্রবাহিত হয়, আর পাখি আমার দিকে উড়ে আসতে পারেনা। আমি খিলাফতের বিপরীতে একটা পর্দা রেখে দিয়েছি এবং আমাকে এটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছি। তারপর আমি ভাবতে লাগলাম যে, আমি প্রচণ্ড আক্রমন করব নাকি দুর্দশার

চোখ অন্ধকারী অন্ধকার নীরবে সহ্য করব যার মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি দুর্বল হয়ে যায়, আর যুবক হয়ে পড়ে বৃদ্ধ, আর সত্যিকার বিশ্বাসী চাপের মুখে কাজ করে যায় যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত না করে (মৃত্যুর পর)। আমি দেখেছিলাম যে, সহ্য করে যাওয়াই অধিকতর বিচক্ষণতা। অতএব আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করলাম যদিও চোখে খোচা মারা যন্ত্রনা হচ্ছিল আর গলায় শ্বাসরোধ হচ্ছিল (অপমানের কারণে)। আমি আমার উত্তরাধিকার লুণ্ঠিত হওয়া প্রত্যক্ষ করছিলাম যে পর্যন্ত না প্রথমজন তার পথে প্রস্থান করে ছিলেন কিন্তু তার পর খিলাফত হস্তান্তর করেছিলেন ইবনে খাত্তাবের নিকট।

এটা বিস্ময়কর যে তিনি (আবু বকর) জীবদ্দশায় খেলাফতের গদি থেকে মুক্ত হতে চেয়ে ছিলেন কিন্তু তার ইন্তেকালের পর এর পথকে পরবর্তীজনের জন্য সোজা করে দিয়েছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই দুইজন উট এর বাটকে সম্পূর্ণরুপে ভাগাভাগি করে ভোগ করতেন। এই লোকটি (ওমর) খিলাফতকে একটি শক্তিশালী খেরের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন যেখানে কথা ছিল উদ্ধতপূর্ণ এবং স্পর্শ ছিল রুক্ষ। ভুল ছিল প্রচুর এবং তার অজুহাতও তদনুরুপ। এর সংস্কারে আগাম শক্তি যেন দুর্বিনীতি উটের আরোহী ছিল। সে যদি তার লাগাম টেনে ধরত তাহলে তার নাক ছিঁড়ে যেত। কিন্তু সে যদি এটা ঢিলা করে দিত তাহলে তাকে আসন থেকে ফেলে দিত। আল্লাহ্‌র শপথ। ফলে মানুষ হঠকারিতা, পাপাচার, অস্থিরতা এবং বিপথগামীতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তথাপি আমি একটা লম্বা সময় (১২ বছর) এবং পরীক্ষার অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ধৈর্যশীল ছিলাম যে পর্যন্ত না তিনি তার মৃত্যুর পথে চলে গিয়েছিলেন এবং খেলাফতের বিষয়টি একটি দলের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম আর আমাকে তাদের একজন বলে বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু হায়, আল্লাহ্‌ এই মন্ত্রণায় আমার কি করার ছিল? যেখানে তাদের প্রথম জনের আমার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিলনা সেখানে বর্তমান সময়ে আমাকে এই লোকদের সমকক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছিল। কিন্তু আমি নম্র থাকছিলাম যতক্ষণ তারা নম্র থাকছিল। আর উচুঁতে উড়তে লাগলাম যখন তারা উড়তে ছিল। তাদের (নির্বাচনীর কমিটির সদস্যগণ) একজন আমার বিরোধীতা করছিল তার না পছন্দের কারণে এবং অন্যজন তার বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে এবং আলতু-ফালতু কারণে অন্যদিকে ঝুঁকে পড়ল, যে পর্যন্ত এই লোকগুলোর তৃতীয়জন স্ফীত বক্ষে তার গোবর ও গোখাদ্যের সাথে না দাঁড়িয়ে গেল। তার সঙ্গে তার জ্ঞাতি ভাইয়েরাও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌র সম্পদ গলোধরণ করতে উট যেমন ঝরনার ধারের পত্র পল্লব গোগ্রাসে গিলে যে পর্যন্ত না তার রশি ভগ্ন হয়ে যায়, তার কার্যাবলী তাকে শেষ করে দিয়েছিল আর তার পেটুকতা তাকে ভূমিতে অবনত করে ফেলেছিল। সেই মুহূর্তে জনতা আমাকে ভীতি প্রদর্শন করছিল। এটা আমার দিকে প্রত্যেক প্রান্ত থেকে হায়েনার কেশরের মত অগ্রসর হচ্ছিল এতটা যে হাসান ও হোসাইন পিষ্ট হচ্ছিলেন আর আমার কাঁধের চাদরের উভয় প্রান্ত ছিড়ে গিয়েছিল। তারা আমার চারদিকে ছাগল ভেড়ার পালের ন্যায় সমবেত হচ্ছিল। যখন আমি প্রশাসনের লাগাম ধরেছিলাম তখন একদল পালিয়ে গিয়েছিল আর অন্যদল অবাধ্য হয়েছিল যেখানে বাকীরা অন্যায় আচরণ করছিল যেন তারা আল্লাহ্‌র বাণী শুনে নাই। যেমন: পরজগতের ঐ বাসস্থান আমরা তাদের জন্য বরাদ্দ করি যারা পৃথিবীতে পদ মর্যাদার অহংকার করেনা, অথবা যেখানে পাপভার না করে এবং পুণ্যবান্যগণের জন্য উত্তম সমাপ্তি (কুরআন : ২৮:৮৩)।

হ্যাঁ আল্লাহ্‌র শপথ, তারা এটা শুনেছে এবং বুঝেছে কিন্তু এই পৃথিবী তাদের চোখে চাকচিক্যময় লেগেছে এবং এর সাজসজ্জা তাদেরকে অপরাধের দিকে প্রলুব্ধ করেছে (নাহজুল বালাগা: ভাষণ-৩, পৃ-২৬-২৮)।

খিলাফতে রাশিদা হিসাবে কথিত প্রথম তিন খলিফার ক্ষমতায়নের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হয় সিফফিন যুদ্ধের সময় হযরত আলী (আ.) এর পক্ষ হতে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রা.) মুয়াবিয়াকে হক পথে (আলীর পথে) আসার জন্য একটি পত্রে লিখেছিলেন, মুয়াবিয়া উল্টা মুহাম্মদকেই তার দিকে আহ্বান করে চিঠি লিখেছিলেন পত্রটি নিম্নরুপ:

"এই চিঠি হইতেছে মুাবিয়া বিন সখরের নিকট হইতে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের কাছে, যে মুহাম্মদ তাহার ওয়ালিদ (আবু বকর)কে হীন করিয়া ফেলিয়াছে তাহার যে চিঠিতে আল্লাহ্‌র বিরাটত্ব, ক্ষমতা ও রাজ্যের কথা, যে বিরাটত্ব, ক্ষমতা ও রাজরাজ্যের তিনি মুস্তাহেক, তুমি উল্লেখ করিয়াছ আর মুহাম্মদ মুস্তফার গুণাবলী যাহার জন্য তিনি পছন্দনীয় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন, সেসব তৎসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছ তোমার সে চিঠি আমি পাইয়াছি। ইহার সঙ্গে চিঠিতে তোমার দুর্বলতা প্রকাশ পায় এমন কিছুও আছে এবং তাহার দ্বারা তোমার ওয়ালিদ (আবু বকর) কে লোকের নজরে হীন প্রতিপন্ন করিয়াছ।

চিঠিতে আলী ইবনে আবি তালিবের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়াবলী, রাসূলের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে তাহার ব্যক্তিগত অগ্রগন্যতার কথাও উল্লেখ করিয়াছ এবং বলিয়াছ যে রাসূলের আমলে তাহার উপর যত রকম বিপদ আসিয়াছে, আলী তাহার প্রত্যেকটির মুকাবিলায় পরিপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণিত হইয়াছেন।

আল্লাহ্‌র শুকর করি আমি এই জন্য যে উল্লিখিত সদ গুণাবলী আল্লাহ্‌ তোমার জন্য মঞ্জুর করেন নাই। অন্যকেই (আলীকে) দান করিয়াছেন। তোমার ওয়ালিদ (আবু বকর) ও আমরা সকলেই আলীর ঐসব গুণাবলী খুব ভালভাবেই ওয়াকিফহাল ছিলাম।

অতঃপর আল্লাহ্ রাসূলকে সরাইয়া লইলেন। আর শ্রেষ্ঠত্ব তাহাকে (আলীকে) সমর্পন করিলেন। যাহা তাহাকে (আলীকে) তিনিই দিতে ওয়াদা করিয়াছিলেন (গাদীরে খুমের ঘোষণা ও অন্যান্য স্থানে রাসূল কর্তৃক কথিত), তখন তোমার ওয়ালিদ ও তাহার দোস্ত ওমর ফারুকই তো প্রথম আলীর সেই হকের উপর চড়াও হইলেন। তাহারা উভয়েই রাসূলের খিলাফত বিষয়ে আলীর প্রতিকূলে চলিয়া গেছেন খিলাফত কাড়িয়া লইলেন। অতঃপর তাহারা তাহাকে নতি স্বীকার করাইতে তাহাদের কাছে ডাকিলেন। এই বিষয়ে তাহারা আলীর উপর জোর জুলুম চাপাইলেন (আলীর বাড়ী আক্রমন, ফাতিমার আহত হওয়া ও গৃহ দাহ করার ভয় দেখানো) ঘটনাচক্রে আলী জেরবার হইয়াছিলেন, তাহাদের কাছে বাইয়াত করিয়াছিলেন এবং এসব সত্ত্বেও তাহাদের উভয়ের কাউকে আলীকে তাহাদের মৃত্যু পর্যন্ত নিজেদের পরিকল্পনার কথা জানাইয়া যান নাই। অতঃপর তাহাদের দলের তৃতীয়জন উসমান আসিয়া দাঁড়াইলেন। অতএব হে আবু বকর পুত্র, তোমার অন্তরতলে ভয় পোষণ করা উচিত। যে তুমি তোমার সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছ। তোমার মুরুব্বী (আবু বকর, উমর উসমান)দের বিরুদ্ধে তোমার দাঁড়ানো উচিত নয়। যাহার ওজন একটা পর্বতের তুল্য তাহার চাইতে তোমার ওজন অনেক কম। অতএব যদি তোমার চিঠির কথা সত্যও হইয়া থাকে, তবে তোমার ওয়ালিদ (আবু বকর) তো আলীর ভয়াবহ জুলুম সংঘটিত করিয়াছেন এবং আমি তো মাত্র সেই মতই অনুসরণ করিতেছি। যদি তোমার ওয়ালিদ আগেভাগে ঐরুপ না করিতেন, তাহা হইলে আমিও আলীর বিরুদ্ধে যাইতাম না এবং আলীকে নির্বিকারে খিলাফত চালাইতে দিতাম। যেহেতু আমি তোমার ওয়ালিদকে বেআইনী পথ অনুসরণ করতে দেখিয়াছি আমিও সেইরুপ করিয়াছি। আর ওয়ালিদের ভুল ধরতে যাওয়ায় তোমার উচিত হইবেনা। যাহা হইবার হইয়াছে এখন চুপ করে বসিয়া থাক। আসসালুমু আলাইকুম আলা মানি ত্তা বায়ান হুদা, (ইতিহাসগত বিভ্রান্তির রহস্য লেখক মুফাখ্খারুল ইসলাম, পৃ-১২২-১২৩)।

আবু আব্দুল্লাহ জেদিয়ার বিন বুকাউজ/জুবায়রী জন্ম ১৭১ হিজরী সনে মৃত্যু ২৬৪ হিজরী সনে। তিনি মক্কার কাজী ছিলেন, তিনি আল মুকাফিযাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ইবনে আব্বাস বলিয়াছেন যে, তিনি ও খলিফা ওমর একদিন মদীনার রাস্তায় চলিতেছিলেন, তখন ওমর বলিলেন, হে ইবনে আব্বাস, আমার ধারণা হইয়াছে যে, তোমার সহচর আলীর উপর বড়ই জুলুম হইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস মনে মনে বলিলেন তিনি যে, এই সুযোগ পাইয়াছেন তাহা হেলায় হারাইবেন না এবং তখন তিনি (ইবনে আব্বাস) বলিয়া বসিলেন, হে আমিরুল মোমেনীন, তাহা হইলে যাহা জোর করিয়া আলীর নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে তাহা কেন আলীকে এখন ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে না? এই কথা শুনিয়া উমর তাহার হাত সরাইয়া লইলেন। বিড় বিড় করিতে করিতে খানিক হাঁটিয়া গেলেন।

কেবল খলিফা ওমর স্বীকার করেন নাই যে আলী, তাহাকে ও আবু বকরকে মিথ্যাচারীরুপে বিদ্রোহীরুপে আর আমানতের খিয়ানতকারীরুপে লক্ষ্য করিতেন। যে আমানত তাহাদের (উম্মতের) উপর বিশ্বাস করিয়া রাখা হইয়াছিল। অনেকেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। (সহীহ মুসলিম তৃতীয় বালামে ওহুদ প্রসঙ্গে)। [সূত্রঃ পূর্বোক্ত পৃ-১২৫] হযরত ওসমান (রা.) এর শাসনকালে (৬৪৪-৬৫৬) ইসলামের দুশমন বনি উমাইয়ারা সুবিধা পেয়ে গিয়েছিল এবং বাইতুল মাল (সরকারি কোষাগার) লুণ্ঠন করা শুরু করেছিল এবং যেমন গবাদি পশু খরার পর সবুজ খাস দর্শন মাত্র মাড়িয়ে শেষ করে তারা তেমনি বেপরোয়াভাবে আল্লাহ্র অর্থের উপর আপতিত হয়েছিল এবং গিলছিল। অবশেষে স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্বজনপ্রীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে ছিল যে, এক শ্রেণীর বিদ্রোহী জনতা তাকে শহীদ করে। যে দুঃশাসন ঐ সময় অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা এ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে কোন মুসলমান সেটা দেখে অবিচল থাকতে পারতনা যে, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীগণ অযত্নে পড়েছিলেন। তাঁরা দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েছিলেন। কপর্দকহীনতায় পরিবেস্টিত হয়েছিলেন যেখানে বাইতুল মালের পদসমূহ তাদের যুবকদের এবং অনভিজ্ঞ লোকদের দখলে ছিল, বিশেষ বিশেষ মুসলমানদের সম্পত্তি তাদের দখলে চলে গিয়েছিল, তৃণক্ষেত্রসমূহ কেবলমাত্র উমাইয়া গোত্রের গবাদি পশুর ঘাস সরবরাহ করত। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই বাড়াবাড়ি সম্পর্কে কিছু বলতেন তাঁর পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে দেওয়া হতো। জাকাত ও সাদাকা যা দরিদ্র এবং দুদর্শাগ্রস্তদের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং সর্বসাধারণের অর্থ যা মুসলমানদের সাধারণ সম্পত্তি ছিল, সে সব যে যে খাতে ব্যয় করা হতো তা নিম্নোক্ত কতিপয় নিদর্শন থেকে পর্যবেক্ষণ করা যাবে:

১. হাকাম বিন আছ যে আল্লাহ্র রাসুল কর্তৃক মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল, তাকে শহরে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। কেবল সে যে নবীর সুন্নতের বিরুদ্ধে তাই নয় প্রথম দুই খলিফার আচরণের বিরুদ্ধেও তাকে এক লাখ দিরহাম দেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে।

২. ওয়ালিদ বিন আকবা যাকে কুরআনে মুনাফিক আখ্যায়িত করা হয়েছে তাকে এক লাখ দেরহাম দেয়া হয়েছিল।

৩. খলিফা তার নিজ কন্যা আবানকে মারোয়ান বিন হাকামের নিকট বিবাহ দিয়েছিলেন এব তাকে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে এক লাখ দিরহাম প্রদান করেছিলেন এবং তাকে মুখ্য মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেছিলেন যার অপকীর্তি ও কুপরামর্শের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করেছিলেন অথচ মারোয়ানকে তার জঘন্য অপরাধের জন্য আইনের আওতায় আনতে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

৪. তিনি তার অপর কন্যা আইশাকে হারিছ বিন হাকামের (মারোয়ানের ভাই) নিকট বিবাহ দিয়েছিলেন এবং তাকে এক লাখ দিরহাম প্রদান করেছিলেন।

৫. আব্দুল্লাহ্ বিন খালিদকে চার লাখ দিরহাম প্রদান করা হয়েছিল।

৬. মারোয়ানকে আফ্রিকা থেকে খুমছ (কুরআনে সুরা আনফাল ৪১ বর্ণিত) রাষ্ট্রীয় খাত থেকে রাসূলের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য নির্ধারিত অর্থ) হিসাবে সাড়ে পাঁচ লাখ দিরহাম দেওয়া হয়েছিল।

৭. যে "ফেদাক" নবীজীর ফেরেশতার চেয়ে মর্যাদাবতী কন্যা ফাতিমা (আ.) এর নিকট থেকে কুরআনের নির্দেশ লংঘন করে রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়, তা মারোয়ানকে রাজকীয় অনুগ্রহ হিসাবে দেওয়া হয়।

৮. মদীনার বাণিজ্যিক এলাকায় বাহজোজ নামক স্থানটিকে আল্লাহ্র রাসূল সরকারের গচ্ছিত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন সেটা হারিছ বিন হাকামকে দান করা হয়।

৯. মদীনার চতুপার্শ্বস্থ তৃণক্ষেত্র গুলিতে বনি উমাইয়াদের ব্যতীত অন্য কারো উট চরতে দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

১০, হযরত ওসমান (রা.) এর শাহাদাতের পর তার ঘরে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার দিনার, সাড়ে তিন মাশা ওজনের স্বর্ণ মুদ্রা এবং দশ লাখ দিরহাম পাওয়া যায়। খাজনা মুক্ত জমির কোন সীমা ছিলনা কিন্তু একটি জায়গীরের মূল্য ছিল এক লাখ দিনার, উট এবং ঘোড়া ছিল অসংখ্য।

১১. খলিফার আত্মীয়রাই প্রধান প্রধান শহরগুলো শাসন করত। কুফায় ওয়ালিদ বিন আকবা ছিল গভর্নর কিন্তু যখন মদ্যপান জনিত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সে ফজরের নামাজের ইমামতি করছিল এবং দুই রাকাতের স্থলে চার রাকাত নামাজ পড়েছিল এবং গণআন্দোলনে তাকে অপসারণ করা হয়, খলিফা কর্তৃক তার জায়গায় সাইদ বিন আছ নামক মুনাফিককে ক্ষমতাসীন করা হয়। মিশরে আব্দুল্লাহ্ বিন সারাহ রাসূল (সা.) যাকে কাবা শরিফে আশ্রয় নিলেও তার হত্যা বৈধ ঘোষণা করে ছিলেন, সিরিয়াতে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং বসরাতে আব্দুল্লাহ্ বিন আমর গভর্নর হিসাবে নিয়োজিত ছিল (সূত্র: নাহজুল বালাগা, মূল: মাওলা হযরত আলী, বাংলা অনুবাদক: বজলুর রহমান ওরফে জালালুদ্দিন উয়ায়ছী, পৃ-৪২)।

হযরত আলী খলিফা হয়েই এইসব প্রমাণিত দুর্নীতিবাজ ও অত্যাচারী শাসকদের বরখাস্ত করেন। "ওসমান (রা.) এর আমল থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা জনিত মত বিরোধীতা একটি মারাত্মক ফেতনা হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। সেটি হলো প্রধানত পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, জমিদারতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র বনাম দারিদ্র বিমোচন, তথা, অর্থনৈতিক সাম্য, প্রকৃত ইসলামী আইনের শাসন। এই ধারা অদ্যাবধি বিদ্যমান। হযরত আলী (আ.) প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত ইসলাম রক্ষা করতে গিয়ে উমাইয়াদের, ইসলাম ধর্মের নামে মুনাফিকী, প্রবঞ্চনা, শঠতা, মিথ্যাচার, প্রতারণা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন কিন্তু তদানীন্তন মুনাফিকদের প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এর মুলোৎপাটন করতে সক্ষম হননি এবং হযরত আলীর শাহাদতের (৬৬১ খৃঃ) পর উমাইয়া সর্দার মুয়াবিয়া অন্যায় যুদ্ধ ও কূটকৌশল ও প্রতারণা, গুম খুন, হত্যা, বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন এবং তার মতামতের ভিত্তিতে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক বিকৃতি ঘটান এবং বর্তমানে বহুল প্রচলিত আহলে "সুন্নাত আল-জামাত" ধর্মমতের সূত্রপাত ঘটান। এরই ধারাবাহিকতায় মুয়াবিয়ার কুপুত্র ইয়াজিদ ক্ষমতাসীন (৬৮০ খৃঃ) হয়। উমাইয়া বংশের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত ইসলামের স্বরূপ বুঝতে হলে ইয়াজীদের তিনটি জঘন্যতম কার্যক্রম পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্টীকরণ করা যাবে। ১. কারবালার অন্যায় যুদ্ধে হুসাইনকে শহীদ করা ও আহলে বাইতদের সম্মানিত মহিলাদের বেপর্দায় শহরে নগরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ও বেয়াদবী। ২. মদীনায় রাসূল (সা.) এর রওজাপাককে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করা, হাজার হাজার লোককে হত্যা, মদীনার পুরনারীদেরকে ব্যাপক হারে গণধর্ষন ও শরীয়ত বিরোধী পদ্ধতিতে বাইয়াত গ্রহণ। ৩. মক্কার ক্বাবা শরীফে অগ্নিসংযোগ, ও কামান দাগা। এর ফলে হাজরে আসওয়াদ একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হয়। হযরত ইসমাইলের বদলে বেহেশত থেকে আগত দুম্বার শিং জ্বালানো, কাবার ঘরের ছাদে মৃত মানুষের লাশ টাঙ্গিয়ে রাখা।

অর্থাৎ ইসলামের নবী ও তার পরিবারের প্রতি এদের কোন রকম দয়া, মায়া, ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ কিছুই ছিল না। আল্লাহ্র প্রিয় ধর্মমত ইসলাম ধর্মের দুইটি শহর মক্কা ও মদীনা সম্বন্ধে তাদের প্রকাশ্য অশ্রদ্ধা, অসম্মান ও ধ্বংস করা তাদের দৃষ্টিতে কোন ধর্মীয় বিশ্বাসের ঘাটতি অথবা এসব কাজ করলে সে বা তারা আর মুসলিমদের

ঈমানের সীমারেখায় থাকতে পারে না এই চিন্তা থেকেও উমাইয়া শাসক ও তাদের অনুসারীরা সম্পূর্ণরুপে মুক্ত ছিল।

আমাদের জাতীয় কবি প্রখ্যাত সুফি গবেষক কাজী নজরুল ইসলাম তার বিখ্যাত মহরম কবিতায় বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং বাংলা ভাষায় সর্ব প্রথম "ইয়াযিদি ইসলাম" শব্দ ব্যবহার করে বিদ্যমান ইসলাম ধর্ম যে সেই ইয়াযিদি ইসলামের উত্তরাধিকার বা ধারাবাহিকতা তা তাঁর "মানুষ" কবিতায় লিখেছেন:

মসজিদে কাল শিরনী আনছিল অঢেল গোশ্‌ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে। মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি।
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন,
বলে বাবা আমি ভুখা-ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন,
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা ভ্যালা হল দেখি ল্যাঠা
ভুখা যা-মর ভাগাড়ে। নামাজ পড়িস বেটা?
ভুখারী কহিল না বাবা। মোল্লা হাঁকিল "তাহলে শালা
সোজা পথ দেখ।" গোশ্‌ত রুটি নিয়ে মসজিদে দিল তালা।
ভুখারী ফিরিয়া চলে
চলিতে চলিতে বলে-
আশিটি বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু
আমার ক্ষুধার অন্ন তাবলে বন্ধ করনি প্রভু।
তব মসজিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি;
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।
কোথা চেঙ্গিস, গজনী মাহমুদ, কোথায় কালা পাহাড়
ভেঙ্গে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া-দ্বার।
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা
হায়রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়।
মানুষের ঘৃণা করি
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি
ও মুখ হইতে কেতাবগ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে
যাহারা আনিল গ্রন্থকে তার সেই মানুষের মেরে।
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল মুর্খরা সব শোনো
আদম, দাউদ, ঈসা, মুসা, ইব্রাহিম মোহাম্মদ
কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক কবীর বিশ্বের সম্পদ
আমাদের এরা পিতা-পিতামহ,
এই আমাদের মাঝে,
তাদেরি রক্ত কমবেশী করে প্রতি ধরনীতে রাজে,
আমরা তাদেরি সন্তান, জ্ঞাতি তাঁদেরি মতন দেহ,
কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ

এই কবিতার বিষয় বস্তুকে হালকাভাবে গ্রহণ করার কোন অবকাশ নাই কারণ পবিত্র কুরআনের সূরা মাউনের নির্দেশনা যে গরীব দুঃখীর খানা দেয় না, বা দিতে উৎসাহ প্রদান করেনা সে প্রকৃত পক্ষে ধর্মে অবিশ্বাসী মর্মে আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে যারা ধর্মের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত আছেন বা হয়েছিল তারা প্রকৃত ধর্মের সংরক্ষক নয় বরং তারা হলো ভণ্ড, প্রতারক ও ধর্ম ব্যবসায়ী। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: অতঃপর অযোগ্য উত্তর পুরুষগণ একের পর এক তাহাদের স্থলাভিষিক্তরুপে কিতাবের (ধর্মের) উত্তরাধিকারী হয়, তাহারা এ তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে আমাদেরকে ক্ষমা করা হইবে (সূরা আরাফ : ১৬৯)।

এরই ধারাবাহিকতায় উমাইয়াদের অনাচার, অত্যাচার ও আহলে বাইত ও তাঁদের উপর দীর্ঘ নব্বই বছরের নির্যাতন, জুলুম, খুন ও তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার করুন কাহিনী জন সম্মুখে বর্ণনা করে আহলে বাইতদের ক্ষমতাসীন করার প্রতিজ্ঞা করে সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক পদ্ধতিতে আব্বাসীয়রা নিজেরাই ক্ষমতাসীন হয় (৭৫০খৃ)।

আব্বাসীয়রা পাঁচশত বছরের অধিক সময় (৭৫০-১২৫৮) ক্ষমতাসীন ছিল। তারা এই এজীদী ধর্ম সম্পূর্ণ নতুন নামে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। তারা তাদের প্রচারিত ধর্মমতের একটি প্রতিষ্ঠানিক রুপ দেয়। এতে তারা কুরআনের নতুন বা বিকৃত ব্যাখ্যা, জাল, মিথ্যা হাদিসের মাধ্যমে ৪টি মযহাব প্রতিষ্ঠা করে এবং এর সপক্ষে ৬টি হাদিসের উৎসকে কুরআনের বিপরীতে দাঁড় করায়। রাসূল (সা.) এর বিকৃত জীবন চরিত প্রচারের মাধ্যমে ইতিহাস বিকৃতি তথা ধর্মীয় বিধি বিধানের ব্যাপক বিকৃতি এই নতুন ধর্ম মতে অন্তর্ভুক্ত করে। এ ধর্ম মত সমাজে তাদের ধন বল, অস্ত্র বল ও তাদের অনুগত ও অনুসারী আলেম সমাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যে, পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয় যে, আল্লাহ্‌ ও তাঁর বিভিন্ন নবী একই ধর্ম যার নাম ইসলাম তা প্রচার করে আসছেন। সেই নবীর ধর্মে ব্যাপক বিকৃতি ও তাঁর অনুসারীদের ধর্মদ্রোহী কর্মকাণ্ডের জন্য একের পর এক নবী প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তাদের ধর্মীয় চিন্তা বা আক্বীদা মূলত একই ছিল বা আছে তবে তাদের বিশ্বাসের সাথে কর্ম পদ্ধতি বা শরীয়ত সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তন করা হয়। এরশাদ হচ্ছে: আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি ধর্ম যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নূহকে যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে–যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে। এই বলে যে তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর ও তার মধ্যে

মতভেদ করোনা। তুমি অংশীদারীদের যার দিকে ডাকছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ধর্মের দিকে টানেন আর যে তাঁর দিকে ফিরে আসে তাকে তিনি ধর্মের দিকে পরিচালিত করেন (৪:১৩)। "আর এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক হিসাবে আমি তোমার উপর সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। তাই আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেইভাবে তুমি তাদের বিচার কর আর সে সত্য তোমারই কাছে এসেছে তা ত্যাগ করোনা। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শিরআত (শরীয়ত/আইন) ও স্পষ্ট পথ (ত্বরিকা) নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক জাতি (এক ধর্মাবলম্বী) করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য করেন নি। তাই সৎ কর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্র দিকেই তোমরা সকলেই ফিরে যাবে। তারপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করেছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন (সূরা মায়েদা: ৪৮)।

পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের মর্মানুযায়ী জানা যায় যে, সকল নবীদের একই ধর্মপথ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তবে তাদের শরীয়তে বিভিন্নতা রয়েছে কিন্তু সে কারণে বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজনীয়তা নাই কারণ জ্ঞানের এক পর্যায়ে প্রবেশ করলে আল্লাহ্ স্বয়ং এই মতভেদ নিরসন করে দেবেন আল্লাহ্তালার কোন নবী আগমনের আগ পর্যন্ত পূর্ববর্তী নবীর মূল শিক্ষা যে পালন করবে (পরবর্তীতে ধর্মের বিকৃতি বা সংযোজন ব্যতীত) সে মুক্তি পাবে। তাই আমরা দেখতে পাই যে, রাসূল (সা.) এর পূর্ব পুরুষগণ যারা সরাসরি হযরত ঈসমাইল (আ.) এর বংশধর তাঁরা রাসূল (সা.) এর বাণী প্রচারের পূর্ব পর্যন্ত হযরত ইসমাইল (আ.) এর ধর্ম মতের অনুসারী হিসাবে মুসলমানই ছিলেন। যার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় রাসূল (সা.)'র সাদী মোবারক এ হযরত আবু তালিব এর খোতবা থেকে। আবু তালিবের ভাষণ ছিল নিম্নরূপ:

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র-যিনি আমাদের ইবরাহীমের বংশেও ইসমাইলের গোত্রে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের মর্যাদা ও মুদাবের পবিত্র উৎস থেকে উৎসারিত করেছেন। যিনি আমাদেরকে তাঁর গৃহের রক্ষক ও হজ্বের ইমাম মনোনীত করেছেন যার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে অসংখ্য লোকের আগমন ঘটে এবং এমন 'হরম' দান করেছেন যেখানে কেউ উপস্থিত হলে পুরোপুরি নিরাপত্তা লাভ করে। যিনি আমাদের জনগণের নেতা মনোনীত করেছেন। অতঃপর বলছি। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ সম্পর্কে। তার সাথে অন্য কারো তুলনাই হয় না। যদিও তার ধন সম্পদ অতি অল্প তবে জেনে রাখবেন ধন সম্পদ নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী, মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে আমার কি সম্পর্ক রয়েছে আপনারা সকলে তা জানেন। তিনি বিবি খাদীজা বিনতে খুয়াইলদকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল, অতএব, আমি আমার সম্পদ হতে বিশটি উট এ বিবাহের মুহর হিসাবে দান করলাম। তাঁর ভবিষ্যত, আল্লাহ্র শপথ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও গৌরবময়।

যখন আবু তালিবের ভাষণ শেষ হলো তখন বিবি খাদিজার পিতৃব্য পুত্র ওরাকাহ বিন নওফেল ভাষণ দিতে উঠেন। তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল: সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি আমাদের সে সব গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যার কথা আবু তালিব উল্লেখ করেছেন। আমরা সারা আরবের নেতা ও ইমাম আর আপনারা সর্বপ্রকার সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কোন দল বা গোষ্ঠীই আপনাদের মর্যাদা অস্বীকার করতে পারবে না এবং আপনাদের আভিজাত্য ও মর্যাদাকেও চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমরা অত্যন্ত আনন্দ উদ্দীপনা নিয়ে আপনাদের সাথে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হতে যাচ্ছি। অতএব হে কোরায়শের লোকেরা আপনারা সাক্ষী থাকুন। আমি চারশ মিসকলের বিনিময়ে খাদিজা বিনতে খুয়াইলদকে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্র হাতে তার জীবন সঙ্গিনী হিসাবে তুলে দিচ্ছি"। (তথ্য সূত্র: বিশ্বনবীর রাজনৈতিক জীবন-ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্, পৃ-৬৫-৬৬)।

রাসূল (সা.) এর বিবাহে প্রদত্ত উভয় পক্ষের বক্তব্যে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা হযরত ইসমাইলের ধর্মের অনুসারী হিসাবে ইমানদার হিসাবে সমাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তাদের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্মে তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। অথচ এই ধর্মীয় বাস্তবতার মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে পাশ কাটিয়ে আব্বাসীয় আলেমগণ এক নতুন ধর্মমত খাড়া করলেন যাতে বলা হলো আবু তালিব যেহেতু তাদের বর্ণনা মতে বাহ্যিকভাবে ইমান আনেন নাই তাই তিনি দোজখে গেছেন এবং তার শাস্তিও তারা বর্ণনা করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় এক শ্রেণীর আলেম রাসূল (সা.) এর পিতা-মাতাকে দোজখের বাসিন্দা সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন। অথচ তারাও যে ইসমাঈলের ধর্ম ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন তা সর্বজনবিদিত। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলাম ধর্মকে এক ধরণের নতুন ধর্মমত হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হলো এবং অন্যান্য সকল ধর্মমতকে বাতিল বা অগ্রণযোগ্য বিবেচনা করা হলো এবং আব্বাসীয় আলেমদের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ব্যাখ্যা ও মতামত অগ্রাহ্য বা গুরুত্বহীন বা তাদেরকে শিয়া-রাফেজী বা ধর্মদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হলো। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানেও এর সাথে আল্লাহ্র নবী-রাসূলসহ প্রিয় বান্দাদেরকে ভালবাসা বা সম্মান বা শ্রদ্ধা করাকে শিরক বিদআতের' ভয়াবহ চক্রে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো।

আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কীল (৮৪৭-৮৬১) এর ধর্মমত যে পূর্বোক্ত বর্ণনার সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ তার বাস্তব প্রমাণ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. মফীজ্জিল্লাহ্ কবীর লিখিত "ইসলাম ও খিলাফত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "মুতাওয়াক্কিল মুতাজিলাদের নির্যাতন আরম্ভ করিলেন, তিনি এক ফরমান জারি করিয়া মুতাজিলা মতবাদ পোষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মুতাজিলা মতাবলম্বী আলিম ও সরকারি কর্মচারীদের চাকুরী হারাইতে হইল এবং তাহাদের সম্পত্তি বাজোয়াপ্ত হইল। বিখ্যাত আলিম ও কাজী ইবন আবি দুয়াদ পূর্ববর্তী তিন খলিফার আমলে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে ও মুতাজিলী মতবাদের জন্য প্রধান কাজীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাহাকে পদচ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি তাঁহার ভূসম্পত্তি বাজোয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে পরিবারের অন্যান্য লোকজনসহ কারারুদ্ধ করেন। কয়েক বৎসর পর কাবাগৃহে তার মৃত্যু হয়। তিনি (মুতাওসাক্কিল) প্রকাশ্যে আলী (রা.) এর স্মৃতির (মাজারের) প্রতি অবজ্ঞা (ধ্বংস করেন) প্রদর্শন করতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। তিনি কারবালায় আলীর (রা.) পুত্র হুসেনের সমাধিকে ধুলিসাৎ করিয়া দেন এবং ঐখানে তীর্থযাত্রা (মহরম বা আশুরা উদ্‌যাপন) নিষিদ্ধ করিয়া অমান্যকরীদের কারাবাসের ভয় প্রদর্শন করিলেন। ফাদাক বাগা কর্তৃক যাহা মারওয়ান কর্তৃক (প্রকৃত পক্ষে হযরত আবু বকর) (রা.) রাসূল (সা.) বংশধরগণের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় ওমর (৭১৭-৭২০ খৃঃ) কর্তৃক প্রত্যার্পন করা হইয়াছিল। পুনরায় পরবর্তী সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়। তিনি (মুতাওয়াক্কিল) প্রথম তিন খলিফাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন (অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) থেকে অধিক মর্যাদাশীল ইহা ধর্ম মত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন) আবু বকর (রা.), উমর (রা.) ও আয়েশা (রা.) সম্পর্কে নিন্দাসূচক মন্তব্য করায় এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। (অর্থাৎ তাঁরা যে শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে নিয়োজিত হন নাই বা তাদের সময়ে যে বিভিন্ন ধর্ম-রাজনৈতিক (Religo-Political) বিষয়ে বিতর্ক ও পরবর্তীতে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক জঙ্গে জামাল (৬৫৬ খৃ:) এ অন্যায়ভাবে অংশগ্রহণ ইত্যাদি আলোচনা-সমালোচনা তথা প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন বা ইতিহাস পর্যালোচনা নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে নির্ধারণ করেন। তিনি উমাইয়া শাসকদেরও সম্মান করতেন। অর্থাৎ মুয়াবিয়া যে অন্যায়ভাবে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ও তার পুত্র ইয়াজীদ যেসব ধর্মদ্রোহী কাজ করেছিলেন তার আলোচনাও নিষিদ্ধ করেন।

তাহার রাজত্বে ইহুদী ও খৃস্টানদের প্রতি নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। তাহাদের জন্য অশ্বারোহন নিষিদ্ধ করা হয়। তাহাদের পোশাক পরিচ্ছেদ ও বাড়ির দরজায় চিহ্ন ব্যবহার করতে হইত। অধিকন্তু তাহাদেরকে রাজ কার্যে নিযুক্ত করা হইত না (পৃ: ২৭৩-২৭৪)। এই মোতায়াক্কিল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামকেই আমরা এজীদী ইসলাম নামে অভিহিত করেছি। বাহ্যিক আচার সর্বস্ব এ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মূল মোহাম্মদী ইসলামের ভাবধারায় যে ধর্মমত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাই সুফিবাদ। তাছাড়া যেহেতু সমাজ প্রচলিত ধর্ম চিন্তায় স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিলনা, তাই স্রষ্টার সাথে সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য মানব মনের আকুল আকুতি সুফি মতবাদের জন্মদান করে। নীতি (Ideal/Principle) ও মতবাদের (Concept) চেয়ে গভীর চিন্তা ও অনুভূতিই সুফিবাদের মূল কথা। বিখ্যাত বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান (৭২১-৮১৫ খৃ:) যিনি হযরত ইমাম জাফর সাদিকের ছাত্র ছিলেন যাকে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের পিতাও বলা হয়। জাবির ইবনে হাইয়ানকেই আধুনিক সুফিগণের মধ্যে প্রথম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। প্রথম যুগের সুফিগণের মধ্যে ইব্রাহীম ইবন আদহাম (৭১৮-৭৮২ খৃ:) যিনি বর্তমান আফগানিস্তানের বলখ নামক এলাকার রাজা ছিলেন যার বংশ ধারায় হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর নাতি হযরত ইমাম বাকির (আ.) এর পুত্র আব্দুল্লাহ্ যিনি হযরত ইমাম জাফর সাদেকের ভাই হিসাবে সম্পর্কিত ছিলেন। ইনি বুদ্ধদেবের মত রাজত্ব ত্যাগ করে সুফি সাধনায় লিপ্ত হন। হযরত রাবিয়া বসরী (রহঃ) (৭১৮-৮০১খৃ.) এই সময়কার একজন আল্লাহ্‌র মহান বন্ধু ছিলেন। নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে বিখ্যাত সুফি মারুফ কারখী (৭৫০-৮১৫) যিনি হযরত ইমাম আলী রেযার কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে হযরত দাউদ তাঈ এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মারুফ কারখীর সময় হতে নিছক বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্র সাধনা হতে সুফিবাদের পৃথক ভাবধারায় উৎপত্তি হতে থাকে।

সুফিবাদকে যিনি সর্বপ্রথম বিশেষ মত ও পথ হিসাবে স্বাতন্ত্র দান করেন তিনি হলেন হযরত যুননুন মিশরী (রহঃ) (৭১৬-৮৫৯ খৃ:)। মরমীয় পুলকানুভূতির (ওয়াজদ) মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিব্য জ্ঞান লাভের কথা তিনিই প্রথম ব্যক্ত করেন। পারসিক বায়েজীদ আল বিস্তামী (৮০৪-৮৭৪খৃ:) সর্বপ্রথম ফানা বা ব্যক্তি সত্তার বিলোপ নীতি প্রবর্তন করেন। ৯২২ খৃস্টাব্দে ইবনে মনসুর আল হাল্লাজ বিশেষ অতিন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় "আনাল হক" বা আমি সত্য উচ্চারণের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। সুফি বায়েজিদের "ফানার" অভিজ্ঞতার এটি অন্যতম অভিব্যক্তি। পরমাত্মার মধ্যে মানবাত্মার অবলুপ্তের যে অনুভূতি, হাল্লাজ আনাল হক "এর মাধ্যমে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কবিতায় তাহার সুফিভাব ধারা ফুটিয়া উঠেছে: আমি সেই, যাহাকে আমি ভালবাসি

এবং যাহাকে আমি ভালবাসি সেই আমি; আমরা দুই আত্মা একই দেহে আমাদের বাস, তুমি যখন আমাকে দেখ, তখন তাকেও দেখ এবং যখন তুমি তাহাকে দেখ তখন আমাদের উভয়কেই দেখ। সুফিবাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্পেনের মরমী সাধক মুহীইদ্দন আল আরাবী (১১৬৫-১২৪০ খৃ:) যাবতীয় পদার্থ আল্লাহ্‌র অনুভূতির ধারণা তারই অবদান। মরমী কবি ও সাধকদের মধ্যে পারসিক শায়খ সাদী (১২১০-১২৯১ খৃ:) , হাফেজ সিরাজী (১৩১৫-১৩৯০), মাওলানা রুমী (১২০৭-১২৭৩) বিখ্যাত নাম। দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে সুফিবাদে যাদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে আল ফারাবী (৮৭২-৯৫০ খৃ:), ইমাম গাজ্জালী (১০৫৮-১১১১ খৃ:) অন্যতম। প্রথম পাঁচ শতাব্দী যাবত সুফিবাদ সঙ্গত কারণেই ব্যক্তি ভিত্তিক ছিল। দ্বাদশ খৃস্টীয় শতকের শেষ ভাগে বিভিন্ন সুফি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (১০৭০-১১৬৬) প্রতিষ্ঠিত কাদেরিয়া ত্বরিকা, আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথ হিসেবে মুসলিম জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। মরমী কবি জালাল উদ্দিন রুমীর অনুসারীদের ত্বরিকার নাম মৌলবী ত্বরিকা। ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই ত্বরিকার লোকেরা ভক্তিমূলক গানের ব্যবহার করত।

শিহাব উদ্দিন সুহরাওয়ার্দী (১১৫৫-১১৯১ খৃ:) তাহার সুফি মতবাদের জন্য ১১৯১ খৃস্টাব্দে আলেপ্পোতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি বিখ্যাত সুহরাওার্দী ত্বরীকার প্রবর্তক সুফি পন্থায় বৈরাগ্য, দারিদ্র্য কৃচ্ছ্র সাধনায় জিকির ও ধ্যানের মাধ্যমে মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সাধিত হয়। ভালবাসার সাহায্যে এই মিলন সংঘটিত হয় ভয় ও ভীতির মাধ্যমে নয়। সুফিদের আদর্শ হিসাবে মহীয়সী হযরত রাবিয়া বসরী (রা.) একজন আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি অনুশোচনা (তাওবা) ধৈর্য্য, দারিদ্র ও আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতার (তাওয়াক্কুল) জন্য সমগ্র মুসলিম জগতে সুপরিচিতা, তার অপরাপর বাণীর মধ্যে প্রধান হলোঃ "আমি আল্লাহ্‌র ভয়ে কিংবা বেহেশতের আশায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করি নাই, শুধু তাহারই প্রেমে এবং তাহাকে পাওয়ার আশায় ইবাদত করিয়াছি।"

আমার এই পুস্তক "এজীদী ইসলাম বনাম সুফিবাদের প্রতিষ্ঠাতা ১২ ইমাম" সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে আমার দুই যুগের ইসলামের ইতিহাস, কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদিস গবেষণার ফসল। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির বিরুদ্ধাচরণ, বা চরিত্র হনন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমার ব্যক্তিগত ইমান মজবুত করার মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়ে কুরআনের ও রাসূল (সা.) এর প্রকৃত ইসলামকে জানা, বুঝা ও মান্য করার জন্যই আমার দুই যুগের অধ্যয়ন ও গবেষণা। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে ধর্ম মানব সমাজকে উপহার দিয়েছেন তা বর্তমানে প্রচলিত নাই, সাধারণ পাঠ্য পুস্তকে বা মাদ্‌রাসার আলেমদের কাছেও তা পাওয়ার কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা নাই। তাই প্রত্যেক ইমানদার মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো কুরআন ও হাদিস গবেষণার মাধ্যমে মূল মোহাম্মদী ইসলামকে আবিষ্কার করার ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এ ব্যাপারে অন্ধ আনুগত্য, ধর্মান্ধতা, কূপমন্ডুকতা, উগ্র আরব জাত্যাভিমান (Ultra Arab Nationalism) ভিত্তিক বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত ইসলামকে বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর আহলে বাইতের সান্নিধ্যে হাজির হওয়ার কোন বিকল্প নাই। কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি এই বইতে উল্লেখিত কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে কোন নুতন তথ্য উপস্থাপন করতে আগ্রহী হন তাহলে বিনা দ্বিধায় আমাদেরকে জানাতে পারেন। আমরা আনন্দিত চিত্তে আমাদের ভুল (যদি প্রমাণিত হয়) তা মেনে নিব। এই পবিত্র বইটি যেন আমার নাজাতের উসিলা ও পাঠকদের হেদায়েতের ওসীলা হিসাবে ভূমিকা পালন করতে পারে এটাই মহান স্রষ্টার কাছে আমার আকুল প্রার্থনা।

– খাদেমুল ইসলাম
ডা. এ. এন. এম. এ মোমিন

মন্তব্য

বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও ঐতিহাসিক খাদেমুল ইসলাম (ডা. এ. এন. এম.এ মোমিন) রচিত "এজিদী ইসলাম বনাম সুফিবাদের প্রতিষ্ঠাবাদ" শীর্ষক পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি আমি আগাগোড়া পড়েছি। আমি যা বুঝেছি, পুস্তকটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো প্রকৃত ইসলামের সাথে তথাকথিত পোষাকী ইসলাম (যাকে লেখক 'এজিদী ইসলাম' নামে অভিহিত করেছেন) এর পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব বা সংঘাত কোথায় তা' তুলে ধরা। লেখক বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্ত এবং ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্য দলিল প্রমাণাদিসহকারে এ সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা ও বানোয়াট হাদিস প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ হাসিল ও বংশানুক্রমিকভাবে ক্ষমতা জবর দখলের অপচেষ্টায় ইসলামকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করার এবং "আহলে বাইত" এর খেলাফত ও ইমামতকে অস্বীকার করার হীন চক্রান্ত ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে মুয়াবিয়া ও এজিদের শাসনামল থেকে যা অদ্যাবধি কোন না কোন আকারে চালু রয়েছে। ইসলামের এ বিকৃত উপস্থাপনাই হচ্ছে তথাকথিত 'এজিদী ইসলাম' যার মূল বৈশিষ্ট্য হল হত্যা, গুম, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস, কলহ, মারামারি, রক্তপাত, কাটাকাটি, দলাদলি এবং সংঘাত। এই 'এজিদী ইসলামে'র অনুসারীরাই কারবালার ময়দানে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কে শহীদ করেছে অত্যন্ত নির্মমভাবে। হযরত ইমাম হাসান (রা.), হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা.), হযরত ইমাম বাকের (রা.), হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রা.), হযরত ইমাম মুসা আল কাজিম (রা.), হযরত ইমাম আলী রেজা (রা.), হযরত ইমাম আলী তৃকী (রা.), হযরত ইমাম আলী নকী আল হাদী (রা.), হযরত ইমাম হাসান আসকারী (রা.) প্রমুখ আহলে বাইতকে এজিদের উত্তরাধিকারী উমাইয়া ও আব্বাসীয় বংশের শাসকগণ বিষ প্রয়োগে শহীদ করেছে যা ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত কলঙ্কজনক অধ্যায়।

'আহলে বাইত' এর উত্তরসুরী ইমামগণকে এভাবে শহীদ করা না হলে আজ ইসলামের ইতিহাস অন্য রকম হতো। সোনালী ইতিহাস হতো। আহলে বাইতের ইমামতের যোগ্য প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী হলেন মহান অলিয়ে কামেলীনগণ ও সুফি সাধকগণ। তাঁরা আহলে বাইতের প্রেমিক এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র তথা ইসলামের প্রকৃত অনুসারী। আজ সারা মুসলিম বিশ্বে অশান্তির মূল কারণ হল প্রকৃত ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুতি। তাই সারা বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাসাওউফের চর্চা করতে হবে এবং তাসাওউফ ভিত্তিক ইসলামের অনুসারী হয়ে খোদা প্রদত্ত ইমামতের নিয়ন্ত্রণাধীন শাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। লেখক কুরআন-হাদিসের আলোকে এজিদী ইসলামের সাথে সুফি ইসলামের পার্থক্য অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এজিদী ইসলামের অনুসারীরা যে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত তা প্রমাণ করেছেন এবং তাদের অনুসৃত পথ যে প্রকৃত ইসলামের পথ নয় সে ব্যাপারে ঐতিহাসিক অখণ্ডনীয় দলিল-প্রমাণাদির মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, মহানবী (দঃ) এবং আহলে বাইতের মহব্বত বিহীন ইসলাম প্রকৃত ইসলাম নয়। আহলে বাইতের প্রতিনিধি ও যোগ্য উত্তরসুরী অলি-আল্লাহ্‌গণের ইমামতকে স্বীকার না করার কোন বিকল্প নেই। লেখক এ বিষয়টি অত্র পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পুস্তকটি পাঠে লেখক, গবেষক, ইতিহাসবিদসহ সর্বস্তরের পাঠকগণ উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। লেখককে এ দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অভিনন্দন জানাই এবং বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। খোদা লেখকের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন!

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রফেসর (অবঃ),
অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
ডিন, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ,
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

প্রথম অধ্যায়

সুফি ও সুফিবাদ

বাংলা অভিধান অনুযায়ী সুফি অর্থ ধার্মিক। মরমী সাধক। সুফি শব্দটির সূচনা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা লুৎফী জুমায়া তাঁর নিজ প্রবন্ধে (তারিখে ফালাসিফাতে ইসলাম) মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, সুফি শব্দ দুটি গ্রিক শব্দ "সুই উসুফিয়া" শব্দ থেকে উদ্ভুত। গ্রিক ভাষায় এর অর্থ স্রষ্টা বিষয়ক জ্ঞান। উল্লেখ্য গ্রিক ভাষায় Sophia শব্দের অর্থ জ্ঞান। এই ভাষায় Philos অর্থ প্রেম বা অনুরাগ। তাই Philos+Sophia শব্দ দুটি থেকে Philosophy শব্দ তৈরী করা হয়েছে। আর এ বিষয়ে অনুরাগীর নাম দেওয়া হয়েছে Philosopher এবং এর অর্থ বলা হয়েছে জ্ঞানপ্রেমী বা জ্ঞানানুরাগী। তাই আমরা বিবেচনা করতে পারি যে, স্রষ্টা প্রেমিক বা স্রষ্টানুরাগী তথা আল্লাহ্ প্রেমিক বোঝানোর জন্য এই শব্দটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাই এটি একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত জ্ঞান। অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক বিজ্ঞানকে আমরা সুফিবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি। এই বিষয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা যায় যে, পরম সত্তাকে জানার ও চেনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। মানুষ এই পরিচয়-আকাঙ্ক্ষায় নিরন্তর গতিতে এগিয়ে চলে সেই আল্লাহ্র পথে, যার ধারণা প্রচলিত দর্শন শাস্ত্রে নৈর্বক্তিক আল্লাহ্ রূপে মানুষের অন্তরের এই অনন্ত পিপাসাকে নিবারণ করতে আদৌ সমর্থ নয়। সেজন্যই মানুষ তার হৃদয়ের মধ্যে সেই পরম প্রিয়তমের সন্ধান লাভ করে তাঁর সাথে নিবিড় যোগসূত্রে মিলিত হয়েছে। পরম সত্তাকে জানার এই প্রচেষ্টা বিষয়ক জ্ঞানকে মরমীবাদ Mysticism বা Occulticism হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

পৃথিবীর সকল ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যেই এই মরমীবাদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিধায় সুফিবাদের শিক্ষায় বিভিন্ন ধর্মের মিল দেখতে পাওয়া যায় যা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কারণ ইসলাম ধর্ম কোন অভিনব বা নতুন ধর্মমত হিসাবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় নাই। বরং আদম (আ.), নূহ (আ.) ইব্রাহীম (আ.), মুসা (আ.) ও ঈসা (আ.) পৃথিবীতে যে শাশ্বত ইসলাম ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই একই ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং পূর্ববর্তী সকল ধর্মগ্রন্থের সত্যতা প্রত্যয়ন করেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা : তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, ইব্রাহীম, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের কাছে ওহী প্রেরণ করেছিলাম ও দাউদকে যবুর দিয়েছিলাম, অনেক রাসূল যাঁদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি ও অনেক রাসূল যাঁদের কথা তোমাকে বলিনি। আর মুসার সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাৎ কথা বলেছিলেন। সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রাসূল পাঠিয়েছি যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে

মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ তো শক্তিমান ও তত্ত্বজ্ঞানী। (সুরা ৪ : ১৬৩-১৬৫)। এ কারণেই ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষার সাথে অন্য ধর্মের যে মিল দেখতে পাওয়া যায় তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বরং এর বিপরীত চিন্তাধারা একটি কুরআন বিরোধী চিন্তাধারা। এই বিপরীত চিন্তাকে যারা উৎসাহিত করেন। তারা প্রকৃত পক্ষে ধর্মের প্রকৃত শত্রু। কারণ তারা বিশ্ব মানবতার মহামিলনের পথে প্রধান অন্তরায় হিসাবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। অত্যন্ত সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, একশ্রেণীর মুসলিম বুদ্ধিজীবী ইসলামের সুফিবাদ বা তাসাউফের সাথে অন্যকোন ধর্মের মিল থাকতে দেখলেই পরিকল্পিতভাবে গেল, গেল বলে সোচ্চার হয়ে উঠেন তা প্রধানত অজ্ঞতাপ্রসূত এবং কার্যত পর ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও অহমিকা প্রসূত। তাই বিষয়টি পবিত্র কুরআনেরও ভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত / বিশ্লেষণের দাবি রাখে। "মুমিনগণ, ইয়াহুদীগণ, সাবীগণ, (নক্ষত্র মূর্তি পূজারীরা বা অনুরূপ) খৃস্টানগণের মধ্যে কেহ আল্লাহ্ ও আখিরাতে ইমান আনলে এবং সৎ কার্য করিলে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হইবেনা। (সূরা ৫ মায়িদা ৬৯) এই আয়াতের মর্মানুযায়ী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও যে ব্যক্তি আল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত চরিত্রের অধিকারী হয়ে সৎ কর্মে নিয়োজিত থাকবেন। তিনি অবশ্যই মুক্তিপ্রাপ্ত হবেন। তিনি আফসোস করবেন না বা দুঃখিত হবেন না বরং বেহেশতে যাবেন। তাই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্পর্কে কোন ধরণের ভুল ধারণা থাকা আমাদের জন্য একটি মারাত্মক অপরাধ।

সুফিদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য

সুফিগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও গুণাবলী সম্পর্কে ইমাম খতীব বাগদাদী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তারিখে বাগদাদ এ উল্লেখ করেছেন, প্রখ্যাত সুফি হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) আব্বাসীয় খলিফা আবুল ফজল জাফর, মুতাওয়াকিকল আলাইল্লাহ (৮৪৭-৮৬১) কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে আউলিয়াদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। যুন্নুন (রহঃ) বলেন, আমিরুল মোমিনুন। আউলিয়া হলেন ঐ মহান ব্যক্তিগণ, যাঁরা আল্লাহ্র উজ্জ্বল আলোর নিচে মহিমান্বিত তাঁর সম্মানের চাদরে আচ্ছাদিত হন। যাঁদের অন্তরে তিনি ঢেলে দিয়েছেন গায়েবী তত্ত্বের ভাণ্ডার। প্রিয় মাহবুব আল্লাহ্র সাথেই তাঁদের অন্তর চক্ষু থাকে সদা ব্যস্ত। ললাট চক্ষু সদা, ক্ষীপ্রমাণ থাকে তাঁর মহিমার পানে। প্রতিষেধক হাতে তিনি তাদেরকে অধিষ্ঠিত করেছেন মারিফাতে খোদার আসনে। সন্ধান দিয়েছেন আত্মিক রোগ নিরাময়ের উৎসসমূহের। তাদের অনুসারীগণকে আবির্ভূত করেছেন তাকওয়া ও খোদাভীরুতার প্রতীক রূপে। নিশ্চয়তা দিয়েছেন তাঁদের কৃত প্রার্থনা কবুল করার। আল্লাহ্ তাঁদেরকে সম্বোধন করে বলেন, হে আমার প্রিয় বান্দাগণ, আমার ভীতি সঞ্চারিত হয়ে কেউ তোমাদের কাছে আপতিত হলে তোমরা তার সুশ্রূষা করো।

আমার করুণা বঞ্চিত আহত ব্যক্তিদের সাথে সদয় ব্যবহার করো। আশাহতদের প্রেরণা যোগাও। পথভ্রষ্টদের দ্বীনের পথে আহ্বান করো। যারা আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, তাদেরকে প্রতিষ্ঠা করো। যারা আমার অনুগ্রহের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে চায় তাদেরকে সুসংবাদ দাও। অনুরূপভাবে যারা আমার কথা ভুলে গিয়ে দিকভ্রষ্ট হয়ে যায় তাদেরকে আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দাও। গরীব-দুঃখীদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। কারো অনুপস্থিতি টের পেলে তার সন্ধান করো। কেউ কোন অপরাধের অপবাদ দিলে তা সহ্য করার মানসিকতা সৃষ্টি করো। নিজের পাওনা অধিকারে কেউ কম দিতে চাইলে তা ছাড় দিয়ে দাও। কেউ কোন ভুল করে বসলে উপদেশের মাধ্যমে তা সংশোধন করো। অসুস্থদের সেবা করো। কোন উপঢৌকন আসলে তা পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করে নাও। আমার পক্ষ থেকে কোন জীবিকার ব্যবস্থা হলে তা সাদরে গ্রহণ করে নাও। হে আমার অলিরা। আমি তোমাদেরকে যেমন তিরস্কার করি, তেমনিভাবে আমি তোমাদেরকে উৎসাহিতও করি, আমি তোমাদেরকে সহস্রবার খোঁজাখুঁজি করি। কেননা তোমরা আমাকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছো। তোমরা তোমাদের "রব" হিসাবে আমাকে গ্রহণ করেছ। আমি তোমাদেরকে আমার বিশেষ বান্দা হিসাবে সৃষ্টি করেছি। আমি আমার কাজে তোমাদেরকে ব্যবহার করি।

কোন দাম্ভিক ব্যক্তিকে আমি আমার কাজে লাগাইনি। কোন লোভাতুরের আনুগত্য আমি গ্রহণ করিনি। আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান, অফুরন্ত নেয়ামত 'তোমাদের জন্য রয়েছে আমার মহান করুনা। আমার সাথে হবে তোমাদের উত্তম বিনিময়। এ কারণে আমি তোমাদের কাছে চাই গভীর খোদাভীতি। আমি মানুষের অন্তরের নিরীক্ষক। আমি অদৃশ্য সম্পর্কে মহাজ্ঞাত। আমি মানুষের মনোযোগ অবলোকন করি। আমি মানুষের চিন্তার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। আমি মানুষের অন্তরের খুবই কাছে। মানুষের চোখের পাতা কি বলতে চায় আমি তা জানি। তোমাদের অন্তরে আমার ভয় ব্যতীত যেন অন্য কোন প্রতাপাশালীর ভয় জায়গা না পায়। যেইবা তোমাদের ক্ষতি করতে চাইবে, আমি তাকে ধ্বংস করে দেব। কেউ তোমাদের কষ্ট দিতে চাইলে আমিই বরং তাকে কষ্ট দিব। যে তোমাদের সাথে শত্রুতা করবে। আমিও তার সাথে শত্রুতা করব। আর যে তোমাদের সাথে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিবে, আমিও তার সাথে বন্ধুত্ব করব। যে তোমাদের সাথে উত্তম পন্থা অবলম্বন করবে, আমিও তার

সাথে উত্তম ব্যবহার করবো। তোমরা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোমরা আমার প্রিয় বান্দা, তোমরা আমার জন্য এবং আমিও তোমাদের জন্য।

এ পর্যায়ে উপস্থিত একজন যুন্‌নুন (রহঃ) কে প্রশ্ন করলো। এ লোকগুলো কারা? যুন্‌নুন (রহঃ) উত্তরে বললেন: এঁরা অতিথি পরায়ন, কাফেলা বিশ্রামের ঠিকানা খুঁজে পায় তাদের পাশে। তাদের রক্ত মাংসের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে আল-কুরআনের আলোক রশ্মি। আল-কুরআনের জ্যোতিতে তাঁরা খানিকের জন্য স্ত্রী-সংসারের কথা ভুলে গিয়ে মহান আল্লাহ্‌র ধ্যানমগ্নে একাকার হয়ে যান। পবিত্র কুরআনকে অন্তরের অন্তস্থলে স্থান দিয়ে আলোকময় করেছেন। হৃদয়ের সব জানালা খুলে গেছে এ কুরআনের ছোঁয়া পেয়ে। পার্থিব সকল অভিপ্রায় হার মেনে যায় এ মহাগ্রন্থের জাগতিক শক্তির সামনে। এ আসমানী কিতাবকে তারা তমসাচ্ছন্ন পথে প্রদীপ্ত মশাল রূপে ব্যবহার করেছেন। এটি তাদের জন্য একটি অকাট্য দলিল। এ কারণেই সকল মানুষ যখন ঘুমের নেশায় আত্মহারা হয়ে যায়, তখন তারা মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের প্রতিযোগে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। দিন-দুপুরে, ঘরে ঘরে, যখন বাসন কোসনের ঝণঝনানি কানে লাগে। তখন তারা সংযম প্রদর্শন করত রোযা রাখেন, একদিকে সকল মানুষ যখন নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে নিরাপদ ও আশংকা মুক্ত মনে করে। অন্য দিকে তারা থাকেন যথেষ্ট শংকিত ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে, "রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম, (সূরা ফুরকান : ৫৩) (সূত্র : কুরআন ও হাদিসের আলোকে সুফিতত্ত্ব ও সুফিবাদ: আল্লামা শায়খ সৈয়দ ইউসুফ হাশেম আর রেফায়ী, প্রথম প্রকাশ ২০১১, সন্‌জরী পাবলিকেশন।

সুফিদের ধর্মীয় বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি

সুফিগণ আল্লাহ্‌কে হক-মহাসত্য/বাস্তব (The Truth / Real) ও মহাপ্রেমময় (ওয়াদুদ) বলে বিশ্বাস করেন। আল্লাহ্‌র এই দুইটি বৈশিষ্ট তাঁদের কাছে এত বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে যে, মহান আল্লাহ্‌তালার অন্যান্য রূপ তাদের কাছে অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে থাকে। সুফিগণ নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র দাস (একান্ত বিনীত দাস) হিসাবে বিবেচনা করেন। চূড়ান্ত অধীনতা প্রকাশ করার অর্থে)।

তবে তারা তাঁকে বন্ধু বা মাশুক বা প্রেমাস্পদ বলে মনে করে এবং সর্বদা প্রেম বিগলিত হৃদয়ে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করেন। তারা আল্লাহ্‌কে চিরস্থায়ী (কাদিম) বলেই বিবেচনা করে এবং এটার উপর এত জোর দেন যাতে তারা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই (লা-মজুদা-ইল্লাল্লাহ্‌) এবং তিনি ছাড়া কোন উদ্দিষ্ট নেই (লা-মাকসুদা ইল্লাল্লাহ)।

সুফিগণ 'হামে উস্‌ত' তত্ত্বে বিশ্বাসী। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো 'সবই সে' (All is He) এটা তাওহিদের একটা মৌলিক বিষয় যাতে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌ বিশ্ব জগতের সর্বব্যাপি অস্তিত্ববান এবং তাঁর অস্তিত্ব চিরস্থায়ী ও চির সত্য, তিনি ছাড়া অন্যসব কিছু ধ্বংসশীল ও বিলুপ্তি প্রবণ। এ কথার মূলভাব হলো সব কিছুই তার প্রকাশ। খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (১১৪২-১২৩৬) বলেছেন : আউয়াল (আদি) ও (আখের শেষ), জাহের (প্রকাশ) ও বাতেন (গুপ্ত)-সবই সে।

শুধু সেই ছিল, সেই আছে এবং সেই থাকবে (গজল-২৬) বাইবেলের মতে : He that loveth not khoweth not god. for god is love, অর্থ- যে জন প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না-কারণ ঈশ্বরই প্রেম। জন: ৪:৮। এই কারণেই প্রেমতত্ত্ব সৃষ্টি জগতের মূলতত্ত্ব। ইবনে সিনা বলেছেন: প্রেম বিশ্বতাত্ত্বিক নিয়ম ও প্রকৃতির কার্যকরী শক্তি, প্রেম পরম সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তি সত্তার অমরতা অর্জনে শক্তি যোগায়।" প্লাটো বলেন; পরম সত্তা অতীন্দ্রিয় জগতের সত্তা ধারণার উৎস পরম ধারণা এবং প্রেম বিশ্বের মূলনীতি।"

সৃষ্টি জগতের সর্বত্র যে, সৌন্দর্যের প্রকাশ ও বিকাশ দেখা যায় তা শাশ্বত এবং চিরন্তন পরম সৌন্দর্যের মূর্ত প্রকাশ। মওলানা রুমির (১২০৭-১২৭৩) মতে; প্রেমই পরম সৌন্দর্য এবং পরম সৌন্দর্যই প্রেম। আল্লাহ্‌ পরম সুন্দর ও সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যসত্তা। পার্থিব জগতের সকল সৌন্দর্য পরম সুন্দরেরই আংশিক প্রকাশ মাত্র। পরম সুন্দর সকল সৌন্দর্যের মূল উৎস। সূর্যালোকের অভাবে যেমন বিভিন্ন বস্তু আধারে ঢাকা পড়ে যায়, তেমনি ঐশী সৌন্দর্যের অভাবে বিশ্বের সকল বস্তু সৌন্দর্যহীন হয়ে পড়ে। প্রেমই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব, বিশ্ব সৃষ্টির কারণ পরম সুন্দরের প্রকাশ। বাসনা বা প্রেম, প্রেম আল্লাহ্‌র সত্তার নির্যাস সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণ।

পরম সত্তার নির্যাস বা সত্তাসার রুপে এই প্রেমের উদয় না হলে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির উদ্ভব ঘটত নাা। এই প্রেম ব্যতিরেকে অনস্তিত্ব অবস্থা থেকে অস্তিত্বশীল অবস্থায় কোন কিছুরই আবির্ভাব হতো না। প্রেম বিশ্ব তাত্ত্বিক নীতি ও প্রকৃতির মধ্যে কার্যকরী এক মহাশক্তি। এই প্রেমের প্রকৃত অর্থ যে বুঝতে সক্ষম হয়েছে, সে ব্যক্তি সৃষ্টির নিগূঢ়তত্ত্ব

ও তথ্য বা রহস্যভেদ বুঝতে সক্ষম হয়েছে। প্রেম দ্বারা মানবাত্মা পরিবর্তিত হয়ে পরম আত্মার গুণে গুণান্বিত হয়ে উঠে অথবা তার রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে উঠে। এই প্রেমের দ্বারা জড়জগত থেকে আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব। এই প্রেমের সৌজন্যে পূর্ণ মানবত্বে পৌছানো সম্ভব। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আবরণ দূর করে বুদ্ধি জ্ঞানের বাধা অতিক্রম করে প্রেমের মাধ্যমে মানব রুপের মধ্যে অপরূপকে, সীমার মধ্যে অসীমকে জানতে পারে। প্রেমই আত্মার রহস্য। রুমির মতে প্রেমই সৃষ্টি জগতের আদি কারণ। বিশ্ব তাত্ত্বিক নীতি, গতিশক্তি, জ্ঞানের উৎস মূল এবং পরমাত্মা ও মানবত্মার মহামিলনের মূলমন্ত্র বা সেতুবন্ধন।

পরম সত্তা নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিজেকে নিজে, ভালবাসেন। নিজেকে নিজে প্রকাশ করার বাসনা তাঁর মনে জাগে। তাই তিনি নিজেকে বিশ্ব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বিশ্ব জগত এখন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ধর্মী শব্দ "কুন" বা 'হও' শুনেছে। তখনই তাদের মাঝে প্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

ঐশী প্রেমই প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ রুপী মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটায় এবং সমগ্র সত্তায় ঐক্য অনুভব করায়। প্রেমিক তখন বুঝতে পারে সবকিছু মিলে এক, সব কিছুর মুখে এক, সকল সত্তার মূল সত্তা এক, সকল প্রেমের মূল এক, আর তিনিই পরম আত্মা, পরম সত্তা বা স্বয়ং আল্লাহ্ নামে অভিহিত। প্রেমিক যখন কোন বিশেষ আকার বা রূপকে ভালবাসেন, তখন তিনি সেই আকার বা রুপের মধ্যেই আল্লাহ্‌র প্রকাশ দেখতে পান। যখন তিনি কোন বস্তু বা সত্তাকে ভালবাসেন, তখন তিনি সেই আকার ও রুপের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন।

মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর "আহাদ" অবস্থায় পরম অচিন, অজ্ঞেয়, অনির্দিষ্ট, অনির্নিত, অনিয়ন্ত্রিত, অসীম, অনন্ত নিরাকার। তাঁর গায়েব অবস্থা থেকে সত্তা ও গুণাবলীর প্রথম মিশ্রণজাত অবস্থায় যে আকারে নিজের কাছে নিজে আত্ম প্রকাশ করেন, সেই প্রথম নির্দিষ্ট আকার বা সত্তার নাম "নূরে মোহাম্মদি" এটাই হলো আহাদ হতে "আহমদ" অবস্থায় প্রকাশ বা আল্লাহ্ হতে প্রথম প্রজ্ঞার উৎপত্তি। এ নূরে মুহাম্মদি-ই-সৃষ্টি জগতের মূল সত্তা। আল্লাহ্ হাদিসে কুদসীতে বলেন, তোমার মতো এত প্রিয় করে সৃষ্টির মধ্যে আমি আর কাউকে সৃষ্টি করিনি। তোমারই মাধ্যমে আমি দান করি, তোমারই মাধ্যমে আমি গ্রহণ করি এবং তোমারই মাধ্যমে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি। আল্লাহ্ আরো বলেন, ওহে মোহাম্মদ আমি যদি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম তবে ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে এবং সৃষ্টি জগতে কোন কিছুর আবির্ভাব ঘটাতাম না। হাদীসে উল্লেখ আছে বিভিন্ন লোকের জবাবে রাসূল (সা.) বলেছেন আল্লাহ্‌র নুর থেকে আমার নূর (নূর মোহাম্মদী) সৃষ্টি হয়েছে এবং আমার নূর থেকে সমস্ত সৃষ্টির উদ্ভব ঘটেছে।

ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ কাসিদায় লিখেছেন: হে মোহাম্মদ (সা.) আপনাকে সৃষ্টি না করলে কোন মানুষকেই সৃষ্টি করা হতো না। আপনি না হলে কিছুতেই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি হতো না। আপনারই নূরের পোশাক পরে চাঁদ আলোকিত হয়েছে। আপনারই নূরের আভায় সূর্য জ্যোতির্ময় হয়েছে।

আল্লাহ্‌কে ভালবাসা তথা প্রেম করা হলো ঈমানের ভিত্তি। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ্ প্রেম-নবী-প্রেম-আহলে বাইত প্রেমই যে ফরজ এবং এই ফরজ প্রতি পালিত না হলে কোন ব্যক্তি ইমানদারই হতে পারে না এবং তার তথাকথিত কোন ইবাদতই আল্লাহ্ কবুল করেন না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হচ্ছে।

১) পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পূণ্য আছে কেহ আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ইমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ্ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে। সালাত কায়েম করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ- ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করিলে। ইহারা তাহারা যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই মুত্তাকী। ২:১৭৭

উপর্যুক্ত আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা গেলো যে, সকল প্রকার ইবাদতের ভিত্তিই হলো ঐশী প্রেম। এবং এই ধরণের প্রেমিকরাই মুত্তাকী। নবীর প্রতি ভালবাসা নিজ প্রাণের চেয়ে বেশি হতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআন, "নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের (প্রাণ) অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতার (প্রিয়) এবং তাহার পত্নীগণ তাদের মাতা।" (৩৩:৬)

এই আয়াতের মাধ্যমে নবীর প্রতি প্রাণাধিক ভালবাসা যে ইমান তা নিশ্চিতভাবে জানা গেলো। আরও জানা যায় যে, রাসূল (সা.) মুমিনদের রূহানী পিতা। তাঁকে যারা ভাই বা অন্য কিছু মনে করেন তারা সত্যনিষ্ঠ নয়। আহলে বাইতদের প্রতি ভালবাসাও অনুরূপভাবে ঈমানের অংশ। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা : (হে মোহাম্মদ (সা.)) বল আমি ইহার (মহান ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে নিকট আত্মীয়ের (রাসূল (সা.) আলী ফাতেমা হাসান হোসাইন) ও পরবর্তী বংশধরগণে প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা (মোয়াদ্দাত) ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাহি না; (৪২: ২৩)।

রাসূল (সা.) এর মাধ্যমে ধর্ম তথা ইমান অর্জন করার বিনিময়ে আল্লাহ্তালা গুরু দক্ষিণা হিসাবে আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা ফরজ করে দিয়েছেন। নবুওতী ও রেসালতের কার্যক্রম বিশ্ব স্রষ্টার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রচার কার্য তথা ধর্মীয় নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বে চালু রাখার জন্য আল্লাহ্তালা ওয়াদাবদ্ধ। পবিত্র কুরআনে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

আমি (আল্লাহ্) বললাম তোমরা (আদম ও হাওয়া) এই স্থান (বেহেশত) হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎ পথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ-অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (২: ৩৮)

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্তালা ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানব জাতির হেদায়তের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ অবশ্যই তাদের মধ্যে উপস্থিত থেকে তাদেরকে আল্লাহ্র দ্বীন-ধর্ম শিক্ষা দিবেন তাই তাঁদের মান্যতা বা অনুসরণ করাও প্রকৃত ইমানদারদের জন্য ফরজ তথা অবশ্য পালনীয়। এ বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ ব্যাপারে যদি মানবজাতিকে সম্যক অবহিত করা না হয় তাহলে রাসূল (সা.) এর রেসালতি কার্যক্রমই অপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনে এ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে।

"হে রাসূল তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। তা প্রচার কর; যদি না কর তবে তো তুমি তার বার্তা প্রচার করলে না, আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচাললিত করেন না।" (৫:৬৭)

এ আয়াতটির ব্যাখ্যাও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত এই হুকুম যা প্রচার করার জন্য রাসূল (সা.) কে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা ভিন্ন মাত্রার এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটি প্রচার না করা হলে নবুওত ও রেসালতের সমস্ত শিক্ষা কার্যত ব্যর্থ হয়ে যাবে। আবার এই নির্দেশটি এমনই স্পর্শকাতর যে, তা প্রচার ও বাস্তবায়ন করতে গেলে মানুষের পক্ষ থেকে রাসূল (সা.) এর অনিষ্টের আশংকা রয়েছে। আর সঠিকভাবে এই নির্দেশ প্রতিপালন না করা হলে সেই সম্প্রদায় কার্যত রাসূল দ্রোহী তথা খোদাদ্রোহী বা কাফের হিসাবে আল্লাহ্র নিকট বিবেচিত হবে।

প্রখ্যাত সাহাবী ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূল (সা.) বিদায় হজ্ব শেষ করার পর গাদীর খুম নামক স্থানে ১০ম হিজরীর ১৮ জিলহজ তারিখে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। এটি একটি সুদীর্ঘ ভাষণ। এই ভাষণে তিনি নবুওত ও রেসালতের উত্তরাধিকার সম্পর্কে যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্তরূপ: হে উপস্থিত জনতা! আল্লাহ্ যা কিছু নাজিল করেছেন, সেগুলো পৌঁছে দেয়াতে আমি কোন কার্পণ্য করিনি। আর এখন আমি এ আয়াতের শানে নুজুলও তোমাদের জন্য স্পষ্টাকারে ব্যক্ত করছি। এর আগে জিবরাইল (আ.) আমার নিকট এ হুকুমটি তিনবার নিয়ে এসেছেন।

আমার প্রভুর পক্ষ থেকে সালামসহ তিনি নিজেই সালাম এবং সালামের উৎস, আমি যেন এ স্থানে দাঁড়িয়ে যাবতীয় কালো ও সাদাকে এ সংবাদ দিই যে, আলী ইবনে তালিব (আ.) হলো আমার ভাই, আমার ওয়াসী, আমার খলিফা ও আমার পরবর্তী ইমাম। আমার সঙ্গে তাঁর মর্যাদা ও সম্পর্ক ঠিক তদ্রূপ যেমন নবী মুসার (আ.) সঙ্গে হারুন (আ.) এর ছিল। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে আমার পরে আর কেউ নবী হবেন না। আল্লাহ্ ও আমার পরে আলী (আ.) তোমাদের অলি (অভিভাবক) নেতা/শাসক।

হে মানব সকল, আমি ইমামত (ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব) ও উত্তরাধিকার (রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে) এই দুটি বিষয়কে কিয়ামত পর্যন্ত আমার বংশধারায় রেখে যাচ্ছি। আর আমার প্রতি যে কথা পৌঁছে দেওয়ার আদেশ হয়েছিল সে কথা আমি পৌঁছে দিয়েছি, যেন প্রমাণ হয়ে যায় উপস্থিত আর অনুপস্থিতদের প্রতি এবং ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি যারা জন্মগ্রহণ করেছে আর যারা জন্মগ্রহণ করেনি। সে জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি অবশ্যই কর্তব্য হবে তারা যেন অনুপস্থিতদের নিকট এ খবরটি পৌঁছে দেয়। আর এ ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই অব্যহত থাকবে।"

আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত এবং রাসূল (সা.) কর্তৃক এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের মুসলিমদের নক্শবন্দী তরীকা ব্যতিত সকল ত্বরীকার ইমাম হলেন হযরত আলী (আ.)। আর হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ১২জন ইমামের নাম হলো (১) আলী বিন আবি তালেব (২) আল হাসান বিন আলী (৩) আল হুসাইন বিন আলী (৪) আলী জয়নাল আবেদিন বিন আলি আল হুসাইন (৫) মুহাম্মদ আল বাকির বিন জয়নুল আবেদীন (৬) জাফর আল সাদিক বিন মুহাম্মদ আল বাকির (৭) মুসা আল কাযিম (৮) আলী আর রিযাহ (৯) মুহাম্মদ আল জওয়াদ (১০) আলী আল হাদী (১১) আল হাসান আসকারী (১২) মুহাম্মদ আল মাহেদী।

পবিত্র কুরআনে নবী রাসূলদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে আমরা তাদের বিভিন্ন ধরণের কার্যাবলী, দায়িত্ব পালন, অলৌকিক শক্তির অধিকারী হিসাবে দেখতে পাই। এরই ধারাবাহিকতায় নবী রাসূলদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এদের সার্বিক উত্তরাধিকারী হতে হলে একজন ব্যক্তিকে একই ধরণের জ্ঞান, কার্যাবলী ও ক্ষমতার

অধিকারী হতে হবে। পবিত্র কুরআন এ ধরণের মহান ব্যক্তিকে ইমাম, খলিফা, উলিল আমর, ওয়ালী, মুর্শিদ, হাদী প্রভৃতি পদবীতে ভূষিত হিসাবে দেখা যায়। এ প্রেক্ষিতে আমরা কুরআনের কিছু নির্বাচিত আয়াত পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব। (১) এভাবে আমি ইবরাহিমকে আকাশ ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা (প্রশাসনিক রহস্য বিষয়ক জ্ঞান) দেখাই যাতে সে স্থির বিশ্বাসীদের একজন হয় (সূরা আনয়াম : ৭৫)।

"স্মরণ করো, যখন তার পালনকর্তা (রব) কয়েকটি বাক্য (নির্দেশ) দিয়ে ইবরাহিমকে পরীক্ষা করলেন এবং তিনি সেইগুলো পূর্ণ করলে আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম নির্ধারণ/নিয়োগ করলাম। তিনি (ইবরাহীম বলেন, আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। আল্লাহ্ বলেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমার অঙ্গীকার (এই নির্বাচন) জালেমদের জন্য প্রযোজ্য নয়" (সূরা বাকারা ২:১২৪)। এই আয়াতের মর্মানুযায়ী জানা গেল জালিম ব্যক্তি কখনও মুসলমানদের বৈধ নেতা হতে পারে না এবং এ ধরণের নিয়োগ স্বংক্রিয়ভাবেই বাতিল।

তাকে রাসূল করেছেন বনি ঈসরাইলদের জন্য আমি তোমাদের কাছে নিদর্শন এনেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখি বানাব তারপর ওতে ফুঁ দেব। তা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করব। আর আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবন্ত করব। আর তোমাদের বলে দেব তোমরা কি খেয়েছ আর কি মজুদ রেখেছ। (সূরা আল ইমরান : ৪৯)

হযরত মুহাম্মদ (আ.) সম্পর্কে, শপথ অস্তমিত নক্ষত্রের, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, পথভ্রষ্ট নয়। আর সে নিজের ইচ্ছা মতো কথা বলে না। এ অহী প্রেরণ/ প্রত্যাদেশ যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাকে শিক্ষা দেয় মহা শক্তিধর (সূরা নজম : ১-৫)।

হে দাউদ আমি আপনাকে পৃথিবীতে আমার খলিফা নিয়োগ করলাম (সূরা সাদ : ২৬)।

"জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র বন্ধুদের (অলি) কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না। যাহারা ইমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখেরাতে, আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই; উহাই মহাসাফল্য (সূরা ইউনুস : ৬২-৬৪)।

তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব (রাজত্ব/ নেতৃত্ব/ মালিকানা/ উত্তরাধিকারীরত্ব) দান করবেন। যেমন তিনি তা দান করেছেন। তাদের পূর্ববর্তীদের (সূরা নুর : ৫৫)।

আমি উপদেশের পর যবুর কিতাবে লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার যোগ্যতা (আল্লাহ্র বিবেচনায়) সম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী (মালিক/প্রশাসক) হইবে (সূরা আম্বিয়া : ১০৫)।

হে ইমানদারগণ যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাত বিশ্বাস কর তবে তোমরা আল্লাহ্র অনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে যাদেরকে (রাসূলের ন্যায় প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী (উলিল আমর) হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে (সূরা নেসা : ৫৯)।

আল্লাহ্ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন, সে সৎ পথ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক (ওয়ালীম মুর্শেদ) পাইবে না। (সূরা কাহফ-১৭) আলোচ্য আয়াত সমূহ পর্যালোচনা করে আল্লাহ্ কর্তৃক যে সব পদবী বা কার্যক্রমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা যে আল্লাহ্র নির্বাচিত বান্দাগণ প্রয়োগ করে থাকেন কারণ এসব ক্ষমতার তারাই বৈধ অধিকারী। আর তারা যে সাধারণ ধর্মপ্রাণ বা ইমানদার ব্যক্তি নয় তা বলাই বাহুল্য।

মওলানা রুমী এ সকল আয়াত সমূহ গবেষণাপূর্বক এবং বাস্তবে প্রয়োগ করে ইসলাম ধর্ম সাহিত্যে একটি নতুন ধারা যোগ করেন যাকে বলা হয় ইনসান-ই-কামিল বা পূর্ণাঙ্গ মানব সত্ত্বা যিনি ঈশ্বর থেকে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত তথা আদর্শ মানব। অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর পর শুধু আল্লাহ্র বন্ধু তথা সুফিগণই এই যোগ্যতার অধিকারী।

আল্লামা রুমীর দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ মানব/ইনসানে কামেল তথা সুফির বিশদ ব্যাখ্যা

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (১২০৭-১২৭৩) বলেন, ইনসানে কামিল (পূর্ণ মানব- Perfect Man) আল্লাহ্র সত্ত্বায় অস্তিত্ববান হয়ে থাকেন বিধায় সবকিছু জানতে পারেন ও সবকিছু করতে পারেন। মানব হৃদয়ে যে ঐশী জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে তা দিয়ে পূর্ণ মানব সব কিছুর অন্তর্নিহিত সত্যকে জানতে পারেন। তিনি আল্লাহ্র আলোকে আলোকিত হয়েই সবকিছু দেখে থাকেন। দিব্য জ্ঞানে জ্ঞানবান ব্যক্তিই আল্লাহ্র স্বরূপ বুঝতে সক্ষম। মাওলানা বলেন, মানব হৃদয়ে একটি প্রজ্ঞাতীত ও অতীন্দ্রিয় উৎস আছে, যা কেবল আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমেই উপলব্ধি করা সম্ভব। যার অর্ন্তচক্ষু উন্মোচিত হয়েছে তিনি জড় বিশ্বের প্রতিটি অনুপরমাণুতে মহান আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যার আত্মা নির্মল ও নিষ্পাপ (মাসুম) কেবল তিনিই অদৃশ্য সত্তার দর্পণ স্বরূপ। এই দর্পণে উভয় জগতের প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। যদিও অলির নিকট জিব্রাইল (আ.) মারফত ওহী আসেনা বা নতুন ধর্ম প্রচারের

নির্দেশ দেয়া হয় না। তবুও তিনি স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ বাণী লাভ করে থাকেন। যাকে বলা হয় ইলহাম বা ঐশী প্রত্যাদেশ, যা বিশেষ বান্দাহ্‌র অন্তরে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রোথিত হয়ে যায়। ধর্মের স্বার্থে তথা মানব কল্যাণে ওলীগণ এলহাম বা প্রত্যাদেশ অথবা ওহীয়ে দিল বা দৈববাণী লাভ করে থাকেন। কেননা কুরআন থেকে প্রমাণিত হয় যে, ছয় প্রকার ওহী ছয় রকম স্থলে অবতীর্ণ হয়েছে। কেবল নতুন আইন-কানুন প্রচারের উদ্দেশ্যে জিব্রাইল (আ.) মারফত ওহী নাযিল হতো। আর বাকী সব ক্ষেত্রে সরাসরি উপদেশ অনুপ্রেরণা বা প্রত্যাদেশ স্বরূপ অবতীর্ণ হতো।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) হৃদয়ের অনুপ্রেরণাকে আধ্যাত্মিক এবং ঐশী জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, নবুওতে বিশ্বাস করার অর্থ–এই রূপ স্বীকারোক্তি করা যে মানব বুদ্ধির অতীত এমন একটি স্তর আছে যেখানে পৌছাতে পারলে মানবের অন্তর্চক্ষু উন্মোচিত হয়ে যায় এবং মানব আধ্যাত্মিক ও পরাতাত্ত্বিক বস্তু বিষয়ের আসল স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারে; যা মানব বুদ্ধির অতীত। যা মানব প্রজ্ঞা তা কল্পনাও করতে পারে না। রুমী বলেন, একজন ইনসানে কামিল বা আদর্শ মানব তাঁর অতীন্দ্রিয় চিরন্তন ও অমর সত্তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। যেহেতু তিনি আত্মিক উন্নতির দ্বারা ঐশী সত্তার গুণে গুণান্বিত হয়ে নিজে অমরত্ব লাভ করে চিরঞ্জীব হন। (আমাদের তো আর মৃত্যু হইবেনা, প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে না। ইহাই তো মহা সাফল্য)। এই রূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা। (সাফ্‌ফত ৫৮-৬১)

আদর্শ মানব আল্লাহ্‌র অতি নিকটবর্তী ব্যক্তি। আদর্শ মানব ও আল্লাহ্‌র মধ্যে সংযোগ স্থাপনের তৃতীয় কোন মাধ্যম নাই। তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সব কিছু জেনে-শুনে নিতে পারেন। কেবল আদর্শ মানবই প্রেমের মাঝে আপন ইচ্ছাকে পরম ইচ্ছার স্থানে এক করে দিয়ে বলতে পারেন যে, তিনি সত্ত্বাবান ও অসত্ত্বাবান উভয়ই। আদর্শ মানবের নিজ বলতে কিছু থাকেনা পরম সত্তাই তার মধ্য দিয়ে কথা বলেন, কাজ করেন ও দেখেন। আদর্শ মানবই বিশ্ব সৃষ্টি করেন ও পরিচালনার দয়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই হিসাবে তিনি সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালনকর্তা। আদর্শ মানবই সৃষ্টির আদি কারণ। বিশ্ব সৃষ্টির বহুপূর্বে থেকেই তিনি ধারণা (Concept) হিসাবে বিদ্যমান ছিলেন। আদর্শ মানবের সূচনা আদি মানব হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু হয়েছে এবং উহার পরিপূর্ণতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। আদর্শ মানবই সার্বিক প্রজ্ঞা, আর তিনি সার্বিক প্রজ্ঞা হিসেবে বিশ্বাত্মা। পূর্ণ মানব বা ইনসানে কামিলই আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী। তিনি বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণ। এই অর্থেই আল্লাহ্ মানবকে তার খলিফা তথা প্রতিনিধি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ্‌র খলিফা হিসাবে রাসূল (সা.) এর রাষ্ট্রনীতি

নির্যাতিত মানবতার কল্যাণ কামনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে ইসলামী বিপ্লবের বীজ রোপণ করেছিলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে উঠে। এত অল্প সময়ে পৃথিবীতে কোন বিপ্লবই ইসলামী বিপ্লবের মত এমন পূর্ণাঙ্গরূপে আত্ম প্রকাশ করতে পারে নাই। অথচ সময়কাল মাত্র ৩০ বৎসরের মত ছিল এই বিপ্লবের ব্যাপ্তি। যে বিপ্লব মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ ও শান্তির জন্য এক বিরাট সম্ভাবনার দরজা উন্মুক্ত করেছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যেই সেই দ্বার রুদ্ধ হল কেন? এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে ইসলামী বিপ্লবের স্বরূপের উপর একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। ইসলামের কলেমার মধ্যেই নিহিত আছে ইসলামী বিপ্লবের মূলমন্ত্র। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। মুহাম্মদ (সা.) সেই মহান আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। অর্থাৎ দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল কিছুর উপর সার্বভৌমত্ব রয়েছে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির অর্থাৎ রাসূল (সা.) মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল কলেমার শাশ্বত বাণী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত সম্পদের মালিকানা আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করে ইসলামী বিপ্লব সকল প্রকার শোষণের অবসান ঘটাইতে সমর্থ হয়েছিল। অর্থ ও সম্পদের সুষম বণ্টনও নিশ্চিত করেছিল ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই অর্থ ব্যবস্থায় সূদ হারাম ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পদ কেন্দ্রিভূত করা নিষিদ্ধ বা হারাম। প্রবৃত্তিবাদ বা নফসানিয়াতের প্রাধান্য এবং ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা শোষণের জন্য দায়ি। সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার মোহও সৃষ্টি হয় নফসানিয়াতের প্রাধান্য হতে। আল্লাহ্ আল কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন সমস্ত সম্পদের মালিক আল্লাহ্। মানুষ এর অভিভাবক (custodian) মাত্র। তাই অবৈধ (হারাম) পদ্ধতিতে সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় বা খরচ উভয়ই নিষিদ্ধ। রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ শুধুমাত্র সম্পদের সুষম বণ্টনের দায়িত্বভার গ্রহণ ও পালন করবেন। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ভোগ বিলাসের বল্গাহীন আকাংখাকে সুসংহত করে কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়। ইসলামে শোষকের কোন স্থান নাই। একদিকে যেমন শোষকের বিরুদ্ধে সুসংহত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। অন্যদিকে মানুষকে এমনভাবে জ্ঞানী-প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে যে, তারা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কোন প্রকার শোষণ বা পাপ কাজকে ঘৃণা করতে শেখে। তাছাড়া সমাজ জীবনে এমন একটি ভাবধারা বা

জীবন দর্শন সৃষ্টি করতে হবে যাতে শোষকরাও নিজেদের চারিত্রিক দুর্বলতা-মত-পথকে ভ্রান্ত বলে উপলব্ধি করার শিক্ষা লাভ করে। শোষকরা যাতে নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারে তার পথও খোলা রাখতে হবে। এই পন্থায় শোষণ রোধ করতে পারলে সমাজ, বা রাষ্ট্রীয় জীবন প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসা-সিঞ্চিত হবে। তাই ইসলামী সমাজে Class Struggle (শ্রেণি সংগ্রাম) এর বদলে Class Cohesion (শ্রেণি সু-সম্পর্ক) বিরাজমান থাকবে। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় যে নীতি ইসলামী বিপ্লবকে এক নতুন বৈশিষ্টে বলীয়ান করেছিল তা হলো ইসলামের পালনবাদ তথা রবুবিয়াত। ইসলামের মূল কথা হলো স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং স্রষ্টাকে লালন পালনকর্তা (রব) এবং বিবর্তনকর্তা (সৃষ্টি হতে পর্যায়ক্রমে আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তনকারী) হিসাবে গ্রহণ ও মান্য করা। সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকে স্রষ্টা যেমন সৃষ্টি করেন। তেমনি তিনি লালন-পালনও করেন। সৃষ্টির অভিজাত মানুষকেও। মানুষ সৃষ্টি হয়েছে স্রষ্টার প্রতিভূ হিসাবে। তাই মানুষ তার দৈনন্দিন জীবন যাপনেও হবে পালনবাদের অনুসারী। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্রষ্টার খলিফা হিসেবে মানুষ পালনবাদের নীতিকে প্রবর্তন করবে। শাসনবাদকে (Brute Force) পরিহার করে। একটি পরিবারের আদর্শ পিতা/অভিভাবক যেমন পরিবারের সদস্যদের অভাব-অনটন অনুযায়ী সবকিছুর প্রতিপালন করে থাকেন; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতগণও রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করবেন। (এ কারণেই এই ধরণের চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নির্বাচিত ব্যক্তি হতে হবে।

সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনে পিতা ও সন্তানদের ভিতর প্রেম-প্রীতির আর ভালোবাসা মানুষের জীবনকে ঘিরে থাকবে। ইসলামবিহীন শাসন নীতিতে শাসন করে অন্যকে আদেশ প্রতিপালন করানো যেতে পারে। কিন্তু তার ফল শুভ হয় না। আন্তরিকভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন নীতি বা কার্যক্রম গ্রহণ করতে না পারলে বাহ্যিক চাপ শুধু সমস্যারই সৃষ্টি করে। শাসনবাদের যে কর্তৃত্বের অহমিকা (Brute Force) রয়েছে তা মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিতর ফাটল সৃষ্টি করে থাকে। শাসিত শাসককে দেখে সন্দেহের চোখে, সুযোগ পেলেই শাসকের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। এ কারণেই ইসলামে শাসনবাদের কোন স্থান নেই। প্রতিপালনের প্রীতিপূর্ণ মধুময় রসে ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আপ্লুত। সেখানে নাই শাসিত ও শাসকের ব্যবধান। রবুবিয়াত অর্থাৎ পালনবাদের প্রতিষ্ঠা ইসলামী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

রবুবিয়াত বা পালনবাদকে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তি জীবনে সফল করে তুলতে পারলে পালনবাদের অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমকে স্বীকার করে নিয়েই মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হবে। এই ভাবধারা মদীনা সনদের মাধ্যমে রাসূল (সা.) মুশরেক, ইহুদী, খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সমতা বিধান করেছিলেন। স্মরণ রাখতে হবে রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত এই পালনবাদ কোন বিশেষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নয়। বরং রবুবিয়াত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটি স্বতঃসিদ্ধ শাশ্বত বিধান। তাই হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সকল মানুষের জন্য হুকুমতে রব্বানিয়া কল্যাণকর হতে বাধ্য। কারণ এই নীতি অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য যিনি রব বা পালনকর্তা, বিবর্তনকারী প্রভু, হিন্দুদের জন্য তিনিই একই বিধানে আলো-হাওয়া, ফল, পানি, বস্ত্র, খাদ্য সবই যোগাইতেছেন। একমাত্র রবুবিয়াতের আদর্শই মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। রবুবিয়াতের আদর্শ নফসানিয়াত অর্থাৎ আমার নিমিত্ত, আমার উদ্দেশ্য, আমার লক্ষ্য, আমার দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ, আমার চিন্তাধারা আমার-আমার ভাবধারা লুপ্ত করে ফেলে।

ইসলাম মানব-প্রকৃতির ধর্ম। তাই মানবিক কোন প্রবৃত্তির উৎখাতে ইসলাম বিশ্বাস করেনা। মানব-প্রকৃতির সার্বিক কল্যাণের বিরোধী যে সব প্রবৃত্তি, তাকে অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে এমনভাবে সুসংহত ও সুসংযত করতে হবে যে তা যেন কল্যাণ বিরোধী না হয়ে কল্যাণকারী হয়। মানুষের প্রকৃতির ভিতর নিহিত রয়েছে বিপরীতধর্মী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব। তাই কখনও ভোগ বিলাসের প্রবৃত্তিগুলি প্রধান্য লাভ করে এবং তার ফলে মানুষ হয়ে পড়ে প্রবৃত্তির দাস। এই প্রবৃত্তির প্রাধান্য থেকেই ভোগ বিলাসের আকাংখা প্রকট হয়ে উঠে। পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রবৃত্তি পূজা অর্থাৎ ভোগ-বিলাসের আকাংখাই সব শোষণের মূল। মানব প্রবৃত্তিকে সুসংহত ও সুসংযত করে মানব কল্যাণে তা নিয়োগ করা সম্ভব। প্রকৃত পক্ষে নফসানিয়াত ও রুহানিয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের মাধ্যমেই রাসূল (সা.) মদীনার মহা কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। এই রাষ্ট্রের নাগরিকরাই সেদিন মানবকল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন। রাসূল (সা.) এর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং নিজেদের জীবনে আদর্শের রূপায়ন মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেছিল বিপ্লবী সমাজ-ব্যবস্থা কায়েমে। এরপর ইসলামের আকাশে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। নফসানিয়াত বিস্তার করে তার আপন প্রাধান্য। নফসানিয়াতের প্রাধান্যের সাথে সাথে ইসলামের কল্যাণধর্মী রূপের সমাধি রচিত হয়।

বিশ্ব জাহানের প্রভু। সৃষ্টি জগতের মালিক, শাসনকর্তা, তার সুবিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে আমরা পৃথিবী হিসেবে যে গ্রহে অবস্থান করি সেখানে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাকে জানার, চিন্তা করার বুঝবার শক্তি দিয়েছেন, ভালো ও মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা

দিয়েছেন, যাচাই-বাছাই করারও ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। অর্থাৎ এক ধরণের স্বায়ত্তশাসন দান করে তাকে পৃথিবীতে নিজের খলিফা বা প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, "স্মরণ করো। যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (আমার পক্ষে থেকে নির্বাচিত ব্যক্তির মাধ্যমে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। তখন তারা বলল, আপনি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন। যারা সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি (ফিতনা-ফাসাদ) ও খুন-খারাবি করবে? আল্লাহ্ বললেন, আমি যা জানি তা তোমরা জাননা। আর তিনি আদমকে সবকিছুর নাম (বস্তু ও বিষয়ের গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্য, উপযোগিতা) শিক্ষা দিলেন, এরপর সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, আপনি মহা পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন। তার বাইরে আমরা কিছুই জানিনা বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। (২:৩০-৩২)

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম শিক্ষা হলো-মানবীয় চরিত্রের এমন একটি দিক রয়েছে যা স্বভাবতই অন্য মানুষের সঙ্গে ঝগড়া, বিবাদ, বিসম্বাদ এবং খুন খারাবি করার প্রবণতা। এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা মানবজাতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে আল্লাহ্ প্রদত্ত হেদায়েত বা পথনির্দেশ অবশ্য পালনীয়। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "আমি বলেছিলাম, তোমরা সবাই এখান থেকে দুনিয়ায় যাও। অতঃপর তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি অবশ্যই সত্য ও সঠিক পথের দিক নির্দেশনা-জীবন ব্যবস্থা (আমার নির্বাচিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে) প্রেরণ করব। তখন যারা এই দিক নির্দেশনা-নৈতিক বিধিবিধান সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় বা দুঃখ থাকবেনা। আর যারা সত্য পথের নৈতিক বিধানকে প্রত্যাখান করবে, তারাই জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। (২:৩৮)

আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত দিক নির্দেশনার ব্যাখ্যা, প্রতিপালন ও তা সর্বযুগে বাস্তবায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, বিশ্ববাসী কখনো যেন কোন ক্রমেই আল্লাহ্র এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত না হয়। এ দায়িত্ব আল্লাহ্ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। আর মানবজাতির হেদায়েত লাভের দুইটি উপায় রয়েছে। এক আল্লাহ্র কালাম, তথা ঐশী কিতাব ও নবী-রাসূল ও তার বৈধ প্রতিনিধিগণের উপস্থিতি।

এ দুটি বিষয় চিরকাল এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটিকে অন্যটি আলাদা করে না মানুষ দ্বীনের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, আর না সে হেদায়েত লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই আল্লাহ্র নির্বাচিত ব্যক্তিকে আল্লাহ্র ঐশী গ্রন্থ থেকে আলাদা করলে তা এক কান্ডারী বিহীন তরী হয়ে পড়বে। একজন জীবন পথের যাত্রী তা নিয়ে জীবন সমুদ্রে যতই ঘুরাফেরা করুক না কেন সে কোনদিনই গন্তব্য স্থলে পৌছতে সক্ষম হবে না। সে কোনদিনই গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হবে না। এ মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার আহলে বাইত ও কুরআন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হাউজে-কাউসরে না পৌঁছানো পর্যন্ত তা আলাদা হবেনা।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬২২ খৃস্টাব্দে মদীনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় তা ছিল THEOCRACY বা ঈশ্বরতন্ত্র ঐশীতন্ত্র বা দিব্যতন্ত্র তথা ধর্মরাজ্য। এই রাষ্ট্র আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত প্রশাসকের মাধ্যমে আল্লাহ্র ঐশী গ্রন্থকে শাসনতন্ত্র হিসাবে গণ্য করে যে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয় তাকেই ঐশীতন্ত্র ধর্মরাজত্ব বলা হয়। পৃথিবীর সকল সভ্যতায়ই এই ধরণের শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আল্লাহ্র মনোনীত শাসন ব্যবস্থা এটাই। পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে 'ইমাম' হিসাবে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূচনা করা হয় মর্মে বিবেচনা করা যায়। তবে হযরত দাউদ (আ.) কে কুরআনে "খলিফা" পদবীতে ভূষিত করা হয়। হযরত সুলেয়মান (আ.) এই ধরণের শাসক ছিলেন। আল্লাহ্র পছন্দনীয় ও মনোনীত এই শাসন পদ্ধতি হলেও আল্লাহ্ প্রদত্ত মানবীয় স্বাধীনতার অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করে বহু জনগোষ্ঠী এই ধরণের শাসন প্রত্যাখান করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মর্মে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে : অতঃপর অযোগ্য উত্তর পুরুষগণ একের পর এক তাহাদের (আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত প্রশাসক) স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের (ধর্মের অবৈধ সংরক্ষক) উত্তরাধিকারী হয়। তাহারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। (সূরা আরাফ : ১৬৯)

ইউরোপে পোপতন্ত্র ও হোলি রোমান সাম্রাজ্য (HOLY ROMAN EMPIRE) খৃস্ট ধর্মের অবৈধ রক্ষক হিসাবে INQUISITION এর মাধ্যমে হাজার হাজার লোককে ধর্মের নামে যে অমানুষিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে তা সর্বজন বিদিত। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী (১৫০৯-১৫৪৭) পোপের সাথে বিরোধিতা করে নিজেই কার্যত পোপ হয়ে ইংল্যান্ডের চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন এবং খ্রস্টান ধর্মের রক্ষক হিসাবে ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ মুদ্রায় DEFENDER OF FAITH (DF) এই স্বঘোষিত উপাধি এখন পর্যন্ত বহন করা হচ্ছে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অযোগ্য উত্তরাধিকারী "ধর্মের রক্ষক" হয়েছে তার বাস্তব প্রমান এখন পর্যন্তও রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত উসমান (রা.) এর শাহাদতের পর উমাইয়া শাসকগণ (৬৬১-৭৫০) ইসলামী খিলাফতের বিরুদ্ধে নীতিহীন যুদ্ধ, গুম, খুন, বিষ প্রয়োগে, হত্যা, বিচারের নামে হত্যা, নীতিহীন ও অবৈধ যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে রাসূল (সা.) এর মহান আহলে বাইত, রাসূল (সা.) এর সাহাবা, নীতিবান ও ধর্মপ্রাণ লোকদের নির্বিচারে খুন, চাকুরীচ্যুত, রাষ্ট্রীয় সুবিধাদি বন্ধ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় জনগণকে যে নির্যাতন করেছে তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। একই প্রক্রিয়ায় আব্বাসীয় শাসকগণ অনুরূপভাবে (৭৫০-১২৫৮) ইসলামের নামে মুসলিম জনসাধারণের নির্যাতন করেছে। যদিও উভয় বংশের রাষ্ট্র প্রধানদের পদবী ছিল আমীর উল মোমেনিন। অর্থাৎ মোমিনদের নেতা যারা নিজেরাই প্রকৃত অর্থে মোমিন ছিল না বরং ছিল মোমিনদের হত্যাকারী কি বিচিত্র তাদের এই ইতিহাস!

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্র কুরআনের আলোকে রাসূল (সা.) এর ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য। "মুসলমান তারা" যাদেরকে আমি পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম (ন্যায় নীতি, প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন করবে) যাকাত আদায় (আল্লাহ্ নির্দেশিত ৮টি খাতে, সুরা তাওবা-৬০) ব্যয় করবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বারন করে। (সুরা হজ্জ : ৪১)

এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র যে মূলনীতি গ্রহণ করে তা হলো :

আল্লাহ্র আইনের সার্বভৌমত্ব

এ রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম মূলনীতি হলো এই যে, একমাত্র আল্লাহ্তালারই সার্বভৌত্বের অধিকারী এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের (নবী-রাসূল, ইমাম, উলিল আমর, অলি, হাদী, মুর্শিদ, সালেহীনদের) শাসন। আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা। আল্লাহ্র রাসূল (সা.) আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে গাদীরে খুমের বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন, হে মানব সকল, আল্লাহ্কে ভয় কর। আর আমিরুল মোমেনীন আলী এবং হাসান ও হুসাইন (আ.) আর ঐ সকল ইমামের (এঁদের পরবর্তীতে আগত) প্রতি বাইয়াত করে নাও যারা আল্লাহ্র অবশিষ্ট কলেমা। (হযরত ইসা (আ.) কে পবিত্র কুরআনের সুরা আল ইমরান : ৪৫, কলেমা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে)। তারপর যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করবেন। আর যে বিশ্বস্ত থাকবে আল্লাহ্তালা তার প্রতি দয়া করবেন। আর যে এ বাইয়াত ভঙ্গ করবে, তা ভঙ্গ করার ক্ষতি তার আপন সত্ত্বার উপর আবর্তিত হবে। আল্লাহ্র আইনের কর্তৃত্ব ও সম্পর্ক এ আয়াতগুলো সুরা নিসা ৫৯,৬৪, আল আহযাব: ৫৬ আল হায : ৭ ইত্যাদি।

আদল-সকল মানুষের প্রতি সুবিচার

দ্বিতীয় যে, মূলনীতির উপর রাসূল (সা.) এর রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তা ছিল কুরআন ও সুন্নাহ্ দেয়া আইন যা সকলের জন্য সমান। রাষ্ট্রের সামান্যতম ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র প্রধান পর্যন্ত সকলের উপর তা সমভাবে প্রযোজ্য। এতে কারো ব্যতিক্রমধর্মী আচরণের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। কারণ বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন- "আমি আদিষ্ট হয়েছে তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে।" (৪২:১৫)

মানুষের মধ্যে সাম্য

এই রাষ্ট্রের তৃতীয় মূলনীতি হলো-বংশ, বর্ণ-ভাষা, দেশ, কাল, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার। এব্যাপারে কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা– হে মানবমণ্ডলী এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে নানা গোত্র, নানা জাতিতে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। মূলত আল্লাহ্র নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানী সে, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্কে ভয় করে" (৪৯:১৩)।

সৎ কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের জবাবদিহিতা

ইসলামী রাষ্ট্রের চতুর্থ মূলনীতি হলো শাসন কর্তৃত্ব এবং তার ক্ষমতা, এখতিয়ার ও অর্থ সম্পদ আল্লাহ্র এবং সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আমানত তাই আল্লাহ্ভীরু, ইমানদার এবং ন্যায়পরায়ন লোকদের হাতে তা ন্যস্ত করা উচিত। কোন সরকারী কর্মকর্তা এ আমানত খেয়ানত করার অধিকার রাখেনা। এ আমানত যাদের উপর ন্যস্ত করা হবে তারা এ জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। আল্লাহ্ বলেন, আমানত বহনের যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে আমানত সোপর্দ করার জন্য আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। "আর মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে, ন্যায় নীতির সাথে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালো উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও দেখেন" (৪:৫৮)।

তাছাড়া অসৎ, মোনাফেক, বা অন্যায়কারী ব্যক্তির আনুগত্য করা নিষেধ। পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে "এমন লোকের আনুগত্য করোনা, যার অন্তরকে আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে তার নফসের কামনা-বাসনা (প্রবৃত্তির দাস) এর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং যার কার্যধারা সীমাতিক্রম করেছে" (১৮:২৮)।

"সে সব সীমা লংঘনকারীর আনুগত্য করোনা, যারা জমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে সংস্কার-সংশোধনকারীরা না" (২৬: ১৫১-১৫২)।

ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীকে অবৈধ কাজে সহায়তা করা বা নিজের স্বার্থে হাসিলের জন্য ঘুষ প্রদান করা নিষেধ। এ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা, "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধন সম্পত্তির কিয়দংশ জানিয়া শুনিয়া অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্য উহা (ঘুষ) বিচারকগণের (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) নিকট পেশ করিও না" (২:১৮৮)।

রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে পরামর্শ বা আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তথা সীমিত গণতন্ত্র

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন, পরিচালনা, জনগণের রায় অনুযায়ী হতে হবে। এই নীতি অনুযায়ী আধুনিক গণতন্ত্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রনীতি একমত। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ লাগামহীন নয়। রাষ্ট্রের আইন কানুন, জনগণের জীবন-যাপনের মূলনীতি, অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি, রাষ্ট্রের উপায় উপকরণ সব কিছু জনগণের ইচ্ছানুযায়ী হবে এমন নয়। বরং আল্লাহ্তালার পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সা.) এর নির্দেশনা ভিত্তিক বিধি বিধানের আওতায় জনগণের ইচ্ছা-বাসনার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ যোগ্য হবে। রাষ্ট্র এমন এক সুনির্দিষ্ট পথে চালিত হতে হবে তার পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা ইখতিয়ার, শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, কারোরই নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারবে না। সামগ্রিকভাবে গোটা জাতিরও সেই ক্ষমতা থাকতে পারে না। তবে যদি জাতি আল্লাহ্র সাথে তার কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ঈমানের বৃত্ত থেকে সরে যেতে চায় তাহলে স্বতন্ত্র কথা। অথবা বিদেশী শাসকদের চাপে বাধ্য হয়ে ঈমান বিরোধী কিছু করতে মুসলিম জনগণ যদি বাধ্য হয় তাহলে তা একটি স্বতন্ত্র ব্যতিক্রম বিষয়।

সৎ কাজে আনুগত্য

সৎ কাজ বা মারুফ কাজে সরকারের আনুগত্য অপরিহার্য। পাপাচারে বা অধর্ম তথা শরীয়ত বিরোধী কাজে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার কারো নাই। এই মূলনীতির তাৎপর্য এই যে, সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কেবল সে সব নির্দেশই তাদের অধীন ব্যক্তিবর্গ এবং প্রজাবৃন্দের জন্য মেনে চলা আইনানুগ যা ধর্ম বা শরীয়ত সম্মত। আইনের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেয়ার কোন অধিকার তাদের নেই। তাই তা মেনে চলার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না। আর তাদের জন্য তা মেনে চলা উচিত নয়। এ নীতি স্বয়ং কুরআন রাসূল (সা.) এর বাইয়াতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মর্মে শর্ত আরোপ করেছে। এরশাদ হচ্ছে এবং সৎ কাজে তোমাকে অমান্য করবে না। (৬০:১২)

পদ/ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির আকাংখা বা লোভ নিষিদ্ধ

রাষ্ট্রের এটাও একটি মূলনীতি যে, ক্ষমতার অপব্যবহার বা মানুষের কাছে নিজের বাহাদুরী অথবা সামাজিক প্রকাশ ভারসাম্য বিনষ্ট বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা বা অবৈধ উপায়ে ধন সম্পদ আহরণ যেন কোন সরকারী কর্মকর্তার অভিলাষ না থাকে যেমন পবিত্র কুরআন বর্ণনা করা হয়েছে– "ইহা আখিরাতের সেই আবাস যাহা আমি নির্ধারিত করি তাহাদের জন্য যাহারা পৃথিবীতে উদ্ধত হইতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চাহে না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য" (২৮: ৮৩)।

সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ এর অধিকার ও কর্তব্য

রাসূল (সা.) তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ মূলনীতি যা এই ধরণের রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার নিশ্চয়তা দেয় তা হলো–রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক সত্য বাক্য উচ্চারণ করবে, ন্যায় ও কল্যাণের কাজে সহায়তা করবে। সমাজ বা রাষ্ট্র যেখানেই কোন ইসলাম বিরোধী বা অন্যায় কাজ হতে দেখবে সেখানেই তাকে প্রতিহত করতে হবে। সে কারণে তাকে একই সাথে জ্ঞানী, দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী, সাহসী ও সৎকর্মশীল হতে হবে। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের এটা শুধু অধিকারই নয়, বরং অপরিহার্য কর্তব্য ও বটে।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের নির্দেশ

১। "কোন সম্প্রদায়ের (ভিন্ন মতাবলম্বী বা বিধর্মী) প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনই সীমা লংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎ কর্ম ও খোদাভীরুতার কাজে তোমরা পরস্পর সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করিবে না। আল্লাহ্কে ভয় করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর" (৫:২)।

২) "হে মোমিনগণ আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ন্যায় ও সত্য কথা বল" (৩৩:৭০)।

৩) "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন আমানত উহার হকদারকে প্রত্যার্পন করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বস্রষ্টা" (৪:৫৮)।

৪) "হে মোমিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহ্র সাক্ষী স্বরূপ, যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা (তোমাদের) পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান (ক্ষমতাশালী) অথবা বিত্তহীন হোক, আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠ, সুতরাং, তোমরা ন্যায় বিচার করতে তোমাদের প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচানো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তো তাহার সম্যক খবর রাখেন" (৪:১৩৫)।

৫) "উহারা তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকর্মের নির্দেশদাতা। অসৎ কর্মে নিষেধকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী। এই মুমিনদিগকে শুভ সংবাদ দাও" (৯:১১২)।

প্রকৃত ইমানদারের করণীয় সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর নির্দেশ

১) "তোমাদের কেউ যদি কোন অসৎ কাজ দেখে তবে তার উচিত হাত দিয়ে তা প্রতিহত করা। তা যদি না পারে, তবে মুখ দ্বারা বারণ করবে, তাও যদি না পারে, তবে অন্তর দ্বারা (খারাপ জানবে এবং বারণ করার আগ্রহ রাখবে) আর এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়। (মুসলিম)

২) যালেম শাসকের সামনে ন্যায় বা সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জেহাদ; (আবু দাউদ)

৩) যালেমকে দেখেও যারা তার হাত ধরেনা। (বাধা দেয় না) তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব প্রেরণ করা দূরে নয়, অর্থাৎ শীঘ্রই আবার এসে যাবে। (আবু দাউদ)

৪) যে ব্যক্তি কোন শাসককে রাযী করার জন্য এমন কথা বলে। যা তার প্রতিপালককে নারায করে। সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছে। (কানযুল উম্মাল)

৫) অনতিবিলম্বে এমন সব লোক তোমাদের উপর শাসক হবে। যাদের হাতে থাকতে তোমাদের জীবিকা। তারা তোমাদের সাথে কথা বললে মিথ্যা বলবে, কাজ করলে খারাপ কাজ করবে। তোমরা যতক্ষণ তাদের মন্দ কাজের প্রশংসা না করবে, তাদের মিথ্যায় বিশ্বাস না করবে, ততক্ষণ তারা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে না। সত্যকে বরদাস্ত করা পর্যন্ত তোমরা তাদের সামনে সত্য পেশ করে যাও। তারপর যদি তারা সীমা লংঘন করে যায়। তাহলে যে ব্যক্তি এ জন্য নিহত হবে, সে শহীদ।

স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসূল (সা.) এই নির্দেশ প্রতিপালনের জন্যই আহলে বাইতের মহান ইমাম হোসাইন (আ.) কারবালা প্রান্তরে সপরিবারে শহীদ হয়েছেন, হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত সুফি হিন্দুস্থানের বেলায়তের মালিক হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি বলেছেন, হোসাইন রাজা, হোসাইন বাদশাহ, হোসাইন দ্বীন (ধর্ম) হোসাইন দ্বীনের আশ্রয়, মাথা দিয়েছেন। দেননি তো হাত ইয়াজীদের হাতে। প্রকৃতপক্ষে হোসাইন লা-ইলাহার বুনিয়াদ। হে হোসাইন, যে কাজ তুমি আঞ্জাম দিয়েছো তা দিয়ে মোস্তফার ফুল বাগিচায় বসন্ত এনে দিয়েছো। কোন পয়গম্বর যে কাজ করার সুযোগ পায়নি। খোদার কসম! হে হোসাইন, তুমি সে কাজ সম্পন্ন করেছো। হে নবী দুলাল, তোমার মস্তকেই নবীর মুকুট শোভা পায়। হে সম্রাট, তোমার তরবারির নবীর ন্যায় বিচারের প্রতীক। হে (হোসাইন) তোমার মে'রাজ হয়েছে অনেক ঊর্ধ্ব স্তরে আহমদ নবীর মেরাজ থেকে এক স্তর উপরে। সূত্র : দিওয়ান-ই-খাজা-মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী, অনুবাদ সম্পাদনা জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান। (পৃ: ৪১৩-৪১৫)

তৃতীয় অধ্যায়

সুফিবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

সুফি দর্শন বা তাসাওউফ পবিত্র কুরআন এবং রাসুলের (সা.) বাণী ও কর্ম থেকে উদ্ভুত হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক করার অবকাশ নাই। এ কারণেই সকল সুফিদের পথ পরিক্রমায় তাদের শাজরানামায় প্রথম সুফি ও মুর্শিদ বা গুরু হিসাবে হযরত মুহাম্মদের (সা.) নাম রয়েছে। তাই এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে ইসলামের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে সুফি দর্শনের বিকাশ ঘটেছে। দেহের সাথে আত্মা যেভাবে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, শরবতে যেভাবে চিনি অদৃশ্যভাবে মিশে থাকে। চিনিতে যেমন মিষ্টতা জড়িয়ে থাকে। ফুলে যেভাবে সুগন্ধ মিশে থাকে ইসলামী শরীয়তেও একইভাবে সুফি দর্শন তথা তাসাউফ মিশে আছে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বিদায় হজ শেষে মদিনায় ফেরার পথে ১৮ জিলহজ ১০ হিজরী (১০ মার্চ মতান্তরে ১৯ মার্চ, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) মক্কার অদূরে 'জুহফা'র কাছাকাছি গাদীরে খুম নামক স্থানে পৌঁছান, ঠিক তখনই রাসুলের (সা.) কাছে ওহী নাযিল হয়। অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে রাসূল (সা.) হযরত আলী ইবনে তালিবকে (আ.) ইমামত, বেলায়েত ও খেলাফতের উত্তরাধিকারী হিসাবে সরাসরি নিজের স্থলাভিষিক্ত (ওয়াসী) নিযুক্ত করার ঘোষণা করেন।

এরপর সবাই আলী (আ.) কে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। সবার আগে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) এগিয়ে এসে হযরত আলীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, হে আবু তালিবের সন্তান; তোমাকে অভিনন্দন!! আজ থেকে তুমি প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর মওলা (অভিভাবক, মনিব, প্রভু, প্রেমাস্পদ) হিসাবে অভিনন্দিত হবে প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় (প্রতি মুহূর্তে) (মেশকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৫৮৬, ফজলুল করিম)। তাফসিরে কাশশাফ। তাফসিরে দুররে মুনসুর : আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি (রঃ), সহিহ মুসলিম ২য় খণ্ড, পৃ-৩৬২)। প্রকৃতপক্ষে কুরআনের আলোকে হযরত আলী (আ.) ছিলেন নফসে নবী (সা.) বা তাঁর প্রাণস্বরূপ। বেলায়েতী জ্ঞানের বাদশা, অলি-আল্লাহ্: সুফি দরবেশ ও পীর, ফকির বুজুর্গদের আধ্যাত্মিক ও রূহানী দুনিয়ার অন্যতম রহস্য জ্ঞানী, প্রেমিক জগতের অবিসংবাদিত মহা পুরুষ, উজ্জ্বল নক্ষত্র, স্রষ্টার নৈকট্য ও সৃষ্টি রহস্যের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রত্যক্ষকারী। হযরত আলী (আ.) হলেন বেলায়তের সম্রাট ও রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রাপ্ত দরবেশী খেরকার কামালিয়াত দানকারী। কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ত্বরিকা ও ত্বরিকতের ইমামগণের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলেন তিনি। তার কেন্দ্রবিন্দু হলেন রাসূল (সা.) এবং রাসূল (সা.) এর কেন্দ্র হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। এভাবেই মওলা আলীর (আ.) বেলায়েতী জ্ঞানের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে

এবং সমস্ত ওলী আল্লাহ্‌গণের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে তিনি তাঁদের বেলায়তে জ্ঞান বিতরণ করতে থাকবেন। কারণ রাসূল (সা.) হলেন বেলায়েত তথা তাসাওউফ জ্ঞানের শহর আর মওলা আলী হলেন সেই শহরের একমাত্র দরজা (হাদিস)। আর তার এই জ্ঞান ও ক্ষমতার বৈধ উত্তরাধিকারী হলেন মহান আহলে বাইতের মহান সদস্য–ইমামগণ ও আল্লাহ্‌র অলিগণ, এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ও স্থায়ী বিধান। অথচ মানবজাতির দুর্ভাগ্য যে, তাসাওউফের ইতিহাসে কার্যত এ বিষয়টিকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আহলে বাইত নয় এমন সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে সুফি দর্শনের উত্তরাধিকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তাসাওউফের উৎপত্তি বা উৎস হিসাবে অধিকাংশ পুস্তকে লেখা হয়ে থাকে যে, রাসূল (সা.) এর দরবারে সঙ্গীবিহীন, সংসার ত্যাগি ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তারাই প্রথম সারির সুফি। বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এটি অবশ্য স্বীকার্য যে, এরা রাসূল (সা.) এর মহান সাহাবা। যাদের রাসূল প্রেম প্রশ্নাতিত। কিন্তু এরা দ্বীন ইসলামের বা সুফিদের Model বা আদর্শ হতে পারেন না। কারণ এই সব মহান ব্যক্তিদের কোন বাসস্থান ছিল না। তাদের কোন পরিবার পরিজন ছিলনা। তাদের রুজি রোজগারের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। তারা সমাজের কোন সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। অথবা এসব ক্ষেত্রে তাদের কোন কর্তৃত্বও ছিলনা। তারা রাসূল (সা.) এর নিকট আগত সদকা, হাদিয়া ও তাঁর ব্যক্তিগত দান-দক্ষিণার উপর জীবন নির্বাহ করতেন এই সমস্ত লোকদের সুফিবাদের প্রথম শ্রেণীর অনুসারী হিসাবে উল্লেখ করায় সাধারণ জনমনে এই ধরণের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় যে, কোন সুস্থ, স্বাভাবিক, সামাজিক জীবন যাপন যারা নির্বাহ করেন তারা কখনও সুফি হতে পারেন না। বা এ শিক্ষা গ্রহণ করতেও পারবেন না। এর ফলে সুফিবাদ সম্পর্কে জনমনে এক প্রকার ভীতি বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমরা নিশ্চতভাবে জানি রাসূল (সা.) এর পর হযরত আলী ছিলেন মুসলমানদের নেতা। তাঁর মাধ্যমেই ত্বরীকাগুলো এসেছে। তিনি একই সাথে ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে সুফি, সুফিদের নেতা, রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে একটি প্রশাসনিক কাঠামোর বাস্তবায়নকারী এবং জনপ্রশাসনের সরকারী কর্মচারীদের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনাকারী। বিরোধী দলের সাথে কি ধরনের আচরণ করা উচিত তার নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নকারী হযরত আলী ছিলেন একজন সেনাপতি, একজন সুফি কখন যুদ্ধে যাবে, যুদ্ধের আইন বাস্তবে প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণাও আমরা তাঁরই মহান চরিত্রে দেখতে পাই। অথচ তাঁকেই সুফিবাদের ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ আমরা নিশ্চিতভাবে জানি হযরত আলীর মহান উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত ইমাম হাসান (আ.), হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণ তারা তদানীন্তন সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি যারা সকলের নিকট সম্মানীয় ও পূজনীয় ছিলেন। একারণে সুফিবাদের ইতিহাস অনুসন্ধানকল্পে আমরা রাসূল (সঃ) এর ওফাতের পর মুসলিম সমাজে যে ভয়াবহ ধর্ম-রাজনৈতিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়। যার ফলে আহলে বাইত বিরোধী চক্ররা এক নতুন ধর্মমত তথা বিকৃত ইতিহাস সৃষ্টি করে ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়।

ধর্ম রাজনীতিতে বিপর্যয় (Religo-Political Debacle)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬৩২ খৃস্টাব্দের ৮ জুন তারিখে এই নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করেন। তার ওফাতের সাথে সাথে তার উত্তরাধিকারত্ব তথা খেলাফত নিয়ে এক শ্রেণীর সাহাবা যে চক্রান্ত করেন তা বর্ণনা করাই একটি দুঃখজনক বিষয়। রাসূল (সা.) এর শেষকৃত্য না করেই বনী সফীফা নামক প্রাক ইসলামিক যুগে ডাকাতদের লুটের মালের ভাগাভাগির জায়গায় গিয়ে রাসূল (সা.) এর পরে কে তার স্থলাভিষিক্ত হবেন এ নিয়ে বিরাট জটিলতা, বাকবিতন্ডা, মারামারি ও খুনখারাবির ঘটনা ঘটে এবং বলা হয় যে হযরত আবু বকর (রা.) সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে খলিফা নির্বাচিত হন। জার্মানির বন (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ প্রচুর গবেষণা করে এ বিষয়ে তার অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, "এই সব শ্রদ্ধাষ্পদ ব্যক্তিদের কেহই যেহেতু এখন জীবিত নেই; তাই অবশ্য এই বিষয়ে একটি সহজ মীমাংসার সুযোগ আছে। রাসূল (সা.) যে মুমিনদের জন্য রুহানী মুরশিদ ও পার্থিব কর্মকাণ্ডের নেতার কাজ করতেন। ইহা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। ইসলামের মারফতি উত্তরাধিকারের বিষয়ে বলতে গেলে বলতে হয় নকশবন্দিয়া ত্বরিকাহ্‌ হতে একটি শাখা ত্বরিকার কিছু সংখ্যক লোক ব্যতীত সকল সুন্নীই সম্পূর্ণরূপে একমত যে, হযরত আলী (আ.) রাসূল (সা.) এর অব্যবহিত পরবর্তী খলিফা। পার্থিব ক্ষণস্থায়ী শাসন ক্ষমতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তারা সকলেই স্বীকার করেন যে, ইহা ক্ষণস্থায়ী বিষয়। এমনকি সুন্নীরাও বিশ্বাস করে যে, প্রবল সংখ্যাধিক্যের দ্বারা নির্বাচিত হওয়া ছাড়া ঐ পদের জন্য আবু বকর (রা.)'র কোনরূপ দাবিই ছিলনা। অবশ্য এখানে সংখ্যাধিক্যের দ্বারা নির্বাচিত মন্তব্যটি খুবই নাজুক ও প্রমাণ সাপেক্ষ। কারণ মদীনার সকল লোক ঐ নির্বাচনী সভায় উপস্থিত ছিলেন না। তাছাড়া এই নির্বাচন মসজিদেও অনুষ্ঠিত হয় নাই। এখানে মাত্র ৪০/৪৫ জন লোক

ছিল। আবু বকর (রা.) ওমর (রা.) ও আবু ওবায়দা এই তিনজন মাত্র কোরায়েশ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদের উপস্থিতির তো প্রশ্নই আসেনা। সূত্র (Muslim Conduct of State Dr. Md. Hamidullah, Page-46) মাওলানা রুমী এ ধরণের সাহাবাদের সম্পর্কে বলেছেন, চুঁ সাহাবা হুবেব দুনিয়া দাস্তান্দ মোস্তাফারা বে কাফন আন্দাখতান্দ আহলে দুনিয়া কাফিরানে মুতলাকান বাক বাকান জাক জাকান্দর বাক বা কান। অনুবাদ: সাহাবারা দুনিয়ার মহব্বতে গিরে মুস্তফাকে বে কাফনে রেখে কোথা ফিরে বেশক কাফির হে দুনিয়াদারেরা, বকাঝকা জানে তারা দুনিয়ার সেরা। (ইতিহাসগত বিভ্রান্তের রহস্য-মুফাখারুল ইসলাম)। প্রকৃতপক্ষে হযরত আবু বকর (রা.) তদানীন্তন আরবীয় গোত্রীয় নির্বাচন পদ্ধতিতে খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই তার উত্তরাধিকার নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নীতি পরিত্যাজ্য বিবেচনা করে নিজে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে সম্পূর্ণ এককভাবে তার উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন। ওমর (রা.) বিষয়টি অধিকতর জটিল করে নিজ বিবেচনায় একটি নির্বাচনী কমিটি গঠন করেন। কমিটির কোন কোন সদস্যকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে কমিটিকে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয়া হয়। আবার তিন দিনের মধ্যে এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন না করা হলে নির্বাচনী কমিটির সবাইকে হত্যা করার সিদ্ধান্তও প্রদান করা হয়। নির্বাচনী কমিটির একজন সদস্য আব্দুর রহমান বিন আউফ সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী শর্ত প্রতিপালনে বাধ্য করার জন্য পরবর্তী নির্বাচিত খলিফাকে চাপ প্রয়োগ করলে হযরত আলী (আ.) সেই শর্ত প্রত্যাখ্যান করেন। শর্তটি ছিল কুরআন, হাদিস এবং পূর্ববর্তী খলিফাদের (প্রণীত বিধি বিধান আচার অনুষ্ঠান) অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করার শর্ত। এই শর্তের ব্যাপারে হযরত আলী বলেন, আমার পূর্ববর্তী দুইজন যদি কুরআন ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ্ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকেন, তাহলে কুরআনও সুন্নাহ অনুসরণই যথেষ্ট। আর যদি তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত কাজ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে তাদের নীতি অনুসরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই শর্ত প্রদানের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, পূর্ববর্তী দুই রাষ্ট্রনায়ক নিশ্চয় এমন কিছু কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, যা সর্বজনবিদিত ছিল। তাই কায়েমী স্বার্থবাদীগণ তার বিপরীত কোন নীতি গ্রহণ না করতে পরবর্তী রাষ্ট্র প্রধানকে বাধ্য করতে চেয়েছিলেন। যা হোক, এ ধরণের শর্ত প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে হযরত উসমান (রা.) ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হিসাবে নিয়োজিত হন।

হযরত ওসমান (রা.) স্বীয় জামাতা হারেস ইবনে হাকামকে তার বিয়ের দিন বায়তুল মাল থেকে দুই লাখ দিরহাম দান করেন। পরদিন সকালে বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষ জায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বিষন্ন বদনেও অশ্রুসজল নয়নে খলিফার নিকট এসে তাকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিতে অনুরোধ করেন। ওসমান (রা.) এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান যে, খলিফার এই অবৈধ পদ্ধতিতে এত বিপুল অংকের অর্থ তার জামাইকে প্রদানের কারণে তিনি চাকুরী থেকে ইস্তফা দিতে চান। এ প্রেক্ষিতে ওসমান (রা.) বললেন, আমি আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদয় ব্যবহার করেছি-এ জন্য তুমি কাঁদছো? জায়েদ বিন আরকাম (রা.) বলেন, আমি এই চিন্তা করে কাঁদছি যে আপনি রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় মুসলমানদের জন্য যে বিপুল অর্থ দান করতেন তারই প্রতিদান হিসাবে এই অর্থ গ্রহণ করলেন না তো। খোদার শপথ করে বলছি আপনি তাকে একশত দিরহাম দিলেও তা বেশী হতো। ওসমান (রা.) এই ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন এবং বলেন, তুমি চাবি রেখে যাও, আমি অন্য লোক অবশ্যই পাব।

ধন সম্পদ ছাড়াও পদ ও চাকুরীর অবস্থা ছিল এই যে, ওসমান (রা.) এর আত্মীয় স্বজনের উপর তা বৃষ্টির মত বর্ষিত হচ্ছিল। এদেরই অন্যতম ছিলেন তার চাচাত ভাই সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, ওসমান (রা.) তার রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে ফিলিস্তিন ও হেমস তার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তাকে সমগ্র সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দেন এবং তিনি যেন পরবর্তীতে আর্থিক ও সামরিক শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে কেন্দ্রীয় শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা অর্জন করেন তার পথ খোলাসা করে দেন।

চাকুরীর সুবিধা লাভকারীদের মধ্যে ছিল রাসূল (সা.) কর্তৃক মদীনা থেকে বহিষ্কৃত ও প্রথম দুই খলিফা যাদের মদীনায় প্রবেশ নিষিদ্ধ আদেশ বহাল রেখেছিলেন সেই হাকাম ইবনে আলা (দুষ্কৃতকারী মারোয়ানের পিতা), ওসমানের দুধ ভাই তথা আবদুল্লাহ ইবনে সারাহ যাকে কাবা শরিফের গিলাফের ভিতরে পালালেও হত্যা করার নির্দেশ খোদ রাসূল (সা.) দিয়েছিলেন। মারওয়ানকে ওসমান (রা.) তার মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে প্রধান উযীর নিয়োগ করেছিলেন। আবদুল্লাহ্কে মিসরের গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। ইরান বিজয়ী বীর সা'দ ইবনে আবি আক্কাসকে (রা.) পদচ্যুত করে তার বৈমাত্রেয় ভাই ওয়ালীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবী মোয়াইতকে কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। এরপরে তার অপর এক বন্ধু সাঈদ ইবনে আসকে এ পদ দান করেন। তার মামাত ভাই আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমেরকে মুসা আলা আশআরীকে (রা.) কে পদচ্যুত করে তার

পদে নিয়োগ করেন। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ জনপ্রশাসন রাসূল (সা.) বংশের দুশমন খোদাদ্রোহী উমাইয়াদের হাতে ন্যাস্ত হয়; যে কারণে হযরত আলী মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত প্রত্যক্ষ গণভোটে নির্বাচিত হয়ে প্রথমেই এই দুর্নীতিবাজ উমাইয়া গভর্ণরদেরকে পদচ্যুত করেন।

উল্লেখ্য যে, এই সব দুর্নীতিবাজ গভর্ণরদের অপশাসনে, একই সাথে মিশর, কুফা, বসরা প্রভৃতি জায়গায় প্রচণ্ড গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহীগণ বিষয়টি কেন্দ্রীয় খলিফার নজরে আনার জন্য মদীনার আগমন করেন। কিন্তু বাস্তবে মারোয়ানের প্ররোচনায় বিষয়গুলো অনিষ্পন্নই রয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে অভিযোগ উঠে খেলাফতের দপ্তর থেকে খলিফার নিয়োগকৃত গভর্ণর মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে (রা.) হত্যা করার লিখিত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে। লোকজন সবাই ওসমান (রা.) এর সততায় ও ব্যক্তিত্বে সন্তুষ্ট ছিল। তাদের মূল দাবি ছিল এ কুচক্রি মারোয়ানের মুহাম্মদের মৃত্যুর নির্দেশ সম্বলিত লিখিত নির্দেশ হিসাবে প্রমাণিত বিচার-অথবা বিদ্রোহীদের হাতে তাদের বিচারের জন্য তুলে দেয়া, ওসমান (রা.) এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় বিদ্রোহীগণ বুঝতে পারে যে এই খলিফার মাধ্যমে কোন ধরণের রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয় এবং এদের একটি গ্রুপ ওসমানের (রা.) বাড়ির পিছন দিকে দিয়ে প্রবেশ করে কুরআন পাঠরত অবস্থায় তাকে শহীদ করে (ইন্নালিল্লাহে---রাজেউন)।

হযরত ওসমান (রা.) শাহাদতের পর ৬৫৬ খৃস্টাব্দে হযরত আলী (আ.) ইসলামের খলিফা হন। হযরত আলী বলেন, আমার পূর্ববর্তী খলিফাগণ যে সব আইন-কানুন প্রণয়ন করেছেন ও কর্মকাণ্ড করেছেন ও এখন যদি আমি ঐ সকল (সুন্নাহ মূল ধর্ম বিরোধী) কাজ লোকদেরকে পরিত্যাগ করতে জোর দেই এবং তা রাসূল (সা.) এর সময় যেরূপ ছিল, সেরূপ পুনর্জ্জীবিত করার পদক্ষেপ নেই, তবে আমার সেনাবাহিনী আমাকে একা ফেলে অসহায় অবস্থায় রেখে দলে দলে চলে যাবে। সর্বসাকুল্যে অল্প কিছু অনুসারী আমার সাথে থাকবে, যারা কুরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক আমার ইমামতকে স্বীকার করে। তোমরা কি মনে কর–যদি আমি এ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করি:

- মাকামে ইব্রাহীম রাসূল (সা.) যেখানে স্থাপনের আদেশ দিয়েছিলেন সেখানে স্থানান্তর করা।
- ফাতেমা (আ.)'র নিকাত্মীয়গণকে 'ফাদাক' ফেরত দেয়া। রাসূল (সা.) কর্তৃক ফাতেমা (আ.) কে প্রদত্ত যা আবু বকর (রা.) কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয়।
- রাসূল (সা.) এর আমলে যে রূপ ওজনের পরিমাপ চালু ছিল, সে রকম ওজনের পরিমাপ ব্যবস্থা পুনঃ চালু করা।
- রাসূল (সা.) যাদেরকে জমি প্রদান করেন, তাদেরকে তা ফেরত দেয়া।
- খলিফাগণ কর্তৃক জারীকৃত নিষ্ঠুর আইন বাতিল করা। কথায় কথায় চাবুক মারা হাদিস প্রচারে নিষেধাজ্ঞা বা বর্ণনা করলে শাস্তির ভয় ইত্যাদি।
- বৈধ স্বামীদের থেকে অবৈধভাবে পৃথক (Separation) করে অন্যদেরকে প্রদত্ত স্ত্রী লোকদেরকে প্রকৃত স্বামীর কাছে ফেরত দেয়া হয়েছিল। কুরআনে বর্ণিত তালাকের বিধান পরিবর্তন করা।
- প্রকৃত ব্যবস্থা অনুযায়ী যাকাত সমন্বয় করা।
- ধনীদের কাছে সম্পদ স্তুপীকৃত করার পরিবর্তে রাসূল (সা.) এর সময়ে যে ব্যবস্থা চালু ছিল সেরূপভাবে বায়তুল মাল হতে লোকদের মধ্যে সকলকে সমভাবে প্রদান করা।
- (খলিফাগণ শ্রেণি ব্যবস্থা চালু করেছিলেন)। ওযু ও নামাযের প্রকৃত ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবন করা।
- জমির খাজনা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা (হযরত ওমর (রা.) ইরাকে জমির খাজনা সামানীয় নিয়মে ও মিশরে রোমান নিয়ম চালু করেন।
- বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল মুসলিমকে সমান ঘোষণা। হযরত ওমর (রা.) আরবদের সাথে অনারবদের বিবাহ নিষিদ্ধ করেন। (যা মধ্যপ্রাচ্যে অনেক দেশে বর্তমানেও চালু আছে)।
- আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী (সুরা আনফল: ৪১) অনুযায়ী খুমস সংগ্রহ করা ও আহলে বাইতদেরকে প্রদান করা। খলিফাগণ খুমাসের বিধান বাতিল করেন।
- ওযুর সময় চামড়ার জুতায় মসেহ বন্ধ করা, নাবিজ ও খেজুরের রস এর মদ পানের আইন অনুযায়ী দণ্ড ও শাস্তির বিধান করা।
- হজ-ই মুতা ও নিকাহ-ই-মুতা বৈধ ঘোষণা করা। যা রাসূল (সা.) এর সময় চালু ছিল হযরত ওমর (রা.) উক্ত মুতাদ্বয় নিষিদ্ধ করেন এবং বলেন, যারা তার নির্দেশ অমান্য করবে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। মৃতের যানাযার দোয়ায় ৫ তকবীর পুনঃচালুকরণ। হযরত ওমর (রা.) ৪ তকবীর চালু করেন।

- রাসূল (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী জামাআতে তারাবীর নামায পড়া নিষিদ্ধ করণ। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম উচ্চস্বরে বলা বাধ্যতামূলক করা যেহেতু বিসমিল্লাহ্ সুরা ফাতিয়ার ১ নম্বর আয়াত।
- রাসূল (সা.) এর সময়ে কুরআনের মতো প্রচলিত তালাক প্রদান প্রথা চালু/কার্যকরী করা। হযরত ওমর (রা.) ৩ তালাক এক সাথে দেয়ার বিধান চালু করেন। যা সম্প্রতি (২০১৭) ভারতে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বার তালাক ঘোষণাকে বৈধ ঘোষণা করেন।
- বিভিন্ন জাতির যুদ্ধ বন্দীদের সাথে আল্লাহ্ ও তার রাসুলের বিধান মোতাবেক ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া। (সূত্র: আমরা কি প্রকৃত সুন্নাহ অনুসরণ করছি?) (সহীহ আল বুখারী অবলম্বনে)। এম এ রহমান, লেখক, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ প্রকাশকাল একুশ বইমেলা ২০১৩।

রাসূল (সা.) এর সময় মসজিদুল নববী যেরূপ গঠন (Structure) ছিল উহা সেরূপ গঠনে পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

এ বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূল (সা.) এর ওফাতের ২৫ বৎসরের মধ্যে তাঁর সুন্নাহকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং নতুন পদ্ধতি (বিদআত) চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে উমাইয়া ও আব্বাসীয় একনায়কগণ ধর্মের কত ক্ষতি করেছে তা সহজেই অনুমেয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাসূল (সা.) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত আলী (আ.) কে ও তাঁর আহলে বাইতকে পবিত্র কুরআনের উপযুক্ত ব্যাখ্যাকারী তথা ধর্মের সংরক্ষণকারী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। আহলে বাইতদের এই মর্যাদা ও ক্ষমতা রাষ্ট্রীয়ভাবে অস্বীকার করার জন্য ধর্মের এক ব্যাপক বিকৃতি ঘটে। যেহেতু হযরত আলী (আ.) এর ধর্মীয় অবস্থান সামাজিকভাবে গ্রহণ করা হয় নাই ও তাই তাঁর মতামত বা সিদ্ধান্তকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অগুরুত্বপূর্ণ বা এর মান্যতা বাধ্যতামূলক নয় মর্মে বিবেচনা করা হয়েছে। তাই তিনি খলিফা হওয়া সত্ত্বেও অবস্থার কোন পরিবর্তন করতে সক্ষম হননি। এই অবস্থার আরো অবনতি ঘটে তিনি খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর। হযরত জুবায়ের (রা.), হযরত তালহা (রা.) এবং মা আয়েশা (রা.) ও শক্তিশালী একটি উমাইয়া গ্রুপ তাঁর বিরুদ্ধে জংগে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধ করে। ফলে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই যুদ্ধে বিজয়ী হলেও ধর্ম রাষ্ট্রীয়ভাবে (Religo Political) এক ব্যাপক জনসংখ্যার নিকট তাঁর ধর্ম রাজনীতিক অবস্থান বিতর্কিত হয়ে পড়ে। এই অবস্থার অধিকতর অবনাতি ঘটে জংগে সিফফিনের যুদ্ধের পর থেকে। কারণ কোরানিক প্রতারনার ফলে কার্যত মুয়াবিয়ার এই যুদ্ধে বিজয় সূচিত হয়। পরবর্তীতে মুয়াবিয়া স্বাধীন রাজার মত আচরণ করতে থাকেন এবং আলী (আ.) এবং আহলে বাইতের বিরুদ্ধে গালির বিধান চালু করে এবং আহলে বাইতের অনুসারীদের, গুম খুন, অবৈধ বিচারের মাধ্যমে খুন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, সরকারী জীবিকা ভাতা বন্ধ প্রভৃতি পদ্ধতি চালু করে। ফলে আহলে বাইতদের ধর্মীয় গুরুত্ব একই সাথে সরকারীভাবে ও সামাজিকভাবে প্রত্যাখান করা হয়। পরবর্তীতে খারেজীদের সাথে যুদ্ধে হযরত আলী (আ.) এর ধর্ম-সামাজিকভাবে (Religo Social) কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আহলে বাইতদের যে নিরংকুশ মর্যাদা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার অবসান ঘটে এবং এক ধরণের ফরমায়েসী আলেমের সৃষ্টি হয়। আব্বাসীয় শাসনামলে অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হতে থাকে এবং এ ধারা এখন পর্যন্ত অব্যহত রয়েছে।

রাসূল (সা.) বলেছেন, ইসলামী খিলাফত ৩০ বৎসর চালু থাকবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বলতে যা বোঝায় তা সর্বোচ্চ ৩০ বৎসর মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ মুসলিম সমাজে প্রকৃত ইসলাম থাকবেনা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ ও ফিরকা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আহলে বাইত ও অলি আল্লাহ্র মাধ্যমে হেদায়েত লাভ করতে সক্ষম হবে তারাই হেদায়েত পাবে, অন্যরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যেমন রাসূল (সা.) বলেন, আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে, শুধু একমাত্র ফেরকা যারা কুরআন ও আমার আহলে বাইতকে আঁকড়ে ধরবে তারাই রক্ষা পাবে।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের ধর্ম-রাজনীতিতে (Religo Politics) যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তা সংক্ষেপে আলোচনা করব। এ পর্যায়ে আমরা পর্যালোচনা করে দেখবো যে, রাসূল (সা.) এর প্রবর্তিত রাষ্ট্রনীতির বিপরীতে রাজতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি ছিল, একটির স্থান অপরটি দখল করায় ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতিতে কি কি পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল এবং মুসলমানদের ধর্ম-সমাজ ও অর্থ-রাজনীতিতে এর কি প্রভাব পড়েছিল। এই বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে সুফিবাদের প্রকৃত ইতিহাস জনগণ জানতে পারছে না।

রাষ্ট্র প্রধান নিয়োগের পদ্ধতি পরিবর্তন

১) আমরা জানি যে গাদীরে খুমে রাসূল (সা.) যে রাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেছিলেন তা ছিল Theocracy বা ঐশীতন্ত্র। যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান ও ধর্মীয় নেতৃত্ব একই ব্যক্তির উপর ন্যাস্ত থাকবে এবং তিনি হবেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত ও নিয়োগকৃত। কিন্তু রাসূল

(সা.) ওফাতের পর একশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ এই নীতি এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করেন যে, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব হাশেমীয় বংশের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বরং লোকেরা নিজেরাই নিজেদের নেতা নিয়োগ করবে এবং এ ব্যাপারে তারাই ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাই ঐশী নেতৃতের কনসেপ্ট সামাজিকভাবে বাদ দেয়া হয় এবং এর পরিবর্তে ইসলামী আইন বিজ্ঞানে (Islamic Gurisprudence) এক নতুন তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়। আর তা হলো সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত যাকে আইনের পরিভাষায় 'এজমা' বা সম্মিলিত মতামত হিসাবে বিবেচিত হয়। এই মতবাদ অনুসারে একশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের মতামত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের (সা.) নির্দেশের চেয়ে অগ্রগন্য। দৃশ্যত আবু বকর (রা.) এই পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হয়। তবে স্বয়ং আবু বকর (রা.) এই নীতি পরিবহার করে এককভাবে হযরত ওমরকে (রা.) তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছার বা ওসীয়তের মাধ্যমে খলিফা হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। ওমর (রা.) তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনেও সংখ্যা গরিষ্ঠের বিষয়টি বিবেচনায় না এনে হযরত আবু বকর (রা.) এর মনোনীত পদ্ধতি মত তাঁর পছন্দনীয় একটি নির্বাচনী কমিটির মাধ্যমে হযরত ওসমানকে (রা.) নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এই নিয়োগের ফলে মুসলিম বিশ্বে গৃহ যুদ্ধের মত ঘটনা ঘটে এবং হযরত ওসমান (রা.) শাহাদত বরণ করেন। তখন হযরত আলী (আ.) সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গের সমর্থনপ্রাপ্ত হয়ে প্রকাশ্য জনসভায় নবী (সা.) এর মসজিদে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। তখন থেকে মুসলিম উম্মাহ্ মোটামুটিভাবে প্রকাশ্যভাবে জনসমর্থনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রধান নিয়োগের বিষয়টি একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেন। তখন হযরত আলী (আ.) যেহেতু রাসূল (সা.) এর পরে আহলে বাইতদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার বিষয়টি সর্বজনবিদিত ছিল, তাই হযরত আলীর (আ.) ওফাতের পর হযরত হাসান (আ.) এর খলিফা হিসাবে নিয়োগ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিন্তু উমাইয়া শাসক মুয়াবিয়াা এই নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করেন এবং হযরত হাসান (আ.) এর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। যেহেতু রাসূল (সা.) ওফাতের পরবর্তী সময় (৬৩২-৬৬১ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম-রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়, তাই হযরত হাসান (আ.) এর বিরুদ্ধ শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে এবং হযরত হাসান (আ.) মুয়াবিয়ার সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হন। চুক্তির শর্ত ছিল নিম্নরূপ :

১) হাসান বিন আলী (আ.) মুয়াবিয়ার নিকট শাসন ক্ষমতা বা সরকার ব্যবস্থা (খিলাফত/ইমামত নয়) এই শর্তে হস্তান্তর করেন যে তিনি আল্লাহ্র কুরআন, রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী ধার্মিক ও আমানতদার খলিফাদের ন্যায় পরিচালনা করবেন।

২) পরবর্তীকালে অন্য কাউকে নিয়োগ বা মনোনয়ন দেয়ার ক্ষমতা মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের থাকবেনা। বরং; খেলাফত হাসান বিন আলী (আ.) নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাঁর অবর্তমানে খেলাফত হোসাইন বিন আলী (আ.) উপর তা বর্তাবে।

৩) সিরিয়া, ইরাক, তোহাময় হেযায-বা যে কোন অঞ্চলের সাধারণ জনতার জান-মাল, ইজ্জত নিরাপদ থাকিবে।

৪) হযরত আলী (আ.) এবং তাঁর পরিবারের সকল সদস্য ও তাঁদের অনুসারীদের জান, মাল, ইজ্জত সুরক্ষিত থাকবে। আর এ বিষয়ে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ থাকবে এবং আল্লাহ্র সাথে কৃত এই ওয়াদার প্রতি সম্মান বজায় রাখবে।

৫) হাসান বিন আলী (আ.) এর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন প্রকার আক্রমণ করতে পারবে না এবং তাদের কাউকে পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে আতংকিত করতে পারবেনা।

৬) হযরত আলীকে (আ.) সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করা হবে এবং তাকে কোন প্রকার গালিগালাজ দেয়া যাবে না। উল্লেখ্য, সিফ্ফিনের যুদ্ধের পর সালিশকারকদের প্রতারণামূলক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ইসলামী খেলাফতের একাংশে মুয়াবিয়া স্বাধীন রাজার ন্যায় আচরণ করতে থাকেন এবং তাঁর শাসনাধীন সমস্ত মসজিদে হযরত আলী (আ.) এর গালিগালাজের নীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচার করতে থাকেন।

ইতিহাস সাক্ষী আমীর মুয়াবিয়া চুক্তি ভঙ্গ করা কবীরা গোনাহ্ জানা সত্ত্বেও হরত হাসান (আ.) এর সাথে কৃত সন্ধির একটি শর্তও প্রতিপালন করেন নি। বরং আহলে বাইতদের ও তাঁদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও গোপন আক্রমণ, জুলুম, অত্যাচার, গালিগালাজের নীতি অব্যহত রাখেন এবং কিছুদিন পূর্বেই সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে প্রতারণা ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে মদ্যপ, চরিত্রহীন, ধর্মজ্ঞানহীন ৩২ বৎসরের যুবক ইয়াজীদকে তার উত্তরাধিকারী তথা ইসলামী রাজ্যের আমিরুল মুমেনিন হিসাবে নির্ধারিত ও নিয়োগ করেন। ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি আল্লাহ্র সাথে মুহাব্বত এবং রাসূল ও আহলে বাইতের প্রতি কুরআনী নির্দেশ অনুযায়ী "মুয়াদ্দাত" তথা অকৃত্রিম ভালবাসার কনসেপ্ট বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় এবং আনুষ্ঠানিক নামায, রোজা ইত্যাদিকে ধর্মের মৌলিক ভিত্তি হিসাবে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠা

করা হয়। ফলে প্রেমময় আল্লাহ্‌র পরিবর্তে একজন একনায়ক বা স্বৈরশাসক আল্লাহ্ বিশ্বের শাসক এ ধরণের মতবাদ সমাজে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এ কারণেই হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) এর বিরুদ্ধে এত বিপুল সংখ্যক মুসলমান নামধারী সৈনিকরা তাঁকে সপরিবারে হত্যা ও নির্যাতন এবং অসম্মান করতে কোন দ্বিধাবোধ করে নাই। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলাম ধর্মে উত্তরাধিকার সম্পর্কে কোন বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। ক্ষমতাসীন বাদশাহ্ তার পছন্দ অনুযায়ী একজন উত্তরাধিকারী নিয়োগ করতেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী এই নীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে অন্য এক ব্যক্তিকে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করতেন। ফলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী রাজত্বে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ একটি স্থায়ী সমস্যা হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে।

ইসলামের রাসূল (সা.) কর্তৃক ঘোষিত নীতি আহলে বাইতের শাসনের পরিবর্তে সৎ ব্যক্তির জন সমর্থনে মানোনয়নের নীতি বাদ দিয়ে উমাইয়া শাসক (মুয়াবিয়া) যে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলনীতি চালু করেন তা তার রাজত্বের সূচনাকালে একবার মদীনায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেছিলেন "আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তোমাদের সরকারের দায়িত্ব গ্রহণকালে আমি এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম না যে, আমার ক্ষমতায় আসীন হওয়ায় তোমরা সন্তুষ্ট নয়, তোমরা তা পছন্দ করোনা। এ বিষয়ে তোমাদের মনে যা কিছু আছে, আমি তা ভালো করেই জানি। কিন্তু আমার এ তরবারি দ্বারা তোমাদেরকে পরাভূত করেই আমি তা অধিকার করেছি।... এখন তোমরা যদি দেখ, আমি তোমাদের হক পুরোপুরি আদায় করছি না, তাহলে সামান্য নিয়েই আমার উপর সন্তুষ্ট থাকবে। (সূত্র: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ইবনে কাসীর, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৩২)

এভাবে যে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছিল ইয়াযীদের স্থলাভিষিক্তের পর বিগত দশকে (১৯২৪) মোস্তাফা কামাল কর্তৃক তুরস্কের খেলাফতের অবসান পর্যন্ত একদিনের জন্যও যার নড়চড় হয়নি। এ থেকে বাধ্যতামূলক বাইয়াাত এবং বংশধরদের উত্তরাধিকার সূত্রে বাদশাহী লাভের এক স্বতন্ত্র ধারা চালু হয়। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত নির্বাচনভিত্তিক খেলাফতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা মুসলমানদের ভাগ্যে জোটেনি। মুসলমানদের স্বাধীন এবং অবাধ পরামর্শক্রমে নয়, বরং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লোকেরা ক্ষমতাসীন হয়েছে। বায়আতের সাহায্যে ক্ষমতা লাভের পরিবর্তে ক্ষমতার ভয়ে বায়আত হাসিল শুরু হয়। বায়আত করা না করার ব্যাপারে মুসলমানরা স্বাধীন থাকেনি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য শর্ত হিসাবে বায়আত লাভও পরিত্যাগ করা হয়। প্রথমত ক্ষমতা যার হাতে ন্যস্ত, তার হাতে বায়আত না করার ক্ষমতাই জনগণের থাকেনি। কিন্তু জনগণের বায়আত না করার অর্থ এই নয় যে, এর ফলে ক্ষমতাসীনদের হাত থেকে ক্ষমতা অন্যত্র চলে যাবে।

মুসলমানদের স্বাধীন পরামর্শ ব্যতিত বাহুবলে যে রাজত্ব বা শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আইনের দৃষ্টিতে তা সিদ্ধ কিনা এখানে সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। আসল প্রশ্ন হচ্ছে ইসলামে খেলাফত প্রতিষ্ঠার সঠিক পন্থা কি? যে পন্থায় আল্লাহ্‌র রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন, অথবা যে পদ্ধতিতে খেলাফত বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে মুয়াবিয়া, ইয়াজীদ ও তৎপরবর্তীগণ খলিফা হয়েছেন। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোন ফকীহ দেননি বরং যে কোন পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীন হওয়াই বৈধ পদ্ধতি মর্মে দুঃখজনকভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের ধর্মীয় আইন বিশারদগণ ঘোষণা করেছেন। মুয়াবিয়া ও ইয়াজীদের ধর্ম বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম লিখেছেন:

ওরে বাংলার মুসলিম তোরা কাঁদ।
এনেছে এজিদ বিদ্বেষ পুনঃ মোহরমের চাঁদ।
এক ধর্ম ও এক জাতি তবু ক্ষুধিত সর্বনেশে
তখতের লোভে এসেছে এজিদ কমবখতের বেশে
এসেছে 'সীমার' এসেছে কুফার বিশ্বাসঘাতকতা,
ত্যাগের ধর্মে এসেছে লোভের প্রবল নির্মমতা।
মুসলিমে মুসলিমে আনিয়াছে বিদ্বেষের বিষাদ,
কাঁদে আসমান জমিন, কাঁদিছে মোহরমের চাঁদ।
একদিকে মাতা ফাতেমার বীর দুলাল হোসেনী সেনা
আর দিকে যত তখত বিলাসী লোভী এজিদের কেনা,
মাঝে বহিতেছে শান্তি প্রবাহ পুণ্য ফোরাত নদী,
শান্তি বারির তৃষ্ণাতুর মোরা, ওরা থাকে তাহা রোধি
একদিকে ইসলামী ইমামের সিপাহী শান্তিব্রতী।
আর এক দিকে স্বার্থান্বেষী হিংসুক ক্রোধমতি,
এই দুনিয়ার মৃত্তিকা ছিল তখত যে খলিফার।
ভেঙে দিয়েছিল স্বর্ণ সিংহাসনের যে, অধিকার মুয়াবিয়া কর্তৃক ও ভোগী বর্বর,
এজিদী ধর্মী যত যুগে যুগে সেই সাম্য ধর্মে করতে চেয়েছে হত,
এই ধূর্ত ও ভোগীরাই তলোয়ারে বেঁধে কুরআন,
সিফফিনের যুদ্ধে বর্শায় কুরআন বাঁধার অপকৌশল সম্পর্কে
মুয়াবিয়া মসজিদে আহলে বাইতদের গালি গালাজের বিধান চালু করে
আলীর সেনারে করেছে সদাই বিব্রত পেরেশান।
এই এজিদের সেনাদল শয়তানের প্ররোচনায়,
হাসান হোসেনে গালি দিতে যেত মক্কা ও মদীনায়।

এরাই আত্ম প্রতিষ্ঠা লোভে মসজিদে মসজিদে,
বক্তৃতা দিয়ে জাগাত ঈর্ষা হায় স্বজাতির হৃদে।
ঐক্য যে ইসলামের লক্ষ্য। এরা তা দেয় ভেঙ্গে।
ফোরাত নদীর কুল যুগে যুগে রক্তে উঠেছে রেঙ্গে,
এই ভোগীদের জুলুমে। ইহারা এজিদী মুসলমান।
এরা ইসলামী সাম্যবাদকে করিয়াছে খান খান।
এক বিন্দুও প্রেম-অমৃত নাই ইহাদের বুকে।
শিশু আসগরে তীর হেনে হাসে পিশাচের মত সুখে।
আপনার সুখ ভোগ ও বিলাস ছাড়া জানে না কিছু।
একজন বড় হতে চায় করে লক্ষ জনের নীচু---।

(মহররম নজরুল ইসলাম, ইসলামী কবিতা প্রকাশকাল, ২ শে মে, ১৯৮২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)।

খলিফার জীবন যাত্রার বিকৃতি ও পরিবর্তন

নব্য শাসকগণ মহানবী (সা.) ও চারজন প্রথম খলিফার জীবন ধারা পরিহার করে। তারা রাজপ্রাসাদে বসবাস শুরু করে। রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনী (Royal Body Guard) তাদের রাজ প্রাসাদের সুরক্ষায় নিয়োজিত হয়। এই দেহরক্ষী বাহিনীকে বাদ দিয়ে কোন সাধারণ ব্যক্তি তাদের সাথে দেখা করার বা কথা বলার অধিকার হারায়। প্রজা সাধারণের অবস্থা জানার জন্য অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। আমরা জানি এই জীবনযাত্রা খোলাফায়ে রাশেদার বা রাষ্ট্র প্রধানদের বিপরীত আচরণ। হযরত আলীর (আ.) অনেক শত্রু ছিল। তার ব্যক্তিগত কর্মচারী কম্বল তাঁকে সব সময় অনুসরণ করতে চাইলে তিনি তার কাছে কৈফিয়ত তলব করে বলেন, যে (কম্বর) কেন তাকে সব সময় অনুসরণ করে। কম্বর জবাবে বলেন, আপনার অনেক শত্রু তাই কেহ যেন তাঁকে পেছন দিক থেকে হঠাৎ আক্রমন করতে না পারে সেই জন্য কম্বর তাকে অনুসরণ করে থাকেন। এ প্রেক্ষিতে আলী (আ.) বলেন, "মৃত্যুই আমার সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা" এবং কম্বরকে তাকে অহেতুক অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখেন। তাছাড়া এই সব রাষ্ট্র প্রধান জনগণের নামাজের ইমামতি করতেন, তাদের সুখ সুবিধা প্রত্যক্ষ করতেন এবং প্রয়োজনে সমস্যার সমাধান করে দিতেন। পক্ষান্তরে পরবর্তী শাসকগণ নামাযে ইমামতির দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন যাদেরকে বর্তমানে "নামাযের ইমাম" বলা হয়। যার চাকুরীই অন্যদের নামায পড়ানো। যা একটি পেশা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। সমাজে যার অন্য কোন নেতৃত্বের সুযোগ নাই।

বায়তুল মালের মালিকানার প্রকৃতির পরিবর্তন

বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার সম্পর্কে ইসলামী নীতি এই যে, তা রাষ্ট্র প্রধান এবং তার সরকারের নিকট আল্লাহ্ এবং জনগণের আমানত। এতে কারো ইচ্ছামত ব্যবহারের অধিকার নাই। রাষ্ট্র প্রধান বে আইনীভাবে তাতে কিছু জমাও করতে পারবেন না। আর পারেন না তা থেকে অবৈধভাবে কিছু ব্যয় করতে। মধ্যম শ্রেণির জীবন যাত্রা নির্বাহ করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন। শুধু ততটুকু গ্রহণ করার অধিকার তিনি সংরক্ষণ করেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে সামরিক এক নায়কতন্ত্র চালু হওয়ার পর বায়তুল মালের আয়-ব্যায়ের এই নীতি বিসর্জন দেয়া হয় এবং এর মালিকানা, বাদশাহ, তার বেগম ও রাজবংশের মালিকানাধীন হয়ে পড়ে। প্রজারা পরিণত হয় নিছক কর দাতায়। সরকারের হিসাব বা জবাবদিহিতা থেকে বাদশাহরা মুক্ত হয়ে যান। অর্থাৎ জনগণকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই সময়ে বাদশাহ, শাহজাদা, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, সামরিক নেতৃবৃন্দের জীবন যাত্রা যে শান শওকেতের সাথে নির্বাহ হতে থাকে, তা বায়তুল মালকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। উমাইয়া শাসনামলে জিজিয়া কর থেকে অব্যহতি পাওয়ার জন্য তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এই অজুহাতে নও মুসলমানদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করা অব্যাহত থাকে।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি "ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ" কুরআনের এই নীতি প্রতিপালন করা রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক। উমাইয়া প্রশাসক মুয়াবিয়ার শাসনামলে এমনকি আল্লাহ্র রাসূল (সা.) এর সাহাবীর ক্ষেত্রে পর্যন্ত এই অধিকার হরণ করা হয়। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজর ইবনে আদীর (রা.) হত্যার (৫১ হিজরী) মাধ্যমে এ নতুন পলিসির সূচনা হয়। এই শাসকের আমলে সরকারী নির্দেশনায় খোতবায় প্রকাশ্য মিম্বরে হযরত আলী (আ.) উপর লানত (অভিসম্পাত) এর কার্যক্রম চালু করা হয়। ইমানদার লোক খুবই মানসিক কষ্টে শাস্তির ভয়ে ধৈর্য্য ধারণ করেন। কিন্তু কুফায় হুজরে আদী (রা.) তা সহ্য করতে পারেন নি। কুফার গভর্নর যিয়াদ (মুয়াবিয়ার অবৈধ ভাই) খোতবায় হযরত আলীকে (রা.) গালি দিতেন। আর হুজুর ইবনে আদি (রা.) তাতে প্রতিবাদ করতেন। যিয়াদ ১২জন সঙ্গীসহ তাকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে মুয়াবিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেন। মুয়াবিয়া হযরত

আদীকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। হত্যার পূর্বে জল্লাদরা তার সামনে যে কথাটি পেশ করে তা হচ্ছে তুমি আলী (আ.) এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর উপর অভিসম্পাত করলে তোমাকে মুক্তি দান অন্যথায় হত্যা করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি তা করতে অসম্মতি জানিয়ে বলেন, আমি মুখে এমন কথা উচ্চারণ করতে পারিনা, যা আমার 'রবকে অসন্তুষ্ট করে'। অবশেষে ৭জন সঙ্গীসহ তাঁকে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে হামমাকে মুয়াবিয়া যিয়াদের নিকট ফেরত পাঠান। তিনি যিয়াদকে লিখেছেন, একে নৃঃশসভাবে হত্যা কর। যিয়াদ তাঁকে জীবন্ত পুঁতে ফেলে। সূত্র : তারাবী। ৪র্থ খণ্ড, ১১০-২০৭ পৃষ্ঠা)

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ

ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্র প্রধানগণ বিচারক নিয়োগ করলেও এই সব বিচারকদের উপর আল্লাহ্‌র ভয়, নিজের জ্ঞান ও বিবেক ব্যতীত অন্য কিছুর চাপ ও প্রভাব তাদের উপর চাপানো হতো না। তাই তারা নির্ভয়ে স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে রায় দিতে পারতেন এবং দিতেনও। রাজতন্ত্রের ক্ষমতায়নের পর এই নীতির অবসান ঘটে। যে সব ব্যাপারে বাদশাহদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকত সেসব ক্ষেত্রে সুবিচার করার অধিকার থেকে কাযীদের বঞ্চিত করা হয়। এমনকি শাহজাদা, গভর্নর, রাজ প্রাসাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও মামলায় সুবিচার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সত্যপ্রিয় আলেমদের সাধারণত বিচারকের পদ গ্রহণে রাজী না হওয়ার এটাই ছিল অন্যতম কারণ। যেমন ইমামে আযম আবু হানিফা (রা.) তিনি কারাগারে গিয়েছিলেন তবুও কাযীর পদ অলংকৃত করেনি। বিচার বিভাগের উপর শাসন বিভাগের খবরদারী এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, বিচারপতিদের নিয়োগ ও বরখাস্তের অধিকার বাদশাহর পরিবর্তে প্রাদেশিক গভর্নরদেরকে দেয়া হয়।

শুরা বা আলোচনা ভিত্তিক সরকারের অবসান

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম একটি মূলনীতি হলো রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া। আলোচনা করা হবে এমন সব লোকের সাথে যাদের তত্ত্ব জ্ঞান, তাকওয়া, বিশ্বস্ততা এবং নির্ভুল ও ন্যায়নিষ্ঠ মতামতের উপর জনগণের আস্থা রয়েছে। যাদের মান্য করা নিষিদ্ধ তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী মিথ্যাচারী, কথায় কথায় শপথ করে পশ্চাতে নিন্দাকারী, একের কথা অপরের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়, কল্যাণের কাজে বাধাদান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ। রুঢ় স্বভাব, কুখ্যাত, কুরআনের উপর অবিশ্বাসী, অথচ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সম্পদশালী (সূরা কলাম : ৮-১৫)।

রাজতন্ত্রের আগমনে এই নীতির পরিবর্তন সাধিত হয়। সামরিক একনায়কত্ব শুরার স্থান অধিকার করে। রাজা বাদশাহরা সত্য ও ন্যায় নিষ্ঠ ও নির্ভীককণ্ঠ জ্ঞানীদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়। আর জ্ঞানীরাও তাদের কাছ থেকে সরে আসে। এভাবে যে সব স্বাধীন ও ন্যায়নিষ্ঠ মতামতের অধিকারীদের যোগ্যতা, সততা এবং ন্যায়নিষ্ঠতার উপর জনগণের আস্থা ছিল, তাদের পরিবর্তে গভর্নর, সেনাপতি, বংশীয় আমীর-ওমরাহও দরবারের সভাসদগণই ছিল বাদশাহের পরামর্শদাতা। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রে আইনগত জটিলতা দেখা যায়। গোটা এক শতাব্দীকাল মুসলিম উম্মাহ্‌র নিকট এমন কোন নীতিমালা ছিলনা, যাকে প্রমাণ বা ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে দেশের সকল আদালত সেই অনুযায়ী ঘটনাটির ব্যাপারে এক ধরণের ফায়সালা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

বংশীয় এবং অতি উগ্র আরব জাতীয়তাবাদী (Ultra Arab Nationalism) ভাবধারার প্রাধান্য

ইসলামের আবির্ভাবে ইসলাম জাহেলী যুগের যে সব জাতি বংশ গোত্র ইত্যাদির ভাবধারা নিশ্চিহ্ন করে আল্লাহ্‌র দ্বীন গ্রহণকারী সকল মানুষকে সমান অধিকার দিয়ে এক উম্মতে পরিণত করেছিল। রাজতন্ত্রের যুগে তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বনী উমাইয়া সরকার প্রথম থেকেই আরব সরকারের রুপ ধারণ করেছিল। আরব মুসলমানদের সাথে অনারব মুসলমানদের সমান অধিকারের ধারণা এ সময় রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে পরিহার করা হয়। ফলে অনারবদের মনে এ ধারণা প্রবল হয় যে, ইসলামের বিজয় মূলত তাদেরকে আরবদের গোলামে পরিণত করেছে। ইসলাম গ্রহণ করেও তারা এখন আর আরবদের সমান হতে পারে না। বিষয়াটি এখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, শাসনকর্তা, বিচারপতি, এমন কি সালাতের ইমাম নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে দেখা হতো সে আরব, না অনারব। কুফায় কুখ্যাত হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোর নির্দেশ ছিল যে, কোন অনারবকে যেন সালাতে ইমাম নিয়োগ না করা হয়। এমনকি কোন অনারবকে জানাযার সালাত আদায় করার জন্যও অপ্রবর্তী করা হতো না। কোন ব্যক্তি অনারব নও মুসলিম কন্যাকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করলে কন্যার পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে পয়গাম না পাঠিয়ে পয়গাম পাঠাতো তাদের পৃষ্ঠপোষক আরব খান্দানের নিকট। দাসীর ঔরসে জন্মগ্রহণকারীদের জন্য আরবদের মধ্যে 'হাজীন'

(ত্রুটিপূর্ণ) বলে একটি পরিভাষার প্রচলন ছিল। এ কারণে উত্তরাধিকারে তার অংশ আরব স্ত্রীর সন্তানদের সমান হতে পারে না-এ ধারণা সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

বনী উমাইয়াদের এসব ভ্রান্ত নীতি কেবল আরব আজমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং আরবদের মধ্যে কঠোর গোত্রবাদের সৃষ্টি করে। হাশেমী-উমাইয়াদের মধ্যে গোত্রীয় কি বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল কারবালার যুদ্ধই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং হাশেমী বংশ ও তাদের অনুসারীদের কিভাবে গুম খুন, হত্যা, বিনা বিচারে আটক, রাষ্ট্রীয় জীবিকা ভাতা থেকে বঞ্চিত করা ও তথা কথিত বিচারের নামে নির্যাতন করা রাষ্ট্রীয় পলিসি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন ও হাদিসের আলোকে এই হাশেমী বংশের মহান ব্যক্তিরা পবিত্র আহলে বাইতদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যারা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈধ অধিকারী। বর্তমানেও এই ধারা ধর্মীয় নেতৃত্বের একাংশ মেনে চলেন না। তাই কোন ব্যক্তি হযরত আলী (আ.) ও আহলে বাইতদের মর্যাদা বর্ণনা করলেই তাকে "শিয়া" বা আহলে বাইতদের তুলনায় সাহাবাদের মর্যাদা বেশি এ ধরণের কুতর্কের সূচনা করেন।

হাফেজ ইবনে কাসীর আল বেদায়াওয়ান নেহায়া গ্রন্থে ইবনে আসাকীর এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন : যে সময় আব্বাসীয় বাহিনী দামেশক শহরে প্রবেশ করছিল। উমাইয়াদের রাজধানী তখন ইয়ামানী আর মুয়াবীদের গোত্রবাদ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এমনকি শহরের প্রতিটি মসজিদে দুটি পৃথক পৃথক মেহরাব ছিল। জামে মসজিদে দু'জন ইমাম দুটি মিম্বরে খোতবা দিতেন এবং দুটি জামাতের পৃথক পৃথক ইমামতি করতেন। এ দুটি দলের কেউ অন্য দলের সাথে সালাত আদায় করতে প্রস্তুত ছিলনা (আল বেদায়াওয়ান নেহায়া ১০ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫)।

আরব জাত্যাভিমান ও আরব ভাষা ও আরব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এমনভাবে প্রচার করা হয় যাতে করে পৃথিবীর সমস্ত অনারব ভাষা, সংস্কৃতি, জনগোষ্ঠির কোন মর্যাদা কোনক্রমেই স্বীকার করা হয় না। অনারব ভাষাকে আরবগণ নাম দেয় 'আজমী' অর্থাৎ বোবা। এই সব ভাষা মানব সমাজে ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও এগুলোকে ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় না। এরই ধারাবাহিকতায় অন্য ভাষায় রচিত হামদ, নাত, সামা, কাওয়ালীও এই অতি আরব শাসকগোষ্ঠী কোন ধর্মীয় কর্মকাণ্ড হিসাবে মানতে নারাজ যা প্রকৃতপক্ষে জিকিরের অন্তর্ভুক্ত তাও বিদআত বা ধর্মে অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। এই একই নীতিতে ভিন্ন ভাষা বা সংস্কৃতির ধারা অনুযায়ী নববর্ষ পালন, নবান্ন উৎসব, বিভিন্ন পার্বন, তাদের পোশাক ও পরিচ্ছদ অন্যান্য সকল ভাষা ভিত্তিক কর্মকাণ্ডকে অনৈসলামিক তথা অধর্ম বা বড় ধরণের গুনাহ্ হিসাবে গণ্য করা হয়। অথচ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন: আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে" (সূরা রুম:৩০)। এই নীতির আলোকে মহান আল্লাহ্তালা বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের কাছে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন এবং রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য না করার নির্দেশও দিয়েছেন। এসব তথাকথিত ধর্মীয় নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য হলো অনারব সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও ধ্বংস করা। এ কারণেই পরবর্তীতে এই অতি আরবীয় ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত আরব মুসলিম সাম্রাজ্যবাদ স্থানীয় লোকদের মধ্যে ক্রমাগতভাবে অজনপ্রিয় হতে থাকে এবং এক ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও আরবীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে লোক বিদ্রাহ করে স্বাধীনতা অর্জন করে তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে বাধ্য হয়। তাই এই নীতির অন্ধ অনুসারী পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাংলা নববর্ষ উদ্যাপন, একুশে ফেব্রুয়ারি ও অন্যান্য বাংলা ভাষা ভিত্তিক সকল কর্মকাণ্ড শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ ঘোষণা করে থাকেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানীরা ইসলাম নাম দিয়ে বাঙালিদের সকল দিক থেকে শোষণ বঞ্চনা করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বাঙালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ইসলাম ধর্ম রক্ষার নামে বা অন্যায়ভাবে বাঙালিদের ওপর অকথ্য নির্যাতন করে। ফলে ইসলাম ধর্ম কার্যত ইসলাম ও বাহকরা ইসলাম এই দুই দিলে বিভক্ত হয়ে যায়। এ ধারা অদ্যাবধি অব্যহত রয়েছে। প্রসঙ্গত, হযরত আলী (আ.) তার গভর্নর মালিক আশি তাবের কাছে মিশর রাজ্য পরিচালনার যে দিক নির্দেশনা পাঠিয়েছিলেন তাতে উল্লেখ ছিল, (পূর্ববর্তী সময়ের) সৎ লোকদের জীবন প্রণালী রদ করো না যার উপর এই জাতির পূর্ববর্তী লোকগণ আমল করতেন এবং উহাব বদৌলতে বন্ধুত্ব অর্জন করতেন আর উহার মাধ্যমে প্রজাবৃন্দের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হত। জীবন প্রণালী যেভাবে চলে এসেছে তা কোন কিছু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করে প্রচার করো না কারণ ঐসব জীবন প্রণালী পুরস্কারের কারণ হয়েছে যারা উহা মেনে চলেছে তাদের জন্য আর তোমার জন্য ওগুলি অমান্য করার বোঝা। বিদ্বান ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা বৃদ্ধি করো এবং বিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে জটিল বিষয়ের পর্যালোচনা বেশি করো তোমার দেশে যে শান্তি অর্জিত হয়েছে তাকে স্থিতিশীল করতে আর সেটার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে যাতে তোমার পূর্ববর্তী লোকেরা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। (নাহজুল বালাগা মূল: মাওলা হযরত আলী (আ.) অনুবাদ বজলুর রহমান জুল কারনাইন ওরফে জালাল উদ্দিন ওয়াসসী, পৃষ্ঠা-৬১০)। উল্লেখ্য এ কারণেই আলী

(আ.) অনুসারী আল্লাহ্‌র অলিগণ স্থানীয় জনগণের মাতৃভাষায় ধর্মচর্চা উৎসাহিত করেছেন এবং প্রত্যক্ষ মূর্তিপুজা ব্যতীত কোন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ বা নাজায়েজ ঘোষণা করেন নাই। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আরবী ভাষা-ভাষী হলেই তার কুরআন সম্পর্কে বেশি জ্ঞান হবে এ ধারণা যে ভুল তা পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ৯৭ আয়াতে উল্লেখ আছে। "কুফরী ও কপটতায় আরববাসীগণ কঠোর এর এবং ও তাঁহার রাসূলের উপর যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন কুরআন তাঁহার সীমারেখা সম্পর্কেও অজ্ঞ।"

রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহ্‌র আইনের সার্বভৌমত্বের অবসান

ইসলাম যে ভিত্তির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে তা হচ্ছে এই যে, ধর্মীয় বিধি বিধান বা শরীয়ত (অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আইন অবশ্য পালনীয় সব কিছুর উর্ধ্বে সকলের উপরে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র প্রধান, শাসক এবং শাসিত ছোট বড়, সাধারণ, অসাধারণ সকলেই এই শরীয়তের অধীন। কেউ শরীয়তের উর্ধ্বে নয়; নয় কেউ ব্যতিক্রম। হোক, কি মিত্র, যুদ্ধে লিপ্ত কাফের হোক বা চুক্তিবদ্ধ কাফের। মুসলিম প্রজা, হোক বা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম, রাষ্ট্রের অনুগত মুসলিম হোক বা যুদ্ধে লিপ্ত বিদ্রোহী যেই হোক না কেন তার সাথে আচরণ করার একটা রীতি-পদ্ধতি ইসলামী শরীয়তে নির্ধারিত আছে। সে রীতি কোন অবস্থাতেই লংঘন করা যাবে না-যা অলংঘনীয়।রাজতন্ত্রের যুগে রাজা-বাদশাহরা ব্যক্তিগত স্বার্থ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা প্রতিহিংসা এবং বিশেষ করে নিজেদের অবৈধ শাসন শোষণ পাকাপোক্ত করার ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত বিধি-বিধান লংঘন এবং তার সীমারেখা অতিক্রমে কুণ্ঠাবোধ করেনি এবং তা একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। যদিও তাদের সময়ে দেশে ইসলামী আইন বলবত ছিল। তাদের কেউই আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ্‌র আইনগত মর্যাদা মৌখিকভাবে অস্বীকার করেনি। এ আইন অনুযায়ী আদালত ফায়সালা করতো। সাধারণ পরিস্থিতিতে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বিষায়াদির ফায়সালা হতো। তবে আসল কথা হলো এসব রাষ্ট্র নায়ক বা রাজা-বাদশাহর রাজনীতির সকল কর্মকাণ্ড ধর্মের অনুবর্তী ছিল না। অর্থাৎ রাজনীতি, ধর্মনীতি নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করত। ধর্মরাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতনা। প্রকৃতপক্ষে অধর্ম তথা শরীয়ত বিরোধিতাই রাজনীতির ভিত্তি ছিল। তাই বৈধ-অবৈধ সকল পর্যায়ে রাষ্ট্রের দাবি মিটানো হত। এ ব্যাপারে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় সত্য-মিথ্যা-দয়া বা নিষ্ঠুরতা এর কোন তোয়াক্কা করা হতো না। তথাকথিত আমীর উল মুমেনিন, রাজা বাদশাহ, সুলতান, গভর্ণর, বিচারক, পুলিশ যে যা যখন বলত বা করত তাই কার্যকরী করা হতো এ ব্যাপারে কুরআন হাদিসের নির্দেশনা বা পরলোকের ভয়ের কোন তোয়াক্কাই তাদের ছিল না। এ ব্যাপারে ইতিহাস থেকে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে।

ইমাম যুহরীর বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এবং চারজন খলিফার শাসনামলে এ নীতি চলে আসছিল যে, কাফের মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারবে না। আর মুসলমানও হতে পারতো না কাফেরের উত্তরাধকারী। মুয়াবিয়ার (৬৬১-৬৮০) শাসনামলে মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিশ করেছেন। কাফেরকে মুসলমানের ওয়ারিশ করেন নি। ওমর বিন আব্দুল আজিজ (৭১৭-৭২০) এ বিদ্‌আতকে রহিত করেন। কিন্তু হিসাম ইবনে আব্দুল মালেক (মৃত ৭৪৩) তার বংশের ধর্মদ্রোহিতার ঐতিহ্য পুনর্বহাল করেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহারকারী প্রথম শাসক যিনি ছিলেন তিনি হলেন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, আমরা জানি রাসূল (সা.) এর ধর্মীয় ও রাজনীতিক ক্ষমতার উত্তরাধিকারী ও তাঁর পরে সবচেয়ে ধর্মীয় জ্ঞানে, কুরআন বিশেষজ্ঞ, খেলাফতে রাশেদার একমাত্র সর্বসাধারণ কর্তৃক গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন মুয়াবিয়া। এ গৃহযুদ্ধে (সিফফিনের যুদ্ধ) প্রায় ১ লক্ষ মুসলমান নিহত হন। বিশ্ব বিখ্যাত সুফি আশেকে রাসূল হযরত খাজা ওয়ায়েস করণী এই সিফফিনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আম্মার বিন ইযসামার (রা.) যার সম্পর্কে রাসূল বলেছেন, "ধর্মদ্রোহী ব্যক্তিরা তোমাকে হত্যা করবে"। এই যুদ্ধে যারা তাঁকে হত্যা করে মুয়াবিয়া তাদের পুরস্কৃত করেন। তাছাড়া তাঁর শিরচ্ছেদ করে তার মৃত দেহের উপর অত্যাচার করা হয়।

মুয়াবিয়ার নির্দেশে তার গভর্নর মিম্বরে দাঁড়িয়ে খোতবায় হযরত আলী (আ.) এর উপর প্রকাশ্য গালিগালাজ/অভিসম্পাত করেন। এই বক্তব্যে বলা হতো যে, হযরত আলী দ্বীন ধর্ম ইসলাম পরিত্যাগকারী। তাই তার উপর অভিসম্পাত। পৃথিবীতে এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যা আর কোন কথা হওয়া সম্ভব নয়। মুসলমানদের সকল তরীকার ইমাম, আহলে বাইতের এই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় মিথ্যাচারের ফলে সমস্ত ইসলামী সাম্রাজ্যে এক ব্যাপক সংখ্যক লোক, আহলে বাইত বিরোধী তথা রাসূল বিরোধী তথা চূড়ান্তভাবে আল্লাহ্‌ বিরোধীতায় লিপ্ত হয় এবং মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজীদের মত জগণ্য চরিত্রের লোককে মুসলমানদের শাসক নির্বাচন ও পরবর্তীতে কারবালা যুদ্ধের (৭৮০) মত হৃদয় বিদারক ঘটনায় আহলে বাইতের সম্মানিত-পবিত্র মহিলাদের সাথে বেআদবীর মত ঘটনা, মদীনায়, হারবার যুদ্ধে (৬৮১) সংঘটিত হয়।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কুরতবী বলেন, মদীনাবাসীদের মদীনা থেকে বাইরে চলে যাওয়ার কারণ এই যে, কুখ্যাত ইয়াজীদের এক খোদাদ্রোহী সেনাপতি মুয়াবিয়ার প্রচারনায়

বিভ্রান্ত হয়ে এ ধারণা পোষণ করত যে, মদিনাবাসী ও আহলে বাইতগণই হযরত ওসমান (রা.) এর শাহাদতের জন্য দায়ী। তাই তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত। এই সেনাপতির নাম ছিল মুসলিম ইবনে ওকবা। কারবালার যুদ্ধের পর মদীনার একটি পর্যবেক্ষণকারী দল দামেস্‌কে গমন করে সরেজমিনে ইয়াজীদের ইসলাম বিরোধী জীবন যাত্রা প্রত্যক্ষ করে মদীনায় ফিরে আসে এবং ইয়াজীদ নিয়োজিত গভর্নরের প্রতি অনুগত্য প্রত্যাহার করে। অর্থাৎ উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইয়াজীদ তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ মুসলিম ইবনে ওকবাকে প্রেরণ করে। এই নিকৃষ্ট সেনাবাহিনীর লোকরা 'হারবা' নামক স্থানে অত্যন্ত নির্মমতা ও অবমাননার সাথে এই মহাত্মাদের শহীদ করে। ইয়াজীদ বাহিনী তিনদিন পর্যন্ত মসজিদে নববীর সম্মানহানিকর কাজে লিপ্ত ছিল। এই মর্মান্তিক ও ভয়াবহ ঘটনার প্রাক্কালে এই পাপী বাহিনী শিশু ও মহিলা ব্যতীত বার হাজার চারশত সাতানব্বই জন লোককে হত্যা করে। ইয়াজীদ তার সেনাবাহিনীর জন্য মদীনার অধিবাসীদের সাথে যে কোন ধরণের ব্যবহার অর্থাৎ হত্যা, ব্যভিচার, লুট, বল প্রয়োগের মাধ্যমে যে কোন শর্তে হাজীদের পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করার স্বাধীনতা প্রদান করে। এই ঘটনার পর এক হাজার মহিলা অবৈধ সন্তান প্রসব করে। এছাড়া এই বাহিনী মসজিদের নববীর অমার্জনীয় বেয়াদবী করে। এ পবিত্র স্থানটিকে তারা ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করে। রাসূল (সা.) এর রওজাপাক ও মিম্বরের মধ্যবর্তী জায়গাক "রিয়াজ উল জান্নাত" তথা "বেহেশতের টুকরা" হিসাবে অভিহিত করছেন। সেই জায়গাটি ইয়াজীদের সেনাবাহিনীর ঘোড়ার প্রস্রাব-পায়খানায় কলুষিত করে। আর লোকদের থেকে ইয়াজীদের জন্য এ শর্তে বাইয়াত (ইয়াজীদ) গ্রহণ করা হয় যে, ইয়াজিদ যদি ইচ্ছা করে তাদেরকে বিক্রয় করতে পারবে বা তাদেরকে স্বাধীনভাবে রাখতে পারবে। সে যদি ইচ্ছা করে আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে (ঈমানের সাথে) রাখতে পারবে। আর যদি ইচ্ছা করে বেইমান হওয়ার শর্তও আরোপ করতে পারবে। হযরত আবদুল ইবনে যমআ (রা.) জনৈক সাহাবী বলেন, বাইয়াত তো অন্ততপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর উপর গ্রহণ করা চাই। তখন মুসলিম বিন ওকবা তাকে শহীদ করে। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন মদীনা জনপদ শূন্য হয়ে যায় ও মসজিদে নববী কুকুরের আড্ডাখানায় পরিণত হয়। মুসলিম বিন ওকবা অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরকে (রা.) শায়েস্তা করার জন্য মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়।

রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে তার জন্য মক্কা নগরীতে রক্তপাত বৈধ হবে না। অথচ মুসলিম বিন ওকবা মৃত্যুর পূর্বে হোসাইন ইবনে নুমাইরকে তার স্থলাভিসিক্ত করে বলে, ইয়াজীদ 'আমার পর তোমাকেই আমীর (প্রধান সেনাপতি) নিয়োগ করেছে। তুমি অতি সত্বর মক্কায় পৌঁছে আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের যদি কাবাগৃহেও আশ্রয় নেয় তাতেও পরোয়া করোনা। মিনজানিক (কামান) দাগিয়ে দিও।" হোসাইন নুমাইর প্রায় দুই মাসের অধিক সময়ব্যাপি মক্কা শরিফকে ঘেরাও করে রাখে এবং কামানের গুলি ছোঁড়ে ফলে কাবা শরিফে ফাটল ধরে যায়। জনৈক সেনা কাবার গিলাফে আগুন ধরিয়ে দেয় ফলে বেহেশতী দুম্বার দুটি শিং (যা ইব্রাহীম (আ.) এর আমল থেকে এখানে সংরক্ষিত ছিল) পুড়ে যায়। হযরে আসওয়াদ (কালো পাথর) তিন খন্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। এই সময়ে খোদায়ী গজবে ইয়াজীদ মারা যায় (৬৮৩) এবং এই সংবাদ পেয়ে তার সেনা মক্কার অবরোধ তুলে নিয়ে দামেস্ককে ফিরে যায়। এই ধরণের কাজের হোতা ইয়াজীদকে একশ্রেণীর মুসলিম বুদ্ধিজীবী যুক্তি জালের মাধ্যমে বেহেশতে পাঠানোর জন্য কুরআন হাদিস অনুসন্ধান করে ফতোয়া বের করে। কি বিচিত্র এই ধরণের আলেমগণ!! অথচ তদানীন্তন মুসলিম বিশ্ব যদি এই ইয়াজীদের বিরুদ্ধে একযোগে বিদ্রোহ করে ইমাম হোসাইনের (আ.) হাতে বাইআত গ্রহণ করতো যা রাসূল (সা.) নির্দেশ অনুযায়ী তাদের জন্য ফরজ ছিল, তা না করার জন্য মুসলিম সমাজে এই ধরণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা বলাই বাহুল্য।

রাসুলের (সা.) শাসনামলে মুসলিম ও ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের রক্তপন (অনিচ্ছাকৃতভাবে হত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ) সমান ছিল। মুয়াবিয়া এই আইন পরিবর্তণ করে তাকে অর্ধেক করে অবশিষ্ট অর্ধেক নিজে গ্রহণ করা শুরু করেন। সূত্রঃ (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৮ম খণ্ড, পৃ:-১৩৯ ইবনে কাসীর)

গনীমতের মাল বিতরণে রাসুলের মূলনীতি কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। "আরও জানিয়া রাখ যে, গণমীতের মাল যাহা তোমরা লাভ কর তাহার এক পঞ্চামাংশ আল্লাহ্‌র রাসুলের, রাসুলের স্বজনদের (উপর) আহলে বাইতদের, ইয়াতীমদের, মিসকিনদের এবং পথচারীদের যদি তোমরা ইমান রাখ আল্লাহ্‌র (সূরা আনফাল : ৪১)।

এই মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে মুয়াবিয়া আল্লাহ্‌র কিতাবের এই নির্দেশ পালনের ব্যাপারে স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করেন। অর্থাৎ এই আয়াতের মর্মানুযায়ী প্রাপ্ত মালামালে $\frac{1}{5}$ অংশ বায়তুলমালে জমা করতে হবে এবং বায়তুল মালের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা এর আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) এর আত্মীয় স্বজনসহ অন্যান্য খাতে এ অর্থ বণ্টন করবেন এবং অবশিষ্ট অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। অর্থাৎ এই

আয়াতের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে রাসূল (সা.) এর পরিবারের তথা আত্মীয় স্বজনদের মর্যাদা ও সম্মানের সাথে তাদের জীবনযাপন করার ব্যাপারে সর্বাত্মক দায়িত্ব পালন করা অর্থাৎ ধর্মীয়ভাবে অবশ্য পালনীয়। মুয়াবিয়া নির্দেশ দেন যে, প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে স্বর্ণ রোপ্য তার জন্য পৃথক করে রাখার এবং রাসুলের আত্মীয়দের (আহলে বাইতদের বাদ দিয়ে)অন্যদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দান করেন। (সূত্র: তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৭ম খণ্ড পৃ: ২৮-২৯), আততাবারী ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৭, আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃ:১১৮, ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড পৃ: ২১)

যিয়াদ ইবনে সুমাইয়ার ক্ষেত্রে মুয়াবিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থে শরীয়তের সর্বসম্মত আইন অগ্রাহ্য করেন। তায়েফের সুমাইয়া নাম্নী একজন বেশ্যার উদরে যিয়াদের জন্ম। বলা হতো মুয়াবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ান সুমাইয়ার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ফলে যিয়াদ জন্মগ্রহণ করে। মুয়াবিয়া যিয়াদকে তার সমর্থক ও সহায়ক করার জন্য তার পিতার ব্যভিচারের সাক্ষ্য গ্রহণ করে প্রমাণ করেন যে, যিয়াদ তার পিতার অবৈধ সন্তান আর এ ভিত্তিতে মুয়াবিয়া যিয়াদকে নিজের ভাই ও আপন পরিবারের সদস্য করেন। তার এ কাজ নৈতিক দিক থেকে একটি জঘন্য বিষয়, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আর মুসলিম আইন অনুসারে এটি একটি ভয়াবহ অপরাধ। কারণ শরীয়তের বিধান অনুসারে ব্যভিচারের মাধ্যমে কোন বংশধারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। আল্লাহ্‌র রাসুলের স্পষ্ট নির্দেশ হলো-শিশু যার বিছানায় ভূমিষ্ঠ হয় তার। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে প্রস্তর খণ্ড। উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) যিয়াদকে তার ভাই হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং তার সাথে পর্দা করে চলতেন। (সূত্র: অলি ইস্তিআব ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৬, ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ-২২০-২১১ আল বেদায় ওয়ান নেহায়া ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৮, ইবনে খালিদুন, ৩য় খণ্ড, পৃ:৭-৮)

উল্লেখ্য, এই জারজ সন্তানের পুত্র উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ছিল ইয়াজীদের অবৈধ চাচাত ভাই। এই ব্যক্তি কুফার গভর্নর হিসাবে কারবালার এই জঘন্য যুদ্ধ সংঘটিত করে এবং আহলে বাইতের সম্মানিত সদস্যদের সাথে অবমানাকর ও জঘন্য ধরণের আচরণ করে এবং ইয়াজীদের পূর্ণ সম্মতিতেই সে এ ধরণের কাজ করে তা না হলে ইয়াজীদ তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিত। কিন্তু তা সে নিয়েছে বলে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া য়ায় না।

সরকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অব্যাহতি

সরকারী কর্মকর্তাদের আইনের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে তাদেরকে সব ধরণের অবৈধ কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা প্রদান মুয়াবিয়ার একটি মারাত্মক ধর্ম বিরোধী নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। মুয়াবিয়ার গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে গ্যাইলন একবার বসরার মিম্বরে দাঁড়িয়ে খোতবা দিচ্ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তার দিকে কংকর নিক্ষেপ করে। এ কারণে গভর্নর তাকে গ্রেফতার করে তার হাত কেটে ফেলেন। এটা সর্বজনবিদিত, এটি এমন কোন অপরাধ ছিলনা যার জন্য কারো হাত কাটা যায়। মুয়াবিয়ার কাছে এর বিচার চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমি বায়তুল মাল থেকে হাতের দিয়াত (ক্ষতিপূরণ আদায় করবো) কিন্তু গভর্নর থেকে প্রতিশোধ (কিসাস) গ্রহণের উপায় নাই। অনুরূপভাবে কুখ্যাত গভর্নর উবায়দুল্লা যিয়াদ কুফার জামে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়ালে কিছু লোক (তাদের সংখ্যা ৩০-৮০জন) তার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করলে তিনি তাদের গ্রেফতার করে তাদের হাত কেটে ফেলেন। সূত্র: আত-তারাবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৫, ইবনুল আসীর ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২৮)।

মুয়াবিয়ার কাছে বিষয়টি উত্থাপিত হলে তিনি এর কোন গুরুত্বই দেন নাই। মুয়াবিয়ার এ ধরণের নিষ্ঠুর আচরণের ক্ষেত্রে এমনকি হযরত আবু বকর (রা.) এর পুত্র মুহাম্মদ পর্যন্ত রেহাই পান নাই। মুহাম্মদ বিন আবু বকর মিশরে হযরত আলী (আ.) এর নিয়োজিত গভর্নর ছিলেন। মুয়াবিয়া মিশর দখল করে তাকে গ্রেফতার করেন। অতঃপর মুহাম্মদকে হত্যা করে তার লাশ মোবারক মৃত গাধার চামড়ায় জড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। (সূত্র: আল ইস্তি আব, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩৫, আততাবারী ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭১)

মুয়াবিয়া থেকে শুরু হওয়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লাশের সাথে এই ধরণের অমানবিক আচরণ ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এটি একটি স্বতন্ত্র রীতি তথা আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয় যা প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্র (ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে থাকে) আব্বাসীয়, ওসমানী সাম্রাজ্য, মুঘল সাম্রাজ্য, পাঠান সাম্রাজ্য ও অন্যান্য রাজ বংশ তার বাস্তব উদাহরণ হল অতি সম্প্রতি তুরস্কের সৌদি দূতাবাসে সাংবাদিক জামাল খামোগির মৃত এসিড দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ২ অক্টোবর এটিও সেই নিষ্ঠুর এজিদের বংশধর সৌদি ওহাবী রাজ বংশ।

রাজতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে একটি খোদায়ী অভিশাপ মুসলিম জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় চিন্তা-গবেষণা করে আল্লাহ্ ও রাসুলের নির্দেশ, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব আল্লাহ্‌র নির্বাচিত আহলে বাইতকে বাদ দিয়ে নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী আরবীয় গোত্রীয় নীতির অনুসরণে যে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তার ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি চালু আছে। মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির সীমাবদ্ধতার কারণেই মাত্র ৩০ বৎসরের মধ্যে আল্লাহ্ রাসুলের দেওয়া ধর্ম রাষ্ট্রীয়

(Religo Political) নীতিতে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তার ফলশ্রুতিতে এই অভিশপ্ত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা : "তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে বিশ্বে বিপর্যয় ঘটবে আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে–তোমাদের কাছ থেকে এছাড়া আর কি আশা করা যায়? আল্লাহ্ ইহাদিগকে লানত করেন, আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন। তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদের অন্তরকে তালাবদ্ধ যাহারা নিজেদের নিকট সৎপথ ভক্ত হইবার পর উহা পরিত্যাগ করে, শয়তান উহাদের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় এবং উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবর্তীণ করিয়াছেন তাহা যাহারা অপছন্দ করে তাহাদিগকে উহারা বলে, আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করিব?

চতুর্থ অধ্যায়

রাজতন্ত্রের সাথে আহলে বাইত তথা আল্লাহ্‌র নির্বাচিত অলি-আল্লাহ্‌দের বিরোধের কারণ

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিনি শুধু রাষ্ট্র প্রধানই ছিলেন না বরং ছিলেন মুরশিদ বা পথ প্রদর্শক। তাঁর দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রের কোন আইন শৃংখলা রক্ষা করা এবং সেনাবাহিনী পরিচালনা করার মধ্যেই সীমিত ছিল না। বরং সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র সমগ্র দ্বীন তথা ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করাও ছিল তাঁর কাজ। তার সত্তায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একীভূত ছিল, রাজনৈতিক দিক থেকে এ নেতৃত্ব মুসলমানদের দিক দর্শনের ভূমিকা পালন করতো এবং বিশ্বাস, ধর্ম, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, আইন-কানুন বিধি বিধান শরীয়ত। সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রতিফলন এবং ধর্ম প্রচার ও প্রসারের সমস্ত বিষয়ে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সঠিক তত্ত্বাবধান করাও তাঁরই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেভাবে ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে হয়ে পরিব্যপ্ত আছে। ঠিক তেমনি এই নেতৃত্বও সকল দিককে বেস্টন করে রেখেছিল। সমগ্র মুসলিম সমাজ-পরিপূর্ণ আস্থার সাথে এ নেতৃত্বের দিক দর্শনে তাদের সামগ্রিক জীবন পরিচালিত করতো। রাজতন্ত্র যখন বল প্রয়োগের মাধ্যমে এ শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তখন এই শাসন ব্যবস্থা এ ব্যাপক নেতৃত্ব প্রদানের জন্য উপযুক্ত ছিলনা। আর মুসলমান সমাজ একদিনের জন্যও এ রাজতন্ত্রকে এ মর্যাদা প্রদান করতে সম্মত বা প্রস্তুত ছিল না। রাজা-বাদশাহদের যে কার্যক্রম আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি তারপর বাহ্যত তাদের কোন নৈতিক মান-মর্যাদা জাতির মধ্যে বজায় থাকতে পারেনা। তারা জনগণের মাথা জোরপূর্বক নোয়াতে পারতো এবং তা করেছিলও। ভয়ভীতি এবং লোভ-লালসার অস্ত্র দ্বারা, কুরআনের অপব্যাখ্যা, মিথ্যা হাদিসের বক্তব্য দ্বারা তারা অগণিত মানুষকে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যবহার করতে পেরেছিল। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে যাতে তাদেরকে ইমাম বলে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে এ রকম অস্ত্র তারা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। তাই তারা কখনও জনগণের একই সাথে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে পরিগণিত হতে পারেনি। এই পরিস্থিতিগত বাস্তবতার নিরিখে মুসলমানদের নেতৃত্ব দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ধর্মীয় নেতৃত্বের বিষয়টি আলোচনার পূর্বে আমাদের জানতে হবে যে, আমাদের সমাজে ধর্ম ও রাজনীতি যেমন দুইটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় হিসেবে পরিগণিত, পবিত্র কুরআনে বা দ্বীন বা ধর্ম এ ধরণের সীমিত অর্থে ব্যবহার করা হয় নি বরং মানুষের হৃদয়ের সৎ-অসৎ চিন্তা থেকে শুরু করে সমস্ত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড দ্বীনের আওতাভুক্ত। পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে : এবং স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীমকে তাহার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা (নির্দেশ বাস্তবায়নের) দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ছিলেন এবং সেইগুলো যে পূর্ণ করিয়াছিল। আল্লাহ্‌ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা (ইমাম) করিতেছি। সে (ইব্রাহিম) বলল, আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও? আল্লাহ্‌ বলরেন, আমার প্রতিশ্রুতি (ইমাম হওয়ার) তা জালিমদের প্রতি প্রযোজ্য হবেনা। (বাকারা: ১২৪)। অর্থাৎ আমাদের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী নবী-রাসূলগণ যে শুধুমাত্র ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় বরং পার্থিব অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনা বা আধুনিক পরিভাষায় রাজনৈতিক বিষয়েও তারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিয়োজিত নেতা, যার আদেশ অবশ্য পালনীয় হিসাবে বিবেচিত।

এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্‌তা'লা সূরা নেসার ৫৪ নম্বর আয়াতে বলেছেন : আমি ইবরাহীমের বংশধরকে তো কিতাব ও হিকমত প্রদান করিয়াছি এবং তাহাদিগকে বিশাল রাজত্ব দান করিয়াছি (সূরা নিসা : ৫৪)। তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসহ আল্লাহ্‌র রাজত্বের পরিচালনার ক্ষমতা) দান করিবেন। যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব (মালিকানা) দান করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহাদের দ্বীনকে যাহা তিনি তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন (সূরা নূযুর : ৫৫)।

আমি যবুর কিতাবে লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার বিবেচনায় উপর্যুক্ত বান্দাগণকে পৃথিবীর (পরিচালনা, মালিকানা, নেতৃত্ব, উত্তরাধিকারী) অধিকারী হইবে (সূরা আম্বিয়া : ১০৫)।

পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াত সমূহের মাধ্যমে এটা স্থির নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র নির্বাচিত বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌ পাথিব কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মদকে (সা.) গাদীরে খুমে আল্লাহ্‌রই নির্দেশে মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শাসক হিসাবে হযরত আলী (আ.), হাসান (আ.) হোসাইন (আ.) ও তৎপরবর্তী ইমামদের নাম ঘোষণা করে ছিলেন।

এই নির্দেশ অমান্য করণের এক প্রক্রিয়ায় রাজা বাদশাহরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি অংশ নিজেদের করায়ত্ব করেছিল। আর যেহেতু শক্তি প্রয়োগ ছাড়া রাজাদের অপসারণ করা সম্ভবপর ছিল না এবং শক্তিহীন রাজনৈতিক নেতৃত্বও সম্ভব ছিলনা তাই নিতান্ত বাধ্য হয়েই মুসলিম উম্মাহ্‌ এই নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এই নেতৃত্ব প্রকাশ্যে খোদাদ্রোহী নেতৃত্ব ছিল না যে, উম্মাহ্‌ তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবে। এ রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিচালকরা দৃশ্যত মুসলমান ছিল। তারা

মৌখিকভাবে ইসলাম ও ইসলামের আইন মেনে চলতো। আবার আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহকে তারা আইনের ভিত্তি হিসাবে মান্য করতে মৌখিকভাবে অস্বীকার করতো না। আবার সম্পূর্ণভাবে মানতেও প্রস্তুত ছিল না। তবে তাদের শাসনে সাধারণ বিষয়াদি শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হতো। কিন্তু তাদের রাজনীতি দ্বীনের অনুবর্তী ছিলনা। আর এ কারণেই তারা ইসলামের শাসননীতি থেকে বহু দুরে সরে গিয়েছিল। এর কারণে মুসলিম উম্মাহ্‌ ও রাষ্ট্রের শাসন শৃংখলা বহাল, আইন-শৃংখলা রক্ষা, সীমান্ত প্রতিরোধ, দ্বীনের দুশমনদের সাথে জিহাদ বা আত্মরক্ষা, জুমা, জামাআত এবং হজ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। আদালতের মাধ্যমে ইসলামী আইন কানুনের প্রয়োগ অব্যাহত থাকে। মুসলমানদের অনেক নেতৃত্ব স্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তাদের নেতৃত্ব মোটামুটি স্বীকার করে থাকলেই একথা বিবেচনা করার কোন কারণ নাই যে, এই সব রাজা-বাদশাহ তথা শাসকগণ-সত্যের ধারক বাহক, ন্যায়নিষ্ঠ, অত্যন্ত ধর্মপরায়ন ব্যক্তি ছিলেন বরং এর অর্থ ছিল এই যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে তারাই উম্মতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃত অধিকারী। এই বাস্তবতাকে তারা স্বীকার করতেন। তাছাড়া সাধারণভাবে তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেতৃত্ব পাওয়ার বা দেওয়ার সুযোগ ছিল না। এই রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবশ্যম্ভাবী অনুসঙ্গ হিসাবে মুসলিম সমাজ, ধর্ম, অর্থ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনের বিষয়টি ধর্মীয় সাহিত্য, লেখক, ও (১) ঐতিহাসিকগণ পর্যালোচনা করে যা পর্যবেক্ষণ করেছেন তা সংক্ষিপ্তারে নিম্নরূপ :

রাসূল (সা.) এর প্রকৃত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী আহলে বাইত এর মর্যাদার রাষ্ট্রীয় অস্বীকৃতি

দ্বীন ইসলাম তথা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রাসূল কর্তৃক ঘোষিত, "আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু কুরআন ও আমার আহলে বাইত রেখে যাচ্ছি। তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তারা মুক্তি পাবে"। এই হাদিসের বাণীর মান্যতায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অস্বীকৃতি। অন্য কথায় কুরআন ও হাদিস ব্যাখ্যাকারী হিসাবে নবী পরিবারের বৈধ কর্তৃত্বের অস্বীকৃতি। ফলে নবী পরিবারের নিকট থেকে হাদিস প্রাপ্তির বিষয়টিরও সামাজিকভাবে অস্বীকার করা হয়। নবী পরিবারের কাছেই বেশী হাদিস পাওয়া যাবে এই সহজ বিষয়টি হাদিস সংগ্রহকারীগণ বিবেচনায় না নিয়েই বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থসমূহ রচনা করা হয়েছে। এ কারণে আহলে বাইতের মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিকাংশ হাদিস অগুরুত্বপূর্ণ বা অগ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলমানদের নিকট সব চেয়ে গ্রহণ যোগ্য হাদিস গ্রন্থের মধ্যে আহলে বাইতের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদিসসমূহ অন্তর্ভুক্ত নাই। এমন কি মওলা আলী (আ.)'র বক্তৃতাসমূহ যে ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস সে বিষয়টি সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্বহীন বিবেচনা করা হয়।

ইব্রাহীমের বংশ তথা রাসূল (সা.) এর বংশ ধারার মধ্যে যে ইমামতি/ খেলাফত বর্তাবে (কুরআন সুরা বাকারা-১২৪, সুরা নেসা-৫৪) এই নির্দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অস্বীকৃতি। এরই ধারাবাহিকতায় আহলে বাইত ও তাদের অনুসরণ আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত অলৌকিক ক্ষমতাধর আল্লাহ্‌র অলি-মুর্শিদদের অস্বীকৃতির ফলে কুরআন-হাদিস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা যে এসব আল্লা্ নিয়োজিত ব্যক্তিদের রয়েছে তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অস্বীকৃতি। ফলে কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুপস্থিতির কারণে ধর্মের একই বিষয়ে একাধিক ব্যাখ্যা একটি স্থায়ী ধর্মীয় বিষয়ে পরিণত হয়। ফলে ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন মাযহাব, ফিরকা, দলাদলির অর্থাৎ স্থায়ী মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব এক ধারাবাহিক সমস্যা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বা নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের উলিল আমর দ্বারা এই বিশ্ব পরিচালনা করে থাকেন। এই মৌলিক ঈমানী ধারণা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অমান্য করা হয় বা এই Concept বা ধারণা সঠিক নয় মর্মে জোর প্রচার চালানো। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নিয়োগ/ নির্বাচন/ অনুমোদন/ সন্তুষ্টি ইত্যাদি কনসেপ্ট অস্বীকার করা হয় এবং এর বিপরীতে যে কোন পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল করলেই তার উপর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্ট এই ধারণা সমাজে ব্যাপকভাবে চালু করা হয়। অন্য কথায় বল প্রয়োগ ও হারাম পদ্ধতি অবলম্বনকারীকেই আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন সমাজে এই ধারণা সৃষ্টি করা হয়।

রাষ্ট্রীয় ফতোয়ার মাধ্যমে রোম ও পারস্যের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ইসলাম ধর্মীয় রাজনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলে বলা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের জন্য রাজপ্রসাদ নির্মাণ, তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী, বায়তুল মালের বদলে খলিফার ব্যক্তিগত খাত এবং এ খাত থেকে যথেচ্ছা খরচকারীকে দয়ালু, দাতা, গরীবের বন্ধু, প্রজা দরদী ইত্যাদিতে ভূষিতকরণ। এক্ষেত্রে কেউ প্রশ্ন করতে চায় না বা পারেনা যে, রাজা বা খলিফা প্রথমে কিভাবে ধনী হয়েছেন। ইসলাম ধর্মে দাস প্রথাকে এমনভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে যে, তা প্রায় নিষিদ্ধের সামিল বলেই গণ্য করা যায়। কিন্তু রাজা বাদশাদের হেরেমে

সুন্দরী মহিলাদের সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে মহিলাদের সংগ্রহ করে তাদেরকে নৃত্য, সংগীত, রন্ধন প্রভৃতি কলার প্রশিক্ষণ দিয়ে রাজা, আমাত্য, সেনাপতিদের নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রি করার জন্য দাস প্রথা একটি লাভজনক শিল্পে (Industry) পরিণত হয়। সকল মুসলিম রাজ্যেই দাস প্রথা চালু ছিল। উল্লেখ্য শরীয়ত অনুযায়ী কোন কোন দাস মালিকগণ তাদেরকে ক্রীত দাসদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন এবং ভারতসহ অনেক দেশে কোন কোন দাস রাজা পর্যন্ত হয়েছেন কিন্তু প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাসপ্রথা লোপকারী হিসাবে কৃতিত্ব দিতে হলে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদেরকে দিতে হয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি Congress of Vienna, (১৮১৫) এই চুক্তির মাধ্যমে দাসপ্রথার বিলোপ সাধন করা হয়। আমেরিকার দাসপ্রথা ১৮৬৫ সালে বন্ধ হলেও বর্ণবাদের অত্যাচার ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিল।

সমাজের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির অংশ হিসাবে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে যাকাতের অর্থ যে আট শ্রেণির লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার উল্লেখ আছে (সুরা তাওবা: ৬০) সেই নির্দেশটি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড হিসাবে বিবেচনা না করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় ফতোয়ার মাধ্যমে যাকাত প্রথাকে নামায-রোজার ন্যায় ব্যক্তিগত ইবাদতে রূপান্তরিত করা হয়। ফলে দারিদ্র বিমোচনের মত গুরু দায়িত্ব থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র অব্যহতি প্রাপ্ত হয় এবং রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, ইসলাম ধর্ম-সামাজিক রাজনৈতিক (Religo Socio political) প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পুঁজিবাদ দাসত্ববাদ, সাম্রাজ্যবাদ এ সকল কুপ্রথা ও বিকৃতি এই ইসলামের অনুসঙ্গ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইসলাম ধর্মের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দর্শন যথা জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান, সাম্য, ন্যায় বিচার, অর্থনৈতিক সাম্য প্রভৃতি সংস্কারমূলক কার্যক্রমকে পালাক্রমে হত্যা করা হয়। যা রাসূল (সা.) এর মদীনা সনদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এলমে তাসাউফ তথা কুরআনের গুপ্ত জ্ঞানের যে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে রাষ্ট্রীয়ভাবে তা গুরুত্বহীন বিবেচনা করা হয়। শাসন ক্ষমতা গ্রহণের উত্তরাধিকারী আইন বিষয়ক জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে ভ্রাতৃহত্যা বা ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটি স্থায়ী অনুসঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রাজা বা ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত যে কোন যুদ্ধকেই জেহাদের মর্যাদা দান। অর্থাৎ জেহাদ বা পররাজ্য লোভের জন্য যুদ্ধের গুণগত তথা ধর্মীয় পার্থক্যের বিলুপ্তি এরই ধারাবাহিকতায় উমাইয়া আব্বাসীয়দের যুদ্ধ, মোঘল-পাঠানদের যুদ্ধ এবং ইসলামের ইতিহাসের অসংখ্য ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার সঙ্গে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের কোন সম্পর্কই ছিল না। পররাজ্য গ্রাস ছাড়া এসব যুদ্ধের কোন ধরণের ধর্মীয় যৌক্তিকতাই ছিলনা। পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা ও মিথ্যা হাদিসের মাধ্যমে রাসূল (সা.) এর মর্যাদার অবমূল্যায়ন একটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রচার করা হয়। ফলে রাসূল (সা.) একজন সাধারণ মানুষ/হিসাবে প্রচার করা হয়। যেমন প্রচলিত তফসীরের মাধ্যমে জানা যায় যে, সূরা দ্বোহার ৭নং আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি পথভ্রান্ত মানুষ হিসাবে দিন কাটাইতে ছিলেন, হঠাৎ করে আল্লাহ্তালা তাঁকে সঠিক পথ প্রদান করে নবী হিসাবে নিয়োগ করলেন। (নাউজুবিল্লাহ) অথচ আমরা স্থির নিশ্চিতভাবে জানি যে রাসূল (সা.) বলেছেন, তিনিই হলেন, সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু উম্মী (মূল/মাতৃ)। তাঁকে সৃষ্টি না করা হলে কিছুই সৃষ্টি করা হতো না। এই কারণেই রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন আদম (আ.) যখন কাদামাটিতে তখনও আমি নবী। (সহীহ বোখারী)। সহীহ তিরমিজীর হাদিসেও আছে আদম (আ.) রুহ ও শরীরের সমন্বয়কৃত রূপ লাভ করেনি তখনও আমি নবী ছিলাম।

পবিত্র কুরআনে রাসূল (সা.) কে বান্দার সুপারিশকারী হিসাবে গোষণা করা হয়েছে, এরশাদ হচ্ছে এবং যখন এরা সাধারণ মানুষগণ নিজ নফসের উপর জুলুম করে (গুনাহ্ করে) এবং হে আমার মাহবুব। এরা আপনার নিকট আসে এবং নিজ গুনাহ্র জন্য ক্ষমা চায় এবং রাসূল (সা.) যদি তাদের জন্য সুপারিশ করেন তবেই তারা আল্লাহ্কে তাওবা কবুলকারী হিসাবে পাবে (সুরা নিসা : ৬৪)।

পবিত্র কুরআন এ রকম স্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও কুরআনের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বলা হয়েছে রাসূল (সা.) নিজের কল্যাণই করতে পারেন না, অন্যের কি উপকার করবেন। (নাউজুবিল্লাহ্)

এই বিকৃত ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সঠিক, অপরিবর্তিত ও রাসূল (সা.) এর প্রচারিত প্রকৃত ইসলাম হিসাবে প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকার যে ইসলাম প্রচার করে থাকে বা তার প্রসারের জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে এটাই যে, ইসলামের সঠিক রূপ তা বল প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ধর্ম হিসাবে ইসলামের কোন ক্ষতি হয় নাই এবং এটাই প্রকৃত ইসলাম এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের রাজা-বাদশাহ্গণ ও সমাজের নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যে বিদ্যমান রাজনেতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় হারাম বা অবৈধভাবে ক্ষমতাসীন হয়েছেন। এ ব্যাপারে ফকীহ্গণ কোন কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। বরং তারা সাধারণ লোকের বিয়ে ওজু, গোসল, রোজা, নামায এই সমস্ত ব্যাপারে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ব্যপৃত হয়ে গেলেন। ফলে রাজনীতি ধর্ম থেকে পৃথক করা হলো।

রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্মের ভূমিকা কুরআনের মৌখিক উচ্চারণের মধ্যে সীমিত হলো। রাষ্ট্রীয় আচার অনুষ্ঠান ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ধর্মীয় নির্দেশের বাইরে চলে গেল বিধায় ধর্মের প্রকাশ্য আলোচনা শুধু অদৃশ্য বিষয় বস্তু, বেহেশত, দোজখ ও দৈনন্দিন ইবাদতের মাসালা মাসায়েলের মধ্যে সীমিত রাখা হলো এছাড়া পবিত্র কুরআন ও হাদিসের শত শত আদেশ নিষেধ, জ্ঞান-বিজ্ঞান রাজনীতি-অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয় সে সবের ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা হওয়ার সুযোগ থেকে বৃহত্তর মুসলিম সমাজ বঞ্চিত হলো।

আহলে বাইতের ঘোষিত শত্রুরাই দ্বীন ইসলামের ধারক, বাহক, প্রচারক হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো। এই ধর্ম-রাজনৈতিক (Religo-Political) পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমরা ধর্মীয় নেতৃত্বের বিষয়টি আলোচনা করব। এহেন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় ধর্মীয় নেতৃত্ব একটি জটিল আকার ধারণ করল এবং এই নেতৃত্বে একাধিক গ্রুপ বা শ্রেণি তৈরি করা হলো। আমরা জানি যে, পবিত্র কুরআন ও হাদিসের মর্মানুযায়ী সম্মানিত আহলে বাইতগণ হলেন ইসলাম ধর্মের মূল সংরক্ষক। যেহেতু এটা তাদের ঐশী দায়িত্ব তা তাঁরা যথারীতি পালন করতে লাগলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন প্রকার বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করলো। সরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের ধর্মীয় দর্শন প্রচারের জন্য তাদের নিজস্ব আলেম শ্রেণি তৈরি করলো তাদের মূল দায়িত্ব ছিল আহলে বাইতের প্রদত্ত শিক্ষার বিপরীত বক্তব্য উপস্থাপন করার লক্ষ্যে কুরআনের অপব্যাখ্যা ও মিথ্যা হাদিস রচনা ও এগুলোর অপব্যবহার।

আর একজন আরবী ভাষাবিদ তাদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী ধর্মের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন। ফলে ধর্ম সম্পর্কে একাধিক মতামত একটি স্থায়ী মতবিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। এই তিন গ্রুপের মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সবচেয়ে ভয় পেত আহলে বাইত তথা রাসূল (সা.) এর পরিবারের সম্মানিত সদস্যদের। কারণ তারা ঠিকই জানত আহলে বাইতদের বঞ্চিত করেই তারা ক্ষমতাসীন হয়েছে। তাই জনগণ যে ব্যাপকভাবে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের অনুসারী না হতে পারে সে ব্যাপারে তারা সব সময় সচেষ্ট থাকতো। তাছাড়া তারা ছিলেন ইসলামী সাহিত্যে সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী সর্বোপরি তাদের ছিল আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান-এলমে লাদুন্নী ও অলৌকিক শক্তি বা কেরামত। এরা ছিলেন আল্লাহ্তালার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিনিধি। তাই তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থই হলো তাদের রাজ ক্ষমতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। পবিত্র কুরআন হাদিসের একই সাথে আল্লাহ্ রাসূল ও আহলে বাইতদের ভালবাসা ফরজ করা হয়েছে। তাই লোকেরা পাগলের মত তাদের পিছনে ছুটত। তাই ক্ষমতাসীন তাদের সাথে জনগণের দেখাশুনা করা নিরুৎসাহিত করতো। যাতে করে তাদের শিক্ষা অধিকাংশ জনগণের কাছে না পৌঁছায়। এ কারণেই আহলে সুন্নাত আল জামআত ধর্মমত প্রকৃত পক্ষে আব্বাসীয়া খলিফাদের উৎসাহ ও অনুমোদনক্রমে সৃষ্টি করা হয়। এই শিক্ষায় আহলে বাইতদের মহান শিক্ষা বা কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যা বা পর্যালোচনা এই ধর্মীয় এই ফেরকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। বরং আহলে বাইত ভক্ত বা অনুসারীরা যে মুসলমান সেই বিষয়টিও আহলে সুন্নাতে আল জামাআত বেশির ভাগ সদস্যই স্বীকার করেন না। এটা মূলত আব্বাসীয়া খলিফাদের রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন। এ কারণেই আব্বাসীয় খলিফাগণ আহলে বাইতদের মহান ইমামদের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা ও গৃহবন্দী করে রাখে তাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত আলেমগণ দিশাহারা হয়ে জনগণকে আল্লাহ্ ও রাসুলের সাথে সম্পর্কহীন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যহত রাখলেন। অবশেষে তারা এই সব মহান ব্যক্তিকে ভক্তি করা ও ভালবাসা ও মান্য করাকে শিরক বা বেদআত আখ্যা দিয়ে তাদেরকে জনগণকে দুরে রাখার চেষ্টা করলেন। যেহেতু তাঁদের ওফাতের পর তারা বিভিন্নভাবে উম্মতে মোহাম্মদীর উপকার করতে সক্ষম এই বাস্তবতার নিরিখে তাদের মাযার যিয়ারতের ওপরও ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধরণের নিষেধাজ্ঞা জারী করে। এই সব মহামানবের মাধ্যমে লোকজন উপকৃত হলে সাধারণ জনগণের কাছে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে বিধায় তারা এটাও কোনক্রমে বরদাস্ত করতো না। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য মুসলিম জাতির গর্ব হিসাবে যেসব জ্ঞানী বিদ্বান, ফকীহ ও আল্লাহ্র অলি এরা স্বয়ং আহলে বাইতের সম্মানিত সদস্য অথবা তাদের খলিফা, ভক্ত, অনুসারী এ কারণে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের মধ্যে সহযোগিতা ছিল সামান্য এবং সংঘাত বা কমপক্ষে অসহযোগিতা ছিল বেশি। ধর্মীয় নেতৃত্বকে তার দায়িত্ব পালনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব খুব কমই সাহায্য করেছে। আর যতটুকু সাহায্য তারা করতে পারতো ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তার অনেক কম গ্রহণ করেছে। কারণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সাহায্যের বিনিময়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিকট এই মহান ব্যক্তিদের যে মূল্য দিতে হতো, তা আদায় করতে তাদের ইমান এবং বিবেক প্রস্তুত ছিলনা। আর সাধারণ উম্মতের অবস্থা ছিল এই যে, ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে যারাই রাজা-বাদশাহর সান্নিধ্যে এসেছেন এবং যারাই তাদের নিকট থেকে কোন পদ বা পারিতোষক গ্রহণ করেছেন। তারা অতি কষ্টে উম্মাহর মধ্যে তাদের আস্থা বহাল রাখতে সক্ষম হয়েছেন। রাজা-বাদশাহদের সান্নিধ্যে থেকে দূরে থাকা এবং তাদের রোষানলের সামনে অটল-অবিচল থাকা মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয়

নেতৃত্বের যোগ্যতার অন্যতম মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। কোন ধর্মীয় নেতা এ মানদন্ডে উত্তীর্ণ না হলে জনগণ অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টিতে তাকে পর্যবেক্ষন করতো। রাজা-বাদশাহ্দের সান্নিধ্যে এসেও দ্বীনের ব্যাপারে কোন আপোষ না করলেই কেবল কওম তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ মুসলমান তো দূরের কথা, যেসব মুসলিম বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে মাথা বিক্রি করে দিয়েছিল। তারাও এ ধরণের ব্যক্তিকে দ্বীনের ইমাম ও ধর্মীয় নেতৃত্বের পদে বসাতে রাজী ছিল না।

হিজরী প্রথম শতকের মধ্য ভাগ থেকেই ধর্মীয় নেতৃত্বের পথ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পথ সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যায়। উম্মতের আলেম সমাজ-তাফসীর, হাদিস, ফিকাহ্ এবং দ্বীনের জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে গ্রন্থ প্রণয়ন ও কুরআন হাদিস পাঠ ও পঠন এবং ফতওয়ার যতটুকু কাজ করেছেন তার বেশির ভাগই করেছেন সরকার থেকে মুক্ত থেকে। সরকারী সাহায্য ছাড়াই, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারের বিরোধীতার মুখে এবং সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপের কঠোর মুকাবিলা করেই তারা এসব করেছেন। উম্মাহ্র সৎ কর্মশীল মুসলমানদের মন-মানস এবং চরিত্র ও আচার আচরণ পরিশুদ্ধ করার যে দায়িত্ব তারা পালন করেন, তাও ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রভাব মুক্ত। রাজা-বাদশাহ্রা বড় জোর এইটুকু দায়িত্ব পালন করেছেন যে, দেশের পর দেশ জয় করে কোটি কোটি মানুষকে ইসলামের প্রভাব বলয়ে নিয়ে এসেছেন। এরপর কোটি কোটি মানুষের ইমানের বৃত্তে প্রবিষ্ট হওয়া রাজা বাদশাহ্র রাজনীতির ফল ছিল না; বরং তা ছিল উম্মতের সৎকর্মশীল পুত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ও অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন আল্লাহ্র অলিদের তথা আহলে বায়তের সদস্যদের প্রচেষ্টা ও কেরামতের ফসল।

রাজনৈতিক ধর্মীয় দর্শনে (Politico-Religo-Philosophical Conflict) মত বিরোধ

পূর্বাভাষঃ প্রকৃতপক্ষে খেলাফতে রাশেদার পতনের মূল কারণ ছিল মুসলিম উম্মাহ্র অভ্যন্তরে ধর্মীয় বিরোধ। পরবর্তীতে এই খিলাফত তার যথার্থ নীতি-আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে বিভিন্ন ধরণের মতবিরোধ শিকড় গেড়ে বসে এবং তাদেরকে বিভিন্নমুখী স্বতন্ত্র গ্রুপের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কারণ যথা সময়ে যথাযথভাবে এসব মতবিরোধ দূর করার মত নির্ভরযোগ্য ও ক্ষমতাসম্পন্ন কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রাজতন্ত্র নামক প্রতিষ্ঠানে আদৌ বর্তমান ছিল না। হযরত ওসমান (রা.) এর শাসনামলে বিভিন্ন প্রশাসনিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এক গৃহযুদ্ধের মত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কিন্তু এর পরিণতিতে যখন হযরত ওসমান (রা.) এর শাহাদত সংঘটিত হয় এবং হযরত আলীর (আ.) খেলাফতকালে তীব্র মতবিরোধ এ অধিকতর ব্যাপক গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় জং-এ-জামাল, সিফ্ফিনের যুদ্ধ, সালিসের ঘটনা এবং নাহরাওয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন জনমনে প্রশ্ন দেখা দেয় এসব যুদ্ধে কে ন্যায়ের পথে আছে এবং কেন? কেই বা অন্যায়ের পথে আছে। আর অন্যায় পথে যাওয়ার কারণই বা কি? এ সকল প্রশ্ন বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। বিবাজমান দলের কার্যকলাপের ব্যাপারে কেউ যদি নিরপেক্ষতা ও নীরবতা অবলম্বন করে, তাহলে কোন যুক্তিতে ও শরীয়তী দলিলের ভিত্তিতে সে এ নীতি অবলম্বন করছে? এ সকল প্রশ্ন কয়েকটি নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট মতবাদের সৃষ্টি করে। এই সব মতবাদের অনুসারীরা তাদের মতবাদ যে সুদৃঢ় ধর্মীয় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা প্রমাণ করার জন্য কুরআন ও হাদিসের আশ্রয় নেয়। ফলশ্রুতিতে পর্যায়ক্রমে এসব গ্রুপ ধর্মীয় দলে রূপান্তরিত হতে থাকে।

অতঃপর মতবিরোধের সূচনাকালে যে সকল খুন জখমের ঘটনা ঘটে এবং পরবর্তীকালে বনী উমাইয়া এবং বনী আব্বাসীয়দের শাসনামলে তা অব্যাহত থাকে। তার ফলে এ সকল মতবিরোধ আর নিছক বিশ্বাস ও ধারণা কল্পনার বিরোধেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তাতে এমন সব কঠোরতা দেখা দেয় যা মুসলমানদের ধর্মীয় ঐক্যকে এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে নিক্ষেপ করে। বিরোধমূলক বিতর্ক ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি বিষয় থেকে নতুন নতুন রাজনৈতিক-ধর্মীয় দার্শনিক বিতর্কের সৃষ্টি করে। প্রতিটি নতুন সমস্যাকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ফেরকার জন্ম হতে থাকে। এসব ফেরকার মধ্যে কেবল পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষই সৃষ্টি হয়নি বরং কলহ বিবাদ এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার উদ্ভব ঘটে। ইরাকের কেন্দ্রস্থল কুফা ছিল এ ফেতনা ফ্যাসাদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। কারণ এ অঞ্চলে জং-এ-জামাল, সিফফিন ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই স্থানেই জন্ম হয়েছে সকল বড় বড় ফেরকার। হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) এর শাহাদাতের ঘটনাও এখানেই ঘটে। বনী উমাইয়া ও পরবর্তীতে বনী আব্বাসিয়ারা তাদের বিরোধী শক্তিকে দমন করার জন্য এখানেই সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠুর আচরণ করে অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের এ যুগে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব ঘটে।

আপাতদৃষ্টিতে ইসলাম ধর্মের মূলনীতিসমূহকে স্বীকার করে নিয়েই যুগের প্রয়োজনের মোকাবিলায় এসব সম্প্রদায় বা ফেরকার বিকাশ ঘটে। তার মধ্যে প্রধান কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো। এক. নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার মৃত্যুকালীন

সময়ে কোন উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন নি মর্মে ঘোষণা করা হয়। এই উত্তরাধিকারীর প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই উত্তরাধিকারী প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের নেতা নির্বাচন একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এক শ্রেণীর মুসলিম ঐতিহাসিক ধারণা করেন যদিও মহানবী (সা.) প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কোন উত্তরসুরী স্থির না করলেও মাঝে মধ্যে তিনি এমন আভাস ব্যক্ত করেছেন, যার ফলে হযরত আলী (রা.) কে তার উত্তরসুরী বলে ধরে নেয়া যায়। যদিও গাদীরে খুমের ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তিনি হযরত আলী (রা.) কে ও তারপরে হাসান (আ.), হোসেন (আ.) ও ধর্মীয় নেতৃত্বের অধিকারী হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, যা পরবর্তীতে ইসলামের এক শ্রেণির ইতিহাস থেকে পরিত্যক্ত বা গুরুত্বহীন বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে অসুস্থতার সময়ে তিনি আবু বকর (রা.) কে যে নামায পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ফলে অনেকে বিবেচনা করেন আবু কবর (রা.) মহানবীর যথার্থ উত্তরসুরী। এমনি ধরণের আরো বহু যুক্তি প্রদর্শন করে এ প্রশ্নটি নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তিকর প্রতিযোগিতায় ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। প্রাক ইসলামী যুদ্ধে উমাইয়াগণ মক্কার শাসনভার ও কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। বেদুইনগণ পরবর্তীতে উমাইয়াদের বিরুদ্ধাচারণ করে। এভাবে স্বাধীন নির্বাচন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন দল ও মতবাদের বিকাশ ঘটে। এই দলীয় দ্বন্দ্বের সাথে হাশেমীয় ও উমাইয়া গোত্রের দীর্ঘকালের পুরাতন বিরোধ একত্রীভূত হয়ে পরিস্থিতিকে আরো শোচনীয় করে ফেলে। এই দুই গোত্রের দলাদলিকে ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধের মূল কারণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি লিখেন: খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর ভিতরে ইসমাইলের বংশধর কুশাই প্রথমে মক্কায় এবং পরে ক্রমশ হিজাজ প্রদেশে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পূর্ব পর্যন্ত মক্কা প্রধানত কুড়ে ঘর তাবু বিশিষ্ট সামান্য গন্ডগ্রাম ছিল। কুশাই কাবা গৃহের সংস্কার করেন। তিনি নিজের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান কক্ষ সাধারণের কার্যনির্বাহের জন্য মন্ত্রণাগৃহ রূপে ব্যবহার হইত। তিনি কুরাইশদেরকে কাবার চতুর্দিকে প্রস্তর নির্মিত গৃহে বাস করিতে বাধ্য করেন। জনসাধারণের কর আদায় ও আরব দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে আগত তীর্থ যাত্রীদের আহার্য ও পানীয় সরবরাহ প্রভৃতির জন্য তিনি আইন কানুন বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

৪৮০ খ্রিস্টাব্দে কুশাই এর মৃত্যুর পর তৎপুত্র আব্দুল্লাহ তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাহার মৃত্যুর পর মক্কার শাসন কর্তৃত্ব লইয়া তাহার পৌত্রপণ ও তাহার ভ্রাতা আব্দুল মন্নাফের পুত্রদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। তাহারা পরস্পর শাসন ক্ষমতা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া এই বিবাদের মীমাংসা করেন। মক্কার পানি সরবরাহ ও কর আদায়ের ভার আব্দুল মন্নাফের পুত্র আব্দুস শামসের হস্তে অর্পিত হইল এবং কাবা, মন্ত্রণাগৃহ ও সামরিক বিভাগের রক্ষাকর্তার ভার আবদদারের পৌত্রগণের উপর ন্যস্ত হইল। আব্দুস শামস তদীয় ক্ষমতা স্বীয় ভ্রাতা হাশীমকে অর্পন করেন। হাশীম মক্কার একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং অতিথি অভ্যাগতদের প্রতি পরম সদাশয় ছিলেন। ৫১০ খ্রিস্টাব্দের হাশীমের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা দয়ালু উপাধিধারী মুত্তালিব এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ৫২০ খ্রিস্টাব্দ পরে শেষ শেষ ভাগে মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শায়বা ইহা লাভ করেন। শায়বা হাশীমের পুত্র ছিলেন। তিনি আব্দুল মুত্তালিব নামে সবিশেষ পরিচিত। ইতোমধ্যে আবদ্দারের পৌত্রগণ ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু হাশীম পরিবার সাধারণের ভক্তি ও ভালবাসা অধিকার করায় ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করত মক্কার নেতৃত্ব গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আব্দুস শামসের উচ্চাভিলাষী পুত্র উমাইয়া এই দলের প্রধান ছিলেন। এতদ সত্ত্বেও আব্দুল মোত্তালিব তাহার উদার চিত্ত ও কুরাইশদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার বলে ৫৯ বৎসর পর্যন্ত মক্কা শাসন করতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসনকার্যে তিনি দশটি পরিবারের প্রধানদের সাহায্য পাইতেন। (সৈয়দ আমীর আলী রচিত 'দি হিস্টি অব সেরাসন্স' এর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ আরব জাতির ইতিহাস পৃ: ৫-৬)।

কুরআন ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য

কুরআন ও হাদিস ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মুসলামনদের মধ্যে কয়েকটি চিন্তাগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। পবিত্র কুরআন মানব জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যা এতে আলোচিত হয়নি। পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি করা সহজ নয়। নবী (সা.) তার জীবদ্দশায় কুরআনের বাণী প্রয়োজনবোধে ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর ওফাতের পর পবিত্র কুরআনের বাণী এবং তার নিজের কথা উপদেশের (হাদিস) ব্যাখ্যা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এ বিষয়ে উমাইয়া শাসক মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সাথে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারকদের একজন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কথোপকথন থেকে জানা যায়: ঐতিহাসিকদের সূত্র মতে হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার সন্ধিচুক্তির বছরের শেষে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান কাবা জিয়ারতকালে একদিন কোবাইশের পার্শ্ব অতিক্রম করছিল। সেখানে উপস্থিত সকলেই তার সম্মানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস দাঁড়াননি। তখন মুয়াবিয়া তাকে বলল, ওহে ইবনে আব্বাস, সিফ্ফিন

যুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ক্ষোভ কি তোমার অন্য সাথীদের মতো আমার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতে বাধা দিয়েছে? নিশ্চয়ই ওসমান (রা.) মজলুম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল। উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে দেখিয়ে বললেন, উমর ইবনুল খাত্তাবও মজলুম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তিনি তার "কিসাস" এর ভার পুত্রকে দিয়েছিলেন। আর এই তার পুত্র। মুয়াবিয়া যে হযরত ওসমান (রা.) এর শাহাদতের জন্য কিসাস (রক্তপণ) এর দাবি উত্থাপন করেছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত সম্মত ছিল না তার প্রতি ইংগিত। মুয়াবিয়া-নিশ্চয় তাঁকে (হযরত ওসমান (রা.) কে) কোন কাফের হত্যা করেছিল? ইবনে আব্বাস কে তাকে (হযরত ওসমান) হত্যা করেছে? মুয়াবিয়া-তাকে মুসলমানরা হত্যা করেছে। ইবনে আব্বাস" তাহলে তোমার দাবী প্রত্যাখান করার জন্য এটাই যথেষ্ট। যদি মুসলমানেরা তাকে অমর্যাদা ও হত্যা করে থাকে এখানে জুলুমের কোন অবকাশই থাকেনা। মুয়াবিয়া-আমরা সকল স্থানে কিতাবে লিখে দেব। যাতে আলী ও তার পরিবারের গুণগান থেকে লোকেরা বিরত থাকবে। এরপর তোমার জিহ্বাকে বন্ধ করা হবে। ওহে ইবনে আব্বাস। ইবনে আব্বাস: তুমি আমাদেরকে কুরআন পড়া থেকে বিরত রাখতে চাও?

মুয়াবিয়া-না।

ইবনে আব্বাস-তুমি কি এর ব্যাখ্যা থেকে আমাদের দূরে রাখতে চাও?

মুয়াবিয়া-হ্যাঁ

ইবনে আব্বাস-তাহলে কি আমরা কুরআন পড়তে পারব। অথচ জিজ্ঞাসা করতে পারব না যে, এখানে আল্লাহ্ কি বলেছেন?

মুয়াবিয়া-হ্যাঁ

ইবনে আব্বাস-তাহলে যা তিনি আমাদের প্রতি নাজিল করেছেন, তা যদি আমরা না জানি কিভাবে আমরা সেই অনুযায়ী আমল করব? মুয়াবিয়া-এ ক্ষেত্রে তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যাদের ব্যাখ্যা তোমার ও তোমার পরিবারের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্নতা পোষণ করে। ইবনে আব্বাস : কুরআন আমাদের পরিবারের কাছে নাজিল হয়েছিল। আমি কি এ সম্পর্কে আবু সুফিয়ান ও আবু মুহিতের পরিবারের কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারি? মুয়াবিয়া-কুরআন তেলওয়াত তাহলে তোমাদের সম্পর্কে যা নাজিল হয়েছে এবং রাসূল (সা.) যা বলেছেন, তা ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। অন্য কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারো। ইবনে আব্বাস-আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, ওরা চায় মুখের ফুৎকারে আমার নূরকে নিভিয়ে দেবে। কিন্তু আমি আমার নুরকে প্রজ্জলিত রাখব। যতই তা কাফেরদের জন্য গাত্র দাহের বিষয় হোক না কেন? (সুরা তাওবা: ৩২)

মুয়াবিয়া-ওহে ইবনে আব্বাস, আমার থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখ এবং তোমার জিহ্বাকে আমার থেকে হেফাজত করো। যদিও তুমি এসব বলো তবে গোপনে। কারো সম্মুখে প্রকাশ্যে এসব বলতে চেষ্টা করোনা। (শরহে নাহজুল বালাগা, খণ্ড : ৩, পৃ: ১৫)। এই বিতর্কে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুয়াবিয়া তথা উমাইয়া শাসকগণ কুরআন ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সেন্সরশীপ আরোপ করেছিল। কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা জনিত ভিন্নতা তথা পরস্পর বিরোধীতা একটি স্থায়ী ধর্মীয় সমস্যার সৃষ্টি করে। যা অদ্যাবধি বিদ্যমান। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআনের তাফসীর প্রণয়ন ও হাদিসের সংকলন সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত হতে এত দীর্ঘ সময় লেগে গেছে। তাছাড়া কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা দান ও তার প্রয়োগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চিন্তা গোষ্ঠী বা মাযহাব তথা ফেরকার উদ্ভব ঘটে। এতদ্ব্যতীত জীবনের নতুন নতুন সমস্যা ব্যাখ্যায় মুসলমানগণ অসুবিধার সম্মুখীন হন। তারা পুরনো শিক্ষার নতুন ও সময়োপযোগী ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন। এইভাবে নতুন আঙ্গিকে চিন্তা করতে গিয়ে মুসলমানগণ ক্রমশ নতুন নতুন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ঐশী জ্ঞানের বিপরীতে জ্ঞানের অন্যান্য অনৈসলামিক উৎসের উপর গুরুত্বারোপ

রাসূল (সা.) ছিলেন আল্লাহ্র নবী ও রাসূল। তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার উৎস হলেন আল্লাহ্। স্বয়ং নবী (সা.) এর কাছে সরাসরি ওহী আসত। আর এই ওহী লব্ধ জ্ঞানই চূড়ান্ত সত্য জ্ঞান। যেহেতু রাসূল (সা.) এর পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত ও নির্বাচিত ব্যক্তির কনসেপ্ট রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে অস্বীকার করা হলো। তাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তির নিকট ওহীর বিকল্প কোন পদ্ধতি অবশ্যই রয়েছে যাকে সুফি পরিভাষায় এলকা, এলহাম, কাশফ ইত্যাদি যা সামাজিকভাবে অস্বীকার করা হয়। ফলে মানবজাতির সাথে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঐশী সম্পর্ক বা উৎসের ধারণাও সমাজ থেকে পরিত্যক্ত হলো। ফলে জ্ঞানের যথার্থ উৎস নিরুপনকে কেন্দ্র করে ইসলামী আইন, ধর্ম, ইবাদত ও বিশেষ করে দর্শনের ইতিহাসে কিছু চিন্তা গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। ইসলামী সাহিত্যে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ ছাড়াও জ্ঞানের আরো তিনটি উৎসকে নির্দেশ করে। যেমন প্রজ্ঞা (আকল)। প্রত্যাদেশ (নকল) ও স্বজ্ঞা (কাশফ) হযরত (সা.) তার অনুসারীদেরকে জীবনের কিছু ঘটনাকে প্রজ্ঞা, কিছু ঘটনাকে প্রত্যাদেশ এবং কিছু ঘটনাকে স্বজ্ঞার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার উপদেশ দেন। আসলে

জীবনের সমস্যাবলীর উপলব্ধি জীবন জগতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার জন্য এই পদ্ধতিগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু সামাজিক মন-মানসে ব্যাপক বিকৃত চিন্তাধারার কারণে মুসলিম চিন্তাবিদরা প্রজ্ঞা, ইলহাম ও কাশফ এর উপর আর গুরুত্ব আরোপ করেন নি। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন চিন্তা গোষ্ঠীর (School of Thought) উদ্ভব হয়। ফলে সুফিগণ ব্যতীত অন্যান্য চিন্তাবিদগণ ইলহাম (প্রত্যাদেশ) কাশফকে জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসাবে গুরুত্বহীন বলে ধরে নিলেন। ফলে চিন্তাধারা ও মননের ক্ষেত্রে ইসলামী সমাজ বহুধা বিভক্ত হয়ে গেল।

ধর্মের ঐশী ব্যাখ্যার বিপরীতে বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যার অপপ্রয়াস

ইসলাম ধর্মের জ্ঞানের প্রধান উৎস হচ্ছে ঐশী জ্ঞান। যা সাধারণ মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা ও কল্পনা শক্তির বাইরে। তাই ধর্ম হিসাবে ইসলামকে যুক্তি সংগত করার উপর একে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস থেকেও ইসলামের বিভিন্ন গোত্র/সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। প্রথম দিকে মুসলিম চিন্তাবিদগণ ধর্মের ব্যবহারিক দিক নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই ধর্মের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট নিয়ে তারা গভীর বিচারমূলক চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। তারা তাদের ধর্মকে সাধারণ যুক্তির আলোকে বিচার করার এবং পরবর্তীতে প্লেটো ও এরিস্টোটল দর্শনের আলোকে বুঝবার চেষ্টা করেন। ইসলাম ধর্মকে এভাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে (common sense) উপস্থাপনের মানসিকতাই কালক্রমে বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টির পথ সুগম করে।

কুরআনের আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী আয়াতের ব্যাখ্যাজনিত জটিলতা

আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য এটা চিরন্তন যে, তার পক্ষ থেকে এই আইন কেহ ব্যাখ্যা করবে ও তা বাস্তবায়ন করবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এই কাজটি বিভিন্ন দেশের সুপ্রীম কোর্ট করে থাকে। অনুরুপভাবে আল্লাহ্তালা নবী-রাসূল ও উলিল আমরকে তার মহান কিতাবকে ব্যাখ্যা করার জন্য উপর্যুক্ত জ্ঞান, বুদ্ধি ও মর্যাদা দিয়েছেন। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর এ ধরণের নির্বাচিত ও নির্ধারিত ব্যক্তিত্বের কনসেপ্ট অস্বীকার করা হয়। কুরআন ব্যাখ্যার জন্য সর্বজনমান্য কোন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব রইল না। ফলে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে বিভিন্ন চিন্তা গোষ্ঠীর আবির্ভাব লক্ষনীয়। কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতার কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে। আবার এমন কিছু আয়াত আছে যা মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। এই সব আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী আয়াতের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চিন্তা গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। এই চিন্তা গোষ্ঠীর মধ্যে জবরিযা ও কাদরিয়া সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

আল্লাহ্র গুণাবলী বিষয়ক জটিলতা

কুরআনের নিত্যতা, দিকদর্শন প্রভৃতি ধর্ম তাত্ত্বিক সমস্যাকে সামনে রেখে ইসলামের ইতিহাসে কিছু চিন্তা গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। এইসব চিন্তা গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে মুতাযিলা ও আশারীয়া সম্প্রদায়। আল্লাহ্র গুণাবলী কি তার সত্তা থেকে পৃথক না তার সত্তার অন্তর্ভুক্ত, কুরআনকে সৃষ্টি না নিত্য ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে তারা বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে যেসব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটে সেই সকল সম্প্রদায়ই দৃশ্যত ইসলামের মূল নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ও আস্থাশীল ছিল। যে সব সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে তার মধ্যে রাজনৈতিক, কিছু ধর্মতাত্ত্বিক ও কিছু দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল। এতদ সত্ত্বে সার্বিক সমাজ ব্যবস্থায় ইসলাম ধর্মের মূল স্পিরিট বাক স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার, অর্থনৈতিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, তথা সার্বিক খোদাভীরুতা বিদ্যমান ছিলনা।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই সব মুসলিম চিন্তাবিদকে নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম মুসলিম ধর্মীয় গ্রুপকে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে (Religo-Political School) এ বিভক্ত করা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে-খারিজি সম্প্রদায়, সুন্নী মাযহাব এবং শিয়া সম্প্রদায়। দ্বিতীয় মুসলমান চিন্তাবিদদেরকে ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় (Philosophical School) এ বিভক্ত করা যায় এবং এগুলো হলো-জবরিয়া, কাদরিয়া এবং সিফতিয়া সম্প্রদায়। তৃতীয়ত মুসলমান চিন্তাবিদদেরকে দার্শনিক সম্প্রদায়ে (Theological School) বিভক্ত করা যায়। এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মুতাযিলা, আশরিয়া, সুফি এবং ফালাসিফা গোষ্ঠী (সৈয়দ আব্দুল হাই, মুসলিম ফিলসফি পৃ: ৩৭-৩৮)। বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই বিভাজন বা শ্রেণী বিন্যাস খুব সুদৃঢ় নয়, কারণ এদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। তাছাড়া ধর্মীয় আক্বীদা, ইমান ও আমল একই সূত্রে গাঁথা বিধায় কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর চিন্তাধারার সাথে অন্য গ্রুপের চিন্তা চেতনার সংমিশ্রণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। উপরন্তু রাজনৈতিক মতপার্থক্য বা নির্যাতনের কারণেও এই মত পার্থক্য ক্ষেত্র বিশেষে কঠোর বিধি নিষেধে পরিণত হয়। তাছাড়া ইসু ভিত্তিক সমস্যাকে কেন্দ্র করেও এসব বিভাজন

অনেক ক্ষেত্রে প্রকট আকার ধারণ করে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় বিষয় হলো। উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের ঘোষিত শত্রু ছিল আহলে বাইতগণ। অথচ পবিত্র কুরআন ও রাসুলের শিক্ষার মাধ্যমে আহলে বাইতদের ভালোবাসা ও তাঁদের কুরআনের ব্যাখ্যা, হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা বা ধর্মীয় ব্যাখ্যা মুসলমান ইমানদারদের জন্য অবশ্য পালনীয়। কিন্তু মুসলিম ক্ষমতাসীনগণ এই ধর্মীয় বাস্তবতা আজ পর্যন্ত স্বীকার করে নাই। এ কারণে হযরত আলীর (আ.) জনপ্রশাসন ভিত্তিক নীতি, জ্ঞান ও শিক্ষা ও তাঁর উত্তরাধিকারী ইমাম সর্বইমামগণ হযরত হাসান, হযরত বাকের, হযরত জাফর সাদেক, হযরত মুসা কাযেম, হযরত আলী, বিযা, হযরত আলী তকী, হযরত আলী নকী, হযরত হাসান আসকারী, হযরত মেহদী (আ.)।

এই সব মহান ইমামগণ যুগ শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, আলেম ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে এক একজন আল্লাহ্‌র অলি হওয়া সত্ত্বেও আহলে সুন্নাত আল জামাআতের ধর্মীয় চিন্তাধারায় বা আইন বিজ্ঞানে তাঁদের কোন মতামত পর্যালোচনায় বা সিদ্ধান্তে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। হযরত আলীর (আ.) পত্রাবলী সংকলনও ইসলামী ধর্মীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। রাজনৈতিক বিদ্বেষ প্রসূত ধর্মীয় বিশ্বাসই আহলে সুন্নাত আল জামআতের ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তা চেতনার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। অথচ মুসলিম সমাজের দুর্ভাগ্য এ বিষয়টি এত গভীরভাবে আহলে সুন্নত আল জামাতের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে প্রোথিত ও গ্রোথিত করা হয়েছে যে, এই সব মহান ধর্মীয় ইমামদের জ্ঞান থেকে যে, তারা বঞ্চিত হচ্ছেন সে সম্পর্কে তাদের কোন চেতনাই নাই এবং এই সব আহলে বাইতদের ইমামদের তুলনায় আহলে সুন্নাতের ধর্মীয় ইমামদের যে কোন তুলনা করাই যায় না বা করা সম্ভব নয়। এ বিষয়টি মুসলিমদের ধর্মীয় চিন্তা চেতনার বাইরে রাখা হয়েছে। ফলে একপেশে তথ্যের ভিত্তিতে ইসলামের ইতিহাস তথা সুফিতত্ত্বের উদ্ভব উন্নতি ও ক্রমাবিকাশের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তা পক্ষপাতিত্বপূর্ণ, একপেশে, খণ্ডিত ও অপূর্ণাঙ্গ। এ কারণেই সুফিবাদের বিরুদ্ধবাদীরা এ সম্পর্কে নানা ধরণের সমালোচনা করে থাকেন। এই প্রেক্ষাপটে আমরা বিভিন্ন ধর্মীয় রাজনৈতিক (Religo-Political) সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা ফকীহদের মধ্যে শ্রেণি বিভাগ। আল্লাহ্‌ প্রেমিকদের আক্বীদা, ইমান ও আমল সম্পর্কে আলোচনা করব। ফলে এই ধর্মীয়, রাজনৈতিক দার্শনিক গ্রুপদের চিন্তার সঠিকতা বা মতপার্থক্যের বিষয়টি হৃদয়ঙ্গমে করা সহজতর হয়।

এই মতাপার্থক্যের সঠিকতা যাচাই যারা করেন তারা হলেন ফিকাহ্‌ তত্ত্ব বিশারদ বা ফকীহ। ইসলামী আইনতত্ত্বে ইসলামী প্রতিশব্দ ফিকহ। 'ফিকহ্‌' শব্দটি কোন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ও গভীর জ্ঞানের অর্থ হতে উদ্ভুত। আল কুরআনে "ফিকাহ্‌" শব্দটি একাধিক স্থানে উপস্থিত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। (তাহারা যেন ধর্মে উপলব্ধি লাভ করতে পারে)। তাই বুঝা যায় পবিত্র কুরআন ফকীহ্‌ শব্দটি শুধুমাত্র আইন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বরং ইসলামের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত দিকসমূহের ব্যাপক অর্থ বহন করে। পরবর্তীতে মুসলমানগণের বিজিত ভূখণ্ডে অমুসলমানদের সাথে সংস্পর্শ, মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের অযোগ্যতা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জুলুম, বিচার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গদের পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি কারণে ইসলামে বহুবিধ আইনতত্ত্ব ও ধর্মীয় মতবাদের উদ্ভব হয় এবং সমাজ জীবনে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে এবং তার সাথে সথে ইসলামী শব্দ সহজ সরল আদি বা মূল অর্থের পরবর্তীতে বিশেষ অর্থে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় "তাওহীদ" ইমান, দ্বীন, শব্দ গুলোর অর্থও পরিবর্তিত হয়েছে।

ইবনে আব্বাসের জন্য দোয়া করতে গিয়ে রাসূল (সা.) বলেন যে, "হে আল্লাহ্‌ তাকে ধর্মের জ্ঞান দান কর। এখানে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) সে শুধু ফকীহ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে নিশ্চয়ই শুধু আইনের জ্ঞানের কথা বলেন নাই। বরং সাধারণভাবে দ্বীন ইসলামের গভীর জ্ঞানের কথাই বলছেন। এ থেকে স্থির নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, "ফিকহ্‌" শব্দটি ব্যাপক অর্থে ইসলাম ধর্মের সার্বিক গভীর জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই সুফিবাদ বিষয়ক জ্ঞান এর মধ্যে সামিল ছিল এবং ফকিহ্‌দের সাথে সুফিদের মূলত কোন বিরোধ ছিলনা। এ প্রসঙ্গে ইমাম গাজ্জালী এহইয়া উল উলুম-আল দ্বীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সুফি ফারকাদ (মৃত্যু সন: ১১১ হিঃ) কতকগুলো বিষয়ে আলোচনাকালে হাসান বসরীকে বললেন, ফোকাহারা তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবে। জবাবে হাসান বাসরী (দঃ) বললেন, "তিনিই প্রকৃত ফকিহ যিনি পার্থিব জীবন সম্পর্কে উদাসীন, পরকালে আগ্রহী, ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। ইবাদতে সুনিয়মিত, আচরণে সৎ, মুসলমান ভাইদের কখনো অসম্মান করেন না এবং সমাজের কল্যাণ কামনা করেন। "ফকীহ্‌" শব্দটি মূলত নিছক ব্যক্তিগত উপলিব্ধি ছাড়া আরো কয়েকটি অর্থ প্রকাশ করত সেগুলো ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস, আল কুরআনের সঠিক ও সার্বিক জ্ঞান। ইবাদতের নিয়ম কানুন এব ইসলামে সাধারণ নিয়মাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান। (সূত্র: ইসলামী আইনের ভাষ্য আলহাজ গাজী শামছুর রহমান পল্লব পাবলিশার্স, অক্টোবর ১৯৮৮)

পঞ্চম অধ্যায়

কারবালার যুদ্ধের পর ইসলাম ধর্ম-রাজনীতি-সমাজনীতিতে ব্যাপক বিচ্যুতি ও বিপর্যয়

উমাইয়াদের অবৈধ মসনদ লাভে শুধুমাত্র একটি রাজ বংশেরই পরিবর্তন ঘটল না। বরং এর অর্থ ইসলামের ধর্ম-রাজনীতির ব্যাপক পরিবর্তন এবং এমন এক নতুন (বিদআত) অবস্থার উদ্ভব, আমরা দেখতে পাব ইসলামী সাম্রাজ্যের ভাগ্য ও জাতির উন্নয়নের উপর যা অতীব শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ একটি স্থায়ী নীতি বা সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। এসব যুদ্ধের মূল কারণ ছিল ধর্মীয় বিদ্বেষ কিংবা মৌলিক নীতির ক্ষেত্রে মতভেদ যেমন, আহলে বাইতের খোদা প্রদত্ত মর্যাদা, সম্মান ও ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবসান, গণতন্ত্রের সাথে স্বেচ্ছাতন্ত্রের লড়াই, ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের লড়াই। এই বিভাজনগুলিকে আমাদের পর্যালোচনার বাইরে রাখলে দেখা যায় এশিয়া বা ইউরোপে মুসলমানদের সাথে মুসলমানদের অথবা খ্রিস্টান বা মুসলমানদের মধ্যে মানুষ ও জাতিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা এবং তাদেরকে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত করানোর মূলে ধর্মবিদ্বেষের চেয়ে স্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত করানোর প্রবল কারণ আর নেই–এটি এমনই একটি ভাব প্রবণতা বা সেন্টিমেন্ট বা ধর্মান্ধতা বা অজ্ঞতা, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিপ্লবের উপর বীভৎস ছায়াপথ ধরে অদ্যাবধি টিকে আছে।

হযরত হাসান (আ.) এর পদ ত্যাগের পর উমাইয়া বংশের মুয়াবিয়াই হয়ে উঠলেন ইসলামের প্রশাসক। এভাবে ভাগ্যের অন্যতম পরিহাস ইতিহাসে নথিভুক্ত হলো, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিগ্রহকারীরাই তাঁর দৌহিত্রদের উত্তরাধিকার জবর দখল করল এবং তার ধর্ম ও সমাজের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠল। হযরত আলী (রা.) কুফায় শাসন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, এবার তা সরিয়ে নেওয়া হল দামাসকাসে। যেখানে মুয়াবিয়া পারস্য ও বাইজান্টাইন রাজাদের মত জাঁকজমক ও আড়ম্বরতায় নিজেকে ভরিয়ে রাখতেন। তার নীতির অন্তরায় সৃষ্টিকারী শত্রু বা দুরুহ বন্ধুকে সরিয়ে দিতে তিনি বিষ (Rose Water and Surgery) (শরবত) গুপ্ত হত্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। জ্ঞাতিতত্ত্বের দাবী কিংবা ইসলামের সেবা কোন বিবেচনাই তাদের রক্ষা করতে পারেনি। এভাবে যারা উচ্চাকাংখা বা কূটনীতির কাছে উৎসর্গীকৃত বা বলী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত ওমর (রা.) এর পুত্র আব্দুর রহমান যার জনপ্রিয়তা এবং চিন্তাশীল মুসলমানদের শ্রদ্ধা লাভই তাঁকে হত্যার কারণ। মুয়াবিয়ার চরিত্র এবং যে সব ঘটনা পরম্পরায় তাঁর সাফল্য নিশ্চিত হয়েছিল, একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এভাবে তার মূল্যায়ন করেছেন। অন্তত এ ব্যাপারে যার মত পক্ষপাতশূন্য ও তথ্য ভিত্তিক, "ধূর্ত, অবিবেচক ও নির্মম উমাইয়াদের প্রথম খলিফা নিজের অবস্থা নিরাপদ করার প্রয়োজনে কোন দুষ্কর্মেই সংকোচ বোধ করতেন না। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দিতে হত্যাই ছিল তার চিরাচরিত রীতি। নবীর নাতিকে [হযরত হাসান (রা.)] তিনিই বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। একইভাবে ধ্বংস (হত্যা) করা হয় আলী (রা.) এর দুঃসাহসী সেনাপতি মালিক আশতারকে। পুত্র ইয়াজিদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে মুয়াবিয়া কথার খেলাপ করতে দ্বিধা করেন নি। যে অঙ্গীকার করেছিলেন আলী (রা.) এর জীবিত পুত্রের হাসান (রা.) প্রতি। তবু এই ধীর হিসেবী আরব ইসলামের সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন এবং তার পরিবারে সে রাজদন্ড বহাল ছিল প্রায় নব্বই বৎসর ধরে। (এ শর্ট হিস্ট্র অব স্যারাসিনস, সৈয়দ আমীর আলী, পৃ: ৬৯-৭০)

পবিত্র কাবা অবরোধের সময় (৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ) অভিশপ্ত ইয়াজিদ খোদায়ী গজবে নিহত হয়। ইয়াজীদের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মুয়াবিয়া মাত্র কয়েক মাস শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। সে তার পিতার কুকর্মের উত্তরাধিকারী হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় উমাইয়া কুচক্রীরা তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। অতঃপর রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি ভোগকারী যার জাল চিঠি ও অন্যান্য কুকর্মের কারণে হযরত ওসমান (রা.) শাহাদাত বরণ করেছিলেন, যার বিষাক্ত তীরে হযরত তালহা (রা.) শহীদ হন, যার প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় হরত হাসান (রা.) কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় ও পরবর্তীতে তার দাফন মোবারক রাসূল (সা.) এর রওজা পাকের পাশে হওয়ার কথা সত্ত্বেও সেই জানাযার মিছিলে তীর, পাথর বর্ষণ করে, সেই দুরাচার মারোয়ান ইবনে হাকাম ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইয়াজীদের স্ত্রীকে বিয়ে করে মুসলমানের ধর্ম রক্ষাকারী বা আমীরুল মুমেনিন হয়ে ক্ষমতাসীন হয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, কিছু সম্মানিত ব্যতিক্রম বাদ দিলে সকল উমাইয়া শাসকগণ আল্লাহ্, ওহী, কুরআন রেসালত, পরকাল, দোজখ, বেহেশতসহ অধিকাংশ মতবাদ/আকায়েদ বিশ্বাস করত না। বরং তারা এসব বনী হাশেমীয়দের ক্ষমতা গ্রহণের ওসীলা হিসাবে মনে করতো (নাউজুবিল্লাহ)। এ কারণে মদীনার গভর্নর থাকাকালীন ও পরবর্তীতে খলিফা হয়ে রাসূল (সা.) প্রবর্তিত, প্রচারিত ও অনুমোদিত বহু আদেশ-নিষেধ বা বিধি-বিধান যা সে অপছন্দ করত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে সেগুলো পরিবর্তন এবং পরবর্তীতে সে তার নিজস্ব বিধি-বিধান চালু করে। আর মুসলিম উম্মাহর দুভার্গ্য সেগুলো এখন পর্যন্ত ধর্মীয় অনুশাসন হিসাবে পূর্ণ শ্রদ্ধা ও

ঐকান্তিকতাসহ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, রাসূল (সা.) এর রওজা শরিফ মুসলমানদের জন্য অতি পবিত্র ও সম্মানের। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মারওয়ান ও তার পিতাকে তাদের অপরাধের কারণে রাসূল ((সা.) এর নির্দেশে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এ কারণে তারা রাসূল (সা.) ও আহলে বাইতদেরকে অন্তর থেকে অপছন্দ করতো। তাই মারওয়ান, রাসূল (সা.) এর মহব্বত যা ঈমানের ভিত্তি সেই মহান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিল। এ কারণেই মারওয়ান যখন এক ব্যক্তিকে দেখতে পায় যে, তিনি তার মুখমণ্ডল রাসূল (সা.) এর রওজার উপর রেখেছে অর্থাৎ সেজদা বা চুম্বন করছিলেন। মারওয়ান তার গর্দান ধরে বলল : তুমি এ কি কাজ করছ (অর্থাৎ শিরক বা বিদআত)? তখন (যেমন এখনও ওহাবীরা নজদীরা সৌদি আরবে হজের সময় প্রিয় নবীর রওজার দিকে করে জিয়ারত করতে দেয় না)। সেই সাহাবী বললেন, আপনি (মারোয়ন) আমাকে ছেড়ে দিন। (অর্থাৎ আমি কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করিনি)? কেননা আমি আমার মুখ কোন পাথরের উপর রাখিনি বরং রাসূল (সা.) এর রওজা শরীফের উপরই রেখেছি। একথা বলার পর তিনি বললেন, আমি রাসুলে পাক (সা.) কে বলতে শুনেছি। যে, "ঐ সময় তোমরা দ্বীনের (ধর্মের অধঃপতন বা মর্যাদাহানির জন্য দুঃখ কর) জনক্রন্দন কর, যখন দেখতে পাবে অনুপযুক্ত লোক দেশের শাসনকর্তা হয়েছে"। (জজবুল কুলুব জযবুল কুলুব 'ইলা দিয়ারিল মাহবুব' দিযাবল মাহবুব-মুল লেখক মাওলানা শাহ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রা.), অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার, পীর সাহেব বায়তুশ শরিফ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৪৩)

হযরত ওসমান মাযউন (রা.) সর্বপ্রথম মুহাজির যিনি মদীনা শরিফে ইনতেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তার দাফনের পর দেখা গেল একটি পাথর অতিরিক্ত রয়ে গেছে। রাসূল (সা.) স্বহস্তে পাথরখানা সরিয়ে কবরের পশ্চাদপদে পুঁতে দেন। মারওয়ান ইবনে হাকাম মদীনার গভর্নর হিসাবে নিয়োজিত থাকাকালীন হযরত ইবনে মাযউনের (রা.) এর কবরের পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করার পর ঐ পাথরখানা দেখে তা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়। কারণ হিসাবে মারওয়ান বলে যে, আমি তার কবরের উপর এমন কোন নিদর্শন দেখতে চাইনা যা দ্বারা তার বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। গভর্নরের নির্দেশ অনুযায়ী পাথরটি সরানো হলে অনেকেই বলতে লাগলো, যে পাথরখানি স্বয়ং রাসূল (সা.) পুঁতে ছিলেন তা সরানো সঠিক নয়। মারওয়ান তার প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করলো (প্রাগুক্ত) মারওয়ান মুয়াবিয়ার নির্দেশে ইয়াজীদকে খলিফা হিসাবে মনোনয়নের ব্যাপারে মদীনাবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, আমিরুল মুমিনীন (মুয়াবিয়া) তোমাদের জন্য যোগ্য ব্যক্তি সন্ধান করার ব্যাপারে ত্রুটি করেন নি। তিনি নিজ পুত্র ইয়াজিদকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। এটা কোন নতুন কথা নয়। আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.) তাদের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, মারওয়ান, তুমি মিথ্যা বলেছ। আর মিথ্যা বলেছে মুয়াবিয়াও। তোমরা কখনো উম্মতে মুহাম্মদীর কল্যাণের কথা চিন্তা করো নি। তোমরা একে কায়সারতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে চাও। একজন কায়সার মারা গেলে তার পুত্র তার স্থান দখল করে। মারওয়ান বলে, ধরো তাকে। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই কুরআনে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলেছে দুঃখ তোমাদের জন্য (সূরা আহকাফ-১৩)। আব্দুর রহমান ভয়ে হযরত আয়েশা (রা.) এর হুজরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মা আয়েশা (রা.) বলেন, মিথ্যা বলেছে মারওয়ান। আমার খান্দানের কারো প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মারওয়ান ও তার পিতা হাকামের উদ্দেশ্যে এ আয়াত নাযিল হয়। আর এভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার একটি স্বতন্ত্র নীতিতে পরিণত হয়। জুম্মার সালাতের পূর্বে খোতবা দেওয়ার বিদআত মারওয়ানই চালু করে। রাসূল (সা.) সালাত এর পরে খোতবা দিতেন। খলিফাদের আমলেও এই নীতি চালু ছিল। যেহেতু মারওয়ান একজন কুখ্যাত ও অজনপ্রিয় ও জালেম শাসক ছিল। তাই জুমার সালাতের পর তার বক্তৃতা শোনার জন্য মুসল্লীগণ মসজিদে বসে থাকতেন না। তাই মারওয়ান জুমার সালাতের পূর্বে খোতবার বেদআত চালু করে যা মুসলিমরা এখনও অনুসরণ করে। এই মারওয়ান ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্ত্রীর সাথে তার কৃত ওয়াদা ভঙ্গের কারণে স্ত্রীর হাতে নিহত হয়। কুখ্যাত মারওয়ানের মৃত্যুর পর তার পুত্র আব্দুল মালেক মুসলমানদের বাদশাহ্ (৬৮৫-৭০৫) হয়। আব্দুল মালেক আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তার সেনাপতি পৃথিবীর জঘন্যতম ব্যক্তিদের অন্যতম হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে হজ্বের সময় মক্কায় পাঠায়। যাহেলী যুগেও কাফেররা পর্যন্ত এ সময় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতো। হাজ্জাজ আবু কায়েস পাহাড়ে মিনজানিক (তৎকালীন ক্ষেপনাস্ত্র) স্থাপন করে খানায়ে কাবার উপর প্রস্তর/অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে। ফলে সে বৎসর (৬৯১ খ্রিস্টাব্দে) হাজীরা মিনা ও আরাফাতে যেতে পারেনি। এই কুখ্যাত হাজ্জাজ বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) কে মোনাফেকের সর্দার বলত। সে বলতো আমি ইবনে মাসউদকে (রা.) পেলে তার রক্ত দিয়ে মাটির পিপাসা নিবৃত্তি করতাম।

সে ঘোষণা করে কোন ব্যক্তি ইবনে মাসাউদ (রা.) এর কেরআত অনুযায়ী কুরআন পাঠ করলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর কুরআন থেকে তার কেরআত শুকরের হাড্ডি দিয়ে মুছে ফেলতে হলেও তাও আমি করবো। সে সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক, জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ সাহল বিন সা'দ আসসা'দীর মত বুজুর্গ ব্যক্তিগণকে গালি দেয় এবং তাদের ঘাড়ে মোহর অংকিত করে। হযরত ওমর (রা.) এর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) কে হত্যার হুমকি দেয়। সে প্রকাশ্যে বলতো আমি যদি লোকদেরকে এক দরজা দিয়ে বের হবার নির্দেশ দেই আর তারা অন্য দরজা দিয়ে বের হয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করা আমার জন্য বৈধ। তার শাসনামলে বিনা বিচারে আটকে যে সকল ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় বলা হয়ে থাকে তাদের সংখ্যা ছিল ১ লাখ বিশ হাজার আর বিনা বিচারে যারা কারাগারে মৃত্যুর প্রহর গুণছিল তাদের সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। আবু বকর জাসসাস তার তাফসীরে হাজ্জাজ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, শুক্রবার হাজ্জাজ দুপুরের সময় ঘর হতে বের হয়ে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুরু করল। ভাষণ এত দীর্ঘ ছিল যে, মসজিদের মিনারে সূর্যের লাল আভা ব্যতীত আর কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে ছিলনা। হাজ্জাজের নির্দেশক্রমে আজান দেয়া হলো। আমরা তাহার পিছনে সালাত আদায় করিলাম অতঃপর মাগরিবের আযান হলে হাজ্জাজ নামাযের ইমামতি করিল। জামাতে বহু সম্মানিত লোক উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কেহ কিছুই বলতে পারছিলনা। জাসসাস হযরত হাসান বসরীর একটি উক্তি উল্লেখ করিয়া বলেন, হাজ্জাজ মিম্বরে দাঁড়াইয়া আবোল তাবোল কথা আরম্ভ করত আর এদিকে সালাতের ওয়াক্ত শেষ হইয়া যাইত। না সে খোদাকে ভয় করিত, আর না সে খোদার সৃষ্ট জীবকে লজ্জা করিত। উপরে তাহার আল্লাহ্তালা আর নীচে লাখ লাখ লোক তাহার আজ্ঞাবহ। প্রত্যেক ব্যক্তির মাথার উপরে ঝোলানো থাকত খোলা তরবারি। মুখের কথা মুখে থাকতেই মাথা হইতে দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। আব্দুল মালেক ইবনে মারোয়ান এহেন খোদাদ্রোহী গভর্নর সম্পর্কে তার পুত্রদেরকে ওসীয়ত করেছিল, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের প্রতি সব সময় সুনজর দেবে। কারণ সেই তো আমাদের জন্য রাজত্ব কন্টক মুক্ত করেছে। শত্রুদের পরাভূত করেছে। আমাদের বিরোধীদের দমন করেছে।

আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে ফতোয়া জারী করে মদীনায় রাসূল (সা.) এর রওজা জিয়ারত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আব্দুল মালেকের বর্তমান অনুসারীরা এই নিষিদ্ধ করণকে ধর্মীয় নির্দেশ হিসাবে চালু করতে আগ্রহী। এরই ধারাবাহিকতায় তারা দাবি করে যে, রাসূল (সা.) এর মাজার জিয়ারত হজ্বের কোন অংশ নয় ইত্যাদি। অথচ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করিয়া দাও। উহারা তোমার নিকটে আসিবে পদব্রজে, ও সর্ব প্রকার ক্ষীণকায় উষ্ঠের পিঠে, ইহারা আসিবে দূর দূরান্ত পথ অতিক্রম করিয়ে (সুরা হজ্জ-২৭) অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর সাক্ষাত করা হজ্জের অপরিহার্য অংশ। তাছাড়া এই আল্লাহ্-রাসুলের দুশমন মদীনাবাসীদের প্রতি অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা (Economic Blockade) আরোপ করে তাদের জীবন-জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ করে। ফলে মদীনাবাসী এক অমানুষিক নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়। অথচ রাসূল (রা.) এর নির্দেশ হলো মদীনাবাসীদের মর্যাদার সাথে দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করা। এই অবস্থার অবসানকল্পে রাসূল (সা.) এর বয়োবৃদ্ধ সাহাবা হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) মদীনা হতে পায়ে হেঁটে দামেস্ককে গমন করেন। তিনি আব্দুল মালেকের দরবারে বিনীতভাবে আরজ করলেন। "আমিরুল মোমেনীন। মদীনার বর্তমান পরিস্থিতি আপনার নখদর্পণে। উহা পবিত্র শহর। আল্লাহ্র রাসূলের (সা.) দেওয়া নাম। মদীনাবাসীগণ কয়েদীর ন্যায় গৃহকোণে আবদ্ধ। আমিরুল মোমেনীন যদি তাহাদের প্রতি আপনার দয়ার উদ্রেক হয় এবং তাহাদের অধিকার তাহাদের ফিরাইয়া দেন তবে কতইনা ভাল হইত। রাসূল (সা.) এর সাহাবীর মর্যাদা ও মদীনাবাসীদের দুরবস্থা উপলব্ধি করার পরিবর্তে আব্দুল মালেকের বক্ষ দেশে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। চক্ষুদ্বয় ক্রোধে লাল বর্ণ ধারণ করিল। সাহাবী অন্ধ ছিলেন। তাই আব্দুল মালেকের এই পরিবর্তন না দেখিতে পাইয়া বার বার এই দাবি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। আব্দুল মালেক এই সাহাবীর সাথে দুর্ব্যবহার করিতে উদ্যোগী হচ্ছিল। কিন্তু কবীছা নামক তার একজন ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উক্ত সাহাবীর হাত ধরিয়া দরবার হতে বাইরে লইয়া আসিলেন। তিনি অন্ধ উস্তাদকে বলিলেন, হুজুর বনি উমাইয়াগণ তো এখন বাদশাহ্ অর্থাৎ তাহারা তো এখন মুসলমানদের আমীর নাই। তাহারা নিজদিগকে রাসূল (সা.) এর অনুসারী মনে করেন না। তাহারা তো রোম ও পারস্য আধিপতিদের অনুকরণে বাদশাহ্ হইয়া গিয়াছে। কাবিছা আব্দুল মালেকের একজন আস্থাবান সভাসদ ছিলেন। একথা সকলেই জানত, তাই হযরত জাবির (রা.) বললেন, তুমিও তো কিছু বলতে পার। তোমার কথা যে বাদশাহ্ শুনেন। এর উত্তরে কবীছা বললেন, "হযরত, তাহারা শোনে ও এবং শোনেও না। যে কথা তাহাদের ইচ্ছা ও মর্জি মোতাবেক হয় তাহাই শোনে" (ইবনে সাদ, ইমাম হযরত আবু হানিফার (রহঃ) রাজনৈতিক জীবন, পৃ-৪)।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা আব্দুল মালেকের হাতে আসার পর একদিন মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মিম্বরে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিল, "আজ হইতে যদি কেহ আমাকে বলে",

আল্লাহ্‌কে ভয় কর–"এই কথা বলার সাথে সাথেই তাহার দেহ হইতে মাথা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।" এই ইসলামী সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে বাক স্বাধীনতা রুদ্ধ করার প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা হয়। এই কুখ্যাত আব্দুল মালিক তার অতি কুখ্যাত পিতার ওসীয়ত লংঘন করে তার ভাইকে বাদ দিয়ে নিজ পুত্র ওলীদকে খলিফা মনোনীত করে। আব্দুল মালেকের মৃত্যুর পর প্রথম ওলীদ ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের নেতা হয়ে বসে। সে মানুষ হিসাবে কত হিংস্র, প্রতি হিংসা পরায়ন ছিল তা আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের পুত্র যোবায়ের এর সাথে তার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

ওয়ালিদ ইবনে মালিকের নির্দেশে যোবায়েরকে ৫০টি চাবুক মারা হয়। শুধু তাই নয়, কনকনে শীতের মধ্যে তার মাথায় মশক থেকে পানি ঢেলে দেয়া হয়। তারপর সারাদিন তাকে মসজিদে নববীর দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এর ফলে তার মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনায় হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এতদূর মর্মাহত হন যে, পাছে ওলীদের অধীনে গভর্নর হিসাবে এ ধরণের নিষ্ঠুর কাজের জন্য আল্লাহ্‌ তাকে পাকড়াও করেন এই ভয়ে তিনি গভর্নরের পদ থেকে ইস্তফা দেন। ওয়ালীদ নিজের বাহাদুরী ফলাও করার জন্য নির্দেশ দিলো মসজিদে নববীর আশেপাশে যার ঘরই হোক না কেন ক্রয় করে নাও। যে ব্যক্তি ঘর বিক্রয়ে অস্বীকৃতি জানাবে তার ঘর ভেঙ্গে দাও। পয়গম্বর (সা.) এর পবিত্র বিবিগণের হুজরাসমুহ মসজিদে অন্তর্ভুক্ত কর। কথিত আছে- এ ঘটনা যে দিন ঘটেছিল সে দিন মানুষের উপর এক বড় বিপদ নেমে এসেছিল। মদীনায় এমন লোক ছিল না যে, এ ঘটনায় অশ্রু ফেলেনি। ওয়ালীদ মদীনায় এলে মসজিদে খোতবা দেওয়ার সময় মসজিদের সন্নিহিত এলাকায় আহলে বাইতদের উপস্থিতি দেখে অসম্ভব গোস্বা হয়ে বলল, "আমি এদেরকে এখানে দেখতে চাইনা"। সে মদীনার গভর্নরকে নির্দেশ দিল তাদের বাড়ি খরিদ করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করো। এ সময়ে ফাতিমা বিনতে হুসাইন (আ.), হাসান ইবনে আলী (আ.) এর সন্তান সন্ততি ঘরের মধ্যে ছিলেন। তারা তাদের ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ওয়ালীদ নির্দেশ দিল তাঁরা ঘর থেকে বের না হলে তাদের ঘর ভেঙ্গে তাদের উপর চাপিয়ে দাও। ওয়ালীদের বাহিনী আহলে বাইতগণের অনুমতি না নিয়েই আসবাবপত্র ঘর থেকে বের করতে আরম্ভ করে। এভাবে মহান নবী পরিবারের সদস্যগণকে নিজ গৃহ থেকে উচ্ছেদ করা হলো। এই অসূর্যস্পর্শা মহিলাদেরকে বেলা দুপুরে ঘর হতে বের হতে বাধ্য করা হয়। উম্মুল মুমেনিন হযরত হাফসা (রা.) এর ঘর সম্পর্কে এ ধরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘরের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) এর সন্তানগণ বসবাস করতেন। তারা বলেন আমরা এ ঘর ছেড়ে চলে যাবনা এবং রাসূল (সা.) এর ঘরের বিনিময়ে কোন অর্থ গ্রহণ করব না। তখন ওয়ালীদের গভর্নর খোদাদ্রোহী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফও মদীনায় অবস্থান করছিল। সে নির্দেশ দেয় ঘর তাদের মাথার উপর ভেঙ্গে চাপিয়ে দাও।

আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সা.) এর নির্দেশ অমান্য করে জনগণকে ধোকা দেওয়ার জন্য মসজিদে নববীর বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও বর্ধিত করণের কাজ শুরু করা হয়। তাই রোম সম্রাটের কারিগরী সহায়তায় মসজিদের সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। বর্ণিত আছে রোম দেশীয় মজুরদের মধ্যে একজন লোক রাসূল (সা.) এর হুজুরা শরিফের মধ্যে প্রস্রাব করার ইচ্ছা করিলে সাথে সাথে সে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে যায় এবং তার মস্তক চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়। আর একজন মসজিদের কেবলার দেয়ালে শুকরের চিত্র অংকন করে। (নাউজি বিল্লাহ) পুনঃনির্মিত মসজিদের কাজ শেষ হলে ওলীদ তা দেখতে আসে এবং তা দেখে খুব খুশি হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে, মসজিদ ঘুরে ফিরে দেখার এ পর্যায়ে ওয়ালীদের সাথে হযরত ওসমান (রা.) এর কোন পুত্রের সাথে দেখা হলে ওয়ালীদ বলে দেখ। তোমার পিতার ইমারত কেমন ছিল আর আমার ইমারত কেমন? উত্তরে ওসমান (রা.) এর পুত্র বলেন, "আমার পিতার তৈরি ইমারত ছিল মসজিদ আর আপনার তৈরি ইমারত তো গীর্জা।" এই ইমারতের মধ্যে চার কোণায় চারটি মিনার নির্মিত হয়। উল্লেখ্য, ওয়ালীদের পূর্বে মসজিদে মিনার নির্মাণের কোন রীতি ছিল না। এই ওয়ালীদের আমলেই মসজিদে জানাযার নামায পড়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। (জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারুল মাহবুব-আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী, প্রথম খণ্ড, পৃ-১২১)। এই ওয়ালীদী সুন্নত অদ্যাবিধি মুসলিম সমাজে চালু আছে। বসে বসে জুমার প্রথম খুতবা দেওয়ার রীতিও তখন থেকে চালু হয়। ওয়ালীদের জুলুম নির্যাতন এতদূর পৌঁছে যে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহঃ) একদা চিৎকার করে বলে উঠেন, ইরাকে হাজ্জাজ, সিরিয়ায় ওয়ালীদ, মিশরে কুবরা ইবনে শরিক, মদীনায় ওসমান ইবনে হাইয়ান এবং মক্কায় খালেদ ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ আল বসরী, হে আল্লাহ্‌ তোমার পৃথিবী জুলুমে ছেয়ে গেছে। এবার জনগণকে শান্তি দাও, মুক্তি দাও।" ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়ালীদের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা সুলাইমান মুসলমানদের রাজা হয়। সুলাইমান খলিফা হয়ে কুতায়বা এবং কুখ্যাত হাজ্জাজের আত্মীয় স্বজনকে ধ্বংস করেন। স্পেন বিজয়ী মুসা ইবনে নুসওহর, বীর তারিক, সিন্দু বিজয়ী বীর মোহাম্মদ বিন কাসিম প্রভৃতি যে সকল সেনাপতির কৃতিত্ব মুসলিম জাতির গৌরব হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই ঘাতক খলিফা তাদের সকলকে নিশ্চিহ্ন করেছিল। সুলাইমান ৭১৭ খৃস্টাব্দে পরলোক গমন করে। সে নিজ পুত্রকে উত্তরাধিকারী হিসাবে

মনোনীত করে। কিন্তু সে পুত্র তার পূর্বে মারা যাওয়ায় সে অপর নাবালিক পুত্রকে মনোনয়ন দানের চেষ্টা করে। কিন্তু সভাসদগণের অনেকের সুপরামর্শে মত পরিবর্তন করে তার চাচাত ভাই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ও তারপর নিজ ভ্রাতা দ্বিতীয় ইয়াজীদকে উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনয়ন করে।

ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা পদে বরিত হন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ন শাসক ছিলেন। এ কারণে তাঁকে খেলাফতে রাশেদার পঞ্চম খলিফা হিসাবে কৃতিত্ব প্রদান করা হয়। মুয়াবিয়া হতে শুরু করে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত রাজনীতিতে ছিল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও কূটকৌশল, প্রথম মুয়াবিয়া প্রতি মসজিদে জুমার দিন খুতবায় হযরত আলী ও তাঁর বংশের প্রতি অভিসম্পাতের প্রথা চালু করে। এতদিন যাবত এই জঘন্য ধর্ম বিরোধী প্রথা বাধ্যতামূলকভাবে চালু ছিল। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এই কুপ্রথা রহিত করেন এবং খুতবায় গালাগালের স্থলে পবিত্র কুরআনের সুরা নহলের এর ৯০ নম্বর আয়াত "ইন্নাল্লাহা ইয়া মুরুব্বি আদলে ওয়াল এইসান ওয়ায়ি তাইজুল কুরবা ওয়া ইয়ানহাঈ আনিল ফাহশায়ি ওয়াল মুনকার, ওয়ালাবাগিই-ইকুম-লা আল্লাকুম, তাজাককারুন। অর্থ: আল্লাহ্ ন্যায়পরায়নতা, সদাচরন ও আত্মীয় স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। অদ্যাবধি তাঁর প্রবর্তিত এই প্রথা মুসলিম সমাজে চালু আছে। আল্লাহ্তালা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে পুরস্কৃত করুন। আমিন!

ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আহলে বাইতদের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া অধিকার সম্পূর্ণ পুনর্বহাল করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। উল্লেখ যে, ওসমান (রা.) এর ওফাতের পর উমাইয়া শাসক বাদশাহগণ আহলে বাইতদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও নিপীড়ন করতে থাকে। অথচ এরাই আল্লাহ্ ও রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যাকারী ও সংরক্ষক (Custodian and Defender) বিধায় সবচেয়ে বেশি মান্যবর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। অথচ এদেরকে কোন সরকারী চাকুরী প্রদান না করার প্রথা অব্যাহত থাকে। রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার থেকে প্রদত্ত নাগরিক সুবিধাদি প্রদান থেকে এদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়। বিশেষ করে তথাকথিত খলিফা আব্দুল মালেক (৬৮৫-৭০৫ ওলীদ ৭০৫-৭১৫ খ্রিস্টাব্দ) ও সুলাইমানের (৭১৫-৭১৭ খ্রিস্টাব্দ) হাশেমী বংশের লোকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ ও অবর্ণনীয়। রাসূল (সা.) কর্তৃক হযরত ফাতিমা (আ.) কে প্রদত্ত "বাগে ফিদক" কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যাজনিত জটিলতার কারণে রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়। পরবর্তীতে উমাইয়াগণ তা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ভোগ দখল করতে থাকে।

ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহঃ) এই 'বাগে ফিদক' আহলে বাইতদের মহান উত্তরাধিকারীগণকে ফেরত প্রদান করেন এবং তাদেরকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, "আমি বাঁচিয়া থাকলে আপনাদের সব অধিকারই পুরাপুরি আদায় করিয়া দিব।" কিন্তু উমাইয়া কুচক্রীগণ এই মহান রাষ্ট্রনায়ককে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করে। তিনি ৭২০ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। সাধারণভাবে ধারণা করা হয়ে যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের পর মুসলিম শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। শাসকগণ অধিকতর প্রজারঞ্জনও জনকল্যাণমূলক কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তা ছিল না। কারণ ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ইয়াজিদ (৭২০-৭২৪ খ্রি:) খলিফা হন। সিংহাসনে আরোহন করে তিনি যে ফরমান বা অধ্যাদেশ জারি করেন তার সারাংশ হলো : অতঃপর প্রকাশ থেকে যে, "ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ গোমরাহিতে (পথভ্রষ্ট তথা ইসলামের পথ পরিত্যাগকারী) পতিত হয়েছিলেন তোমরা এবং তোমাদের সাথীগণ তাহাকে ধোঁকায় নিপতিত করিয়াছিল। আমার এই ফরমান তোমাদের নিকট পৌঁছার এক মুহূর্তের মধ্যে ঐ সমস্ত কাজ পরিত্যাগ কর। যাহা ওমরের শাসনকালে পালন করতে। দেশের অবস্থা যা হোক কিংবা অভাব অনটন থাকুক লোকে পছন্দ করুক কিংবা বাঁচুক বা মরুক- লোকদিগকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আন।" (ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) রাজনৈতিক জীবন, লেখক মান্যযির আহসান গিলানী, পৃ-১২)। অর্থাৎ উমাইয়া শাসকদের বিবেচনায় হযরত আলী (আ.) ধর্ম ত্যাগী, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ধর্মভ্রষ্ট। তাহলে তাদের ধর্ম কি? তারা কোন বিবেচনায় ইসলাম ধর্মের ধারক ও বাহক হতে পারে সেটাই গবেষণার বিষয়। তাই বিনা দ্বিধায় বলা হয় যে, তারা ইয়াজীদী ইসলামের পদাংক অনুসরণ করেন। তারা সকলেই নবুওতের, ইমামতের, বেলায়েতের পথ পরিত্যাগ করে খোদাদ্রোহী, জাহেলী যুগের পিতৃ পুরুষগণের পদাংক অনুসরণ করেছেন। তারা অনারব বাদশাহদের নীতি মুতাবিক রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করিতেন। দ্বিতীয় ইয়াজিদ তার নাচনেয়ালী সাল্লামাহও হাররাহ সাথে মৌজ করিয়া পানাবস্থায় আঙ্গুর ছুড়িয়া হারবার শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে। এটাও কথিত আছে যে, সাল্লামার মৃত দেহের উপরও দ্বিতীয় ইয়াজিদ পাশবিক অত্যাচার করে। দ্বিতীয় ইয়াজীদ নিজ পুত্র দ্বিতীয় ওয়ালীদকে সরাসরি মনোয়ন দানের ব্যর্থ চেষ্টা করে। পরে ভ্রাতা হিশাম ও তার ১১ বৎসর বয়স্ক পুত্র দ্বিতীয় ওয়ালীদকে মনোননয়ন দান করে। ৭২৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ইয়াজীদের মৃত্যুর পর হিশাম সিংহাসনে

আরোহন করে। সেও পূর্ববর্তী মনোনয়ন বাতিল করে নিজ পুত্রকে মনোনয়ন দানের চেষ্টা করে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয় নি। হিশাম ঘোড়দৌড়ের জুয়া (বাজি ধরা) প্রবর্তন করার জন্য তাকে কুখ্যাত হিশাম বলা হয়। তার আস্তাবলে ৪ হাজার বেসের ঘোড়া ছিল। হিশাম রাষ্ট্রের তিন ভাগের এক অংশ ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিল। রাসূল (সা.) এর খলিফা হিসাবে দাবিদার এই হিশাম সাধারণ সফরে নয় বরং হজ্জের সফরেও দেখা গিয়াছিল–ছয়শত উটের বোঝা ছিল তার পোশাক।" (ইকদুল ফরিদ, পৃ-৩৬৬, ১ম জিলদ)

৭৪৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কিন্নিসরিণ (প্রাচীন ক্যালসিস) জেলার রুসাকায় হিশামের মৃত্যু হয় এবং তার স্থলাভিষিক্ত হয় তার ভাইপো দ্বিতীয় ওয়ালীদ। হিশামের মৃত্যুকালীন সময়ে দ্বিতীয় ওয়ালীদ জর্ডান (উরদুন) জেলার আররাক নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি দ্রুত হাজির হন দামাসকাসে এবং রাজপ্রসাদে থেকে হিশামের পরিবারবর্গকে বিতাড়িত করে রাজত্ব শুরু করেন। প্রথম ওয়ালীদ ও হিশামের পুত্রদেরকে উৎপীড়ন করায় তার প্রতি জনসাধারণ গভীরভাবে ঘৃণা পোষণ করতে থাকে। সে মদের ঢোক গিলবার সুবিধার্থে মদের ডোরায় সাঁতার কাটত। সে ছিল অকর্মন্য, মদ্যপ, নিষ্ঠুর বিলাসী, আত্মকেন্দ্রিক ও আরামপ্রিয় শাসক। তার খামখেয়ালীপনা ও অযোগ্যতার সুযোগে আব্দুল আজিজের তৃতীয় পুত্র তৃতীয় ইয়াজীদ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সসৈন্য দামেস্কে প্রবেশ করে ওয়ালীদকে পরাজিত ও নিহত করে। নিহত ওয়ালীদের হস্তপদাদি বিচ্ছিন্ন করা হয়। তৃতীয় ইয়াজীদ তার ভ্রাতা ইবরাহীমকে মনোনয়ন দান করে পরলোক গমন করে। (৭৪৪ খ্রি:) ইবরাহীমকে কেউ খলিফা হিসাবে স্বীকার করেনি। প্রথম মারওয়অনের দৌহিত্র দ্বিতীয় মারওয়ান আর্মেনিয়া হতে সসৈন্য রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হয়। সে ইবরাহীমকে পরাজিত করে রাজধানী অধিকার করে। পরাজিত ইব্রাহিম দামেস্কের সরকারী ধন ভাণ্ডার লুট করে এবং দ্বিতীয় ওয়ালীদের মনোনীত দুই পুত্র হাকাম ও ওসমানকে হত্যা করে পালাসিরায় পালিয়ে যায়। মারওয়ান বিজয়ীর বেশে দামেস্কে প্রবেশ করে এবং খলিফা হিসাবে শপথ গ্রহণ করে। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয়াদের হাতে দ্বিতীয় মারওয়ান পরাজিত ও নিহত হয়ে ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উমাইয়া খলিফাদের ক্ষমতা গ্রহণের আইনগত ভিত্তি

উমাইয়া শাসকদের ক্ষমতা গ্রহণের আইনী ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও রাসল (সা.) এর নির্দেশের আলোকে বৈধতা ঘোষণার কোন অবকাশ নাই। বরং ধোকাবাজি, মিথ্যাচার, ঘুষ, প্রতারণা, জুলুম ও অবৈধ হত্যার মাধ্যমেই মুয়াবিয়ার ক্ষমতা দখল ছিল সর্বজন বিদিত। অষ্টম হিজরীর প্রথম দিকে সিরিয়ার রোমান বাহিনীকে আক্রমনের জন্য রাসূল (সা.) সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করলেন। যায়েদ বিন হারেসাকে (রা.) সেনাপতি নিয়োগ করে বললেন : যায়েদ (রা.) আহত বা নিহত হলে আমীর বা নেতা হবেন জাফর বিন আবি তালিব (রা.) এবং তিনি নিহত বা আহত হলে আবদুল্লা রাওয়াহা হবেন তাদের নেতা তিনি নিহত হলে মুসলমানরা নিজেদের মধ্য হতে একজনকে আমীর নির্বাচন করবে। এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা.) তার উম্মতের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কতখানি দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন এবং এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, প্রিয় নবী (সা.) গায়েবের তথা অদৃশ্যে সংবাদ জানতেন। কেননা পরবর্তীতে তিন জনই শহীদ হয়েছিলেন। অথচ বর্তমানে বলা হচ্ছে তিনি তার ওফাতের পর কোন উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন নি এবং নবী করীম (সা.) নাকি গায়েব জানেন না নাউযুবিল্লাহ্। এই জঘণ্য মিথ্যাচার, ইসলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর মহান রাসূল (সা.) এর প্রতি জুলুম যা আল্লাহ্ ও তার রাসুলের শত্রুগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত। কারণ এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা গেলে ইসলাম ধর্ম যে একটি অপূর্ণাংগ তথা একটি ত্রুটিহীন ধর্ম নয় তা প্রমাণ করা সহজ হয় এবং অবৈধ ক্ষমতা দখলদারদের রাস্তা সহজ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, উমাইয়াা বংশের প্রতিষ্ঠাতা নিজেই আল্লাহ্ রাসুলের নির্দেশ লংঘন করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অধৈভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন তাই তার এবং তার পরবর্তী মনোনয়ন সবই সঠিক ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ। তাছাড়া উমাইয়া শাসকগণ নিজেদের পরিবার ব্যতীত অন্য কোন পরিবার থেকে তাদের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন না করায় একথাই প্রমাণ করে যে, তারা গ্রীক, রোম ও পারস্যের সম্রাটের ন্যায় ইসলাম ধর্ম ও সাম্রাজ্যকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করতেন। উমাইয়া বাদশাহদের ক্ষমতাসীন হওয়ার আইনগত ভিত্তি ও বৈধতা সম্পর্কে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রা.) এর সাথে এক খারেজীর প্রশ্নোত্তর পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

একজন প্রশ্ন করে যে, ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি কি এটা সহ্য করতে পারে যে, তার উত্তরাধিারী হবে একজন জালেম। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রা.) না সূচক জবাব দিলে সে পুনরায় প্রশ্ন করে আপনি (ওমর) আপনার অবর্তমানে ইয়াজীদ (দ্বিতীয়) ইবনে আব্দুল মালিকের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন। অথচ আপনি জানেন যে, সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। তিনি জবাব দেন আমার পূর্বসুরী সুলাইমান তার স্বপক্ষে পূর্বেই বায়াত গ্রহণ করেছে। এখন আমি আর কি করতে পারি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুসায়ী ওসীয়ত করা একটি আবশ্যকীয়

দায়িত্ব। বিশেষ করে ধর্মীয় নেতা বা রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্‌র নির্দেশে রাসূল (সা.) বিভিন্নভাবে ও স্থানে বিশেষ করে গাদীর খুমের জনসভায় তিনি হযরত আলী (আ.) ও মহান আহলে বাইত (আ.) গণকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেছিলেন। এই নিয়ম অনুসরণ করেই প্রায় সকল মুসলিম শাসক জীবিত অবস্থায় প্রজাদের আনুগত্যের আনুষ্ঠানিকতা চালু করেছিলেন। ইতিহাসে আমরা এটাই দেখতে পাই। অথচ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একটি দল বলে থাকেন রাসূল (সা.) আল্লাহ্ প্রদত্ত তাঁর এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন নি। কি অদ্ভুত তাদের বিচারবুদ্ধি।

ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয়। যে ব্যক্তি ইয়াজীদ ইবনে আব্দুল মালেককে আপনার পর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছে। আপনি কি মনে করেন তার এমন করার অধিকার ছিল? আপনি তার এ সিদ্ধান্তকে ন্যায় সঙ্গত বলে মনে করেন? এ প্রশ্নে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ লা জবাব হয়ে যান এবং বলতে থাকেন ইয়াজীদের মনোনয়নের ব্যাপারটি আমাকে শেষ করে দিয়েছে। আমার কাছে এ যুক্তির কোন জবাব নাই। কারণ সুলাইমানের এ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার স্বীকার করা হলে খোদাদ্রোহী বা জালেম লোকের ক্ষমতাসীন হওয়া আইনের দৃষ্টিতে বৈধ হয়ে যাবে। (সুরা বাকারার ১২৪ নম্বর আয়াতের মর্মানুযায়ী তা জায়েজ নয়)। পক্ষান্তরে এ ধরণের মনোনয়ন অবৈধ হলে স্বয়ং ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (আ.) এর নিয়োগ বা মনোনয়ন ও অবৈধ হয়ে যায়।

উমাইয়া শাসকদের বিচার ব্যবস্থা

আইনের শাসন বলতে সাধারণভাবে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আপন-পর, দোস্ত-দুশমনের পার্থক্য না করাকেই বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু উমাইয়াদের শাসনামলে আইন-কানুন ব্যাখ্যায় এই সমস্ত তথাকথিত আমিরুল মোমেনীন বা তাদের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বা একচেটিয়া অধিকার হিসাবে বিবেচিত ছিল।

মদীনার খিলাফত দামেস্কে স্থানান্তির হওয়ার পর বিচার বিভাগের গুরুত্ব এতই দেওয়া হয়েছিল যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে তাদের ইচ্ছামত কাজী নিয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। অল্পদিন পরে এর কুফল দেখা দেয়। মারওয়ানের শাসনকালে সে মিশর গমন করে। মিশরে পৌঁছে সে তথাকার কাজীকে ডাকিয়া পাঠায়। কাজীর নাম আবেস। কাযী আবেসের লেখা পড়ার দৌঁড় কতটা সে সম্বন্ধে 'আল মুহাযিরা' নামক ইতিহাসে লেখা আছে–কাজী আবেস লিখিতে-পড়িতে জানিত না। মারওয়ান কাজীকে জিজ্ঞাসা করিলো–তুমি কুরআন পাঠ করিয়াছি? কাজী-না–মারওয়ান–মিরাস সম্বন্ধে তোমার পরিপক্ক জ্ঞান আছে? কাজী-না। এই উত্তরে মারওয়ানের মত কুচক্রী লোক ও হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন-তবে তুমি কোন বুদ্ধি দ্বারা বিবাদ মীমাংসা কর? বেচারা আবেস এই কথার উত্তর আর কি দিতে পারিত–সে চুপ করিয়া রহিল।

কাজী আবেসের নিয়োগ সম্বন্ধে লিখিত আছে–মুয়াবিয়া মিসরের শাসনকর্তা মাসলামাকে আদেশ করিলেন– লোকের নিকট হতে ইয়াযীদের জন্য আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ কর। নির্দেশ মত মাসলামা কাজ আরম্ভ করিলেন। কেহই উহাতে বাধা দিল না। কিন্তু মিশর বিজয়ী মুয়াবিয়ার প্রধান উপদেষ্টা আমর ইবনে আসের পুত্র আব্দুল্লাহ্ জ্ঞান বৃদ্ধিমত্তায় এবং আখলাক চরিত্রে পিতার চাইতে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। তিনি ইয়াযীদের বায়আত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ইহাতে মাসলামা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রচার করলেন–আব্দুল্লাকে সোজা (তাদের মতে এটাই সঠিক পথ) পথে কে আনিতে পারিবে? কথিত আছে আবেস ইবনে সাঈদ দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল 'আমি এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম', অতঃপর সে রক্ষী বাহিনী লইয়া হযরত আব্দুল্লাহ্‌র বাড়ি ঘেরাও করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন ইয়াযীদের বায়আত সম্পর্কে এখন আপনার অভিমত কি? আব্দুল্লাহ্ পূর্ববত অস্বীকার করিলেন।

আবেস তখন তাহার বাড়ির চারিদিকে কাঠ জমা করিল। উদ্দেশ্য বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া। নিতান্ত বাধ্য হয়ে হযরত আব্দুল্লাহ আবেসের সামনে আসিলেন এবং সে যাহা বলিতে বলে-হযরত আব্দুল্লাহ তাহা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

এই 'মহান রাজকার্য সুসম্পন্ন' করার জন্য আবেসকে কাজীর পদে বহাল করা হয়েছিল। কুরআন-হাদিসে অজ্ঞ আবেসকে প্রজা সাধারণের জান-মালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করতে উমাইয়া শাসকগণ কোন দ্বিধা করে নাই। এটিকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করে আত্ম প্রসাদের কোন অবকাশ নাই। কারণ উমাইয়া আমলে কাযী নিয়োগের ব্যাপারে এমন অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলংকিত হয়ে রয়েছে।

এ সমস্ত কাযী যারা নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, পরহেজগারী এবং সাধুতার ভিত্তির উপর নয় বরং শাসনকর্তাদের দয়ার উপর বহাল থাকিত তারা নিজেরা যা কিছু করত তা সহজেই বোঝা যায়। তদুপরি শাসনকর্তাদের চাপে পড়ে যে কত কি করত তা বলে শেষ করা যাবে না। দুর্ভাগ্যবশত কোন কাজী যদি নিজের ইচ্ছামত কিছু করতে উদ্যত হতো তার আর উপায় ছিল না। সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে তালহা ইবনে হবস মক্কার কাযী ছিলেন। তখন মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন খালিদ ইবনে

আবদুল্লাহিল কুরা। দুইজন লোকের মধ্যে এক টুকরা জমি নিয়ে বিবাদ বাধে। কাজী সাহেব এক দলের পক্ষে যার নাম ছিল আযাম রায় ছিলেন।

দ্বিতীয় পক্ষ শাসনকর্তা খালিদের দরবারী লোক ছিল। তাহারা তখনই মদীনায় পৌঁছিয়া খালিদের কাছে কাযীর নামে অভিযোগ করিল। খালিদ কাযীর রায়ের বিপরীতে পাল্টা হুকুম দিলেন। এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে খলিফা সুলায়মানের দরবারে একখানা পত্র লিখিয়া নিজের পুত্র মুহাম্মদকে পাঠাইয়া দিলেন। সুলায়মান তখনই এক নির্দেশনামা লিখে কাজী সাহেবের পুত্র মুহাম্মদকেই খালিদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, খালিদকে বলিও সে যেন আযমের ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে। মুহাম্মদ খালিদের দরবারে পৌঁছিয়া খলিফার কথা বলিতেই খালিদ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং খলিফার পত্র পাঠ না করেই জল্লাদকে আদেশ করলেন ইহাকে একশত চাবুক মার। কাযী তালহা পুত্রের রক্তাক্ত মৃতদেহ ও জামা কাপড় খলিফার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উহা দেখিয়া খলিফার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আদেশ করিলেন, খালিদের হাত কাটিয়া ফেলা হোক। কিছু সংখ্যক দরবারী আমীরের সুপারিশে ঘটনার সেখানেই সমাপ্ত ঘটিল। (ইকদুল ফরিদ-পৃষ্ঠা ২৬০, ২য় জিলাদ) প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা সুয়ুতী) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হুসনুল মুহানিয়া' নামক গ্রন্থে বলা হয় যে, উমাইয়াদের সময়কার কাযী খায়র ইবনে নযীমের ঘটনায় লিখিয়াছেন–একজন সিপাহী কোন ব্যক্তিকে গালি দিয়াছিল। সেই ব্যক্তি কাযী খায়েরের এজলাসে মামলা দায়ের করিল এবং ঘটনা প্রমাণের জন্য মাত্র একজন সাক্ষী পেশ করল। কাজী সাহেব দ্বিতীয় সাক্ষী পেশ না করা পর্যন্ত আসামীকে হাজতে রাখার নির্দেশ দিলেন। মিসরের শাসনকর্তা আবু আত্তন আব্দুল মালিক ইবনে ইয়াযিদ নিজস্ব লোক পাঠাইয়া সিপাহীকে হাজতখানা হতে বের করে আনলেন। কাজী সাহেব এক সংবাদ জানতে পেরে কাজীর পদ হতে ইস্তফা দিলেন। আবু আত্তন কাজী সাহেবের নিকট (হয়ত ক্ষমা প্রার্থনা করে) লোক পাঠাইলেন। কাযী সাহেব উত্তর দিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আসামীকে পুনরায় হাজতে প্রেরণা না করা হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাজীর দায়িত্ব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজী সাহেব তার কথায় অটল রহিলেন। (তথ্যসূত্র : ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) রাজনৈতিক জীবন, লেখক মানাজির আহসান গিলানী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০)

উমাইয়াদের ধর্মীয় বিশ্বাস

পবিত্র কুরআনের মর্মানুযায়ী আল্লাহ্ প্রেমই ইমান তথা ইবাদতের ভিত্তি। আল্লাহ্র বিশ্ব পরিচালনার নীতি অনুযায়ী আল্লাহ্র খলিফা হিসাবে মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র পরম প্রিয় নবী রাসূল। তাই আল্লাহ্কে ভালবাসতে হলে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) কে ভালবাসা ও তাঁকে অনুসরণ করা আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী ফরজে আইন অর্থাৎ যা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অবশ্য করণীয় বা বাধ্যতামূলক তথা ঈমানের দাবি। আর রাসূল (সা.) কে ভালবাসতে হলে তাঁর আহলে বাইত হিসাবে হযরত আলী (আ.), ফাতেমা (আ.), হযরত ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাদের বংশধরদের ভালবাসা ও তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করা আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী ফরজ বা বাধ্যতামূলক। হযরত আলীকে (আ.) যিনি জ্ঞান নগরীর দ্বার। রাসূল (সা.) এর ভ্রাতা, জামাতা, তার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিসিক্ত। উমাইয়া শাসকগণ সেই মহান রাসূল (সা.) এর ওসী তথা একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে একজন সাধারণ ইমানদার ব্যক্তি হিসাবেও স্বীকার না করে বরং তাঁকে ও আহলে বাইতদের গালি দেওয়া তাদের রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ধর্মীয় নেতৃত্বের যারা ঐশী নির্দেশ অনুযায়ী প্রকৃত মালিক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত এই আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশ বা কনসেপ্ট ধর্মীয়ভাবে অস্বীকার করা যা ইসলাম ধর্ম-রাজনীতিতে (Religo Political) একটি ধর্মীয় বিধান হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। ফলে ইসলাম ধর্মে কোন কেন্দ্রিয় নেতৃত্বের মান্যতা বা অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে এই ধর্মে একাধিক মত ও পথ একটি স্থায়ী ধর্ম-রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

আল্লাহ্ ও রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, মান্যতা ও আনুগত্য তথা অনুসরণের বিপরীতে বল প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের আনুগত্য ও মান্যতা ফরজ ঘোষণা করা হয়। তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ যতই অশালীন, অমানবিক, নীতি ও ধর্ম বর্জিত হোক না কেন তাদের বিরুদ্ধে টু শব্দ করার সকল প্রকার ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে জনগণকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হয় যা আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় শ্বেত সন্ত্রাস তথা ত্রাসের রাজত্ব (Reign of Terror) কায়েম করা হয়। আবার এই ধরণের রাষ্ট্র নায়কদের মান্যতা ও অনুসরণ ধর্মীয়ভাবে নিষ্কণ্টক ও সাবলীল করার লক্ষ্যে একদল সরকারী দালাল ফকীহ্ নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। ইয়াজীদ ইবনে মালিকের শাসনামলে চল্লিশজন ফকিহ্ সাক্ষ্য দিলেন: চল্লিশজন শায়খ আসিলেন ও সাক্ষী দিলেন যে, কেয়ামতের দিন খলিফাদের নিকট কোন প্রকার হিসাব গ্রহণ করা হইবেনা এবং

তাহাদের কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে না। (ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর রাজনেতিক জীবন মানাযিব আহসান গিলানী, পৃ-৩৫, তারিখে আল ইয়াফী ২২৪ পৃষ্ঠা) এটা সর্বজনবিদিত আল্লাহ্ ও রাসুলের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নির্দেশ ও মদীনায় উপস্থিত সাহাবাদের সম্মতিক্রমে মসজিদে নববীতে সর্বজনীন মতামতের তথা গণভোটে হযরত আলী (আ.) ইসলামের খলিফা হিসাবে নিয়োজিত হন। অথচ মুসলমান জাতির দুর্ভাগ্য এই মহান খলিফার বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্ম অবলম্বনকারী অনেক বুজুর্গ ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, সর্বপ্রথম হযরত জুবায়ের (রা.) তালহা (রা.) ও মা আয়েশা (রা.) অস্ত্র ধারণ করেন, অতঃপর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এরপর খারেজীগণ যারা এতই আপাত দৃষ্টিতে নামায রোজায় এতই তৎপর ছিল যে তারা দিনের বেলা রোজা রাখত আর রাত্রি বেলা নামাযে ব্যস্ত থাকত। এই তিনটি যুদ্ধে যে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে যা আজ পর্যন্ত পূরণ হয় নাই। ইসলামী খিলাফতের চিরস্থায়ী অবসানের মূল কারণ এই যুদ্ধের মধ্যেই নিহিত এবং এই তিনটি যুদ্ধ পৃথিবীর যে কোন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গীকে অন্যায় যুদ্ধ, অনৈতিক কাজ রাষ্ট্রদোহিতা ও বিশেষ করে রাসূল (সঃ) এই হাদিস অনুযায়ী আলী (রা.) হলো ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর যে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।" এই হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রকার মতবিরোধ না থাকা সত্ত্বেও এক ধরণের ফকীহ্ ফতোয়া দিলেন এই সব যুদ্ধকে অন্যায় যুদ্ধ বলা যাবে না বরং তা ছিল ভুল বুঝাবুঝি। যারা কেন্দ্রিয় খিলাফতের আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (আ.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের মত একটি ভয়াবহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ফলে এই তিনটি যুদ্ধে সেই সময়ে রাসুলের (সা.) সাহাবাসহ এক লক্ষের অধিক লোক মারা যায়। এত বড় ঘটনাকে 'ভুল বুঝাবুঝি' বলা সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া ফকিহ্দের পক্ষ থেকে আরও বলা হয় যে, উভয় পক্ষই সওয়াবের অধিকারী হবে। আবার এই ঘটনায় কোন দোষী পক্ষ নাই। সবাই নির্দোষ। এটা যে একটি সামরিক নির্দেশ তথা রাজকীয় সনদ (Royal Decree) কোন ধর্মীয় নির্দেশনা নয় তা সহজেই বোঝা যায়। সেই সময়কার ফকিহদের মতামত যে ধর্মনিষ্ঠ ছিল না তা ৪০জন ফকিহর খলিফা সম্পর্কিত রায় তথা ফতোয়ার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। যা হোক, ধর্ম রাজনীতিতে এই ব্যাপক মতবিরোধ ও বিতর্ক এটাই প্রমাণ করে যে রাসূল (সা.) মদীনায় যে ধর্ম ভিত্তিক ঐশী রাষ্ট্র (Theocracy) প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম রাজনীতিতে এক মহা বিপ্লব সাধন করেছিলেন তা ইসলামী রাজনীতি থেকে চির বিদায় নেয়। এই ধরণের অপরাজনীতি সম্পর্কে কুরআনিক বর্ণনা": তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে। আল্লাহ্ ইহাদিগকেই লানত করেন আর করেন বধিরও দৃষ্টি শক্তিহীন। তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদের অন্তর তালাবদ্ধ? যাহারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হইবার পর উহা পরিত্যাগ করে, শয়তান উহাদের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় এবং উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহা যাহারা অপছন্দ করে তাহাদিগকে উহারা বলে, "আমরা কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করিব। আল্লাহ্ উহাদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে অবগত আছেন। ফিরিশতারা যখন উহাদের মুখ মণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে। তখন উহাদের দশা কেমন হইবে। উহা এই জন্য যে, উহারা তাহার অনুসরণ করে। যাহা আল্লাহ্র অসন্তোষ জন্মায় এবং তাহার সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি ইহাদের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দেন" (সূরা মুহাম্মদ : ২২-২৮)।

মহান আল্লাহ্তালার ঘোষণায় শয়তান উহাদের কাজকে শোভন করিয়া দেখায়। তা সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যই সাধারণ ঐতিহাসিক ও তথাকথিত বুজুর্গগণ উমাইয়া রাজাদের সম্পর্কে প্রকৃত সত্য কথা না বলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি, প্রশাসনিক যোগ্যতা, দক্ষতা, সামরিক বিজয় ও অঢেল ধন সম্পদ এর মালিকানা প্রভৃতি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা ও গর্ব করে থাকেন। অথচ তারা যে প্রকৃত ইসলাম নয় বরং এজীদী ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন একথা কেহই বলেন নাই বা লিখেন নাই। যা হোক, পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারার ৩৮ নম্বর আয়াত: "আমি বলিলাম, তোমরা সকলেই এই স্থান হইতে নামিয়া যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎ পথের কোন নির্দেশ আসিবে (নবী-রাসুলের প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত) তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করিবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।" এই আয়াতের মর্মানুযায়ী নবী-রাসলের শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া-যা কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। তাই নবী-রাসুলের পরিবর্তে এ কার্যধারা ইমাম 'উলিল আমর: হাদী, ওলী-মুর্শিদ ইত্যাদি পদবীধারীদের মাধ্যমে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে জানা যায় যে, কয়েকজন সম্মানিত ব্যতিক্রম ব্যতীত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল উমাইয়া নৃপতিগণ ধর্মদ্রোহী ছিল। তাদেরকে যেন সাধারণ মুসলমানরা ধর্মত্যাগী বা ধর্মদ্রোহী না বলতে পারে তাই তারা ঈমানের সংজ্ঞা পরিবর্তন

করার জন্য পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে ধর্মকে শুধুমাত্র কলেমা, নামায, রোজা, যাকাত, হজ্বের মধ্যে সীমিত করে। অর্থাৎ মানবীয় বিচারে 'সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় নীতিতে ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক ও বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে তা কার্যত অস্বীকার করা হয়, যা এখন পর্যন্ত মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। যা হোক, ঐতিহাসিকগণ গবেষণার মাধ্যমে নির্ণয় করেছেন যে, উমাইয়া শাসকগণ জবরীয়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। 'জবরীয়া' শব্দটি আরবী 'জবর' শব্দ হতে গৃহীত। এর অর্থ অদৃষ্ট বা নিয়তি। এই মতবাদের প্রবক্তা বা দাবী করতো যে, যেহেতু আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান তাই মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোন মূল্য নাই। অর্থাৎ তাদের কার্যাবলীর জন্য তারা আদৌ দায়ী নয়। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ইচ্ছায় সে যন্ত্রের মত কাজ করে।

আল্লাহ্র স্বেচ্ছাচারে বিশ্বাস ও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার অস্বীকৃতির পরিণতি হিসাবে জাবরীয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব। জাহম বিন সাফ ওয়াল (মৃত্যু ৭৪৫ খৃ.) এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তার অনুসারীদের মতে আল্লাহ্ স্বেচ্ছাচারী শাসক, ভাল, মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সব কিছু তাঁর সৃষ্টি। মানুষ তার হাতের ক্রীড়ানক মাত্র। মানুষকে তিনি যা করতে বাধ্য করেন মানুষ তাই সম্পন্ন করে। মানুষের নিজের কোন ইচ্ছার স্বাধীনতা বা কর্মক্ষমতা নাই। আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী। মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোন মূল্য নাই। মানুষের ভাগ্যে যা ঘটবে তা পূর্ব থেকে নির্ধারিত। কাজেই মানুষের কার্যাবলীর জন্য তাকে দায়ী করা চলে না। কারণ, মানুষ যা করে, তা আল্লাহ্র ইচ্ছায় সে যন্ত্রের ন্যায় কাজ করে। মানুষের কোন কার্য নির্বাচন করার ক্ষমতা নেই। তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র বা স্বাধীনতা নেই। সে সম্পূর্ণরূপে সার্বভৌম শক্তির নিয়ন্ত্রণে। জগতের প্রতিটি কার্য ও ঘটনা আল্লাহ্র নির্দেশে সংঘটিত হয়। মানুষ যদি স্বাধীন হত, তবে যত মানুষ আছে, তত ক্রিয়াশীল কর্তা থাকত এবং তার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র শক্তি সীমিত করণ। জাবরীয়া সম্প্রদায় তাদের মতবাদের সমর্থনে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ উল্লেখ করে থাকেন : আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন, কারণ তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী (সূরা বাকারা : ২৮৪)। "বলুন, হে আল্লাহ্ তুমিই রাজ্যের অধিপতি থেকে ইচ্ছা তুমি রাজত্ব দান কর যাকে ইচ্ছা রাজ্যচ্যুত কর, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে সমস্ত কল্যাণ এবং তুমিই সব বিষয়ে পরম শক্তিমান" (সুরা আলে ইমরান : ২৬)। "তিনি যাকে ইচ্ছা সুপথে পরিচালনা করেন" (সুরা বাকারা : ২৭২)। "তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং ভাগ্য নির্দেশ করে দিয়েছেন" (সুরা ফুরকান : ২২)। "নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বিষয় এর পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছি" (সুরা মায়িদা : ৪)। অবৈধ ক্ষমতা দখলদার ও সম্পত্তির মালিকগণ তাদের অপকর্মকে বিচ্ছিন্নভাবে কুরআনের উল্লিখিত ও অনুরূপ আয়াতের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে এই মতবাদকে প্রকৃত ইসলাম হিসাবে বানানোর চেষ্টা আজ পর্যন্ত অব্যহত রেখেছে। এই মতবাদের সবচেয়ে বড় ফায়দা হলো অবৈধ রাজশক্তি ও সম্পদশালী ব্যক্তির হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে প্রজা সাধারণ ও অধীনস্থদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন ও জুলুম করার অবাধ স্বাধীনতা। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার করা হবে এবং বলা হবে এটা আল্লাহ্রই ইচ্ছা এবং এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভাগ্য এবং এ ব্যাপারে অত্যাচারীর কিছু করণীয় নাই। ইতিহাস সাক্ষী, মুয়াবিয়া, ইয়াজীদ, যিয়াদ ইবনে আবিহি প্রভৃতি উমাইয়া নেতৃবৃন্দ যে তোমাদের সকল প্রকার অত্যাচার, অনাচার, প্রতারণা ও অন্যায় যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করেছিল। অথচ তারা মুখে 'সবই আল্লাহ্র ইচ্ছা'। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন প্রভৃতি বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে তাদের কুকর্মকে চাপা দিত। উমাইয়াদের এই বিধর্মী কর্মকাণ্ড তত্ত্বীয়ভাবে অন্য একটি ধর্মীয় মতবাদের মাধ্যমে সমর্থন লাভ করে। এই মতবাদের বিশ্বাসীগণকে মুরজিয়া বলা হয়। মুরজিয়া শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে স্থগিতকরণ। অর্থাৎ ধর্মীয় উদাসীনতা বা নাফরমানির জন্য একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে বিচার দিবসে আল্লাহ্ কর্তৃক রায় ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত বিচার-মতামত-সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত করণ।

মরজীয়া মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ

১) যারা আল্লাহ্ ও তার রাসুলের প্রতি ইমান আনয়ন করে বলে দাবি করে তারা যে পাপই করুক না কেন তারা ধর্মচ্যুত হবে না বা তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করাও সমুচিত নয়। কারণ কেবলমাত্র আল্লাহ্ই তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে ক্ষমতাবান।

২) এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে কাফির (মুনাফিক) আখ্যা দিবে না, যারা তা দেয় তারাই কাফির। শাস্তি বা পুরস্কার কেবল আল্লাহ্ নির্ধারণ করবেন।

৩) সাহাবীদের বিষয়ে সন্দেহপূর্ণ মন্তব্য বা খিলাফত প্রশ্নের কার দাবি অগ্রগণ্য তার বিচার বা সিদ্ধান্তের দায়িত্ব বা মালিক আল্লাহ্র। মানুষের সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত

প্রদান করা উচিত নয়। মুসলিমগণ যে সকল সাহাবীগণকে অপরাধী মনে করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন। আবার তিনি অপরাধী নাও হতে পারেন।

৪) উমাইয়ারা ছিলেন এবং এটাই যথেষ্ট। তাদের খিলাফত বেআইনী ছিলনা। তারা যদি পাপ করেন তবে তার জন্য আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন। কোন মুসলমানের পক্ষে তাদের ধর্মদ্রোহী আখ্যা দেওয়া সমুচিত নয়।

৫) আন্তরিক বিশ্বাসই ইমান সেই সঙ্গে কার্য (আমল) অপরিহার্য নয়।

৬) কোন কোন মুরজিয়া আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলে যে, শিরক থেকে নিকৃষ্ট যত বড় পাপই করা হোক না কেন, অবশ্যই তা ক্ষমা করা হবে। কেউ কেউ আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে বলে যে, মানুষ যদি অন্তরে ইমান পোষণ করে এবং যদি দারুল ইসলামেও বসবাস করে অথচ মুখে কুফরী ঘোষণা করে বা মুর্তি পূজা করে বা ইহুদীবাদ বা খৃষ্টবাদ গ্রহণ করে এতদসত্ত্বেও সে কামেল, ইমানদার, আল্লাহ্র অলি ও জান্নাতী।

(৭) এই মতবাদের আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল কুরআনে ঘোষিত ইমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ নির্দেশ সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নির্দেশ নীতির চির অবসান। এই নীতির প্রবক্তাদের মতে এই নীতি বাস্তবায়নকারীরা হলো ফেত্নাবাজ তাই তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে হত্যা করা বৈধ।

মরজিয়া ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে ইমাম হাসান (আ.) স্মরণ রাখতে হবে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) কে এই কুরআনী অপব্যাখ্যার মাধ্যমে শহীদ করা হয়। তাই আল্লাহ্ওয়ালা আলেমগণ বলেছেন এসব ধ্যান ধারণা যালেমের হস্ত সুদৃঢ় করেছে অন্যায় ও ভ্রান্তির ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত বনাম মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বা ক্ষমতা একটি বহুল আলোচিত বিতর্কিত বিষয়। উমাইয়া শাসনের প্রথম দিকে এই বিষয়সহ অন্যান্য বহু বিষয় নিয়ে ইসলাম ধর্মে ব্যাপক মতবিরোধ হয়। তখন প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত হাসান বসরী (রহঃ) ইমাম হাসান বিন আলী (আ.) এর নিকট এ ব্যাপারে তার নিকট ফতোয়া চেয়ে পত্র লিখেন। এই পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, আপনারা বনি হাশীম গোত্র প্রবহমান নৌকা এবং উত্তাল তরঙ্গ আর মূল সড়কের আলোকজ্জল নিশান স্বরূপ। অথবা নূহের নৌকার ন্যায় যাতে মোমিনরা আরোহন করে এবং মুসলমানরা তার সাহায্যে রক্ষা পায়। হে রাসূলুল্লাহ্র (সা.) এর সন্তান। আমি এ চিঠিটা আপনার কাছে লিখছি। কারণ কদর (পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য) এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের মত পার্থক্য রয়েছে। আর সক্ষমতার (মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা) প্রসঙ্গে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিনা। আপনি আমাদের জানান (এ ব্যাপারে) আপনার ও আপনার পূর্ব পুরুষদের বিশ্বাস কি। কারণ আপনারা আল্লাহ্র জ্ঞান থেকে শিখেছেন আর আপনারা জনগণের উপর হুজ্জাত (প্রমাণ) আর আল্লাহ্ হলেন আপনাদের উপরে হুজ্জাত। আর আপনারা সেই বংশোদ্ভুত যারা একে অপরের থেকে। আল্লাহ্ শ্রবণকারী এবং সর্বজ্ঞানী। তখন ইমাম হাসান (আ.) [মৃ: ৬৬৪] তার উত্তর দেন এরূপে:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, তোমার চিঠি আমার কাছে পৌঁছেছে। যদি তোমার এবং তোমার পূর্বে যারা বিগত হয়েছে তাদের সিদ্ধান্তহীনতা না থাকত তাহলে তোমাকে আমি এ বিষয়ে সংবাদ দিতাম না। পর সংবাদ, যে ব্যক্তি কদর (ভাগ্যের) শুভও অশুভ ও বিশ্বাস করেনা, আর বিশ্বাস পোষণ করে না যে, আল্লাহ্ তা জানেন, নিশ্চিত সে কাফের। আর যে ব্যক্তি পাপসমূহকে আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করে এবং তারই কাজ বলে মনে করে। নিশ্চয় সে লম্পট ও দুষ্কৃত। সত্যই আল্লাহ্ জোরপূর্বক আনুগত্য প্রাপ্ত হন না। আর কারো অবাধ্যতায় পরাজিত হননি। মানুষকে তার আধিপত্য থেকে মুক্ত করে দেন নি। আর তাদেরকে নিজের উপর ছেড়ে দেন নি। বরং তিনি হলেন তাদেরকে দেওয়া সব কিছুর মালিক। আর তাদেরকে যা কিছু সক্ষমতা (স্বাধীন ইচ্ছা) দিয়েছেন তার উপর ক্ষমতাবান বরং তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারা স্বাধীনতাভাবে তা গ্রহণ করে এবং তাদেরকে নিষেধ করেছেন যাতে স্বাধীনভাবে তা বর্জন করে। কাজেই যদি তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চলে তাহলে এক্ষেত্রে কোন অন্তরায় নেই। আর যদি অবাধ্যতার পথে অগ্রসর হয় আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান এবং তাদেরকে বিরত করতে চান তাহলে তা পাবেন। আর তা যদি না করেন তাহলেও আল্লাহ্ জোরপূর্বক তাদেরকে ঐ কাজে প্রবৃত্ত করেন নি এবং তাদেরকে বাধ্য করেন নি। উপরন্তু তদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদেরকে দৃষ্টিবান করেছেন এবং (ভাল-মন্দের) পরিচিত জ্ঞান প্রদান করেছেন এবং সতর্ক করেছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন। নিষেধ করেছেন তাদেরকে ফেরেশতাদের ন্যায় স্বভাববশত তাঁর নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন নি। আর যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করেছেন তাকে বাধ্য করেন নি, সুস্পষ্ট হুজ্জত (প্রমাণ) আল্লাহ্রই। তিনি যদি চান তাহলে সকলকে সত্যে উপনীত করেন। আর সালাম তার উপরে যে সত্য পথে অনুসরণ করে।

এই সার্বিক বিষয়গুলো জাবর (বাধ্যবাধকতাবাদ) ও তাফবীয (পূর্ণসমর্পণবাদ) মতবাদীদের বিপরীতে ন্যায়পরায়নতা ও মধ্যপন্থী মত প্রমাণে হযরত ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ (আ.) স্পষ্টীকরণ ও ব্যাখ্যা করেন। তার বক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত করা হলো। ইমাম বলেন, এ প্রসঙ্গে আমরা আমাদের কথা আরম্ভ

করতে চাই ইমাম জাফর সাদিক (আ.) [৬৯৯-৭৬৫ খ্রি.] এর একটি কথা দিয়ে : জাবির নয়, তাফবীযও নয়, সঠিক হলো এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থা। যেমন সুস্থতা (শারীরিক ত্রুটিমুক্ততা, স্বাধীনতা তার জন্য ভাল ও মন্দের পথ উন্মুক্ত থাকা। যথেষ্ট ফুরসত (পর্যাপ্ত সুযোগ), জীবনের পাথেয় এবং মনের চাওয়া তথা সদিচ্ছা। এই ৫টি বিষয়কে ইমাম সাদিক (আ.) খোদায়ী দান ও অনুগ্রহের সমষ্টি হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। যখন বান্দা এগুলোর কোন একটির অধিকারী থাকেনা সেই অনুপাত তার কর্তব্যের দায় হ্রাস পায়। ইমাম সাদিক (আ.) একটি মৌলনীতির খবর দিয়েছেন যা লোকদের অনুধাবন করার চেষ্টা করা উচিত। কুরআনও এর সত্যতার কথা বলে।

কাজেই তাঁর রাসুলের (সা.) ও তাঁর আল (বংশধর) স্বীয় বচনে কুরআনের সীমানার কিছুই লঙ্ঘন করেন না। যখনই তাঁদের থেকে সত্য খবরসমূহ আসে তখন সেগুলোর সপক্ষে কুরআন থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ খুঁজতে হবে। যদি এর সমর্থনে কিছু পাওয়া যায় এবং আল্লাহ্‌র বাণীর সাথে তা সংগতিপূর্ণ হয় তাহলে সেগুলো সত্য বলে প্রমাণিত হবে ও তার অনুসরণ করা ফরজ হয়ে যাবে। আর এমন বিষয় তার শত্রুরা ব্যতীত কেউ অমান্য করবে না। ইমাম সাদিক (আ.) কে জিজ্ঞাসা করা হয় : আল্লাহ্‌ কি স্বীয় বান্দাদেরকে গোণাহ্‌র কাজে বাধ্য করে থাকেন? ইমাম সাদিক (আ.) উত্তরে বলেন : আল্লাহ্‌ এরূপ কর্ম থেকে (মুক্ত থাকার দৃষ্টিতে অন্য সকলের অপেক্ষা) অধিক ন্যায় পরায়ন। তাঁকে বলা হলো : তিনি কাজকে একেবারে বান্দাদের হাতে অর্পণ করে দিয়েছেন। উত্তরে বললেন : তিনি তাদের উপরে এর (এরূপ কথা) থেকে অধিক শক্তিমান ও কর্তৃত্বশীল। ইমাম (আ.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, জনগণ তাকদীর এর বিশ্বাস প্রশ্নে তিন শ্রেণীভুক্ত: একজন মনে করে যে, কাজ তার উপরেই ন্যস্তকৃত, সে আল্লাহ্‌কে স্বীয় কর্তৃতে দুর্বল মনে করেছে সে ধংসপ্রাপ্ত। আরেকজন মনে করে মহামহিম আল্লাহ্‌ বান্দাদেরকে পাপ কাজে বাধ্য করেছেন এবং তাদের সাধ্য ও ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করেছেন সেও আল্লাহ্‌কে তাঁর নির্দেশ পরিচালনায় অন্যায়চারী বলে সাব্যস্ত করেছে এবং সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

আরেকজন মনে করে আল্লাহ্‌ স্বীয় বান্দাদেরকে তাদের সাধ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন; তাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন নি। আর যদি ভালো কাজ করে তাহলে কৃতজ্ঞতা জানায় এবং যদি মন্দ কাজ করে তাহলে আল্লাহ্‌ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এ হলো সঠিক মুসলমান। অতঃপর তিনি (আ.) খবর দিয়েছেন যে ব্যক্তি জবরিয়া মতবাদ ও তাফবীয মতবাদের অনুসরণ করে ও তাতে বিশ্বাস করে সে সত্যের পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে ইমান-ইসলাম ও ইমান থেকে খারিজ হওয়া সম্পর্কে ইমাম জাফর সাদিকের দ্ব্যর্থহীন/সিদ্ধান্ত জানা আবশ্যক। ইমাম (আ.) বলেন, ঈমানের পূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অর্থ হলো: আল্লাহ্‌র প্রতি স্বীকারোক্তি ও বন্দেগীর স্বীকারোক্তি দ্বারা তাঁর সম্মানে বিনয়ী হওয়া এবং তা দ্বারা তার নৈকট্য লাভ করা এবং জ্ঞানসহকারে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমুদয় ওয়াজিব পালন করা। তাওহীদের শীর্ষ পর্যায় থেকে নিয়ে নীচের দিকে। একের পর এক ধাপ অতিক্রম করে আনুগত্যের শেষ ধাপ অবধি। প্রত্যেকটি একে অপরের সাথে সংযুক্ত এবং এক সাথে। আর কোন বান্দা তার উপর যা ওয়াজিব তা পালন করে ঠিক যেমনটা তার কাছে পৌঁছেছে যা আমরা বর্ণনা দিয়েছি, তখনই সে হবে মুমিন এবং ঈমানের গুণ-বিশেষণের যোগ্য ও সওয়াবের পাত্র। আর এটা সেজন্য যে, ঈমানের এক কথায় অর্থ হলো স্বীকারোক্তি, আর স্বীকারোক্তির অর্থ হলো আনুগত্যের প্রতি সত্যায়ন। আর এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আনুগত্যের সকল প্রকারই ছোট হোক আর বড় পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। মুমিন ঈমানের গুণ থেকে বাইরে চলে যায় না যদি না যা কিছু ঈমানের গুণ বিশেষ লাভের কারণ হয় তা পরিহার করে। নিশ্চয় ঈমানের নাম ও তার অর্থের অধিকারী সেই যে বড় ফরজগুলোকে অব্যহতভাবে পালন করে এবং কবীরা গুণাহ্‌কে ত্যাগ করে ও তার থেকে দুরে থাকে। যদি কেউ ক্ষুদ্র আনুগত্যগুলোকে বর্জন করে এবং ক্ষুদ্র গোনাহ্‌গুলো করে। তবে সে গুনাহ্‌ থেকে খারিজ হয়ে যায় না। আর কেউ ইমান বর্জনকারী হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত না সে বড় আনুগত্যসমূহের কোন কিছুকে ছেড়ে না দেবে ও বড় পাপে পতিত না হবে। আর যতক্ষণ এরূপ কাজে লিপ্ত না হবে ততক্ষণ সে মুমিন। কেননা আল্লাহ্‌ বলেন, যদি তোমরা বড় গুণাহ্‌গুলো থেকে বিরত হও যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাহলে আমরা তোমাদের (ক্ষুদ্র) মন্দ কাজগুলোকে ঢেকে দিব আর তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে পৌঁছে দিব। (সুরা নিসা : ৩১) এখানে উদ্দেশ্য হলো বড় নয় এমন পাপগুলোকে ক্ষমা করা। আর যদি সে বড় পাপে পতিত হয় তাহলে সব পাপের জন্যই জবাবদিহি করতে হবে। ছোট হোক আর বড় এবং সব গুলোর জন্যই প্রতিফল পাবে ও শাস্তি লাভ করবে। এই হলো ঈমানের বৈশিষ্ট এবং মুমিনের বৈশিষ্ট যে সওয়াবের পাত্র হবে।

ইসলামের গুণ বৈশিষ্ট্যের অর্থ হলো প্রত্যেক আনুগত্যের প্রতি স্বীকারোক্তি যার নির্দেশ স্থির ও স্পষ্ট রয়েছে এবং তা পালন করা। কাজেই যখন বাহ্যিকভাবে হলেও সে সবগুলোরই আনুগত্যের প্রতি স্বীকারোক্তি করবে, যদিও বা অন্তরে তা বিশ্বাস নাও করে। তবুও মুসলমান নাম ও তার অর্থের যোগ্য হবে এবং বাহ্যত বন্ধুত্বের পাত্র হবে। আর তার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হবে এবং উত্তরাধিকার লাভ করবে। আর মুসলমানদের সাথে

সমান অধিকার ভোগ করবে এগুলো ইসলামের গুণ বৈশিষ্ট্য। আর মুসলমানও মুমিনের পার্থক্য হলো এটা যে, নিশ্চয় মুসলমান তখনই মুমিন (বিশ্বাসী) বলে গণ্য হবে যখন মুখে যা প্রকাশ করে অন্তর থেকে তার প্রতি আনুগত্যশীল হয়। আর যে বাহ্যিকভাবে শুধু তা (ইমান প্রকাশ) করে (কর্মে নয়), সে মুসলমান। আর যখন সে বিনয় ও নৈকট্যের জ্ঞানসহকারে অন্তর থেকে তা পালন করে তখন সে হয় মুমিন। সুতরাং, এমনটি হওয়া সম্ভব যে, কেউ মুসলমান অথচ মুমিন নয়: কিন্তু কখনই এটা হওয়া সম্ভব নয় যে, বান্দা মুমিন অথচ সে মুসলমান নয়।

ইমান থেকে খারিজ হওয়ার জন্য ৫টির যে কোন একটি করলে সে ইমান থেকে খারিজ হয়ে যায়। সেগুলো হলো : কুফরী, শিরক, পথভ্রষ্টতা, ফাসেকী এবং কবীরা গুণাহ্ করা। কুফর এর অর্থ হলো ঔদ্ধত্য, অস্বীকার ও বিরুদ্ধবাদিতার বশবর্তী হয়ে এবং উপেক্ষার ভাব নিয়ে ছোট বড় সব কর্তব্যে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করা। আর যে এরূপ করে সে কাফের। এটাই হলো কুফরের অর্থ। যে কেউ সে জাতি এবং সম্প্রদায়ভুক্তই হোক না কেন এই বিবরণে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসহকারে অবাধ্য আচরণ করবে সে কাফের হয়ে যাবে। শিরকের অর্থ হলো আল্লাহ্র বিরুদ্ধ ও অবাধ্যতা নির্দেশক যে কোন ধর্মাচার করলেই সে মুশরিক হবে। এ অবাধ্যতা ছোট হোক আর বড়ই হোক, যে তা করবে সেই মুশরিক। পথভ্রষ্টতার অর্থ হলো ওয়াজিব বিষয়ে অজ্ঞতা। আর তা হলো সে এমন কোন বড় আনুগত্যের কাজ ত্যাগ করে যা পালন না করা পর্যন্ত বান্দা মুমিন দাবি করতে পারেনা। সেক্ষেত্রে ত্যাগকারী উক্ত কাজ অস্বীকার কিংবা বরখেলাফ ও ঔদ্ধত্যের বশে ত্যাগ করেনা বরং অবহেলা, উদাসীনতা এবং অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ত্যাগ করে এমন ব্যক্তি পথভ্রষ্ট এবং ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এ বিষয়ে অজ্ঞ এবং ভয় থেকে খারিজ হয়ে গেছে। আর যতক্ষণ সে এই বৈশিষ্ট্য ধরে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট নামধারী ও এ অর্থের যোগ্য হবে। আর যদি অবাধ্যতার পথে ঔদ্ধত্য, অবজ্ঞা এবং অবহেলার বশে অগ্রসর হয় তাহলে সেটা হবে কুফরী। আর যদি প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে পূর্ব পুরুষ ও বিগতজনের (ধর্মীয়) ব্যাখ্যা অনুসরণ, আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টির জন্য তা করে তাহলে সেটা হবে শিরক। আর এমনটি ঘটে যে, মানুষ পথভ্রষ্টতার পথে চলতে থাকবে। অথচ তার প্রবৃত্তি তাকে যে বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর কোন একটির দিকে টেনে আনবে না।

ফাসেকীর অর্থ হলো ভোগ প্রবণতা, প্রবৃত্তির কামনা ও তীব্র আসক্তির বশে কবীরা গুণাহ্য় লিপ্ত হওয়া। এমন কর্মকারীই ফাসেক আর এ ফাসেকীর কারণেই সে ইমান থেকে খারিজ হয়ে যায়। আর যদি তা দ্বীনি বিষয়কে অবজ্ঞা, ক্ষুদ্র ও মূল্যহীন জ্ঞান করার মাত্রায় পৌঁছা পর্যন্ত অব্যহত রাখে তাহলে অবজ্ঞা ও মূল্যহীন জ্ঞান করার দৃষ্টিকোণ থেকে সে কাফের হয়ে যায়। যে কবীরা গুণাহ্ ইমানকে বিনষ্ট করে দেয় তার অর্থ হলো কেউ ঔদ্ধত্য ও ক্রোধের কারণে কবীরা গোনাহ্ নিমিজ্জিত হবে ও অনেক গুণাহ্ করবে। যেমন গালমন্দ করে, হত্যা করে অবৈধ মাল সম্পদ হস্তগত করে প্রাপ্য অধিকার আটকে রাখে এবং এগুলো ছাড়াও অন্যান্য কবীরা গোনাহ্ যেগুলোকে কবীরা গোনাহ্কারী উপভোগের উদ্দেশ্য ছাড়াই করে থাকে। এই প্রকার গোনাহ্র মধ্যে রয়েছে মিথ্যা কসম খাওয়া, সুদ গ্রহণ করা ইত্যাদি যেগুলো গোনাহ্কারী তৃপ্তি উপভোগের জন্য করে না যেমন করে মদ্য পান, ব্যভিচার ও প্রমোদ ক্রীড়া কৌতুকের বেলায়। কেননা এ ধরণের কাজকারীরা এদিকে দিয়ে কবীরা গোনাহের পতিত হওয়ার কারণে ইমানকে ধ্বংস করে ফেলে এবং তা থেকে খারিজ হয়ে যায়; তবে সে মুশরিক নয়, কাফেরও নয়, পথভ্রষ্ট ও নয়; বরং সে মুর্খতা করেছে। আর যদি সে কুপ্রবৃত্তির টানে যেসব পাপকারীর বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর কোন একটির দিকে ঝোঁকে তাহলে তারই বিশ্লেষণ লাভ করে। (তথ্য সংগ্রহ, রাসূলুল্লাহ্ (রা.) ও তাঁর আহলে বাইত থেকে বর্ণিত হাদীসের সংকলন তুহাফুল উকুল আন আলে রাসূল (সা.) মূলঃ শেখ আবু মুহাম্মদ আল হাসান ইবনে আলী ইবনিল হুসাইন ইবনে শুবা আল হারবানী (রহঃ) অনুবাদ আব্দুল কুদ্দুস বাদশা, প্রকাশকাল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ) আমরা ইসলামের বিভিন্ন ফিরকার ধর্মীয় বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ আহলে বাইতের মহান ইমামদের মতামত, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের আলোকে পর্যালোচনা করে এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উমাইয়া রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ভ্রষ্টাচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মুয়াবিয়া অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখল করার পর প্রখ্যাত ইরান বিজয়ী সাহাবা সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, রাজা আপনাকে সালাম। ধর্মীয় ইমাম ও জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে অযৌক্তিক বিদ্রোহ ও অন্যায় যুদ্ধ এবং যুদ্ধে প্রতারণা, মিথ্যাচারের মাধ্যমে কোরআনী শাসন পদ্ধতির ধ্বংসের হোতা রোমান মডেলের রাজত্ব কায়েম করেন মুয়াবিয়া। মুয়াবিয়া প্রবর্তিত রাজতন্ত্র অদ্যবধি মুসলিম রাজা-বাদশাহ মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং এরাই নিজেদেরকে আদর্শ মুসলিম ও আমীরুল মোমিনীন বা মুসলমান নয় ও বরং মোমিনদের নেতা হিসাবে দাবি করেছেন। এবার উমাইয়া রাজন্যবর্গের কার্যকলাপ একটু পর্যবেক্ষণ করা যাক।

উমাইয়া বাদশাহগণ রাজকীয় প্রাসাদে সাড়ম্বরে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতেন। আব্দুল মালিক ও দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত কোন আমীরই শুক্রবার জুমার নামায ও দৈনিক ৫ বার নামাযে ইমামতি করতেন না। ফলে রাজা কর্তৃক নিয়োজিত "ইমামের" পেশাই হলো অন্য লোকদের নামায পড়ানো। সাধারণ দরবারে এসব রাজা-বাদশাহ্গণ সুউচ্চ সিংহাসনে সমাসীন থাকতেন। দরবারে রাজ পরিবারের আমীর-উমরা সদস্যগণ বসতেন। উপবিষ্ট থাকতেন। তাদের সম্মুখে অগণিত জনসাধারণ রাজধানীর গণ্যমান্য ব্যক্তি, সওদাগর, শিল্পী, কবি ও মনীষী লোক তাকে সালাম জানাতেন। সকল সাক্ষাতকার উপলক্ষে তারা জাঁকজমক ও বহু মূল্যবান পোশাকে সুসজ্জিত হতেন।

সন্ধ্যার পর এই বাদশাহগণ লঘু পরিবেশে গল্পের আসর বা গান বাজনার মজলিসে সময় ব্যয় করতেন। মুয়াবিয়া প্রাচীনকালের রাজা-বাদশাহের বিশেষত দক্ষিণ আরবের বাদশাহদের কাহিনী শুনতে ভালবাসতেন, তিনি ইয়ামন হতে আবীদ ইবনে শরিইয়াহ নামক একজন গাল্পিককে আহ্বান করেন এবং তার মুখে প্রাচীন লোকদের কাহিনী শুনে অধিক রাত্রি জাগরণ করতেন। মুয়াবিয়ার জালিম পুত্র ইয়াজীদের আমল হতে নৈশ অনুষ্ঠানে সুরা পানের নিয়ম চালু করা হয়। মক্কা ও মদীনা এ সময় সঙ্গীত চর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠে। বাদশাহ্র আহ্বানে গায়ক-গায়িকা ও নর্তক-নর্তকী মক্কা-মদীনা হতে দামেস্কে আসত এবং তাদের শিল্প নৈপুণ্যে মজলিস সরগরম করে তুলত। বাদশাহ ও তার সভাসদগণ শিকার, ঘোড়দৌড়, পাশা খেলা ও পোলো খেলা পছন্দ করতেন। মোরগের লড়াই এই সময় প্রচলিত ছিল এবং অনেকে এতে বেশ আনন্দ উপভোগ করত। শিকারের জন্য পোষা কুকুর ব্যবহার করা হতো। এই উদ্দেশ্যে চিতা বাঘ ব্যবহারও প্রচলিত ছিল।

উমাইয়া রাজাগণ ঘোড় দৌড়ে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন, ভাল জাতের ঘোড়ার প্রতিপালন এবং সেগুলোকে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবহার করার শখ অনেকেরই ছিল। প্রথম ওয়ালীদ জনসাধারণের জন্য ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। সোলায়মান ও ঘোড়দৌড়ে আমোদ পেতেন। হিশামের সময়ে অনুষ্ঠিত এক ঘোড়দৌড়ে খলিফা ও অন্যান্যদের ঘোড়সহ মোট ৪০০০ ঘোড়া অংশগ্রহণ করে। রোমান রাজাদের ন্যায় বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সংগৃহীত সুন্দরী ও নর্তকীদের বেহাত হওয়ার ভয় থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এ সময়ে রোমকদের ন্যায় হেরেমে শরীয়ত বিরোধী খোঁজা প্রহরীদের নিযুক্ত করার রীতি চালু করা হয়।

উমাইয়া যুগে রাজাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে কবি ও কবিতার বিশেষ উন্নতি হয়। মিসকিন আদ-দারেমী নামক জনৈক কবি মুয়াবিয়া কর্তৃক অবৈধভাবে নিয়োজিত ইয়াজীদের উত্তরাধিকারী মনোয়ন সম্পর্কে কবিতা রচনা করে জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচার করে। হাম্বাদ নামক একজন সংগ্রাহক জাহিলিয়াত যুগের কবিতা সংকলন করেন। উল্লেখ্য ইয়াজীদ মুয়াবিয়ার খৃস্টান স্ত্রী মাইসিনার পুত্র হওয়ায় খৃস্টান কবি আখতাল জোরালো ভাষায় উমাইয়াদের খিলাফতের দাবি সমর্থন করে কবিতা লেখে। শুক্রবারের নামাযের পূর্বে খুতবা প্রদান করার বিদআত (প্রথা) বাগ্মিতা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়। গভর্নর ও সেনাদক্ষগণ উমাইয়াদের মর্যাদা ও সামরিক শক্তির উপর জোর বক্তৃতা দিত। সরকারী আদেশ-নিষেধ ও সকল প্রকার মতবাদ এই বক্তৃতার মাধ্যমে সমাজে জারি করা হতো। উমাইয়াদের শাসনকালে জায়গীর দান ও গ্রহণ প্রথা আরও বিস্তার লাভ করে সিরিয়া ছাড়া ইরাকের বিখ্যাত আল-সাওয়াদ (ব্যবিলন) অঞ্চলের সকল ভূ-সম্পত্তি মুয়াবিয়া, আব্দুল মালিক ও হিশামের আমলে উমাইয়াদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ভাগাভাগি করা হয়। এ সময় স্বয়ং খলিফা হতে শুরু করে বড় বড় সেনাপতি, আমীর ও উমারাহ্গণ ভূ-সম্পত্তি দখল করে বিশাল জোতদারী সৃষ্টি করেন। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে মুয়াবিয়া, আব্দুল মালিক, আলওলীদ, হিশাম প্রমুখ প্রভুত ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির মালিক ছিল। সেনাপতিদের মধ্যে মাসলামা খালিদ আল কাসুরী সেরা জোতদার ছিলেন, হিশাম, খালেদ বিন আব্দুল্লাহ্ ও কাসুরী রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা অধিক সম্পত্তির মালিক ছিল। তারা এত প্রচুর পরিমাণ খাদ্য শষ্য লাভের জন্য গুদামজাত করতো যে, তাদের ইচ্ছায় খাদ্য দ্রব্যের বাজার মূল্য উঠানামা করত। এভাবে জায়গীর লাভ করে সমগ্র মুসলমান সাম্রাজ্য উমাইয়াদের ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়। (তথ্যসূত্র: ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, ইসলাম ও খিলাফত ড. মফিজুল্লাহ কবীর, বাংলা একাডেমি)

উমাইয়া রাজত্ব খোদায়ী গজব

"স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আমি যে দৃশ্য (স্বপ্ন তোমাকে দেখাইয়াছি তাহা এবং কুরআন উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটি ও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি উহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করি (তাহাদের সংশোধনের জন্য, কিন্তু ইহা উহাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে (সুরা বনি ইসরাইল : ৬০)। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনে জারীর সুহাইল বিন সা'দ হতে, ইবনে আবি হাতিম ইবনে ওমর এবং ইয়ালা বিন মুররা হতে এবং ইবনে মারদুইয়্যা ইমাম হুসাইন (আ.) হতে, ইবনে আব্বাস হযরত আয়েশা (রা.) হতে, বায়হকী ও ইবনে আসাকীর সাঈদ বিন মুসাইয়্যের হতে বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম এই যে, মহানবী (সা.) স্বপ্নে দেখেন যে, বনী উমাইয়া তাঁর মিম্বরে বানরের আকৃতিতে নাচানাচি করছে। এ স্বপ্ন দেখে তিনি এতই মর্মাহত হন যে, এরপর যতদিন বেঁচে ছিলেন তিনি আর হাসেন নাই। যে গাছের উপর অভিশাপ (লানত) করা হয়েছে তার উদ্দিষ্ট মারওয়ান বিন হাকাম যে, হযরত ওসমান (রা.) এর মন্ত্রী ও জামাতা ছিল এবং এর ষড়যন্ত্রের কারণেই হযরত ওসমান শাহাদত বরণ করেন। মহানবী (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় তার পাপাচার ও অপকর্মের কারণে মদীনা থেকে বহিষ্কার করে ছিলেন এবং তাকে লোকজন 'রাসূল কর্তৃক বিতাড়িত' বলত। (তাফসীর দুররে মনসুর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৯৯ দ্রষ্টব্য)। ইবনে মারদুইয্যা (রা.) হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) হতে বর্ণনা করেন : একদিন মহানবী (সা.) সকাল বেলায় অত্যন্ত দুঃখ কষ্টে মনমরা অবস্থায় ছিলেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি এরশাদ করিলেন, বনু উমাইয়াগণকে বানরের মত লম্ফের পর লম্ফ দিতে দিতে আমার মিম্বরের উপর চড়িতে দেখিয়াছি। লোকেরা বলিল, ইহার জন্য আপনি দুঃখিত হবেন না। তারা যা কিছু পাবার তা দুনিয়াতেই পাবে। তারা বুঝে নাই যে, রাসুলে (সা.) মনোবেদনার কারণ উমাইয়া শাসকগণ রাসূল (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের (Theocratic State) এর ধ্বংস সাধন ও রাজতন্ত্রের পত্তন করবে। তারা ওসীয়ে রাসূল ও তাঁর আহলে বাইতদের সম্পূর্ণ অবৈধ পদ্ধতিতে ক্ষমতাচ্যুত করবে, আহলে বাইতদের আল্লাহ্ প্রদত্ত মর্যাদা অস্বীকার করে তাদের গালি গালাজের নিয়মনীতি চালু করবে। পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা ও হাজার হাজার জাল হাদিসের মাধ্যমে এক ধরণের বিকৃত ইসলাম চালু করে তাই সমাজে রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলাম বলে চালু করবে। রাসূল (সা.) পুত্র ইমাম হুসাইন (আ.) কে শহীদ করবে। তাঁর পরিবারের পবিত্র মহিলাদের বেপর্দা করে রাস্তায় রাস্তায় শহরে শহরে ঘোরাবে। তার প্রিয় মদীনা শরিফকে অসম্মানিত করবে। মদীনাবাসীদেরকে নৃশংসভাবে খুন করবে তার সাহাবীদের শরীরে দাগ দিবে। অন্তপুরবাসীদের ধর্ষণ করবে, তার পবিত্র মাজার শরিফকে ঘোড়ার আস্তাবল বানাবে। আল্লাহ্র ঘর মক্কা শরিফে গিলাফে আগুন ধরিয়ে দিবে ও কামান দেগে তার ধ্বংস সাধন করবে। হাজরে আসওয়াদের বেহুরমতি করবে, মক্কা শরিফে রক্ষিত ইব্রাহিম (আ.) এর বেহেশতী দুম্বার অংশ পুড়িয়ে ফেলবে। রাসূল (সা.) প্রকৃত অনুসারীদের হাত পা কেটে দেহগুলো খুরমা গাছে ঝুলায়ে দিবে, তাদের শুলিতে চড়াবে পেটগুলো ফেড়ে ফেলবে, চোখে তপ্ত শলাকা প্রবেশ করিয়ে দেবে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াত উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য এক মহা দুঃসংবাদ। হযরত আয়েশা (রা.) মারওয়ানকে বলেছিলেন আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূল (সা.) কে তোমার ও তোমার পিতাকে শাজারা-এ-মালউন ফিল কুরআন হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে মহান আহলে বাইত হযরত যায়েদ (আ.) এর ধর্মযুদ্ধ

বনী উমাইয়াদের শাসনকাল (৬৬১-৭৫০) এর পরিস্থিতি ছিল অবর্ণনীয়। বিশেষ করে কুফায় এ অবস্থা ছিল সাংঘাতিক, কুফার শাসনকর্তা মুসলমানদের উপর ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের চাপিয়ে রেখেছিল। মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছিল, মুসলমানদের পয়সাতেই খৃস্টানদের গীর্জা মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছিল। মুসলমানদের নবী (সা.) এর উপর উমাইয়া খলিফাদের সম্মান ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা চলছিল। হযরত আলী (আ.) কে গালির রেওয়াজ বহাল ছিল। মুসলমানদের ধর্ম একটি তামাশার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাদশাহর চিন্তা ছিল প্রজাদের অবস্থা যাই হোক না কেন টাকা পয়সায় বাজকোষ পরিপূর্ণ থাকলেই যথেষ্ট। মুসলমানগণ উপবাস অবস্থায় দিন দিন কাটাইত আর শাসনকর্তার চাকর তার পুত্রের খাতনায় এত পয়সা খরচ করতো যে অন্য দেশের রাজা-বাদশাহ্র সন্তানদের খাতনায় সাই পরিমাণ অর্থ খরচ করা সম্ভব হত না। কিন্তু সমস্ত দুনিয়া চুপ ছিল। ইমাম আবু হানিফার উস্তাদের উস্তাদ ইব্রাহীম নখয়ী হাজ্জাজের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সাথে সাথে সিজদায় পতিত হয়ে শুকরিয়া আদায় করেন। কথিত আছে, তখন তার গন্ডদেশ বাহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। লৌহদন্ডের প্রতাপে উমাইয়াগণ এমন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল যে, সেখানে কোন প্রকার সংশোধনের কথা মুখে বের করাই ছিল নিজের মৃত্যু ডেকে আনা। তাই অতি বড়

দৃঢ়চেতা এবং সত্যের সাধক ও চুপ থাকাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বিশ্ব বিখ্যাত সুফি হাসান বসরী, সুফিয়ান সওরী, ইবনে সিরীন, ইব্রাহীম নখয়ী, শাবী এর ন্যায় মহান বুজুর্গ ও সত্যের একনিষ্ঠ সাধকগণও চুপ করে থাকা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সকলের মনেই সন্দেহ চাড়া দিয়ে উঠল–যদি রাষ্ট্রের এই অবস্থাই বিদ্যমান থাকে তবে অচিরেই কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখার প্রচার কাজ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে রাসূল (সা.) সে সব ইসলামী আইন-কানুন প্রবর্তন করে গিয়েছেন। লোভ-লালসার পূজারী, ক্ষমতালিপ্সু বাদশাহ্ ও তাদের কর্মচারীদের হাতে তা পর্যায়ক্রমে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই অত্যাচার, নিপীড়ন ও শ্বেত সন্ত্রাসের অন্ধকারে হঠাৎ নবী পরিবার (আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী যারা ধর্মের সংরক্ষণকারী (Protector/Defender of Faith) একজন উজ্জ্বল ভাস্কর যাবতীয় গুণের অধিকারী জনতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। এই রত্নের সন্ধানী ছিল সকল মুমিনের অন্তর। তাদের সামনে যেন রহমতের ফেরেশতা এসে দেখা দিলেন। শুধু কুফার জনসাধারণ নয় বরং সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে এক বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দিল। তিনি ছিলেন হযরত ইমাম যায়েদ (আ.), হযরত যায়েদ (আ.) ৬৯৫ খ্রস্টাব্দে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন। তার মাতা ছিলেন পারস্য রাজার কন্যা যার ফারসী নাম শাহর বানু এবং আরবী নাম সালামা ছিল। তবে হযরত যায়েদ (আ.) ঐতিহাসিকদের বিবেচনায় বাংলা-ভারত উপমহাদেশের রমনীর মহান পুত্র ছিলেন। অর্থাৎ হযরত যায়দ (আ.) এর মাতা বাংলা-ভারতীয় দাদী পারস্য দেশীয় তার মমার্থ এই যে, তিনি একই সাথে কুরায়শী, হাশেমী, ফাতেমী, উলুবী বিশেষত্বের সাথে সাথে ইরানী ও বাংলা-ভারতীয় গুণাবলী ওয়ারিশ সূত্রে পাইয়াছিলেন। এই জন্যই বর্ণিত আছে-হযরত যায়েদ (আ.) অসামান্য রূপের অধিকারী ছিলেন। শায়খ আবু মুহাম্মদ ইয়াহিয়া আশ শাফেয়ী হতে আরবাওযুল কাবীর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে হযরত যায়েদের গায়ের রং উজ্জ্বল লাল বর্ণ, বড় বড় চোখ জোড়া, মজবুত ও দীর্ঘ দেহ, দাড়ি ও মাথার চুল কালো ছিল। ওয়ারিশ সূত্রে যা কিছু পাওয়ার দরকার হযরত যায়দের মধ্যে তার সব কিছুই সমাবেশ হয়েছিল। তাছাড়া তিনি ওয়ারেশী সূত্রে শক্তি, ইলম, বুজুর্গী, বাগ্মীতা, বীরত্ব ও নির্ভীকতা ইত্যাদি গুণের অধিকারী ছিলেন।

হযরত যায়েদ (আ.) এর জ্ঞান গরীমা ও কুরআন গবেষণা

হযরত যায়েদ (আ.) এর মধ্যে তাঁর পিতার ন্যায় জ্ঞানার্জন স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল। সে যুগে যে যে বিষয়কে ইলম হিসাবে গণ্য করা হতো এবং উক্ত বিষয়ে প্রধান জ্ঞানীগণ যেখানে থাকতেন তিনি তাঁদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। কুরআন, হাদিস, ফিকাহ্র এবং ইলমে কালামে তিনি সেই যুগে এতটা দক্ষ ও পারদর্শী ছিলেন যে, লোকে তাঁকে মুজতাহিদ বলত। হযরত যায়েদ (আ.) জ্ঞানার্জনের জন্য যে শ্রম স্বীকার করেছিলেন, খুব কম লোকই তা করেছেন। বিশেষ করে কুরআনের সাথে তাঁর যে সম্পর্ক ছিল তার পরিমাণ এর দ্বারাই করা যেতে পারে। তিনি নিজে বলেছেন-'কুরআন গবেষণার জন্য আমি তের বৎসর পর্যন্ত নির্জন বাস করিয়াছি।" পৃথিবীর যাবতীয় সম্পর্কে পরিত্যাগ করে তিনি কেন তের বৎসর কুরআন অধ্যয়ন করেছিলেন? সমসাময়িক ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিভিন্ন মতবাদী লোক তাদের পৈতৃক ধর্ম বিশ্বাসের কিছু না কিছু বীজ সাথে নিয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছিল ইসলাম গ্রহণ করার পর কিছু লোক জ্ঞাতসারে এবং অধিক লোক অজ্ঞাতসারে তাদের পৈত্রিক ধর্ম-বিশ্বাসের কিছু মতবাদ ইসলামের মতবাদের সাথে মিলানোর চেষ্টা করছিল। সত্য কথা হলো হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মে যে বিভিন্ন মতবাদ ফেরকা-সম্পদায় দেখা দিয়েছি?ল তা এরই ফল। দ্বিতীয়ত হুকুমতের সাথে মুসলমানদের কি সম্পর্ক বা আচরণ বজায় রাখতে হবে। এ বিষয়টিও তারা গভীরভাবে চিন্তা করছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চল্লিশজন দরবারী ফিকাহ্বিদ ফতোয়া দিয়েছিল যে, বাদশাহ/খলিফা যা ইচ্ছা করতে পারেন। সে কারণে ইহকাল ও পরকালে তাদের জবাবদিহি করতে হবে না। তাছাড়া খারেজী মতাবলম্বীরা ও তাদের আরও কিছু লোক প্রত্যেকটি কাজে ও কথায় শিরক, বিদআত, ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগ এনে পাইকারীভাবে মুসলমানদের হত্যা করত। তাদের ধন সম্পদ লুট করত। মুসলিম মহিলা, বালক-বালিকাদের দাস-দাসীতে পরিণত করা নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসে এত ধর্মান্ধ হয়েছিল যে, রাসূল (সা.) যাঁকে তার স্থলাভিষিক্ত ও ইসলাম ধর্মের সংরক্ষক ও সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন সেই হযরত আলীকে? হযরত আলী (আ.) কে তারা বিভ্রান্ত ঘোষণা করে তাকেও তওবা করার নির্দেশ প্রদানের ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলে। তাছাড়া নবী-পরিবার, কারবালার যুদ্ধের পর যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ড হতে দূরে সরে ছিলেন। তাই সম্ভবত এই সব সমস্যার সমাধান কোথায় তা অনুসন্ধান করার জন্য হযরত যায়েদ (আ.) কুরআন অধ্যয়নে ডুবিয়া ছিলেন। পরহেজগারীতেও এই আহলে বাইতের মহান সদস্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক হাজার রাকআত সালাত আদায় ও যিকর আজকারে ব্যস্ত থাকতেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলিতেন–'নবী পরিবারের কিছু সংখ্যক বুজুর্গকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলাম। আমি সেই যুগে তাহার মত ফিকাহবিদ, আর কাহাকেও দেখি নাই। তাহার ন্যায় সরল ভাষী এবং উপস্থিত জবাব দানকারী কোন লোক আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই?। প্রকৃতপক্ষে সেই যুগে তাঁহার সমতুল্য কোন লোক ছিলেন না।" শুধু ইমাম সাহেবই নন বরং সেই যুগের নামকরা ব্যক্তিগণেরাও একথা বলিয়াছেন। বিখ্যাত পণ্ডিত শাবী বলিয়াছেন–"সম্ভবত সে যুগে কোন্ রমণীই যায়েদের ন্যায় পুত্রের জন্ম দেন নাই। তাঁহার ন্যায় ফিকাহবিদ, বীরত্বের অধিকারী, ধৈর্য্যশীল, আবেদ ও যাহেদ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমার দৃষ্টিতে ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়াও পার্থিব বিষয়েও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।" ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর উস্তাদ ইমাম জাফর সাদিক হযরত যায়দের শাহাদতের সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছেন–আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের চাচা আমাদের সকলের চেয়ে অধিক কুরআন তেলাওয়াতকারী, ধর্মীয় জ্ঞানে অধিক জ্ঞানী এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অধিক মেহেরবান ছিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের ইহকাল ও পরকালের সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের বংশে তাহার ন্যায় কোন লোক রাখিয়া গেলেন না।" তিনি এক্ সাথে শিয়াদের একটি শাখার ইমাম ও কাদেরীয়া ত্বরীকার শাজরার একজন মহান ইমাম ছিলেন।

হযরত যায়েদ (আ.) উমাইয়া শাসক হিশামের বিরুদ্ধে ৭৪০ খৃস্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হযরত যায়েদ এই শর্তে লোকদিগকে বায়াত করতেন। "আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্‌র দিকে আহ্বান করিতেছি। তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, তোমরা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। দুর্বলকে উৎপীড়ন থেকে রক্ষা কর। নিজের হক হইতে যে বঞ্চিত তাহাকে তাহার হক আদায় করিয়া দাও। মুসলমানদের যে সম্পদ বায়তুল মালে জমা রহিয়াছে সমভাবে উহা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দাও।"

হযরত ইমাম আবু হানিফা হাজার টাকার দশটি থলে দিয়া এই জিহাদে শরীক হন এবং এই জেহাদে শরীক হওয়া যে ফরজ জনগণের নিকট এই অভিমতও প্রকাশ করেন। প্রখ্যাত সুফি হযরত সুফিয়ান সাওরী মন্তব্য করেন যে, বিপদের চরম সীমায়ই পৌছিয়া তিনি তার পূর্ব পুরুষদের ন্যায় শহীদের নেতার মর্যাদা অর্জন করেছেন। কথিত আছে হযরত ইমাম যায়েদ (আ.) যখন পরাজয় নিশ্চিত মনে করলেন তখন বলেছিলেন, "আল্লাহ্‌র শোকর। যিনি এই সময় আমাকে তাহার ধর্মকে পরম সীমায় পৌঁছানোর সুযোগ দিয়াছেন। অতঃপর তিনি যাহা বলিয়াছিলেন উহাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন–আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট বিশেষভাবে লজ্জিত ছিলাম যে, কেন আমি তাহার উম্মতকে সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ ও অসৎকাজ হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দান না করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়াকে আমি অত্যন্ত গর্হিত কাজ মনে করিতেছিলাম। এই বর্ণনাতেই আছে, আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতেছি, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাহ্‌কে যখন আমি দুরস্ত করিয়া লইয়াছি তখন কেহ অগ্নিকুন্ড প্রজ্জলিত করিয়া উহাতে আমাকে নিক্ষেপ করুক উহাতে আমার কোন পরওয়া নাই। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু আওয়ান্নাহ্ হযরত যায়েদ সম্বন্ধে বলেন–হযরত যায়েদ (আ.) এর পক্ষে জীবিত থাকা দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছিল। পরকালে নানা রাসূল (সা.) এর সম্মুখে কোন মুখে দাঁড়াইবেন। এই চিন্তায়ই হযরত যায়েদ (আ.) অহরহ জ্বালিয়া পুড়িয়া মরিতেন।

উমাইয়া শাসকগোষ্ঠী যে কি জঘন্য চরিত্রের ছিল তার আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো হযরত যায়েদ (আ.) এর পবিত্র মৃতদেহের সাথে তাদের আচরণ। তার শাহাদতের পর তাঁর পবিত্র দেহ অতি গোপনে দাফন করা হয়। কিন্তু কুফার শাসনকর্তা ইউসুফ প্রভুর মনতুষ্টি করার মানসে হযরত যায়েদ (আ.) এর লাশ অনুসন্ধান করে বের করে তাঁর দেহ হতে মস্তক ছিন্ন করে বাদশাহ্ হিশামের নিকট পাঠাইয়া দেয়। হিশাম সেই পবিত্র মস্তক দামেশকে প্রকাশ্য রাজপথে লটকাইয়া রাখার নির্দেশ দেয়। এক বছর দুই মাস পর্যন্ত এই পবিত্র দেহ বস্ত্রবিহীন অবস্থায় লটকানো ছিল। এই সময়ের মধ্যে কুখ্যাত হিশাম মৃত্যুবরণ করিলে ওয়ালীদ ক্ষমতাসীন হয়। ওয়ালীদের শাসনকালে হযরত যায়েদ (আ.) এর পুত্র ইয়াহিয়া বলখের জুয়েজন জিলায় শহীদ হন। পিতার ন্যায় তাঁর মৃতদেহ রাজপথে লটকাইয়া রাখা হয়। খুরাসান, ইরাক এবং সিরিয়া পর্যন্ত যেন ইহা একটি তামাশার বস্তু (নাউযুবিল্লাহ্) লোককে দেখার জন্য লটকাইয়া রাখা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত ইমানদারদের উপর উহার পরিণতি কি ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। ক্ষমতার মোহে বনী উমাইয়াগণ উহা ভুলে গিয়েছিল। কারণ পরবর্তীতে দেখা যায় যে, বনী আব্বাসীয়দের পক্ষে আবু মুসলিম খোরাসানে যে কৃতকার্যতা অর্জন করেছিল তার মূলে ছিল বনী উমাইয়াদের এই ধরণের কার্যকলাপ। খোরাসানে বহু আব্বাসীয়দের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের প্রথম কাজ ছিল হযরত ইয়াহিয়ার লাশের নামাযে জানাযা দিয়ে যথারীতি দাফন করা। সাতদিন পর্যন্ত খোরাসানের প্রতিটি ঘরে শোক প্রকাশ করা হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এক বৎসর পর্যন্ত খোরাসানে যত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের নামই ইয়াহিয়া অথবা যায়েদ রাখা হয়েছিল।

আব্বাসীয়দের মিথ্যাচার, প্রতারণা, শ্বেত সন্ত্রাস ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল

রাসূল (সা.) এর পিতৃব্য আব্বাসের বংশধর। হযরত আব্বাস (আ.) আব্দুল্লাহ্ ফজল উবায়দুল্লাহ্ ও কায়সান এই চার পুত্রকে রেখে ৩২ হিজরীতে (৬৫৪ খৃ) ইন্তেকাল করেন। ইতিহাস ও হাদিসে ইবনে আব্বাস নামেই সমধিক পরিচিত আব্দুল্লাহ্ ৬১৯ খৃস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। চার ভাই-ই হযরত আলী (আ.) এর সাথে জংগে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধে সামিল হন। ইবনে আব্বাস সুদক্ষ যোদ্ধা ও অসাধারণ পণ্ডিত সিফিফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (আ.) এর অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। ইমাম হুসাইন (আ.) এর শাহাদতের (৬৮০ খৃঃ) পর ভগ্ন হৃদয় ইবনে আব্বাস সত্তর বৎসর বয়সে ৬৭ হিজরীতে (৬৮৭ খৃঃ) তায়েফে পরলোক গমন করেন। তাঁর পুত্র আলী, পিতার পদাংক অনুসরণ করে আহলে বাইতদের ঐকান্তিকভাবে অনুরক্ত ছিলেন। ১১৭ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয় এবং পরিবারের নেতৃত্বের স্থলাধিকারী হন তাঁর পুত্র মুহাম্মদ। অতিশয় ক্ষমতাবান ও অসীম উচ্চাভিলাষী মুহাম্মদই প্রথম স্বয়ং খিলাফত দখল করার পরিকল্পনা করেন। ১২৫ হিজরীতে তার মৃত্যুর আগে মুহাম্মদ তার দুই পুত্র ইব্রাহীম আব্দুল্লাহ্, আবুল আব্বাস (ডাক নাম আস-সাফাহ্) এবং আবদুল্লাহ্ আবু জাফর (ডাক নাম আল-মনসুর) যথাক্রমে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। মুহাম্মদ খিলাফত দখলের জন্য যে রাজনৈতিক প্রচারণা শুরু করেন তাঁর মৃত্যুর পরেও উমাইয়াদের বিরুদ্ধে তা একই নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও সাহসের সাথে চালিয়ে যাওয়া হয়। মুসলিম জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে আহলে বাইতদের ক্ষমতাসীন দেখতে যাচ্ছিল বিধায় আব্বাসী প্রচার কখনও আহলে বাইতগণের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে উমায়াদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে। তারা মুসলমানদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিল যে, তারা রসূল বংশের লোক তারা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করবে এবং তাদের হাতে আল্লাহ্র বিধিবিধান কায়েম হবে। তারা স্বীকার করত যে, তারা আহলে বাইতদের জন্য কাজ করছে। ফাতেমীয়দের প্রতি গভীর আনুগত্য স্বীকার করত এবং মুহাম্মদ (সা.) বংশধরদের প্রতি ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য তাদের সব আন্দোলন ও পরিকল্পনা একথা প্রচার করত। আহলে বাইতদের প্রতিনিধি ও সমর্থকগণ তাদের এই স্বীকৃতির পিছনে যে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা রয়েছে তাদের সন্দেহ না করে মুহাম্মদ বিন আলী ও তাঁর দলের প্রতি অনুগ্রহ ও আশ্রয় বিস্তৃত করেছিল যা তার কাজকে স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন হিসাবে জনমনে মুদ্রিত করেছিল।

ফাতেমীয়দের প্রতি পারসিকদের অনুরাগের কারণ ছিল ঐতিহাসিক ও জাতীয় যোগাযোগ। ইরানের বাদশাহ্ ইজিদেজার্দের কন্যার মাধ্যমে (শাহর বানুর স্বামী ছিলেন হযরত ইমাম হুসাইন) ফাতেমীয়রা ইরানের সিংহাসনের দাবীদার ছিলেন। ইসলামের প্রচারের প্রারম্ভে আলী (আ.) পারস্যের মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি ও সৌহার্দ পোষণ করতেন। রাসূল (সা.) একজন বিখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.) দীর্ঘকাল ধরে আলীর (আ.) সঙ্গী ও বন্ধু ছিলেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধের পর আলী তার প্রাপ্ত অর্থ ইরানী বন্দীদের মুক্তির জন্য ব্যয় করতেন এবং তার পরামর্শের সাহায্যে পুনঃ পুনঃ প্রজাদের ভার লাঘব করার জন্য খলিফা ওমর (রা.)কে উৎসাহিত করতেন। তাঁর বংশধরদের প্রতি পারসিকদের অনুরাগ সুস্পষ্ট। মুহাম্মদ বিন আলী আরব জুলুমকারীদের ঘৃণ্য শাসন থেকে পরিসিকদের আসন্ন মুক্তির কথা তাদের নিকট প্রচার করে তাদেরকে প্রতারিত করেছিলেন। খোরাসান, ফার্সি ও ইরানের অন্যান্য প্রদেশে বসবাসকারী ইয়েমেনী যারা আহলে বাইতদের প্রতি সমভাবে অনুরক্ত ছিল এবং তাদের নিকট আব্বাসীয়দের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল মুহাম্মদ বংশের ইমামদের অনুকুলেই তারা কাজ করছেন। এভাবে আব্বাসীয় বা আহলে বাইতের অনুরাগী সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি আবু মুসলিমকে তাদের সম্পর্কে আনতে সমর্থ হয়। আবু মুসলিম প্রদেশের প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে তার দলভুক্ত লোকদেরকে অবিলম্বে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়ানোর নির্দেশ দেন। বিঘোষিত কারণ হল অন্যায় দখলকারী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আহলুল বাইতের অধিকার প্রতিষ্ঠা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আহলে বাইতের সম্মানিত সদস্য ইমাম যায়েদ ও তাঁর মহান পুত্র ইয়াহিয়ার সাথে উমাইয়া শাসক কি আচরণ করে ছিল। আবু মুসালিম হযরত ইয়াহিয়ার (রা.) দেহাবশেষ সম্মানে সমাহিত করার আদেশ দেন। তার অনুসারীবৃন্দ তাদের লোক ও ইয়াহিয়া হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্পের প্রতীক হিসাবে কালো বস্ত্র ধারণ করে। সে দিন থেকে কালো রং আব্বাসীয়দের বৈশিষ্ট জ্ঞাপক প্রতীকে পরিণত হয়।

আবু মুসলিম সত্তর নিজেকে সম্পূর্ণ খোরাসানের অধিকর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে ইরাকের দিকে তার বিজয়ী বাহিনীর অভিযান পরিচালিত করেছিলেন। আন্দোলনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য তখনও কিছু প্রকাশিত হয়নি। আহলুল বাইয়াত হল সংক্ষিপ্ত বাক্য যাহা সকল শ্রেণীর মানুষকে কালো পতাকার তলে সমবেত করেছিল। কুফা তখন আত্মসমর্পন করেছিল। আবু মুসলিমের সহকারী হাসান ইবনে কাহতারা তার সেনাবাহিনীর পুরোভাগে শহরে প্রবেশ করেছিলেন এবং অবিলম্বে তার সঙ্গে যোগদান করলেন আবু সালাম যার ইবনে সোলায়মান আল খল্লিল 'যিনি' "সৌযাতুল সাফার"

লেখক বলেছেন, 'মুহাম্মদের বংশধরদের প্রধানমন্ত্রী মনোনিত হয়েছিলেন। দৃশ্যত এই লোকটি পরিবারের প্রধানের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। আব্বাসিয়া সেনাধ্যক্ষ সহানুভুতির সঙ্গে তাকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁকে চুম্বন করে সম্মানিত আসনে বসিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন আবু মুসলিমের আদেশেই তাকে সব ব্যাপারে মেনে চলতে হবে।

আবু মুসলিম ও হাসান ইবনে কাহতাবার যুগ্ম নামে পরের দিন কুফাবাসীদের জামে মসজিদে সমাবেত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। নামাযের পর বলা হলো যে, এখন প্রয়োজন একজন ইমাম ও খলিফা নির্বাচন করা এবং প্রস্তাব করা হলো যে, আবুল আব্বাসের মতো ধর্মনিষ্ঠ ও খলিফার জন্য অপরিহার্য যাবতীয় গুণের অধিকারী বিখ্যাত ব্যক্তি আর কেউ নেই।

তিনি নির্বাচনের জন্য বিশ্বাসীদের নিকট নিজেকে প্রার্থী হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। অথচ এই আন্দোলনের প্রথম দিকে পবিত্র মদীনা নগরীতে জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, মহত্ব, ধর্মপরায়নতা প্রভৃতি সদগুণের জন্য মুহাম্মদ নামক হাসান (আ.) এর বংশের যিনি তার ধর্মভীরুতার জন্য নফস-আল-যাকিয়া বা পবিত্র আত্মা খেতাব লাভ করেন। উমাইয়াদের পতন সংঘটিত করার জন্য হাশেমী বংশের সদস্যগণ একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হন।

উক্ত অধিবেশনে নফস আল-যাকিয়া মুহাম্মদকে সর্বসম্মতিক্রমে আন্দোলনের নেতা নিযুক্ত করা হয়। আল মনসুর ইমাম হিসাবে তার হাতে হাত দিয়ে আনুগত্যের শপথ নেন। অথচ এই আনুগত্যের শপথকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে আবুল আব্বাস ফাতেমীয়দের জনপ্রিয়তার উপর ভিত্তি করে আব্বাসীয়গণ অর্থাৎ আবুল আব্বাস মুসলমানদের ইমাম ও খলিফা হয়ে গেলেন। আর পরবর্তীতে ফাতেমীয়রা তাদের প্রধান শত্রু হিসাবে বিবেচিত হতে লাগলো।

উমাইয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলনে জনগণকে সামিল করার জন্য সাফফার চাচা দাউদ ইবনে আলী নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন : নিজেদের জন্য স্বর্ণরৌপ্য সংগ্রহ, রাজ প্রাসাদ নির্মাণ এবং তাতে নহর খননের জন্য আমাদের উদ্ভব হয়নি। বরং যে বিষয়টি আমাদেরকে ডেকে এনেছে, তা হচ্ছে এই যে, আমাদের আহলে বাইত এ রাসূল (সা.) এর অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। আমাদের উচ্চ বংশধরদের (আহলে বাইয়াত) উপর জুলুম-নির্যাতন চলছিল, 'বনী উমাইয়ারা তোমাদের নিয়ে চলছিল অত্যন্ত খারাপ পথে। তারা তোমাদের অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করে চলছিল। আর তোমাদের বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছিল। আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং হযরত আব্বাসের দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে, আমরা আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে শাসন কার্য পরিচালনা করব। (আততাবারী ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা ৮২-৮৩, ইবনুল আসীর ৪র্থ খণ্ড পৃ-৩২৫, আল বেদায়া, ১০ম খণ্ড, পৃ-৪১)।

অথচ বনী উমাইয়াদের রাজধানী দামেশ্ক জয় করার পর আব্বাসীয় সৈন্যরা সেখানে জঘন্য রকম গণহত্যা চালায়। এ হত্যাকান্ডে ৫০ হাজার লোক নিহত হয়। ৭০ দিন যাবত দামেশকের উমাইয়া জামে মসজিদ ঘোড়ার আস্তাবল পরিণত করা হয়েছিল। উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়াসহ সকল বনী উমাইয়ার কবর উপড়ে ফেলা হয়। হেশাম ইবনে আবদুল মালেক এর লাশ কবরে অবিকৃত অবস্থায় পেয়ে তার উপর চাবুক মারা হয়।

কয়েকদিন যাবত তা প্রকাশ্য রাজপথে ঝুলিয়ে রাখা হয়। অতঃপর আগুনে পুড়িয়ে তার ছাই উড়িয়ে দেয়া হয়। বনী উমাইয়াদের শিশুদেরকেও হত্যা করা হয় এবং তাদের রক্তাক্ত লাশের উপর ফরাশ বিছিয়ে খাদ্য খাওয়া হয়।

বসরায় বনী উমাইয়াদের হত্যা করে মৃতদের ধরে টেনে টেনে এনে রাস্তায় ফেলা হয়। সেখানে শৃগাল-কুকুর তাদের লাশ ভক্ষণ করে। মক্কা মদীনায়ও তাদের সাথে এ ধরণের আচরণ করা হয়। (আত্তাবারী ৬ খণ্ড, পৃ-৮২-৮৩, ইবনুল আসীর ৪র্থ খন্ড পৃ-৩২৫) সাফফার বিরুদ্ধে মসুলে বিদ্রোহ করা হলে তার ভ্রাতা ইয়াহহিয়াকে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠানো হয়। সে ঘোষণা করে : যে ব্যক্তি শহরের জামে মসজিদে প্রবেশ করবে, তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। হাযার লোক মসজিদে প্রবেশ করলে দরজায় পাহারা বসিয়ে আশ্রয় গ্রহণকারীদের পাইকারী হারে হত্যা করা হয়। যেসব স্ত্রীর স্বামী এবং অভিভাবকদের হত্যা করা হয় রাতের বেলা তাদের কান্না ইযাহহিয়ার কানে ভেসে আসে। এমনিভাবে ৩ দিন মসুলে গণহত্যা চলে, স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কাউকে ক্ষমা করা হয় নাই। এরপর আসে গণ ধর্ষণের পালা।

সাফফাহ্ নিজ হাতে ইয়াযীদ ইবনে আমর ইবনে হুবায়রাকে নিরাপত্তামূলক চুক্তিপত্র লিখে দেন। পরে চুক্তিপত্র লংঘন করে তাকে হত্যা করেন। আব্বাসীয়রা কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহ্র বিধি-বিধান কায়েম করবে-এ শর্তে এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খোরাসানের মশহুর ফকীহ ইবরাহীম ইবনে মায়মুন আসসায়েগ তাদের আহ্বানে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিপ্লব সফল হওয়া পর্যন্ত তিনি ছিলেন আবু মুসলিম খোরাসানীর দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু বিপ্লব সফল হওয়ার পর তিনি আবু মুসলিমের নিকট আল্লাহ্র বিধি-বিধান কায়েমের দাবি এবং কুরআন সুন্নাহ্ বিরোধী কার্যকলাপের

বিরুদ্ধে আপত্তি জানালে আবু মুসলিম তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। (আত্তাবারী ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩৩৯-৩৪০, ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা-১৭৭) আল বেদায়া, ১০ম খণ্ড পৃ-৬৮)

এসব ঘটনাবলী শুরু থেকেই একথা প্রমাণ করে যে, বনী উমাইয়াদের মতো আব্বাসীয়দের শাসনও ছিল দ্বীন-ধর্ম বর্জিত শাসন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা লংঘনে উমাইয়ারা যেমন দ্বিধা করতো না তেমনি আব্বাসীয়দের কোন দ্বিধা ছিল না। আব্বাসীয়ারা যে বিপ্লব সাধন করে তাতে কেবল শাসকের পরিবর্তন হয়েছে। শাসন পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হয়নি। তারা উমাইয়া যুগের কোন একটি বিকৃতির সংশোধন করেনি। বরং খেলাফতের রাশেদার পর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার যে সব পরিবর্তণ সাধিত হয়েছে তারা তার সবটুকু পুরোপুরি বহাল রাখে।

বনী উমাইয়া যেভাবে রাজ কার্য চালিয়ে আসছিলেন আব্বাসীয় আমলেও সেভাবেই চলতে থাকে। পার্থক্য হয়েছে কেবল এটুকু যে, বনী উমাইয়াদের জন্য আদর্শ ছিল কনস্টানটিনোপলের কাইজার আর আব্বাসীয়দের জন্য অনুসরনীয় হয়েছে ইবানের কিসবা বা কায়সার যার একই অর্থ।

শুরা ভিত্তিক শাসন গল্প হিসাবে খুব জনপ্রিয় ছিল। তবে শাসন কাজে এটি প্রয়োগের কথা বল্লে তার জীবন বাঁচানো সম্ভব ছিল না। বায়তুল মালের ব্যাপারে তাদের কর্মধারা উমাইয়াদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল না। বায়তুল মালের আয়-ব্যয়ের কোন ব্যাপারেই শরীয়তের বিধান এবং নিয়মনীতি মেনে চলার চিন্তাও স্বপ্নে আনা হতো না। জনগণের নয় বরং তা বাদশাহ্‌দের ধন ভাণ্ডারে পরিণত হয় বায়তুল মাল। আর আয় ব্যয়ের ব্যাপারে কারো জিজ্ঞাসাবাদ করার কোন অধিকার কারো ছিল না।

বিচার বিভাগের উপর খলিফা, রাজ প্রাসাদের ব্যক্তিবর্গ, শাসক ও পরিষদবর্গের হস্তক্ষেপ তেমনি চলতে থাকে। যেমনি চলছিল বনি উমাইয়াদের শাসনামলে খলিফা আল মেহেদীর (৭৭৫-৭৮৫ খৃ.) সময় তার জনৈক সিপাহসালার এবং একজন ব্যবসায়ীর মামলাকারী ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে হামানের আদালতে পেশ করা হয়। খলিফা কাযীকে লিখে পাঠান যে, এ মামলার রায় আমার সিপাহসালার এর পক্ষে করবেন। কাযী তার নির্দেশ পালন না করায় তাঁকে বরখাস্ত করেন। হারুনুর রশীদের (৭৮৬-৮১৪ খৃ.) শাসনকালে কাযী হাফস্ ইবনে গিয়াস খলিফার বেগম যুবায়দার জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফায়সালা করলে তাঁকে চাকুরী হারাতে হয়।

আব্বসীয়দের ক্ষমতা লাভের আইনগত ভিত্তি

শাসন ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) অভিমত এই ছিল যে, প্রথমে শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতা অধিকার করে প্রভাব খাটিয়ে বায়আত (আনুগত্যের) শপথ গ্রহণ করা ক্ষমতা দখলের কোন বৈধ উপায় নয়। বরং মতামতের অধিকারী ব্যক্তিদের সম্মতি এবং পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতই সত্যিকার খিলাফত। উল্লেখ্য, উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকরা এই পন্থায়ই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিজেরা মুসলমানদের স্বঘোষিত ইমাম, খলিফা ও আমীরুল মোমেনিন বনে বসে। যা হোক, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর এই মতামত এমন নাজুক পরিস্থিতিতে ব্যক্ত করেছেন, যখন এ মত মুখে উচ্চারণকারীর ঘাড়ে মস্তক থাকার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। খলিফা আল মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ খৃ.) এর সেক্রেটারী রবী ইবনে ইউনুসের উক্তি : তিনি ইমাম মালেক (রঃ) ইবনে আবিযেব এবং ইমাম আবু হানিফাকে ডেকে বলেন; আল্লাহ্‌তালা এ উম্মতের মধ্যে আমাকে এ রাজত্ব দান করেছেন। এ ব্যাপারে আপনাদের কি মত? আমি কি এর যোগ্য? স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রতারণা, মিথ্যাচার, অসংখ্য খুন, নির্যাতন, জুলুমবাজী, ওয়াদার বরখেলাপ ইত্যাদি অবৈধ পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি ক্ষমতা দখল করে এর দায়-দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর চাপাচ্ছেন। উমাইয়ারাও নিজেদের অপকর্ম আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করতো। যাক এবার দেখা যাক এই সব আলেম এর উত্তরে কি বলেন। ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, "আপনি এর যোগ্য না হলে আল্লাহ্‌তালা তা আপনাকে সোপর্দ করতেন না। সবচেয়ে জনপ্রিয় অপবাদ ইবনে আবিযের বলেন, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন। কিন্তু পরকালের রাজত্ব তিনি তাকে দান করেন, যা তা কামনা করে এবং এ জন্য আল্লাহ্ যাকে তাওফীক দেন। আপনি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলে তার তাওফীক আপনার নিকটতর হবে। অন্যথায় তাঁর নাফরমানী করলে তাঁর তওফীক আপনার থেকে দূরে সরে যাবে। আসল কথা এই যে, আল্লাহ্ ভীরু ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে খেলাফত (শাসন ক্ষমতা) নিষ্পন্ন হয়। আর যে ব্যক্তি নিজে খেলাফত অধিকার করে। তার মধ্যে কোন তাকওয়া-আল্লাহ্‌ভীতি নাই। আপনি ও আপনার সহায়করা তাওফীক থেকে দুরে ও সত্যচ্যুত। এখন আপনি যদি আল্লাহ্‌র কাছে শান্তি কামনা করেন। পূত পবিত্র কর্মধারা দ্বারা তাঁর নৈকট্য অর্জন করেন, তাহলে এ জিনিসটি আপনার ভাগ্যে জুটবে। অন্যথায় আপনি নিজেই নিজের শিকার হবেন।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, ইবনে আবিযের যখন একথা বলেছিলেন, তখন আমি এবং মালেক (রঃ) নিজ নিজ কাপড় সংবরণ করে নিচ্ছিলাম যে, সম্ভবত তখনই তাঁর শিরচ্ছেদ করা হবে এবং তার রক্তের ছিটা আমাদের কাপড়ে পড়বে। অতঃপর মনসুর

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর দিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করেন। আপনার কি মত? ইমাম সাহেব জবাবে বলেন : দ্বীনের খাতিরে সত্য পথের সন্ধানী ব্যক্তি ক্রোধ থেকে দূরে থাকে। আপনি আপনার বিবেককে জিজ্ঞেস করলে নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, আপনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র খাতিরে ডাকেন নি; বরং আপনার অভিপ্রায় হচ্ছে। আমরা আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী কথা বলি। আর আমাদের উক্তি জনসমক্ষে আসুক। জনগণ জানুক, আমরা কি বলি। সত্য কথা এই যে, আপনি এমন পন্থায় খলিফা হয়েছেন যে, আপনার খেলাফতের ব্যাপারে মতামতের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্য হতে দু'জন লোকের ঐক্যমত্যও স্থাপিত হয়নি। অথচ মুসলমানদের সর্বসম্মতি এবং পরামর্শক্রমেই খেলাফত সম্পন্ন হয়।

এ কথাগুলো বলে তিনজনই উঠে পড়েন। পেছনে মনসুর রবীকে তিন থলি দেরহাম দিয়ে ব্যক্তি তিনজনের নিকট প্রেরণ করেন। রবীকে মনসুর বলে দেন, মালেক তা গ্রহণ করলে তা তাকে দিয়ে দেবে। কিন্তু আবু হানীফা (রঃ) এবং ইবনে আবিযেব তা গ্রহণ করলে তাদের শিরচ্ছেদ করবে। ইমাম মালেক এ দান গ্রহণ করেন। ইবনে আবিযেব এর নিকট গমন করলে তিনি বলেন, আমি স্বয়ং মনসুরের জন্যও তো এ অর্থকে হালাল মনে করি না; নিজের জন্য তা কি করে হালাল মনে করি। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, আমার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হলেও আমি এ অর্থ স্পর্শ করবো না। এ বিবরণী শুনে মনসুর বলেন, এদের নিস্পৃহতা (দুনিয়া ত্যাগী) মনোভাব) তাদের দু'জনের প্রাণ রক্ষা করেছে। (সূত্রঃ আল-কারদারীঃ মানাকেবুল ইমামিল আযম, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫-১৬)।

রাজা বাদশাহ্‌দের ক্ষমতাসীন হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধিতা সর্বজনবিদিত। আপাতদৃষ্টিতে ইমামদের সিদ্ধান্ত যৌক্তিক মনে হলেও তার সবটাই ধর্মনিষ্ঠ নয়। যার প্রমাণ পাওয়া যায় আব্বাসীয় খলিফা মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খৃ.) রাজত্ব কালে। খলিফা সেই সময়কারের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম, ফকীহ্‌, ইসলামী চিন্তাবিদ, সুফি সবাইকে ডেকে ইমামত ও খেলাফতের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে এ সম্পর্কে তাদের মতামত পর্যালোচনা করে নিশ্চিত হন যে, এ ক্ষেত্রে আহলে বাইত-এ-রাসূল (সা.) অর্থাৎ নবী বংশের। পবিত্র কুরআন, সহীহ্‌ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের রায় এটাই। তাই খলিফা মামুন নিজে সিংহাসন ত্যাগ করে তদানীন্তন মুসলিম জাহানের সর্বজন মান্য আহলে বাইত ইমাম হযরত আলী রেযাকে খলিফা হওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। ইমাম আলী রেযা এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে খলিফা মামুন এক প্রকার জোর করেই ৮১৫ খৃস্টাব্দে হযরত ইমাম আলী রেযাকে ওলী এ আহাদ তথা স্থলাভিষিক্ত হিসাবে নিয়োগ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আব্বাসীয়দের কালো রংয়ের পরিবর্তে আহলে বাইতের সবুজ রং রাষ্ট্রীয় রং হিসাবে ঘোষণা দেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বৈধ মালিকানা বিষয়টি মামুন যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন তাই সেই সময়কার আলেমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল, অথচ এই নীতি আজ পর্যন্ত আহলে সুন্নাত আল জামাতে নেতৃবৃন্দ তা সমর্থন করেন নি। অথচ আহলে বাইতেরও পক্ষে এতবড় সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য খলিফা মামুনকে কেহই শিয়া বলে না। অথচ এই একই কারণে খলিফা মুতওয়াকিকাল (৮৪৭-৮৬১ খৃ.) এই বিশ্বাসের কারণে শিয়া বিদ্বেষী হয়ে শহীদ হুসাইন (রা.) সমাধি সৌধ ভূমিসাৎ করেন এবং তার উপর দিয়ে প্রবাহিত করেন জলস্রোত। কঠোরতম দণ্ডাজ্ঞা আরোপ করে পবিত্র স্থানে তীর্থ যাত্রা নিষিদ্ধ করা হয় এবং ফাদাকের (মা ফাতেমার মালিকানাধীন সম্পত্তি যা সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তা আহলে বাইতকে তা ফেরৎ দেন)। সত্যি বিচিত্র এই ধর্ম রাজনৈতিক (Religo Politics) বিদ্বেষ।

সপ্তম অধ্যায়

আব্বাসীয় খলিফাদের শরীয়ত বিরোধী জীবন যাত্রা

আব্বাসীয় নৃপতিগণ ও উমাইয়া বাদ্‌শাহ্‌দের ন্যায় মহা আড়ম্বরে ও জাঁকজমকে জীবন যাপন করেন। চকমকে ইউনিফরম পরিহিত দেহ রক্ষীরা তাদেরকে ঘিরে থাকত। খলিফা জানুর নিম্ন পর্যন্ত কামিজ পরিধান করে মনিমুক্ত খচিত কোমরবন্ধ কোমরে বেঁধে কাঁধের উপর মূল্যবান চাদর চড়িয়ে কালামসূযা নামক চৌথা মাথাবিশিষ্ট টুপি পরতেন। এই টুপি বাদশাহ্‌ মনসুর প্রবর্তন করেন। দেহরক্ষীগণ খোলা তরবারি হাতে তার চারদিকে দণ্ডায়মান থাকত। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি ও যুবরাজগণ সিংহাসনের ডাইনে ও বামে সারিবদ্ধ থাকত। খলিফা পর্দার (কৃত্রিম মর্যাদার সৃষ্টির জন্য) অন্তরালে থাকতেন। পর্দা উত্তোলিত হলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নাম উচ্চারিত হতো। তারা অভিবাদন করে আসন গ্রহণ করতেন এতদুপলক্ষে ভাবী উত্তরাধিকারী খলিফার পার্শ্বে একটি আসনে উপবিষ্ট থাকতেন।

খলিফা মামুনের ৮২৫ খৃস্টাব্দে (২১০ হিজরী রমযান মাসে) তাঁর উজির হাসান বিন সহলের সুন্দরী কন্যা বুরান নামে অভিহিতা খাদিজাকে বিয়ে করেন। বিয়ের আড়ম্বর থেকেই এই যুগের বাগদাদ দরবারের জাঁকজমক সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। বিপুল আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন হয়। ফাসউসসিলহ নামক স্থানে, যেখানে হাসান তখন বাস করতেন। এখানে উজির বিলাস বহুল আড়ম্বরতার সাথে সকল বরযাত্রীকে সতের দিন ধরে আপ্যায়িত করেন। এই বিবাহে হাসানের ব্যয় হয়েছিল

পাঁচ কোটি দিরহাম। এ বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন জুবাইদা (খলিফা হারুনের স্ত্রী) ও তাঁর কন্যাসহ রাজপরিবারের অন্যান্য মহিলারা। উৎসবে তার (কন্যার) মাতামহী খলিফা ও বধুর উপর সোনার থালা থেকে অতুলনীয় আকৃতি ও সৌন্দর্য মণ্ডিত মুক্তা বর্ষন করেছিলেন। খলিফার আদেশে সেগুলি সংগৃহীত হয় এবং তৈরী করা হয় একটি হার এবং তা নব পরিনীতা মহিষীকে দেওয়া হয়। বিবাহ মজলিসটি আলোকিত করা হয়েছিল সোনার সামদানের উপর রক্ষিত আশি পাউন্ড ওজনের তৈল দ্বারা প্রস্তত প্রদীপ শিখায়। রাজকীয় যাত্রী দল যখন বিদায় গ্রহণ করছিল তখন রাষ্ট্রের প্রধান অমাত্যদেরকে উজির সম্মানজনক খিলাত উপহার দেন এবং খলিফার সাথে সমাগত শাহজাদা ও প্রধান রাজকর্মচারীদের উপর বর্ষণ করেন মৃগনাভির গোলাসমূহ। এই সব গোলার প্রত্যেকটির সাথে ছিল একটি করে টিকিট। যাতে একটি জায়গীর, একটি ক্রীতদাস, একপাল ঘোড়া কিংবা এই ধরণের কিছু দানের নামাল্লেখ ছিল। অতঃপর প্রাপক সেটি নিয়ে যান একজন প্রতিনিধিরর কাছে। যিনি তাকে ঐ সম্পদ প্রদান করেন। যা তার ভাগ্যে পড়েছিল। সাধারণ লোকদের মধ্যেও তিনি ছড়িয়ে দেন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, মৃগণাভির গোলা এবং ডিম্বাস্কার তৈল স্ফটিক। ব্যয় নির্বাহের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বাদশাহ্ মামুন হাসানকে ফার্স ও আহয়াজের এক বছরের রাজস্ব প্রদান করেন। (তথ্যসূত্র: এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস্ সৈয়দ আমীর আলী, পৃষ্ঠা-২৬৪-২৬৫)।

মনে রাখতে হবে এই ধরণের অনৈমলামিক দরবারী কালচার মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্টান্ডার্ড রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড বা আদব হিসাবে বিবেচিত হতো। উল্লেখ্য মুয়াবিয়া যখন দামেস্কে তার প্রাসাদ নির্মাণ করছিলেন তখন বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবুযর গিফারী (রা.) বলেছেন, রাষ্ট্রীয় খরচে এ কাজের ধর্মীয় অনুমোদন নাই আর যদি তা ব্যক্তিগত অর্থ হয়ে থাকে তাহলে কুরআন মতে তা অপচয়। অথচ আব্বাসীয় আলেমগণ এই আচার-আচারণকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য হিসাবে বিবেচনা করে ফতোয়া দিতেন। ফলে এগুলো ইসলাম ধর্মীয় কালচারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করে ফতোয়া দিতেন। ফলে এই ধরণের কর্মকাণ্ড ইসলাম ধর্মীয় কালচার হিসাবে মুসলিম সমাজে চালু হয়। এ কারণেই পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম নৃপতিগণ (আফগান, মুঘল, ওসমানী সাম্রাজ্যে দরবারী কালচারকে অনুসরণ শরীয়তসম্মত বিবেচনা করতেন। এই ধারা বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যহত রয়েছে।

আব্বাসীয়দের বিচার ব্যবস্থা

বসরার বিখ্যাত গ্রন্থকার আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুকাফিকা আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের নিকট তৎকালীন বিচার বিভাগ সমন্ধীয় অভিযোগ নিম্নরূপ ভাষায় প্রেরণ করেছিলেন : আদালতের বিচার রায় সম্পর্কে যে দারুন মতবিরোধ ও মতভেদ দেখা দিয়াছে আমি সেদিকে আমীরুল মুমেনীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লোকের জান-মাল-মান-ইজ্জত সম্বন্ধে এই প্রকার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ঘটনা এই যে, হীরার (কুফা হতে ছয় মাইল দূরবর্তী শহর) কাযী যে মামলায় গর্দান উড়াইয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন ঠিক তদ্রূপ মামলায় দেখা গিয়াছে কুফার কাযী হীরার কাযীর বিপরীত রায় দিয়াছেন। বহু ফয়সালা তো বনী উমাইয়া হুকুমতের দৃষ্টান্তে সমাধা করা হয়। যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, এরূপ ফয়সালা কোন দলীল হতে করা হইল। তখন কাযীগণ না রাসূলুল্লাহ্ (সা.) না খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের বরং কাযীগণ বলিয়া থাকে আব্দুল মালেক ইবনে মারোয়ানের যুগে অমুক কাযী এরূপ মামলার এরূপ রায় দিয়াছিলেন। এরূপ অন্যান্য শাসকবৃন্দের দৃষ্টান্ত দিয়া প্রশ্নকারীকে চুপ করাইয়া দেয়।"

হারুনুর রশীদ হাফস ইবনে গিয়াসকে বাগদাদের কাযী নিযুক্ত করেন। ঘটনাক্রমে হারুনুর রশীদের প্রিয়তম স্ত্রী যুবায়দার প্রধান দেহ রক্ষীর নামে কাযীর আদালতে শালিশ করা হইল। প্রধান দেহরক্ষী ঋণগ্রস্ত ছিল। কাযী সাহেব তাহার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করিলে বেগম যুবাইদা ক্রদ্ধ হইয়া বলিল, আমার লোক জানা সত্ত্বেও কাজী সাহেব কিভাবে তাহার বিরুদ্ধে রায় দিলেন। অতঃপর বাদশাহ্ মহলে আসিলে কাযীকে বরখাস্ত করানোর জন্য চাপ দিলেন। হারুনুর রশীদ স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য কাযীকে বরখাস্ত করলেন। বাদশাহদের এ প্রকার অন্যায় পক্ষপাতিত্বের ফলে সে যুগের বহু পরহেজগার ও দায়িত্ববান ব্যক্তি হুকুমতের পক্ষ হতে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেহ কাযীর পদ গ্রহণ করতে রাজী হতেন না। জোর জরবদস্তি করে কাকেও রাজী করালেও তিনি সাহস করে খলিফার নিকট হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন যে, তার বিচারকার্যে কেহ কোন প্রকার ব্যক্তিগত চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। অতঃপর কাযীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ওয়াদাও করা হতো। কিন্তু সেই ওয়াদা শুধুমাত্র ভাঙ্গার জন্য করা হতো। এ প্রসঙ্গে কাযী শরিফের সাথে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এর দ্বারা খলিফাদের কার্যনীতি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। কথিত আছে-আবু জাফর মনসুর, আব্বাসীয় কাযী শরিফকে কাযীর পদ গ্রহণ করতে বলেন। প্রথমে তিনি টাল বাহানা করিতে লাগলেন। অবশেষে মনসুরের চাপে নিরুপায় হয়ে খলিফাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি আমার বিবেক বুদ্ধির মত বিচার কার্য পরিচালনা করিব এবং কাহার বিপক্ষে রায় দিচ্ছি সে চিন্তা করিবনা সে খলিফার আপনার লোক হোক কিংবা দরবারী লোক হোক। এ বিষয়ে

আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। মুখের কথা বলতে দুরাচার মনসুরের ক্ষতি কোথায়? মিথ্যা ওয়াদা ও প্রতারণা এই রাজত্বের ভিত্তি। তাই মনসুর বলল-আপনি আমার সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কেও ফয়সালা করতে পারবেন। কাযী সাহেব জানতেন সেই সময়ে বাদশাহ্‌র চেয়েও বেশি ভয় ছিল খলিফার দরবারীদের। তাই কাযী সাহেব প্রকাশ্যে বললেন, আপনি আমাকে আপনার দরবারী এবং আমীর উমরাদের হাত হতে রক্ষা করবেন। মনসুর এ বিষয়েও প্রতিশ্রুতি দিলেন। সব বিষয়ে পাকাপাকি করার পর কাযী সাহেব যেদিন প্রথম এজলাসে বসিলেন দুর্ভাগ্যবশত সেদিনকার প্রথম মামলাই ছিল খলিফার আযাদকৃত দাসী যে অন্য কোন একটি লোকের সাথে জড়িত ছিল। বিচার এজলাসের রীতিনীতি প্রথম হতেই বিগড়ানো ছিল। এজলাসে যখন উভয় পক্ষ হাজির হলো তখন অভিযুক্ত রাজদাসী ছিল বলে তার প্রতিপক্ষের সমান স্থানে দণ্ডায়মান হওয়া সে অপমানজনক মনে করে সামনে অগ্রসর হয়ে কাযী সাহেবের সম্মুখে দাঁড়ালো। দাসী নিশ্চিত ছিল যে, শাহী লোকদের সাথে আদালত এরূপ ব্যবহারই করে থাকে। কিন্তু দাসী জানতো না যে, সে যেমন নিজেকে শাহী মর্যাদাসম্পন্ন মনে করছিল নতুন কাযী সাহেবও তেমনি শাহী প্রতিশ্রুতি মত নিজের চিন্তায় বিভোর। হে নাপাক রমনী পিছনে সরে যা। কাযী সাহেবের মুখে এই কথা শুনে দাসীর চমক ভাঙ্গল। সে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কাযীকে বলল, 'বৃদ্ধ আহম্মক', একজন সাধারণ দাসীর মুখে এই কথা শুনে ইসলামের একজন প্রসিদ্ধ আলেম হতবাক হয়ে গেলেন এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য আফসোস করতে লাগলেন। মনসুরের প্রতিশ্রুতি বহাল থাকা সত্ত্বেও কাযী সাহেবকে তার পদ থেকে অপসারিত করা হলো।

ইবনে খাল্লিকানে লিখিত আছে খলিফা মেহেদী বিখ্যাত আল্লাহ্‌র অলি হযরত সুফিয়ান সাওরীকে বন্দী করে দরবারে আনলেন এবং কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য বললেন, সুফিয়ান তা অস্বীকার করে এক পর্যায়ে খলিফা ও তাহার দরবারীদের অনধিকার চর্চা সম্বন্ধে বললেন, মোহেদীর পিতা মনুসরের ন্যায় মৌখিক নয় বরং লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেন। কুফায় কাযী পদে বহাল করার নিয়োগপত্রে এই শর্ত লিখিয়া দাও যে তার রায়ের বিরোধিতা করা হবে না। হযরত সুফিয়ান নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে দরবারে কক্ষ হতে বের হয়ে আসলেন এবং পথিমধ্যে নিয়োগপত্রটি তাইগ্রীস নদীতে নিক্ষেপ করলেন।

আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে নফ্‌সে জাকিয়ার বিদ্রোহ তথা জিহাদ

ইসলামের রাজনৈতিক সমস্যার প্রথম অবস্থা ছিল কারবালার প্রান্তরে। যখন আহলে বাইতের হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) শাহাদাত লাভ করেন। হযরত যায়দ (আ.) যিনি উমাইয়া রাজত্বের শেষ ভাগে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। যাঁর শাহাদাতের উপর ভিত্তি করে আব্বাসীয়রা ক্ষমতাসীন হয়। এতদিন পর্যন্ত হাসানী সৈয়দদের পক্ষ থেকে কোন রাজনৈতিক তৎপরতা প্রকাশ পায় নাই। আব্বাসীয় খলিফা মনসুর আবুল আব্বাসের পর ক্ষমতাসীন হয়। তখন হাসানী সৈয়দ বংশের আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ। ছোট বয়স থেকেই তাঁর ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা দেখে লোকে তার নাম নফসে যাকিয়া অর্থাৎ পবিত্র ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করে। এই নফসে যাকিয়ার নামে আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে আহলে বাইতদের এই মহা বিপ্লব শুরু হয়। সৈয়দ আবদুল্লাহ্‌র ভাই ও অন্যান্য পুত্রগণ বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নফসে যাকিয়া মদীনায় নিজেকে খলিফা হিসেবে প্রচার করেন। তার পুত্র আলী ইবনে মুহাম্মদকে মিশর, অন্য পুত্র আব্দুল্লাহ্‌কে খোরাসান, অন্য পুত্র হাসানকে ইয়ামান, তাহার ভাই মুসাকে মুসেল, ইদরীসকে আফ্রিকার মরক্কো, অন্য ভাই ইবরাহীমকে বসরায় প্রেরণ করা হয়েছিল। হাসানী বংশের এই বিপ্লব কোন সাধারণ বিপ্লব ছিল না। এক দিনেই আব্বাসী বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করা হইবে। ভিতরে ভিতরে এই প্রস্তুতি চলিতেছিল। প্রত্যেকে স্ব স্ব এলাকায় মুসলিম অধিবাসীদেরকে হাতে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইদ্‌রিস বিন আবদুল্লাহ মরক্কো ও আফ্রিকার শেষ প্রান্তে একটি স্বতন্ত্র ফাতেমী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যান্যরা আব্বাসী খলিফার পরাজয় বরণ করে যাহারা যেখানে ছিলেন সেখানেই শহীদ হলেন। কেহ বা বন্দী হয়ে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করেন। স্মরণ করা প্রয়োজন, এক সময় উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সঙ্গে অন্যান্যদের সাথে নফস যাকিয়ার হাতে স্বয়ং মনসুরও বাইয়াত গ্রহণ করে। মিথ্যাচারের মাধ্যমে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আহলে বাইতদের আন্দোলন গোপনে চলতে থাকে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) আহলে বাইতদের এই বিপ্লবের সর্বাত্মক সহায়তা করে ইব্রাহীমের সহযোগিতার দীক্ষা দিতেন তার বায়াআত করার জন্য উপদেশ দিতেন। ইব্রাহীমের সাথে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকে তিনি নফল হজ্বের চেয়ে ৫০-৭০ গুণ পুণ্যের কাজ বলে অভিহিত করেন।

আবু ইসহাক আল-ফাযাবী নামক জনৈক ব্যক্তিকে তিনি একথাও বলেন যে, তোমার ভাই ইবরাহীমের সহযোগিতা করছেন। তোমার কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ করা থেকে তোমার ভাই এর কাজ অনেক উত্তম। তার মতে মুসলমান সমাজকে অভ্যন্তরীণ

নেতৃত্বের গোলযোগ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা বাইরের কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে অনেক গুণ অধিক মর্যাদার কাজ।

তা অত্যাচারী সরকাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কেবল জায়েজ-বৈধ নয়, বরং ওয়াজেব। ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) এই চিন্তা ধারার সাথে ইমাম মালিক সম্পূর্ণরূপে একাত্মতা ঘোষণা করেন। নফসে যকিয়ার বিদ্রোহের সময় তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়; আমাদের ঘাড়ে তো মনসুরের বায়আত রয়েছে। তখন আমরা খেলাফতের অপর দাবিদারদের সহযোগিতা করতে পারি কি? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি ফতোয়া দিয়ে বলেন; আব্বাসীয়দের বায়আত জোর-জবরদস্তী বায়আত। আর জোর জবরদস্তী বায়আত-কসম-তালাক-যাই হোক না কেন তা বাতিল। তার এ ফতোয়ার ফলে অধিকাংশ লোকই নফসে যাকিয়ার বিদ্রোহে সামিল হয়।

মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নফসে যাকিয়া এবং তার ভাই ইব্রাহীমের আত্মগোপনকালে তাদের ঠিকানা বলে না দেয়ার অপরাধে আব্বাসীয় জালেম শাসক তার মুর্শেদের পরিবারের সদস্যবর্গ এবং আত্মীয় স্বজনকে গ্রেফতার করে। তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম করা হয়। তাদেরকে হাত কড়া লাগিয়ে মদীনা থেকে ইরাকে নিয়ে যাওয়া হয়। মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল হাসানকে জীবন্ত দেয়ালে পিষে হত্যা করা হয়। ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লার শ্বশুরকে উলঙ্গ করে দেড়শ কোড়া মারা হয়। তারপর তাকে হত্যা করে খোরাসানের রাস্তায় রাস্তায় তার মস্তকের প্রদর্শনী করা হয়। তারা জনগণের সামনে সাক্ষী দিচ্ছিল যে, এটা নফসে যাকিয়ার মস্তক। নফসে যাকিয়া মদীনায় শহীদ হলে তাঁর শিরচ্ছেদ করে শহরে শহরে প্রদর্শনী করা হয়। তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের লাশ তিন দিন যাবত মদীনার রাজপথে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং পরে সালি'মা পর্বতের নিকটে ইহুদীদের গোরস্থানে নিক্ষেপ করা হয়। এসব ঘটনাবলী থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আব্বাসীয়রা তাদের পূর্বসূরী উমাইয়াদের মতই ধর্মহীন ও খোদাদ্রোহীই ছিল। তাদের ক্ষমতায় যাওয়ায় দ্বীন ইসলামের কোন উপকার হয়নি। যদিও কিছু অজ্ঞ মুর্খরা এই সব মুসলমান নামধারী ব্যক্তিবর্গের সামাজিক সাফল্য তথা রাজ্য বিস্তারকে ইসলামের মহা বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করে আত্ম তৃপ্তি লাভ করে।

আব্বাসীয় ধর্মমত একটি পর্যালোচনা

আব্বাসীয়রা যদিও প্রচলিত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সার্বিকভাবে সকল আব্বাসীয় খলিফাগণ এই ধর্ম মতের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিল না। আব্বাসীয় খিলাফত পাঁচশত বছর ক্ষমতাসীন (৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে) ছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ধর্মমত প্রাধান্য পায়। তাছাড়া বাদশাহ্গণের ব্যক্তিগত ধর্মমত প্রজাকুলকে প্রভাবিত করবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে তা প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই সে যুগের স্বাভাবিক দাবী ছিল। আবার একজন বাদশাহ্ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক ধর্মমত অনুসরণ করায় পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে। আব্বাসীয়গণ তাদের সরকারকে দৌলঅহ-নবযুগ-বা রেনেসাঁ বলে অভিহিত করতো। তারা বিশ্বাস করতো রাসূল (সা.) এর আমলের তারাই হলো ধারক ও বাহক। রাসূল (সা.) যেমন একই সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে আব্বাসীয়গণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের দাবিদার হিসাবে নিজেদেরকে ঘোষণা করে। এ কারণেই খিলাফত প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় দিক আব্বাসীয় আমলে অধিকতর আকর্ষণীয় হয় এবং খলিফাকে 'জিল্লুল্লাহে আলাল আরদ' বা 'দুনিয়ায় আল্লাহ্র প্রতিচ্ছবি' যদিও তারা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিল এবং ইমাম আবু হানিফার ভাষ্য মতে জনগণের মধ্যে কোন দুইজনও এইসব বাদশাহদের নিয়োগের বৈধতার ব্যাপারে একমত ছিল না। কিন্তু দরবারী আলেমগণ এইসব রাজাদের কাছ থেকে বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল করার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনের ও হাদিসের অপব্যাখ্যা করে আব্বাসীয় খলিফাকে রাসূল (সা.) প্রতিনিধি বা নায়েবে রাসূল হিসাবে অভিহিত করে। তাই খলিফাগণ এই ফতোয়াকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে। ফলে বাদশাহ্দের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কথা বলা হলে আল্লাহ্র রাসূলের বিরোধিতা করা এবং আল্লাহ্র রাসূলের বিরোধিতা অর্থাৎ আল্লাহ্র বিরোধিতা করা। অর্থাৎ রাজনৈতিক কারণে বাদশাহ্র বিরুদ্ধে কোন কথা বলা হলে তা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে তাদের ধর্মদ্রোহী হিসাবে ঘোষণা করে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদানের তথাকথিত বৈধ ক্ষমতা সংরক্ষণ করতেন এবং তা অবাধে প্রয়োগ করতেন। এবং কুরআনিক অনুমোদন রয়েছে বলে সাধারণ লোক এর বিরুদ্ধে টু শব্দ করার সুযোগ পেত না। এই ফতোয়া যে পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা মূলে প্রাপ্ত এই কথা বলার কেউ ছিল না। এই ফতোয়ার ধারাবাকিতা ওসমানী সাম্রাজ্য, মোগল পাঠানসহ প্রায় সব মুসলিম শাসকগণ ব্যবহার করে আসছেন।

আব্বাসীয়রা যে প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মের উপর দায়েম ও কায়েম ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় সুন্নী মাযহাবের ইমাম সাহেবদের সাথে তাদের আচরণ দেখে। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের আমলে (৭৫৪-৭৭৫) বেত্রদন্ড ও কারাদন্ড ভোগ করেন। এমনকি অবশেষে তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। একই

সময়ে ইমাম মালেক (রহঃ) কে বেত্রদন্ড দেয়া হয় এবং এমন ভীষণভাবে তাকে পিঠমোড়া করে বাধা হয় যে, তার হস্তদ্বয় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইমাম আহমদ হাম্বলের উপর বাদশাহ্ মামুন (৮১৩-৮৩৩), মোতাসিম (৮৩৩-৮৪২), ওয়াসীক (৮৪২-৮৪৭) এই তিন জনের আমলেই অনবরত নির্যাতন চালানো হয়। তাঁকে এত বেশী মারপিট করা হয় যে, সম্ভবত উট ও হাতি সে মারের পর জীবিত থাকত কিনা কি সন্দেহ।

ইমাম শাফেয়ীকে আব্বাসীয় খলিফা হারুন অর রশীদ (৭৮৬-৮০৯) গভর্নর পদ দান করেন, ইমাম সাহেব অত্যন্ত ন্যায়পরায়নতার সাথে কাজ সম্পাদন করছিলেন। তিনি সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য কঠোর নিয়ম অবলম্বন করেন। দুনীতিবাজ কর্মচারীগণ ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে খলিফার নিকট নানা ধরণের অভিযোগ পেশ করে। এর মধ্যে আব্বাসীয় শাসকদের মতে সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো তিনি আহলে বাইতের অনুসারী। তিনি বলতেন যেহেতু আহলে বাইতদের ভালবাসা কুরআনী নির্দেশ তাই তিনি তাদেরকে ভালবাসেন আর তাদের প্রতি দোয়া পেশ না করলে যেহেতু নামাযও কবুল হবে না তাই প্রত্যেক ইমানদার মুসলমানদের আহলে বাইতদের মান্য করা ব্যক্তিগতভাবে ফরজ। তাই দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা বাদশাহ্কে বোঝাতে সক্ষম হলো এই ধরণের "বিপদজ্জনক" ব্যক্তিকে পদচ্যুত করা অতি আবশ্যক। এই পরামর্শ অনুযায়ী হারুন ইমাম শাফেয়ীকে সহ তার সমর্থকদের গ্রেফতার করলেন। খলিফার নির্দেশে প্রতিদিন তার সঙ্গীদের মধ্য থেকে ১০জন লোককে হত্যা করা হতো। ইমাম সাহেবকে কারাগারে দারুন বেত্রাঘাত করা হলো। একদিন খলিফার নির্দেশে ইমাম সাহেবকে হত্যার জন্য হারুনের সামনে নিয়ে আসা হলো। তিনি তখন হারুনের সামনে এক মর্মস্পর্শী ভাষন দিলেন যা শুনে খলিফার হৃদয় কেঁপে উঠলো। হারুন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ইমাম সাহেবকে হত্যার নির্দেশ প্রত্যাহার করলেন। বিখ্যাত সুফিসাধক ও আশেকে ইলাহী হযরত মনসুর হাল্লাজ (রা.) কে ৯২২ খ্রিস্টাব্দে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

বাদশাহ্ মামুন নিরপেক্ষ আলেমদের মতামতের ভিত্তিতে ইমাম আলী রেজা (আ.) কে তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারী হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আব্বাসীয়গণ এই মহান আল্লাহ্ নিয়োজিত ও রাসূল কর্তৃক ঘোষিত এই আহলে বাইতের ইমামকে বিষ প্রয়োগে শহীদ করে। মামুনের আমলে তার নামে মুদ্রা চালু করা হয় তাতে খোদিত ছিল "লা ইলাহা-ইল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ আলী ওলী আল্লাহ্।" পরবর্তীতে বাদশাহ্ মামুনের মতিগতি পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তিনি মুতাজিলা মতবাদ গ্রহণ করেন এবং সেই ধর্মমত অনুযায়ী ঘোষণা করা হয় যে কুরআন সৃষ্ট এই মতবাদের বিরোধিতাকারীদের মৃত্যুদণ্ড শাস্তি নির্ধারিত হয় এবং বহু আলেম এই ফতোয়াজনিত কারণে নিহত হন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আব্বাসীয়গণ আহলে বাইতগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতা দখল করার পর থেকে প্রায় সকল খলিফাগণই আহলে বাইতদের কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখে এবং সকল ইমামকে হত্যা করে। এইসব খলিফাদের স্থায়ী নীতি ছিল আহলে বাইতগণের প্রকৃত সম্মান জনসমক্ষে প্রকাশ না করার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা।

মুতওয়াক্কিল সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে, সে (আহলে বাইতদের ঘোষিত শত্রু ছিল, সে হযরত আলী (আ.) মাযার শরিফ মাটির সাথে মিটিয়ে দেয়। হযরত আলী ও কারবালায় হোসাইন (আ.) এর মাযার যিয়ারত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং রাজাদেশ অমান্যকারীকে কারাবাসের শাস্তি নির্ধারিত করে। আহলে বাইতদের অবমূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে উমাইয়া আমলে প্রচারিত নীতি প্রথম তিন খলিফার মর্যাদা হযরত আলী (আ.) থেকে বেশী মুতাওয়াক্কিল এই মতবাদ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। উপরন্তু প্রথম তিন খলিফার কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন রকম সমালোচনা করা হলে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি নির্ধারণ করা হলো। যেহেতু এই মতবাদের মূল প্রবক্তা ছিল উমাইয়া শাসকগণ। তাই প্রথম যুগের উমাইয়া শাসকদের সমালোচনা করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। (ইসলাম ও খিলাফত-৬: মফীজুল্লাহ্ কবীর, পৃ-২৭৪)

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী সাহাবাদের চেয়ে আহলে বাইতদের মর্যাদা বেশী হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রথম তিন খলিফার মর্যাদা বেশী ও তারাই অনুসরণীয় এই মতবাদ বিশ্বব্যাপি প্রচার ও প্রকাশ করা হলো এবং তা ধর্মবিশ্বাসের অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। আব্বাসীয়রা রাজনৈতিক কারণে একটি কসমোপোলিটান সমাজ সৃষ্টি করার জন্য পারসিক, সংস্কৃত, সিরিয়, গ্রীক ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ঢালাওভাবে আরবীতে অনুদিত হয়। আরবীতে রূপান্তর লাভ করার পর এই ভিন্ন মাত্রার জ্ঞানের আত্মীকরণ ঘটে। আর এই বাদশাহ্গণ যে কাজ করেন তাহলো একদিকে তারা গ্রীক, রোম ও অনারব দেশের ধর্মদ্রোহী বা বিকৃত ধর্মমত বা দর্শনসমূহ হুবহু মুসলমানদের মধ্যে চালিয়ে দেন। অন্যদিকে নিজেদের অর্থ-শক্তি বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি ও সামাজিকতার মধ্যে ইসলাম পূর্ব যুগের সকল প্রকার অনাচার, কুআচরণ, কুসংস্কৃতির বিকৃত ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলণ করেন। গ্রীক দর্শনের ব্যাপক প্রচারের ফলে দ্বীন ইসলামের বিশ্বাস ও

আক্বিদার বুনিয়াদ নড়ে উঠে। মুতাযিলপন্থীরা গ্রীক দর্শনের উপর ভিত্তি করে ইসলামের আকীদাগুলো বিকৃতভাবে আলোচনা করতে থাকে। তাদের নিকট যদি কোন ইসলামী মূলনীতি গ্রীক দর্শনের পরিপন্থী বলে প্রতিভাত হয় তাহলে তারা ইসলামী মূলনীতিকে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে ঘোষণা করতে কোন দ্বিধা করতো না। মুতাযিলীদের মতে আকেল-বুদ্ধি তথা "কমনসেন্স" সকল সমস্যার চরম ও পরম এবং একমাত্র মানদণ্ড এবং তাই তারা ইসলামী প্রত্যেকটি ঐশী নির্দেশ "বুদ্ধি" যোগে বিচারে প্রবৃত্ত হয়। তাদের মতে যে কোন ইসলামী ধর্মমত বা মতবাদ যা বুদ্ধির অগম্য তাই পরিত্যাজ্য। উদাহরণ স্বরূপ রাসূল (সা.) এর মিরাজ বা উর্ধ্বলোকে গমন ব্যাপারটির উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রীক দর্শনের আমদানী হবার আগে সকল সাহাবা ও তাবেঈগণ রাসূল (সা.) স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মিরাজের যথার্থতা বিশ্বাস করে আসছিলেন। গ্রীক দর্শন আসার পর ঐ বুদ্ধিবাদী দল গ্রীক দর্শনের ভিত্তিতে এভাবে মিরাজের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তারা বলেন গ্রীক দর্শনে বলা হয়েছে যে, আসমান একটি কঠিন ও অভঙ্গুর পদার্থ। তাই হাড়ি পাতিলের মত আসমান ভাঙ্গতে পারে না। কাজেই রাসূল (সা.) স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আসমান ভ্রমণ একটি অসম্ভব ব্যাপার। বুদ্ধিজীবীরা কেহ তাদের জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না আকাশের এই বৈশিষ্ট সম্পর্কে কোন বৈজ্ঞানিক এ রকম সুনিশ্চিত প্রমাণ কখন বা কিভাবে পেয়েছেন। এ কারণেই বর্তমান কালের অনেক মুসলমান বুদ্ধিজীবী এই ধারাবাহিকতায় মিরাজ সম্পর্কে নানা ধরণের বিভ্রান্তমূলক কথাবার্তা বলেন, বা লিখেন। আকাশ সম্পর্কে তারা গ্রীক দর্শন বিশ্বাস করেন একথা প্রকাশ করেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ, কুরআন সৃষ্ট প্রভৃতি বুনিয়াদী ইসলামী আকিদা শব্দের যুক্তি জালে অস্বীকার করে ইসলামের মূল ভিত্তি মূলে আঘাত হানে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বর্তমান সমায়েও কিছুটা বিকৃতিসহ এই মতবাদে অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবীই বিশ্বাসী বলে জানা যায়।

এই সময়কালে এরিস্টটলের ১০০টি গ্রন্থ অনুদিত হয়। অমুসলিম চিন্তাবিদ কর্তৃক ব্যাপক অনুবাদের মধ্যে বহু ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা অনুবাদকগণ মূল লেখকের লেখা হিসাবে চালাইয়া দেন। এসব লেখকগণ এরিস্টটলকে পবিত্রতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন একটি মর্যাদায় ভূষিত করেন যা সম্ভবত গ্রীক ধর্মতত্ত্বের সূচনার যুগেও ঘটেনি। রাষ্ট্রীয়ভাবে ভ্রান্ত ধর্মীয় মতবাদ প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করার ফলে মুসলমানদের ভাগে গ্রীসের জ্ঞান ভাণ্ডারের যে অংশ পড়েছিল তার অধিকাংশ দ্বীন ইসলামের বুনিয়াদী আক্বিদা বিরোধী। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সা.) এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ পরিপন্থী।

অথচ মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্য এই ভ্রান্ত গ্রীক দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তিমত্তা মুসলমানদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। লোকেরা এইসব মতবাদকে চরম সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। এরা এই দর্শনের প্রভাবে ইমানকে এমনভাবে কলুষিত করে যে নবুওতের বাস্তবতাকে তারা নীতিগতভাবে অস্বীকার করেছে যার ফলে সমাজে এমন হাজার হাজার লোক দেখতে পাওয়া গেল যে, তারা কুরআন তেলাওয়াত করে জুমার নামাযে হাজির হয় এবং মুখে শরীয়তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ মদ্যপান ত্যাগ করে না। তারা পাপ ও নৈতিকতা বিরোধী কাজও ছাড়েনা। যদি তাকে এ ধরণের কাজের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয় যদি নবুয়ত সত্য না হয় তবে নামায পড় কেন তারা জবাব দিত শরীরের ব্যায়ামের জন্য। তাছাড়া এটা এখনকার রীতি আর এতে ধন দৌলত ও পরিবার পরিজনের নিরাপত্তা রয়েছে। আবার অনেকে এও বলতো শরীয়ত খাঁটি নবুওত সত্য। তারপর যদি বলা হতো তাহলে মদ খাও কেন? তাতে সে হয়তো জবাব দিতো মদ খাওয়া নিষেধ কেবল এ জন্য যে এতে শত্রুতা এবং ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আমি এটাই পরিহার করার মত পর্যাপ্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি রাখি। সুতরাং আমি মদ খাই আমার আত্মাকে আরও জীবন্ত করে চাঙ্গা করে তোলার জন্য। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, আব্বাসীয় দুই খলিফা আবুল আব্বাস ও হারুন রশীদ ছাড়া সবাই নিয়মিত মদপান করতো। মোতাযিলাপন্থী ইবনেসীনা (চিকিৎসক হিসাবে বিখ্যাত) তার শেষ উপদেশ এ লিখেছেন যে, তিনি নাকি আল্লাহ্‌র কাছে অনেকগুলো কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে, তিনি পবিত্র শরীয়তের নির্দেশিত আচার অনুশীলনগুলোর প্রশংসা করবেন, জামাতে নামায পড়বেন, ফাঁকিবাজি করবেন না এবং বলবর্ধক বা ঔষধ হিসাবে ছাড়া আনন্দ ফুর্তির জন্য মদ পান করবেন না। সুতরাং তিনি রোগ নিরাময়ের জন্য মদ হালাল ঘোষণা করলেন। অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন মদে কোন নিরাময় নাই বরং ইহা নিজেই অসুস্থতা বিশেষ। বর্তমানেও কিছু সংখ্যক চিকিৎসক এই অভিমত পোষণ করেন। মুসলিম দেশসমূহে ঐ তথাকথিত খিলাফতের চাপে তদানীন্তন বিশ্বের আধুনিক মতবাদ বিপুল বিক্রমে কাজ করে যাচ্ছিল এবং জনগণের মধ্যে খোদাদ্রোহিতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম কার্যত সমাজ জীবন থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের অপমৃত্যু ঘটেছিল।

উমাইয়া-বনু আব্বাসিয়া রাজন্যবর্গ সকল পবিত্র আদেশাবলীর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে আল-এ-রাসূল তথা আহলে বাইতদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ শত্রুতা, যুদ্ধ বিগ্রহ, হত্যা, ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলানো, শুলদন্ডে বছরাধিককাল ঝুলাইয়া ভয়ভীতির সঞ্চার করে যাতে কেউ এর প্রতিবাদ করার প্রয়াস না পায়। পথে ঘাটে, মসজিদে, মিম্বরে শত শত

বৎসরব্যাপি তাদের গালি-গালাজ অভিসম্পাত এমনভাবে চালু রাখে যে তা স্থায়ী রীতিতে পরিণত হয়। রাসূল প্রেমিক যিনিই এর প্রতিবাদ করেছেন তাকে জীবন্ত সমাধি অথবা অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করে অথবা চাবুকাঘাতে জর্জরিত করে তাদেরকে হত্যা করে।

দুনিয়া পূজারী রাজকর্মচারী, রাজ পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, মোল্লা- মৌলানা, মৌলভী, তাদের এই কুরআন হাদিস, বিরোধী অপকর্মে কেবল সহায়তায় করে নাই, বরং ফরমান-ফতোয়ার মাধ্যমে এতে জায়েজ লেবাস পরিধান করিয়াছে। মিশরের ফেরাউনগণ যেমন খোদাদ্রোহী হয়ে স্বয়ং একজন খোদা সেজে খোদা প্রেমিকের সাথে নিষ্ঠুরতম আচরণ করেছিল, অনুরূপভাবে বনু-উমাইয়া, বনু আব্বাসীয়গণ ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে রাজ সিংহাসন অধিকার করে আল-এ-রাসূলদেরকে খোদাপ্রদত্ত মান মর্যাদা হতে বঞ্চিত করেই ক্ষান্ত হয় নাই বরং তাদের ইবাদত গৃহ হুজুরা-খানকাহ্ হতে উচ্ছেদ, নির্বাসন, ষড়যন্ত্র, মিথ্যা অপবাদে রাজদ্রোহী, দন্ড, বিষ প্রয়োগে হত্যা এহেন কোন কুকর্ম নেই যা করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। দুনিয়া-পূজারী এই রাজ রাজাগণ ও তাহাদের সহযোগী রাজকর্মচারীবৃন্দ, প্রাসাদ-দরবার-দহলিজ তাবুগুলো নট-নটিনী, কবিয়াল, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মদ্য পান বাদ্য-বাজনা, কিসসা কাহিনী, আরব্য রজনীর মঞ্চ, জুয়াবাজী, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি অপসংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী ধর্ম নিরপেক্ষতা, নাস্তিকতাও উম্মুক্ত চিন্তাধারার বন্যায় সমাজ জীবনকে প্লাবিত করে দেয়। ধর্মের লেবাসধারী আমিরুল মোমেনীন যখন বিকৃত মস্তিষ্ক বিলাস-ব্যসনে মত্ত, ধর্মের রুহকে তখন সমাধিস্থ করে সংস্কৃতি আর স্থাপত্যের নামে অট্টালিকা, মসজিদ, মিম্বর, মিনার, নির্মাণের মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে ধোকা দেওয়া হচ্ছিল। শরীয়তি আদেশ-নির্দেশগুলো যখন দলিত, মথিত, কুরআনী ব্যাখ্যা রাজার স্বার্থ মোতাবেক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হলো, দ্বীনের চতুর্দিকের দেওয়াল, ছাদ, ভিত, সোপানাবলী ভাঙ্গিয়া খান খান হয়ে গেল। ধর্মের চেরাগ যখন নিভু নিভু, তখন ঘোরতম অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়ার বুকে রাসূল (সা.) প্রতিচ্ছবি হযরত আলী (আ.) বেলায়েতী ক্ষমতার প্রতিভু। আউলিয়া কুল শিরোমনি, আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, শরীয়ত, ত্বরিকত মারেফাত, হাকীকতের দিশারী তত্ত্বজ্ঞানের আলোকবর্ষণকারী, নূর-এ-ইলাহীর মনি, খোদাতত্ত্বের রহস্যাবলীর আকর, ইলম-এ-লাদুন্নির উৎস, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের হাসানী- হোসাইনী সৈয়দ, মানব দানব উভয় সম্পদায়ের গউস-এ সামদানী মাহবুব মুহাদ্দিস, মুফাখ্খর ওয়াসূলী, ফকীহ্, আরেফীন কেরামের মাথার মুকুট, কুতুব-এ-রাব্বুনী, পীরান পীর দস্তগীর মীরান-এ-মীর, রওশন জমীর, হযরত সৈয়দ আবু মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী আলা জাদ-দাহী নবীয়ানা আলাইহিস সালাত ওয়াসসালাম তাশরীফ রাখলেন। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (১০৭৮-১১৬৬) যে ইন্দ্রিয়লব্ধ ও অতিন্দ্রিয় জ্ঞান ও শক্তি দিয়ে বিশ্ব সমস্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেন সেই জ্ঞানই প্রকৃতপক্ষে তাসাওউফ জ্ঞান বা সুফিতাত্ত্বিক জ্ঞান। সুফিবাদ বা সুফিতত্ত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য আমরা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রাসূলের দায়িত্ব সম্পর্কে দুই ধরণের জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করব।

মাযহাব সৃষ্টির ইতিবৃত্ত

মাযহাব সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, মুয়াবিয়ার শামনকালের (৬৬১-৬৮০) পূর্ব পর্যন্ত আহলুল বাইয়াতের সমর্থকগণ নিজেদের জন্য কোন বিশেষ নাম করণ গ্রহণ করেন নি। আহলুল বাইয়াত তথা মুহাম্মদের বংশধরগণের অনুসারীগণ এই উপাধি সচরাচর ফাতিমা ও আলী এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের দেওয়া হয়। এই নামে ইবনে খালদুন সর্বদা তাদেরকে তাদের অনুসারী ও শিষ্যদেরকে অভিহিত করেছেন শিয়া বা মুহাম্মদের বংশধরগণ। সানায়ী তাঁর কবিতায় বলেছেন: আল্লাহ্র কিতাব ও বংশ ছাড়া রেখে যাননি রাসূল (সা.) কিছু। কিয়ামত তর্ক রইবে এসব চলছে তাদের পিছু পিছু (হাদিস)।

তারা কেবল বনী হাশেম হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বনী-ফাতেমা ও বনী আব্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তারা পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন। মুয়াবিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর মুহাম্মদের বংশের অনুসারীরা নিজেদেরকে 'শিয়া' বলে অভিহিত করতে শুরু করেছিল এবং তাদের শত্রুরা নওয়াসিব (বিদ্রোহী) নয় "খাওয়ারেজী" (দলত্যাগকারী) হিসাবে অভিহিত করে। খাওয়ারেজী নামকরণ বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছিল দুমাতুল জন্দলের যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেসব সৈন্য হযরত আলীকে পরিত্যাগ করেছিল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে দল গঠন করেছিল তাদেরকে বলা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে তাদেরকে স্বতন্ত্র বিদ্রোহী ও ধ্বংসাত্মক দল হিসাবে মুসলিম সমাজের সাধারণ শত্রু হিসাবে বিবেচনা হয়। উমাইয়াগণ তাদেরকে আময়াই (উমাইয়াদের সন্তান বলে অভিহিত করে। তখন পর্যন্ত "আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত" এই টার্মিনোলজী সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত ছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সে বছর ওসমান (রা.) এর হত্যার পর মুসলমানরা মূলত দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল হযরত আলী (আ.) এর অনুসারী, অন্যদল মুয়াবিয়ার অনুসারী। ক্ষমতা দখল করে যে এ বছরের নাম রাখে আল জামাত। (৬৬১ খ্রিস্টাব্দে) *আলীর (আ.) বিবেচনায়*

প্রমাণিত দুর্নীতিবাজ, অসৎ, হারাম পদ্ধতিতে অর্থ উপার্জনকারী বা অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী, সামরিক কর্মকর্তা, মুয়াবিয়া ক্ষমতাসীন হয় এবং হযরত আলী (আ.) এর শাহাদতের পর হাসান (আ.) খলিফা হন। তিনি অবস্থার চাপে পড়ে অনন্য উপায় হয়ে মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন এবং মুয়াবিয়া ক্ষমতাসীন হন। আর তখন সে বছরের নাম রাখা হয় আল জামাত। এরই ধারাবাহিকতায় আব্বাসীয় খলিফা হারুনের শাসনাধীনে আহলে সুন্নাত আল জামাত উপাধি প্রথম চালু করা হয়েছিল। (দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম, স্যর সৈয়দ আমীর আলী, অনুবাদক ড. রশীদুল আলম, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, এপ্রিল ১৯৮৭)

আব্বাসীয় খলিফা হারুন উর রশীদের আমলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশিষ্ট আলেম ওলামাগণ কর্তৃক ধর্মীয় বিধানের রীতিনীতি পালনের জন্য নিম্নবর্ণিত চারজন মুজতাহিদের যে কোন একটি মাযহাব অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইমাম আবু হানিফা জন্ম-৮০হিজরী, মৃত্যু-১৫০ হিজরী (৬৯৯-৭৫৬ খ্রিঃ)

ইমাম মালিক (রহঃ) জন্ম-৯৫ হিজরী, মৃত্যু-১৬৯ হিজরী (৭১১-৭৯৫ খ্রিঃ)

ইমাম শাফেয়ী জন্ম- ৯৫০ হিজরী, মৃত্যু-২০৪ হিজরী (৭৮০-৮৫৫ খ্রিঃ)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল জন্ম-১৬৪ হিজরী, মৃত্যু-২৪১ হিজরী (৭৮৬-৮৬৩ খ্রিঃ)।

এই চারজন মুহাদ্দিস উদ্ভাবিত প্রণীত/গৃহীত/ স্বীকৃত ৪টি মাযহাবের যে কোন একটি মাযহাব অনুসরণ করা রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলক করা হয় এবং এর বিপরীত বা অন্য কোন মতবাদ ও চিন্তাধারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তদানীন্তন সামাজিক সেন্সরশীপের বিপরীত কাজ করায় দণ্ড হিসাবে মৃত্যুই সবচেয়ে কম শাস্তি। একই সাথে রাজকীয় ফরমান বলে ইজতিহাদের (ধর্মীয় গবেষণা করার স্বাধীনতা) দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, এর পূর্বে ইজতেহাদের দরজা উন্মুক্ত ছিল। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবীতে নতুন নতুন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে ইজতেহাদের দরজা বন্ধ করা কতটুকু যুক্তি সঙ্গত তা ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। তাছাড়া যখন একজন মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে সব বিষয়ে জবাবদিহী করতে হবে যেখানে এই সব ইমামদের অনুসারী হয়ে জীবন যাপন করলে যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে এ সম্পর্কে কিভাবে মানুষ নিশ্চিত হতে পারে তাও বিবেচ্য বিষয়। তাছাড়া এইসব মাযহাবের শিক্ষা মূলতঃ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ সঠিকভাবে বিকৃত কুরআনের ব্যাখ্যা, জাল হাদিস আব্বসীয়দের পছন্দ অনুসারী রাসূলের জীবন ভিত্তিক মতবাদ হচ্ছে। আহলে সুন্নাত আল জামাত আব্বাসীয় খলিফার বল প্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে। তাই এটাকে প্রকৃত ইসলাম বা আল্লাহ্‌র বা রাসূলের ইসলাম বলার কোন সুযোগ নাই। অথচ এই খণ্ডিত ধর্মমতকে একমাত্র সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বলে একশ্রেণীর আলেমরা প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা তথা আল্লাহ্ প্রাপ্তি বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির তথা ইবাদতের গূঢ় রহস্যই বা কি তা জানার কোন সুযোগ না থাকায় একজন ব্যক্তির জানার অধিকার আছে যে, উল্লিখিত মাযহাবগুলি প্রকৃত ও সম্পূর্ণ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ ইসলাম ও সুন্নাহ মোতাবেক হয়েছে কি না। এমন কি কুরআন ও রাসূলের (সা.) উপর জ্ঞান চর্চা শুধু মাত্র উক্ত ৪জন বুজুর্গের বক্তব্যের বা চিন্তাধারার মধ্যেই সীমিত থাকবে? এ কথার কোন প্রমাণ হাদিসে নাই। বরং রাসূল (সা.) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব ও আমার আহলে বাইত রেখে যাচ্ছি। রাসূল (সা.) এর ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর আহলে বাইতই হলো ধর্মের প্রধান ভিত্তি, অথচ এই ৪ মাযহাবের মধ্যে এই চিন্তাধারার কোন প্রতিফলন নাই এমন কি রাসূলের হাদিসে বর্ণিত যে ১২জন ইমামের বিষয়টি উল্লেখ আছে। তাঁদের কেহ কেহ সে সময়কালে উপস্থিত থাকলেও রাজকীয় ফরমান অনুযায়ী তাদের সাথে যোগাযোগ ও তাদের চিন্তাধারা/ মতামত গ্রহণ নিষিদ্ধ করা ছিল। তাছাড়া একজন প্রকৃত শিক্ষক কখনো জ্ঞানের দরজা অন্যের জন্য বন্ধ করে যেতে পারেন না। ইজতেহাদ বন্ধ করার পরিণতি আমরা আজ মুসলমান ও ওলামাদের জ্ঞানের দিকে তাকালেই উপলব্ধি করতে পারি। উল্লেখ্য, মাযহাবের ইমামগণ কিন্তু ইজতেহাদের দরজা বন্ধ করেন নি। বরং যালেম শাসক গোষ্ঠী সম্পূর্ণ অবৈধভাবে এক শ্রেণীর দালাল, যালেম, আলেমদের সহযোগিতায় এই কাজ করেছে যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ এই বিকৃত ও অপূর্ণাংগ ধর্মীয় চিন্তাধারা বর্তমান সময় পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ ইসলাম ধর্মমত হিসাবে মুসলিম সমাজে চালু করা হয়েছে।

শরিয়ত ও ফিকাহ্

এই প্রেক্ষাপটে আমরা বিভিন্ন ধর্মীয় রাজনৈতিক (Religo-Political) সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা ফকীহদের মধ্যে শ্রেণি বিভাগ, আল্লাহ্ প্রেমিকদের আক্বীদা, ইমান ও আমল সম্পর্কে আলোচনা করব। ফলে এই ধর্মীয়, রাজনৈতিক দার্শনিক গ্রুপদের চিন্তার সঠিকতা বা মতপার্থক্যের বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা সহজতর হয়।

এই মতপার্থক্যের সঠিকতা যাচাই যারা করেন তারা হলেন ফিকাহ্ তত্ত্ব বিশারদ বা ফকীহ। ইসলামী আইনতত্ত্বে ইসলামী প্রতিশব্দ ফিকহ। 'ফিকহ্' শব্দটি কোন বিষয় বা

বস্তু সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ও গভীর জ্ঞানের অর্থ হতে উদ্ভুত। আল কুরআনে "ফিকাহ্" শব্দটি একাধিক স্থানে উপস্থিত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। (তাহারা যেন ধর্মে উপলব্ধি লাভ করতে পারে)। তাই বুঝা যায় পবিত্র কুরআন ফকীহ্ শব্দটি শুধুমাত্র আইন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বরং ইসলামের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত দিকসমূহের ব্যাপক অর্থ বহন করে। পরবর্তীতে মুসলমানগণের বিজিত ভূখণ্ডে অমুসলমানদের সাথে সংস্পর্শ, মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের অযোগ্যতা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জুলুম, বিচার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গদের পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি কারণে ইসলামে বহুবিধ আইনতত্ত্ব ও ধর্মীয় মতবাদের উদ্ভব হয় এবং সমাজ জীবনে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে এবং তার সাথে সথে ইসলামী শব্দ সহজ সরল আদি বা মূল অর্থের পরবর্তীতে বিশেষ অর্থে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় "তাওহীদ" ইমান, দ্বীন, শব্দ গুলোর অর্থও পরিবর্তিত হয়েছে।

ইবনে আব্বাসের জন্য দোয়া করতে গিয়ে রাসূল (সা.) বলেন যে, "হে আল্লাহ্ তাকে ধর্মের জ্ঞান দান কর। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সে শুধু ফকীহ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে নিশ্চয়ই শুধু আইনের জ্ঞানের কথা বলেন নাই। বরং সাধারণভাবে দ্বীন ইসলামের গভীর জ্ঞানের কথাই বলছেন। এ থেকে স্থির নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, "ফিকহ্" শব্দটি ব্যাপক অর্থে ইসলাম ধর্মের সার্বিক গভীর জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই সুফিবাদ বিষয়ক জ্ঞান এর মধ্যে সামিল ছিল এবং ফকিহ্দের সাথে সুফিদের মূলত কোন বিরোধ ছিলনা। এ প্রসঙ্গে ইমাম গাজ্জালী এহইয়াউ উলুমুদ্দীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সুফি ফাবাদ (মৃত্যু সন: ১১১ হিঃ) কতকগুলো বিষয়ে আলোচনাকালে হাসান বসরীকে বললেন, ফোকাহারা তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবে। জবাবে হাসান বাসরী (দঃ) বললেন, "তিনিই প্রকৃত ফকিহ যিনি পার্থিব জীবন সম্পর্কে উদাসীন, পরকালে আগ্রহী, ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। ইবাদতে সুনিয়মিত, আচরণে সৎ, মুসলমান ভাইদের কখনো অসম্মান করেন না এবং সমাজের কল্যাণ কামনা করেন। "ফকীহ্" শব্দটি মূলত নিছক ব্যক্তিগত উপলিব্ধি ছাড়া আরো কয়েকটি অর্থ প্রকাশ করত সেগুলো ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস, আল কুরআনের সঠিক ও সার্বিক জ্ঞান। ইবাদতের নিয়ম কানুন এব ইসলামে সাধারণ নিয়মাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান।

আবু হানিফা ফিক্হ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন "স্বীয় অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যক্তির চেতনা" যখন ধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানা প্রশ্নের উদ্ভব হয় এবং এক এক দল এক এক ব্যাখ্যা দিয়ে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন এই চিন্তা ও মতবাদের বিভিন্নতা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এই সময় আবু হানিফা ঘোষণা করেন "দ্বীন" (ধর্মের সার্বিক জ্ঞান) এর জ্ঞান ফিকাহর (আহকাম) এর জ্ঞান থেকে শ্রেষ্ঠ। খলিফা মামুনের (মৃত্যু ৮৩৩) যুগে গ্রীক দর্শনসমূহ যখন আরবীতে ভাষান্তরিত হয়, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন ফিক্হ শাস্ত্রকে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভের বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে ফিক্হর অর্থ বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, শব্দটির পরিধি ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে এবং পরিশেষে আইনের সমস্যাসমূহ বোঝাতে আরো সুনির্দিষ্টভাবে আইনতত্ত্ব বুঝাতে এর প্রয়োগ হতে থাকে। সুতরাং একটি ব্যাপক অর্থ হতে "ফিক্হ" শব্দটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে রূপান্তরের এই সময়কাল হলো ইসলামী আইন তত্ত্বের আদি পর্ব। পরবর্তীতে ফকীহ্দের জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য ও তাদের চরিত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে সে বিষয়টি ইমাম গাজ্জালী পর্যবেক্ষণ করে লিখেছেন : "আমি শিক্ষার্থীদের ভেতরে সত্যিকার ঝোক এবং আগ্রহ ফিকাহ্র প্রতি লক্ষ্য করেছি। যাদের দিলে আল্লাহ্র ভয় নাই। তাদের নিকটই ফিকাহ্ বিষয়টি গৌরব এবং অহংকারের বিষয়বস্তু ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। (এহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ: ৭)। এই ধারা বর্তমান সময় পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বর্তমানে এক শ্রেণির ফকিহদের প্রধান কাজ হলো তাদের মত পার্থক্যকারীর বিরুদ্ধে কুরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের হেনস্থা ও নাস্তানাবুদ করা। এরই ধারাবাহিকতায় উপমহাদেশের ফিকাহ্ ইলম ও শরীয়ত সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম সুফি চিন্তাবিদ কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও ড. আল্লামা ইকবালকে কাফের ফতোয়া দেয়া হয়। যা হোক, ফিকাহ্ শাস্ত্রের উন্মেষলগ্ন অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকাল। আল কুরআনের ফিকাহ্ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ব্যবহার হয়েছে যে কোন বিষয়ের উপলব্ধি (Understanding) অর্থে। 'ইলম' শব্দটি কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে শিক্ষা অর্থে। সূরা ত্বহার ১১৪ নং আয়াতে 'ইলম' শব্দটি সার্বিক জ্ঞান অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ফিক্হর অর্থগত দিক বিশ্লেষণে এর একটি বৈশিষ্ট বোঝা যায় তাহলো-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যক্তিগত চিন্তা ও বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ। এক্ষেত্রে ইলম এর সঙ্গে ফিক্হ এর মৌলিক পার্থক্য হলো–ইল্ম সেই মহা জ্ঞান যা স্রষ্টার পক্ষ থেকে সরাসরি আগত যেমন আল্লাহ্র কালাম এবং রাসূলুল্লাহ্র বাণী হতে উৎসারিত জ্ঞান। শব্দ দুটি কখনো কখনো সমার্থবোধক হলেও ফিক্হর এর বুদ্ধিগত বৈশিষ্ট সব সময় বজায় রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাহাবীদের মধ্যে যারা প্রত্যক্ষভাবে বিচার কাজে নিয়োজিত থাকতেন এবং এক্ষেত্রে যারা সিদ্ধান্ত প্রদানে নিজ বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের জন্য খ্যাতিমান ছিলেন তাঁরা ফোকাহা নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ এখানে

আইন ও প্রশাসনিক সমস্যাবলীর জন্য সুখ্যাতি, ফোকাহ্ শব্দটির দ্বারা তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। হযরত আলী (আ.) সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফকিহ্ ছিলেন।

ফকিহ্র অর্থগত বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, শব্দটি পরিধি ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে এবং পরিশেষে আইনের সমস্যাসমূহ বুঝাতে আরো সুনির্দিষ্টভাবে আইনতত্ত্ব বুঝাতে এর প্রয়োগ হতে থাকে এবং এর পাশাপাশি ইলম এর সাথে ফিক্হর একটি স্থায়ী পার্থক্য সূচিত হয়েছে। আইন শাস্ত্রের বিকাশ ও হাদিস শাস্ত্রের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে 'রায়' ও রিউয়াইয়াহ দুইটি রায় শব্দটি ফিকহর সাথে দ্বিতীয়টি হাদীসের সঙ্গে সমার্থবোধক হয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় ফিক্হ শব্দটির একটি ব্যাপক অর্থে হতে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে।

ইসলামী আইন বুঝাইতে সাধারণভাবে যে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। সেটিই হলো শরীয়ত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই শব্দটিও বিশেষভাবে আইনতত্ত্ব বুঝাইত না। "শরীয়ত" শব্দটি এক বচন। এর বহু বচন হলো শরাই। ইসলামের প্রথম যুগে 'শরীয়ত শব্দটির ব্যবহার কদাচিত দেখা যায়। বহু বচন রুপে শব্দটি মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল। সেই সময় শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতো।

আরবী অভিধান 'লিসানুল আরব' এর মতে শরীয়াহ্ শব্দটি মহাসড়ক (Highway) বা চলার সরল পথ হতে উৎপন্ন হয়েছে। আল কুরআনে শিরআহ ও শরীয়াহ্ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। সুরা মায়েদার ৪৮ নম্বর আয়াত ও সুরা জারিয়ার ১৮ নম্বর আয়াত দ্রষ্টব্য। উভয় স্থানে শব্দ দুটি স্বীয় বা সার্বিকভাবে ধর্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে শরীয়াহ্ শব্দটি দ্বীন বা ইসলামের মৌলিক বিষয় অর্থ ধারণ করলেও আবু হানিফা (রহঃ)-এর শরীয়াহ্র স্বতন্ত্র ধারণার আভাস পাওয়া যায়। কিতবুল আলিম ওয়ামুতা আলিন গ্রন্থে দ্বীনও শরীয়াহ্ শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দ্বীন চিরকাল অপরিবর্তিত, শরীয়াহ্ যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। লেখক দ্বীন বলতে তওহীদ, নবুওত, আখিরাত ইত্যাদি মৌল বিষয়সমূহ বুঝিয়াছেন এবং শরীয়হ্ বলতে তিনি প্রতিপালনের বিষয়সমূহকে বুঝিয়াছেন। তাঁর মতে বিভিন্ন পয়গম্বরের দ্বীনের মধ্যে মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য রয়েছে শরীয়াহ্র মধ্যে। প্রত্যেক নবীই পূর্বতন্ নবীর দ্বীন সমর্থন ও সত্যায়ন করেছেন কিন্তু তাদের শরীয়াহ্র বিলুপ্তি, সংশোধন, সংযোজন বা বিযোজন বা অপ্রযোজ্যতা ঘোষণা করে নিজ শরীয়াহ্র অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রখ্যাত ইসলামী আইনবিদ আসফ ফৈজী তার Outlines of Muhamadan Law গ্রন্থে উভয় পরিভাষার যে তুলনামূলক সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে ফিকহর স্বরূপ সুস্পষ্টরুপে প্রতিভাত হয়। তিনি লিখিয়াছেন: শরীয়াহ একটি ব্যাপক আওতা, সমস্ত মানবীয় কার্যাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত, ফিকাহ্র আওতা সংকীর্ণ, আইনগত কার্যাদি বলিতে যাহা বুঝায় শুধু তাহাই ইহার বিষয়বস্তু। শরীয়াহ্ সর্বদা আমাদের ঐশী জ্ঞানের কথা মনে করায় কুরআন ও হাদিস ছাড়া যেই জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। ফিক্হতে যুক্তির প্রাধান্য এবং ইহার 'ইসলাম' ভিত্তিক সিদ্ধান্ত অবিরাম অনুমোদনের সঙ্গে উল্লিখিত হয়। শরীয়াহ্র পথ আল্লাহ্ বা রাসূল কর্তৃক স্থাপিত 'ফিক্হর প্রাসাদ' মানবীয় প্রচেষ্টায় বিরচিত।

ফিক্হতে কোন কাজ আইনানুগ কি বেআইনী, অনুমোদনযোগ্য কি অননুমোদনীয় সেই কথা উল্লিখিত হয়। শরীয়াহ্তে অনুমোদন ও অননুমোদনের স্তর অনেক। ফিক্হ দর্শন হিসাবে আইন শাস্ত্রের একটি পরিভাষা এবং শরীয়াহ্ আল্লাহ্ প্রদত্ত সরল ও সাধু জীবনের একটি বিধি ব্যবস্থার নাম।

এই দুইটি পরিভাষার পার্থক্য সূক্ষ্ম এবং কখনো কখনো পরস্পরের অর্থে ব্যবহার হতে দেখা যায়। তবে একটি পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়, সেটি হলো শরীয়াহ্ আইন ও ধর্মীয় বিশ্বাস উভয়ের মিলিত নাম, কিন্তু ফিক্হ শুধুমাত্র আইনের সূত্র সম্পর্কিত শাস্ত্র।

রাসূলুল্লাহ্র যমানায় বর্তমানের মত আমরা যাকে "মুসলিম আইনতত্ত্ব" বলি তেমন কিছুর প্রচলন ছিলনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সুবিন্যস্তভাবে ওয়াজিব মানদুব, হারাম, মাকরুহ এবং মোবাহ্ সম্পর্কে কিছু বলে যান নাই। এগুলি পরে আইনতত্ত্বে বিশ্লেষিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। যে সমস্ত আইনবিদ গভীরভাবে আল কুরআন জানতেন এবং রাসূল (সা.) এর আদেশ-নির্দেশ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন, সেইসব পণ্ডিত এই সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ এবং শ্রেণী বিভাগ করেছেন। আইনবিদদের মতে মানুষের সব কাজ ঐ বর্ণিত পাঁচটির একটির অধীন হতেই হবে।

এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য তাহলো-রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবীদের কাছে এ ধরণের বিভাজন প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় নাই। তাদের কাছে মূল বিবেচ্য বিষয় ছিল। আল্লাহ্-রাসুলের মহব্বতে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাসূল (সা.) আদর্শ অনুসরণ। কিভাবে ওজু করতে হয়। কিভাবে সালাত আদায় করতে হয় এবং হজ্ব পালন করতে হয় এগুলো ছিল রাসূল্লাহ্ (সা.) এর নির্দেশিত সাধারণ রীতিনীতির অন্তর্গত। কিন্তু এতে প্রতিফলিত হয় না যে, কোন কোন আরকান বা কাজ অত্যাবশ্যকীয় আর কোনগুলো তা নয়। অনেক সময় অনেক বিষয় রাসূল্লাহ্ (সা.) এর গোচরে আনা হয়েছে তার সিদ্ধান্তের জন্য। কিন্তু আইনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে

কখনো তাঁকে কোন প্রশ্ন করা হয় নাই। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই রাসূল (সা.) এর প্রচারিত ও বাস্তবায়িত ধর্ম ইসলাম যে রকম মানবিক, (Humane) নমনীয়, আরামদায়ক, শান্তিময় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল পরবর্তীতে আইনতত্ত্বের ক্রমোআধুনিকীকরণের মাধ্যমে এই ধর্মের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং ইসলামী আইনতত্ত্ববিদদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসলামী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এক ধরণের সামরিক অধ্যাদেশের (Martial Law Regulations) এর রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে এবাদত এক ধরণের যান্ত্রিক আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়। ফলে ফকীহ্দের ধারণা অনুযায়ী ইবাদত সম্পাদিত হলেও আল্লাহ্র নিকট এই ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা তথা কবুলিয়তের নিশ্চয়তার গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়। আল্লাহ্র প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে সালাত আদায় করার কথা তার অভ্যন্তরীণ হৃদয়ানুভূতির বিষয়টি বিবেচনায়ই আনা হয় না। এ বিষয়টি সম্পর্কে সুফি কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন :

হে নামাযী তোর নামায হল যে ভুল
মসজিদে তুই রাখলি সেজদা ছাড়ি ঈমানের মূল।
জামাতে সামিল হয়ে নামায আওড়ালি মুখে সুরা কুরআন
ভাবাল কি তুই পার পেয়ে গেলি, পুলসেরাতের পুল
আজি মিলন তীর্থে বাধবে কাতার
মনেরও জায়নামাযে
সেই আরাফাতে তোর নুইয়ে দিল
না ফরমানির লাজে
ওজু করে ফের শেষে তাওবার নীরে
তাহবিমা বাঁধ নত শিরে
বন্দেগী তোর হবেরে মকবুল
কেয়ামতে পাবিরে কুল।

বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক নামায কোনক্রমেই পড়লেই যে, মুক্তি পাওয়া যাবে না বা বেহেশতে যাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নাই সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআন :

"নিশ্চয়ই মুনাফিকগণ আল্লাহ্র সহিত ধোকাবাজি করে। বস্তুত তিনি তাহাদের শাস্তি দেন আর যখন তাহারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্কে তাহারা অল্পই স্মরণ করে। দোটানোয় দোদুল্যমান, না ইহাদের দিকে না উহাদের দিকে এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবেনা।" (সূরা নিসা: ১৪২-১৪৩)

উপর্যুক্ত আয়াতে একশ্রেণীর নামাযীকে পথভ্রষ্ট হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যার কোন হেদায়েতের সম্ভাবনাই নাই। একইভাবে সুরা মাউনে উল্লেখ করা হয়েছে :তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে যে দ্বীনকে অস্বীকারকারী। সে তো সেই, যে ইয়াতীমকে রুঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয় এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং দুর্ভোগ (ওয়াইল দোজখের বাসিন্দা) সেই সালাত আদায়কারীদের, যাহারা তাহাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন, যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে। (সুরা মাউন : ১-৭) বর্ণিত এই সুরায় এক ধরণের সালাত আদায়কারীকে ধর্ম অস্বীকারকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গ সালাতের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসাবে ইয়াতীমের সাথে সদয় আচরণ ও দেখা শুনার অভাব পূরণে কার্যকর সহায়তা এবং এসব কার্যাদি হতে হবে সম্পূর্ণভাবে "বেরিয়া" তথা প্রদর্শনেচ্ছু মনোভাব ত্যাগপূর্বক। এই বিষয়টির গভীরতা ও ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য পবিত্র কুরআনে "মুসলমান" ও ইমানদার দুইটি শব্দ ও এর তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে।

"আরববাসীরা বলে, আমরা ইমান আনিলাম। বল, তোমরা ইমান আন নাই, বরং তোমরা বল আমরা আত্মসমর্পণ (ধর্ম হিসাবে মৌখিকভাবে ইসলামকে স্বীকার করি এবং সামাজিকভাবে মুসলমান হিসাবে পরিচিত) করিয়াছি। কারণ ইমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। (সুরা হুজুরাত : ১৪)। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে স্থির নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, সামাজিকভাবে মুসলমান হিসাবে পরিচিত হলেই তিনি পাকা ইমানদার নন। বরং প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে সুনির্দিষ্টভাবে ও বিষয়ে স্থির বিশ্বাস (আক্বিদা ও ইমান ও সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কর্মসম্পাদন (আমল) করতে হবে তাহলেই তিনি আল্লাহ্র নিকট ইমানদার হিসাবে বিবেচিত হবেন অর্থাৎ ইমান একটি অর্জনীয় বিষয়। আবার ইমান আনলেই তিনি মোমিন হয়ে যান না। বরং ইমানদারদের মধ্যেও স্তর ভেদ বা পর্যায় রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনের মধ্যে শ্রেণী ভেদের বিষয়টি উল্লেখ আছে যথা– আমানু সালেহীন, মোমিন, মহসীন, মুত্তাকীন, উলিল আমর, ইমাম, ওয়ালী, মুর্শেদ প্রভৃতি পদ বা পদবী তথা অর্থবহ শব্দ রয়েছে। সাধারণভাবে ধারণা করা যায় যে, ইমানদারদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা দায়িত্ব রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র ঐশী ব্যবস্থাপনায় (Divine

Administration) এসব বিভিন্ন স্তরের ইমানদারদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

এছাড়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র মান্যতার সাথে রাসূল (সা.) এর মান্যতা এবং উলিল আমর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র প্রশাসনিক কাজ দেখা শুনা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাডার অফিসারকে (হুকুম প্রদানের অধিকারী) মান্য করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে : হে আমানুগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা অনুগত্য কর। রাসুলের এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌র প্রদত্ত (দায়িত্বপ্রাপ্ত) ক্ষমতার অধিকারী। (সুরা নিসা-৫৯) তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সম্পদ, ব্যবসা বাণিজ্য এমন কি মানুষের প্রাণের চেয়ে প্রিয় হিসাবে আল্লাহ্‌র রাসূলকে ভালোবাসা ও তার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর চেয়ে ইমানদারদের জন্য প্রিয় কিছু নাই। যে সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা : বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্‌ তাহার রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যাহার মন্দা পড়ার আংশকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্‌ সত্য ত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শ করেন না। (সুরা তাওবা : ২৪)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ ও রাসুলের প্রতি নিজের জীবনের চেয়েও অধিক প্রেম বা মহব্বত ও আল্লাহ্‌র পথে নিজের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকেই ইমান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে আর এর বিপরীতে অন্য কিছুকে যদি কেহ ভালবাসে এর ধরণের ব্যক্তিবর্গকে সত্যত্যাগী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই আল্লাহ্‌র রাসুলের উত্তরাধিকারী হিসাবে অলি-মুর্শেদ, ইমাম, উলিল আমর, মোমিন, মুহসিন, সালেহীন বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র এই নির্দেশের আওতায় ইমানদার মুসলমানরা ভালবাসেন ও মান্য করেন এর মধ্যে শিরক বা বিদআত যারা দেখেন তাদেরকে পুনরায় পবিত্র কুরআনে যে এ ধরণের বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সম্মানিত/ মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে সেই সব আয়াত গভীরভাবে গবেষণা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

ইমান-আক্বিদা ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক

ইমান শব্দটি "আমন" ধাতু হতে নিস্পন্ন। আমন এর প্রকৃত অর্থ প্রশান্তি। এই শব্দ হতে গঠিত হয় আমানত, যার বিপরীত খেয়ানত। অর্থাৎ যাতে খেয়ানতের ভয় নাই, তা আমানত। আমীনকে এই জন্য আমিন বলা হয় যে, তার আচরণ যে সত্য হবে, সে যে সম্পর্কে কোন সন্দেহ হয় না এবং সে অসদাচরণ করবে না এমন ভরসা করা যায়। এই মূল বর্ণমালা হতে আরেকটি ধাতু রূপই ইমান। ইমান একটি মনের ভাব বা স্থিরকৃত ধারণা। অন্তরের অন্তস্থলে কোন ভাব বা গভীর প্রত্যয় সততার সাথে পোষণ করা এবং এর প্রতিকুল কোন কিছুর দিকে ঝুঁকিবার ব্যাপারে নিঃশংক হওয়াই ইমান। ঈমানের দুর্বলতা বলতে এ বোঝায় যে, মন বিশেষভাবে পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয় নাই। অন্তকরণ পুরোপুরি প্রশান্তি লাভ করে নাই বরং প্রতিকুল কথা বা ধারণার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার সুযোগ বা সম্ভাবনা রয়েছে।

ধর্মীয় ইমান এমন সব বিষয়ে কেন্দ্রিভুত যেগুলি মানব চরিত্রের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সাফল্য দুটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত দ্বীন বা ধর্ম যে বিষয়গুলোকে সত্য বলে মানার এবং সেগুলোর প্রতি প্রত্যয় পোষণের দাবি জানায়। ন্যায় যুক্তি বা বিচার বুদ্ধির দিক দিয়ে সেগুলো সত্যোপযোগী হবে। দ্বিতীয়ত সে বিষয়সমূহ এমন ধরণের হবে যাতে সেগুলোর ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে মানুষের চরিত্রের সুষ্ঠু গঠন হতে পারে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, ইমান নিছক কতিপয় সংস্কারের সমষ্টি নয়। কিংবা তাতে যুক্তির পরিমাণ কম। ঈমানের ভিত্তি যদি সংস্কার হয়, তবে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির ক্রম বিকাশের উন্নতির সাথে সাথে সংস্কারে মোহ ভঙ্গ শুরু হয়ে যাবে এবং ঈমানের ভিত্তি টলটলয়মান হয়ে পড়বে সেই সাথে আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতার গোটা ব্যবস্থাপনায় চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে।

পবিত্র কুরআনে কিসের উপর ইমান আনতে হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও ঈমানের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি এক বিশাল মহীরুহ। সর্বপ্রথমে যে বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে শুধুমাত্র জন্মসূত্রে মুসলমান বা ইসলাম নামধারী ব্যক্তির জন্য কুরআন কোন হেদায়েতকারী গ্রন্থ নয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে: ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথে নির্দেশ। যাহারা অদৃশ্যে ইমান আনে। সালাত কায়েম করে, ও তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে এবং তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে যাহারা ইমান আনে ও আখিরাতের যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাস। তাহারাই তাহাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে রহিয়াছে তাহারাই সফলকাম (সূরা বাকারা: ২-৫)।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে জানা গেল যে, মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই আল্লাহ্‌ তাকে ইমানদার, মোমিন বা মুত্তাকী হিসাবে স্বীকার করেন নাই। বরং ইমান আনয়নের এক উচ্চতর পর্যায়ে মুত্তাকিন হলেই কুরআন সেই ব্যক্তির জন্য পথ

নির্দেশক হিসাবে ভূমিকা রাখবে। এ পর্যায়ে আমরা "মুত্তাকী" বলতে পবিত্র কুরআনে কাকে বোঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করছি। এরশাদ হচ্ছে "পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই (আনুষ্ঠানিক বা সামাজিক বা লোক দেখানো নামায), কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ্ পরকাল, ফিরিশতাগণ, (আযরাইল, জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিল, বেহেশতের দোজখের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা, কবরে আগমনকারী সওয়াল জবাব ও মানুষের কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত) সমস্ত কিতাব (বেদ, তোরাহ্, যবুর ইঞ্জিল, কুরআনসহ বিভিন্ন নবীর কাছে আগত ঐশী গ্রন্থ/ছহীফাসমূহ) এবং নবীগণে ইমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ্ প্রেমে (ইবাদতের প্রথম ও অপরিহার্য শর্ত) আত্মীয় স্বজন, পিতৃহীন অভাবগ্রস্ত, পর্যটক (মুসাফির), সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করিলে। সালাত কায়েম করিলে ও যাকাত প্রদান করিলে এবং মান্য করিলেও যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রামে, সংকটে ধৈর্য্য ধারণ করিলে। ইহারাই সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই মুত্তাকী (সূরা বাকারা : ১৭৭)।

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদের একজন প্রকৃত মুত্তাকীর বিশ্বাস ইমান ও আমলের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিশ্বাস ও কর্মই শেষ কথা নয়, বরং এই সব বিশ্বাসের উপাদানের মাধ্যমে যে জীবন দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গী (Attitude / Concept) বা ধারণা বিশ্বাস করতে হয় তাকে আকায়েদ বলা হয়। আরবী "আকদ" শব্দের অর্থ হলো-শিরা গ্রন্থি বন্ধন। এই শব্দটি নর-নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ঈমানের সাথে সম্পর্কিত আকায়েদ বলতে যেসব ধারণা/ মতবাদ/ চিন্তাধারা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট জীবন দর্শনের সাথে অসামাঞ্জস্যপূর্ণ বা অসংগতিপূর্ণ তা অবিশ্বাস করা বা ভুল মনে করা। বিষয়টি ব্যাপক ও বিস্তৃত কিন্তু সুনির্দিষ্ট নয়। মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে বিশ্ব সমাজে বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতবাদের সৃষ্টি হয় এর কোনটি ইসলামের বিশ্বাসের সাথে সংগতিপূর্ণ আবার অনেক মতামত বা চিন্তাধারাই ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংঘাতময় বা বিরোধী। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অনেক সমাজতান্ত্রিক বা ধর্মীয় বা দার্শনিক মতবাদ ধর্মের মৌলিক কনসেপ্টের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচিত হলে তা বিশ্বাস করা ইমান রক্ষার্থে অসম্ভব। এই প্রেক্ষাপটে সে সব মতবাদ কনসেপ্ট বা চিন্তাধারা ইসলামী চিন্তাবিদদের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য সেগুলো আকায়েদ বা আক্বীদা হিসাবে বিবেচনা করে তা মানার জন্য অনুসারীদের যে নির্দেশ দিয়েছেন তাকে আকায়েদ বা আক্বীদা বলে।

বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য একটি উদাহরণ-চার্লস ডারউইন, তার বিবর্তনবাদ তত্ত্বে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করেছেন তাতে কুরআন বা ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মানব সৃষ্টির অলৌকিক বা ঐশী পদ্ধতি স্বীকার করা হয় না, বরং কার্যত তা ধর্মীয় বিশ্বাস অস্বীকার বা অসত্য মনে করার জন্য প্ররোচিত করে। তাই মুসলমানদের বিশুদ্ধ আক্বীদা হলো ডারইউনবাদের বিপরীতে কুরআনে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব মতবাদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। অনুরূপভাবে সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি, অশ্লীলতা, নগ্নতার বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুফলের কথা বলে এসব কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হয়। যা ইসলাম ধর্মীয় জীবন দর্শনে অগ্রহণযোগ্য বিধায় বাতিল যোগ্য। আবার কিছু কিছু কাজ বা আমল রয়েছে যা করলে তার সমস্ত ধর্মীয় বিশ্বাস ধংসপ্রাপ্ত হয় এবং সে বাহ্যিকভাবে ধর্মীয় কাজ করলেও আল্লাহ্ ও তার রাসুলের দৃষ্টিতে সে আর মুসলমান বা ইমানদার হিসাবে বিবেচিত নয়। এ সম্পর্ক রাসূল (সা.) বলেছেন : সে সমস্ত কাজ ইমান ধ্বংস হয়।

১) আল্লাহ্র কসম সে মুমিন নয়। আল্লাহ্র কসম সে মোমিন নয়। আল্লাহ্র কসম সে মুমিন নয় যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবশী নিরাপদ নয়।

২) যে ব্যক্তি দোষ যুক্ত জিনিস বিক্রি করে এবং খরিদ্দারকে তার দোষের কথা জানিয়ে দেয় না,তার উপর আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ থাকেন এবং ফেরেশতারা তাকে অভিসম্পাত দিতে থাকে।

৩) অধীনস্থদের সাথে খারাপ আচরণকারীরা বেহেশতে যাবে না।

৪) যে ব্যবসায়ী দাম বাড়ানোর নিয়তে ৪০দিন খাদ্যদ্রব্য আটকে রাখে তার সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নাই। (আল্লাহ্ তার অভিভাবক হিসাবে থাকেন না)।

৫) প্রতিবেশী অভুক্ত থাকতে যে নিজে পেট ভরে খায় সে মোমেন নয়।

৬) যে ব্যক্তি লোক দেখানো নামায পড়ে সে শির্ক করে, যে ব্যক্তি লোক দেখানো রোজা রাখে সে শির্ক করে, যে ব্যক্তি লোক দেখানো দান খয়রাত করে সেও শির্ক করে।

৭) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এত বড় গুণাহ যে তা শির্কের কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

৮) ধোকাবাজ, কৃপণ ও দান করে যে বলে বেড়ায় এ ধরণের লোক বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেনা।

৯) হারাম খাদ্য থেকে তৈরী গোশত বেহেশতে যাবেনা, যে গোশত হারাম খাদ্যের দ্বারা প্রতিপালিত তার জন্য আগুন বা জাহান্নামই উপযোগী।

১০) রোজা, নামায ও দান খয়রাতের চেয়েও ভাল কাজ কি জান? সেটা হলো পারস্পরিক বিরোধের নিষ্পত্তি করে দেয়া। আর পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করা এমন মারাত্মক কাজ যে তার দ্বারা মানুষের সমস্ত কাজ নষ্ট হয়ে যায়।

১১) পুরুষ কিংবা স্ত্রী যেই হোক না কেন জীবনের ষাট বছরও যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে কাটায় কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে এলে কারো হক নষ্ট করে ওছিয়ত করে তাহলে উভয়ের (দাতা ও গ্রহীতা) দোজখে যাওয়া অবধারিত। এক শ্রেণীর অজ্ঞ মুসলিম বুদ্ধিজীবী শুধুমাত্র নামায, রোজা, সিজদার মধ্যেই শিরক খোঁজেন, কিন্তু মানুষের ব্যবহারিক অনেক কাজও মহা শিরক ও জাহান্নামে যাওয়ার গুরুতর কারণ হতে পারে তা অনুসন্ধান ও গবেষণার সুবিধার জন্য আমাদের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট **১১**টি হাদিস উল্লেখ করা হলো।

অষ্টম অধ্যায়

সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রাসূল (সা.) এর অন্তিম ওসীয়ত না লেখার বিবরণ ও তার পর্যালোচনা

সহিহ বোখারীর ছয়টি অধ্যায়ে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আমরা সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করছি:

ইসহাক বিন ইব্রাহীম ওয়াকীয়, মালিক বিন মিফ আওল, তালহা বিন মুসসারাফ, সাঈদ বিন জাবির (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বৃহস্পতিবার হায় বৃহস্পতিবার। অতঃপর তার অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। ইবনে জাবির বলেন, এমনকি আমি তাঁর গালের উপর মুক্তার মত অশ্রু বয়ে যেতে দেখেছি। ইবনে আব্বাস বললেন, রাসূল (সা.) বলেছিলেন, আমার কাছে হাড় (কাগজ) আর দোয়াত নিয়ে আস। যাতে আমি তোমাদের জন্য কিতাব (ওসীয়ত) লিখে দেই যার কারণে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। (উপস্থিত) সাহাবাগণ বলতে লাগলেন যে, রাসূল (সা.) এর উপর রোগের কষ্ট প্রবল হয়েছে।" মুহাম্মদ বিন রাফে আর আব্দ বিন হামিদ, আব্দুর রাজ্জাক মুয়াম্মার, যুহরী, উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উৎবাহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) এর মৃত্যুকালে যখন নিকটবর্তী হলো, ঐ মুহূর্তে হুজরাতে কয়েকজন সাহাবী ছিলেন এবং তাদের মধ্যে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবও (রা.) ছিলেন। রাসূল (সা.) বললেন, "এসো আমি তোমাদেরকে একটি কিতাব (ওসীয়ত) লিখে দেই যেন এর পরে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও" হযরত ওমর

(রা.) বললেন যে, রাসূলের উপর রোগ প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তোমাদের কাছে কুরআন আছে। আর আমাদের জন্য তো আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট। এরপর ঘরের লোকেরা উপস্থিত (সাহাবীরা) পরস্পর বিরোধী হয়ে গেলেন। কেউ কেউ বলতে লাগলেন, দোয়াত, হাড়, ইত্যাদি নিয়ে আস যাতে রাসূল তোমাদের জন্য লিখে দেন, আর তারপর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর কিছু সংখ্যক লোক তাই বললেন যা হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন। বিরোধ এবং কথাবার্তা (গন্ডগোল) রাসূল (সা.) এর উপস্থিতিতে অধিক হতে লাগল। তখন রাসূল (সা.) বললেন, উঠে যাও।"

উবায়দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, হতাশা ও গভীর চিন্তার কথা তো এটাই যে, রাসূল (সা.) তাদের শোরগোল ও বিরোধের কারণে কিতাব (ওসীয়ত) লিখতে পারেন নি। (সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ওসীয়ত, হাদিস নং-১৭৩০ এবং ১৭৩১, কুরআন মহল, করাচী হতে মুদ্রিত)। সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত ওমর (রা.) কেবল রোগের কাঠিনোর জন্য এমন রায় বা মতামত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দেস বর্ণনা করেছেন যে লেখনীর সরঞ্জাম চাওয়ায় তিনি রাসূল (সা.) এর প্রতি প্রলাপ বকার (হিজিযান) অপবাদ দিয়েছেন এবং সেগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা: নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। নবী (সা.) তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ঠ হননি এবং বিপথগামীও হননি এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআনের ওহী যা (তার প্রতি) প্রত্যাদশ হয়। (সূরা নজম : ১-৪)। সেই নবীর শেষ ইচ্ছা বা নির্দেশ যা ছিল উম্মতের সমস্ত গোমরাহী তথা পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার একমাত্র চিকিৎসা। তা উম্মতের কাছে না পৌছানোর যুক্তি হিসাবে বলা হলো 'আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট' উচ্চারণ করে সর্বরূপে রাসূল (সা.) এর সুন্নাতকে অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সর্বপ্রথম "বিরোধ" ও "মতভেদ" সৃষ্টি হয়েছে, আর যত ফিরকা ও মযহাব প্রকাশ পেয়েছে তার জন্য এই রাসূল (সা.) এর অন্তিম ইচ্ছা লিখিত আকারে প্রকাশের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টিকে দায়ী করা যায়।

এখন মূল প্রশ্ন হলো যে, রাসূল (সা.) কি লিখতে চেয়েছিলেন? যা জানা গোমরাহি থেকে বাঁচতে চায় এমন প্রত্যেক ইমানদারদের জন্য ফরজে আইন। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী নিজের শরাহতে রাসূল (সা.) এর কাউল-"উকতুবু লাকুম কিতাবন" এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন হুজুর (সা.) এর উদ্দেশ্য ছিল যেন উক্ত লেখনির মাধ্যমে নিজের পরবর্তী খলিফার নিযুক্তি সম্পন্ন করে ফেলেন। এই আল্লামা অপর স্থানে লিখেছেন যে, "হুজুর (সা.) সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, নিজের পরবর্তী খলিফাগণের নাম নির্দিষ্ট করে দেন এবং লিখিয়ে দেন যেন পরস্পর বিরোধ না হয়। ফতহুল বারী শরহে সহীহ বোখারী মারাযুন্নবী (সা.) ওয়া ফাতাহ অধ্যায়। অনুরূপভাবে আল্লামা সুদী সহীহ মুসলিমের শরাহতে লিখেছেন যে, আলেমগণ মতবিরোধ করেছেন যে, রাসূল (সা.) কি লিখতে চেয়েছিলেন? সম্ভবত তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, খিলাফতের জন্য একজনকে নির্দিষ্ট করেছেন যাতে মতবিরোধ ও ফেতনা সৃষ্টি না হয়।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) লিখেছেন যে, রাসূল (সা.) ইন্তেকালের পূর্বে এরশাদ করলেন যে, আমার কাছে দোয়াত ও কাগজ নিয়ে এসো যাতে করে আমি খিলাফত বিষয়ে তোমাদের সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে দেই যে, আমার পরে খেলাফতের হক্বদার কে হবে। কিন্তু ওমর (রা.) একথা বলে বাধ সাধলেন যে, এ ব্যক্তিটি (রাসূল আকরাম) বকওয়াস করছে অথবা একথা বললেন যে, হিযিযান প্রলাপ বকছে। (সিরিরুল আলামীন মিশরে মুদ্রিত পৃ-১০) এ বিষয়টি হযরত ওমর (রা.) নিজস্ব বক্তব্য হতেও জানা যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তিনি একদা ওমরের (রা.) সাথে শাম এর (সিরিয়ার) উদ্দেশ্য যাচ্ছিলেন। একদিনের ঘটনা যে, হযরত উমর নিজের উটে করে একাই বেরিয়ে পড়লেন, আমিও তাঁর সঙ্গী হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে তিনি আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আমি তোমার নিকট তোমার চাচাতো ভাইয়ের (আলীর) বিরুদ্ধে নালিশ করছি। আমার সাথে আসার জন্য আমি তার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, কিন্তু তিনি আসতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমি তাকে সর্বদাই আমার প্রতি রাগান্বিত থাকতে দেখি; তুমি কি বলতে পারবে যে, তিনি কেন আমার প্রতি রাগান্বিত থাকেন?

ইবনে আব্বাস: হ্যাঁ তিনি আপনার প্রতি রাগান্বিত থাকেন। তার কারণ অবশ্যই আপনার ভাল করেই জানা আছে। (আামার কাছে কেন জিজ্ঞাসা করছেন)

হযরত উমর: আমার মনে হয় যেহেতু তিনি খিলাফত পাননি তাই তিনি রাগান্বিত।

ইবনে আব্বাস: জি হ্যাঁ, সেই কথা। তার (আলীর) ধারণা যে, রাসূলে খোদা (সা.) খেলাফত তাকে দিয়ে গেছেন।

হযরত উমর: হে ইবনে আব্বাস রাসূল (সা.) এর দেয়া ও চাওয়াতে কি হবে। আল্লাহ্ পাক যখন চান নি। (তুমি ঠিকই বলেছ, আলীর ধারণাটিই সত্য) রাসূল (সা.) খেলাফত বিষয়ে কিছু চেয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ্ তার বিপরীত অন্য কিছু চাইলেন। আর হলো সেটাই যা আল্লাহ্ চেয়েছিলেন। আর রাসূল (সা.) যা চেয়েছিলেন তা হয়নি। (যা তুমি প্রত্যক্ষ করেছো)। রাসূল (সা.) চেয়েছিলেন যে, তার চাচা আবু তালেব ইমান

আনেন, কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেন তিনি (আবু তালেব) যেন ইমান না আনেন, সে জন্য তিনি ইসলাম কবুল করেন নি।

রাসূল (সা.) তো খেলাফত আলীর নামে লিখে দিতে চেয়েছেলিন, কিন্তু ফেতনা সৃষ্টি হবে এবং ইসলামে বিশৃংখলার সম্মুখীন হয়ে পড়বে, সে ভয়ে আমি রাসূল (সা.) কে জোরপূর্বক থামিয়ে দিলাম। আর তিনি থেমেও গেলেন এবং যা কিছু আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছিলেন তাই হলো (শরহে নাহজুল বালাঘা-আল্লামা ইবনে আবিল হাদিদ, মোতাজেলী সুন্নী-খণ্ড-২, জুজ-১২, পৃ-৬১)।

নিজেদের ব্যক্তিগত ইমান ও আক্বীদা স্বতন্ত্র অবস্থানে নিয়ে উক্ত কথোপকথনকে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, রাসূল (সা.) যে আল্লাহ্র ইচ্ছারই প্রতিনিধিত্ব করেন তা সঠিক নয়। বরং রাসূলের (সা.) ইচ্ছাও আল্লাহ্র ইচ্ছার পার্থক্য রয়েছে। রাসূল (সা.) চাইলেও আল্লাহ্ তাঁর কথা শুনেন না এবং আপাত দৃষ্টিতে তার জলন্ত উদাহরণও পেশ করা হলো। অথচ এ ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত ভূমিকাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হলো। অর্থাৎ আল্লাহ্কে কুল্লান ইমান (রাসূল) এর বিপক্ষে দাঁড় করানো হলো এবং আল্লাহ্র রাসূল (সা.) কে নিজ জামাই এর পক্ষে দাঁড় করানো হয়েছে। এর মধ্যকার দর্শন তথা আক্বীদা হলো রাসূলে খোদা (সা.) স্বয়ং আল্লাহ্র বিরোধীতা করতে পারেন, যিনি তাঁকে নবী বানিয়েছেন, এমতাবস্থায় আমরা যারা উম্মত, তারা রাসূলের (সা.) বিরোধিতা করলে আমাদের প্রতিও কোন অভিযোগ হওয়া উচিত নয়। হযরত ওমর (রা.) আরো বলেছেন যে, আমার বাধাদান হুজুর (রা.) পছন্দ করে নিলেন। অথচ উক্ত বর্ণনা প্রকৃত ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। যদিও রাসূল (সা.) হযরত উমর কর্তৃক বাধা সৃষ্টি করায় তিনি লেখা থেকে বিরত থাকেন কিন্তু উমরের মতকে মেনে নেননি বরং রাগান্বিত হয়ে "আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও" হুকুম জারি করেছিলেন। অর্থাৎ রাসূল (সা.) হযরত আলীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত (রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের অধিকারী) করতে চেয়েছিলেন কিন্তু হযরত ওমর (রা.), রাসূল (সা.) এর ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে দেননি। তার এই কর্মকাণ্ডে রাসূলের ব্যক্তি সত্ত্বা, রেসালত ও আল্লাহ্র পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে তার নিজস্ব ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

ওসীয়তে লিখার ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.) এর এমন বাধা দেয়া সত্ত্বেও রাসূল (সা.) মৌখিকভাবে তিনটি ওসীয়ত করেছিলেন মর্মে বিভিন্ন সনদসহ উল্লেখ আছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ বা তাজ্জবের বিষয় এটাই যে সমস্ত বর্ণনাকারী তৃতীয় ওসীয়তটি ভুলে গেছেন বলে দাবি করেছেন। এ ভুলটিও অর্থপূর্ণ যা বহু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে। মাদারেজুন নবুওয়াত নবুয়াহ গ্রন্থের রুকন-৪, বাব-১৪, ফাসল-৩ পৃ-২২৯ এ উল্লেখ আছে যে, তৃতীয় ওসীয়তটি রাবী ভুলে গেছেন নাকি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোন মুসহেলাত দেখতে পাননি। প্রকৃত বিষয় তো এটাই যে, তিনি কোন "মুসহেলাত" দেখতে পাননি। কেননা যে কথা থেকে হযরত ওমর (রা.) থামিয়ে দেবেন, তা বয়ান করাতে অনেক মুসীবতের আশংকা ছিল। সুতরাং সেটা বয়ান না করাতেই মুসলেহাত ছিল। বিভিন্ন বর্ণনাকারী বলেছেন যে, হুজুর (সা.) মৃত্যু শয্যায় বলেছিলেন। হে লোকেরা সম্ভবত খুব শীঘ্রই আমি ইন্তিকাল করব এবং আল্লাহ্র দূত আমাকে নিয়ে যাবে। ইতোপূর্বেও আমি তোমাদের বলে দিয়েছি। এখন আবারো বলছি যেন তোমাদের কোন ওজর অবশিষ্ট না থাকে। খবরদার! আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার ইতরাত আলী, ফাতেমা, হাসান হোসাইন (আ.) রেখে যাচ্ছি। অতঃপর তিনি হযরত আলী (আ.) এর হাত ধরে বললেন এ আলী হচ্ছে কুরআনের সাথে আর কুরআন আলীর সাথে এবং এরা উভয়ই পরস্পর হতে ততক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না তারা হাউজে কাওসারে আমার নিকট পৌঁছাচ্ছে। সুতরাং, এ দুয়ের কাছেই ইসলাম এবং আমার শিক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে (তথ্য সূত্র: সোহায়েকে মুহরিকা ২য় অধ্যায়, পৃ-৭৫)।

এ পর্যায়ে ন্যায়নিষ্ঠ যে কোন ব্যক্তির সন্দেহের নিরসন হয়ে যাওয়া উচিত যে, হুজুর (সা.) উক্ত সহীফা অর্থাৎ ওসীয়তনামাতে হযরত আলী (কঃ) এর খেলাফত ও ইমামতকেই নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) যখন উক্ত কাজে বাধা সৃষ্টি করলেন তখনও বিষয়টির মৌখিক স্বীকৃতি দিলেন, রাসূল (সা.) এর ধারণা তো পূর্বে থেকেই ছিল এখন নিশ্চিত প্রমাণ হয়ে গেল যে, হযরত ওমর (রা.) এবং তার ভক্ত দলটি হযরত আলী (কঃ) এর খলিফা হওয়ার বিষয়ে অনেক বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাকে খেলাফতের মসনদে আসীন হতে দিবে না। সুতরাং, তিনি হযরত আলী (কঃ) কে কাছে ডেকে ধৈর্য্য ধারণ করার জন্য ওসীয়ত করলেন, আর হিদায়েতের বিষয়াবলী এবং জাহেরী ও বাতেনী রহস্যাবলীর জ্ঞান দান করলেন। আর এটা তো তারই নসীহাত ও প্রবোধেরই ফল ছিল যে, হযরত আলী (কঃ) নিজের হক্ব লুণ্ঠিত হতে দেখেও তরবারি খাপমুক্ত করেন নি।

পবিত্র কুরআনের আলোকে হযরত ওমর (রা.) এর বক্তব্য 'লোকটি প্রলাপ বকছে' ও 'আমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট' পর্যালোচনা

কোন সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য যে, আমি তোমাদের জন্য এমন ওসীয়ত লিখে দিচ্ছি ফলে তোমরা আর গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হবে না তাই কাগজ কলম নিয়ে এস। এই বক্তব্যে কোন প্রলাপ বাড়তি, বা বাজে কথা বিবেচনা করার কোন অবকাশ নাই। বরং যে বা যারা এই ধরণের বক্তব্য বলেছিলেন বা মেনে ছিলেন তারা কোন রাজনেতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আল্লাহ্‌র মহান রাসূল (সা.) সম্পর্কে এমন ভয়াবহ অন্যায় অযৌক্তিক ও অবাস্তব অভিযোগ এনেছিলেন। আল্লাহ্‌তালা পবিত্র কুরআনে বর্ণণা করেছেন ' হে ইমানদারগণ। তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য হতে (আল্লাহ্‌ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত) ক্ষমতাপ্রাপ্তদের (সূরা নিসা : ৫৯)।

"আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট" কথাটি উচ্চারণকারী ও বর্তমানে বিশ্বাসীদের জন্য জানা অপরিহার্য যে, আল্লাহ্‌ নিজ ও রাসূল এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত (উলিল আমর) দের আনুগত্যকে সর্বাবস্থায় অবশ্য পালনীয় (ফরজ) বলে ঘোষণা করেছেন। যেমনি করে আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রতিপালন যে কোন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে অনস্বীকার্য। ঠিক তেমনিভাবে রাসূল (সা.) রোগ শয্যায় থাকেন অথবা যুদ্ধ ক্ষেত্রেই থাকেন না কেন সর্বাবস্থায় তাঁর অনুগত্য করা ফরজ। যদি কোন ব্যক্তি নবী (সা.) এর আনুগত্য করার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে ফেলেন তাহলে অবশিষ্ট সময় রাসূলের আনুগত্যের বাইরে বলে বিবেচিত হবে এবং তা নবুয়ত অস্বীকার করা হবে। অথচ নবুয়ত বা রেসালতকে অস্বীকার করার কথা চিন্তা করলেও ইমান হারানোর জন্য যথেষ্ট হবে। তাই যখন আল্লাহ্‌ সাধারণ হুকুমের মাধ্যমে কোন সময়সীমা ছাড়াই সর্বাবস্থায় তার রাসূল (সা.) এর আনুগত্য করার হুকুম দিয়েছেন। তাহলে তিনি রাসূল (সা.) যখন রোগ শয্যায় কোন নির্দেশ দিবেন এমতাবস্থায় তাঁর নির্দেশ অমান্য করার অর্থ হবে সেই কিতাবেরই বিরোধিতা করা যা কেহ কেহ যথেষ্ট বলে মনে করেন বা বলে থাকেন। অতএব যখন এ কথাটি বলা হলো যে, তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে গেছে। "আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট" 'তখন থেকে উক্ত কিতাবের প্রাধান্য/মর্যাদা/গুরুত্ব পদদলিত হয়ে গেল এবং এই মহান কিতাবের যিনি ধারক বাহক, ব্যাখ্যাকারী ও পার্থিব মালিক অর্থাৎ যিনি এই মহান বাণীর প্রত্যয়নকারীকেই অসম্মানিত/ অমর্যাদা/ অপমান করা হলো। আর রাসূল (সা.) তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করা এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কঠোর শাস্তিদাতা (সূরা হাশর : ৭), এই আয়াতের নির্দেশ অমান্য করা হলো।

রাসূল (সা.) এমন একটি লেখনী উপহার দিচ্ছিলেন যা ভবিষ্যতে সব ধরণের গোমরাহি বা পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত থাকার রক্ষা কবচ ছিল। কিন্তু যারা বিভিন্ন যুক্তি জালের মাধ্যমে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। আর যে সমস্ত গোমরাহী থেকে রাসূল (সা.) বাঁচাতে চেয়েছিলেন। উক্ত বিরুদ্ধবাদীরা সারা জীবন তাতেই ঘুরপাক খেতে থাকলো। এভাবেই প্রকাশ্যেই কুরআনের বিরোধিতা করা হলো। অর্থাৎ কুরআনের মান্যতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো এবং তা মানুষের ইচ্ছা নির্ভর হয়ে দাঁড়ালো। স্মরণ রাখতে হবে আল্লাহ্‌র নির্দেশটিতে তিনি কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ রাখেন নি এবং হুকুমটি সুস্পষ্ট। সুতরাং রাসূল (সা.) এর নির্দেশের মোকাবেলায় নিজেদের 'কিয়াস' ও ইজতিহাদ এর পথ রুদ্ধ। কিন্তু মুসলিম জাতির দুর্ভাগ্য 'কিতাবই যথেষ্ট' উচ্চারণকারী এদিক থেকেও নিজেদের চোখ বন্ধ রেখেছেন। আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নাই যে, আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয় (সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৬)।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) যখন লেখনীর সরঞ্জাম হাজির করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন যারা নিজেদের বুদ্ধি বলে ও যুক্তিতে তা প্রতিপালন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তারা কুরআনের উক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত বলে প্রমাণিত হয়েছেন। 'নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি ইহকালের ও পরকালের অভিশম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি' (সূরা আহযাব : ৫৭)।

সম্মানিত পাঠকগণ! অনুগ্রহ করে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। রাসূল (সা.) একটি স্বাভাবিক ভাষায় একটি অসাধারণ কথা বললেন সেই কথাকে তাঁরই আপনজনরা তার জ্ঞানের প্রতি, বুদ্ধির প্রতি, ওহীর প্রতি, আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি চূড়ান্ত অমর্যাদা ও তাৎপর্যহীন বিবেচনা করে মন্তব্য করা হলো- তিনি প্রলাপ বকছেন। তাই এই ঘটনায় রাসূল (সা.) কত না দুঃখ কষ্ট ও ব্যাথা পেয়েছিলেন তাই তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, "তোমরা আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও।" এই যে একটি ভয়াবহ অভিশম্পাতের বিষয় তা আজ পর্যন্ত এক শ্রেণীর মুসলিম জনগোষ্ঠী বুঝতেই পারছেন না।"

"হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সব কিছু শুনেন ও জানেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যে

রূপ উঁচু স্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপে উঁচু স্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও পুরস্কার" (সুরা হুজরাত : ১-৫)। রাসূল (সা.) এর ওসীয়ত লেখার সময় সাহাবাদের হট্টগোলটি নিশ্চিতরূপে কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলোর পরিপন্থী ছিল। আর পবিত্র কুরআনের বর্ণিত নির্দেশনামা অমান্য করা ছিল একটি ভয়ানক অপরাধ। বোখারী শরিফের হাদিসে উল্লেখ আছে যে, কুরআনের উক্ত নির্দেশটি বিশেষ করে হযরত ওমর (রা.) এর উচ্চ কণ্ঠস্বরকে বোধ করার জন্য নাযিল হয়ে ছিল। এ সংক্রান্ত ঘটনাটি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে :

হযরত আবু বকর, হযরত উমরকে বললেন, তোমার ইরাদা হচ্ছে আমার বিরোধিতা করা। হযরত উমর বললেন, আমার ইরাদা তোমার বিরোধিতা করা নয়। এভাবে উভয়ের কণ্ঠস্বর হুজুর (সা.) এর সম্মুখে উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর হুজরাতের এ আয়াত নযিল হল যে, "হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না। (তথ্য সূত্র সহীহ বুখারী ৩য় খণ্ড: কিতাবুল ইতিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, হাদিস নং ২১৬২, পৃ-৮১৭)। এতদসত্ত্বেও রাসূল (সা.) মর্যাদা ও সম্মানের কোন পরোয়া না করেই তাঁর প্রতি অন্যায় অপবাদ ও দোষারোপ করা হলো এবং তাঁর সম্মুখেই হট্টগোল বাধিয়ে দেওয়া হলো। এ বিষয়ে কোন ধরণের সন্দেহের অবকাশ নাই যে, রাসূল (সা.) এর রোগ শয্যার সম্মুখে এমন ধরণের চিৎকার চেঁচামেচি করা নিশ্চিতরূপে কুরআন বিরোধী ক্ষমার অযোগ্য কাজ ছিল। আর এসব কেন হলো শুধু এ জন্য যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর ফায়সালাকে যথেষ্ট জ্ঞান করা হয়নি। বরং নফসে আম্মারা যে কথা বললো তাই গ্রহণ করা হলো।

"হাসবুনা কিতাবাল্লাহ কুরআনই যথেষ্ট তত্ত্ব" ও এর বাস্তব প্রয়োগ : একটি পর্যালোচনা

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালা বিশ্বমানবতার জন্য কুরআন নাযিল করেছেন। কিন্তু কুরআন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোন হেদায়েতকারী গ্রন্থ নয়। কুরআনের সঠিক পাঠ, অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও তার বাস্তবায়ন একটি দুরূহ কাজ যার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাঁর নির্বাচিত ও নিয়োজিত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.) কে। পবিত্র কুরআনই ঘোষণা করে যে, এই কিতাব সবাই বুঝতে পারেনা। বা এই কিতাব অধ্যয়ন করলেই হেদায়েত পাওয়া যায় না। বরং এই কিতাব অধ্যয়ন করে অনেকেই গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে। এরশাদ হচ্ছে, (এ কিতাবের দ্বারাই) অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন (সূরা বাকারা : ২৬)। আবার এই কুরআনেই বলা হচ্ছে যে, কুরআনকে অনেকে ফেতনা সৃষ্টির উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। এরশাদ হচ্ছে : তিনি খোদা যিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নযিল করেছেন। এই কিতাবে দুই প্রকার আয়াত রয়েছে। মুহকামাত বা কিতাবের মূল বুনিয়াদ আর মুতাশাবেহাত বা রূপক। যাদের মনে জটিলতা আছে তারা ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই মুতাশাবেহাত এর পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ তার প্রকৃত অর্থ (ব্যাখ্যা) আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পাকা-পোকত লোক তারা বলে, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এসবই আমাদের রবের তরফ হতেই এসছে। আর সত্য কথা এই যে, কোন জিনিস হতে শিক্ষা কেবল জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই লাভ করে (সূরা আলে ইমরান : ৭)। অর্থাৎ আল্লাহ্ থেকে প্রাপ্ত বিশেষ জ্ঞানের অধিকারীরাই কুরআনের প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য পবিত্র কুরআন নিজেই ঘোষণা করে যে, কুরআনের যে সমস্ত ব্যাখ্যা তোমরা যদি না জান, যারা স্মরণ রাখে (ঐশ্বরিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ) তদেরকে জিজ্ঞাসা কর (সূরা আম্বিয়া : ৭)।

মানবজাতি "সাহেব এ কুরআন" হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর তিরোধানের পর এই মহা সমস্যায় পড়বে তা সমপূর্ণরূপে উপলব্ধি করে মানবজাতির কেয়ামত পর্যন্ত দিক নির্দেশনার বা হেদায়েতের জন্য ঘোষণা করলেন, আমি তোমাদের মাঝে দুইটি সমমূল্যবান ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি–আল্লাহ্‌র কিতাব ও আমার ইতরাত (বংশধারা আহলে বাইত আলী ও ফাতেমা (আ.) এর সন্তান হাসান ও হোসাইনের বংশধরগণ)। এ দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না তারা কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারের হাজির হচ্ছে। তোমরা যদি এ দুটোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকো আর তাদের আনুগত্য কর তাহলে আমার পর কিয়ামত পর্যন্ত কখনও গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হবে না। (ক) তথ্যসূত্র: তাফসীরে নুরুল কুরআন, মাওলানা আমিনুল ইসলাম ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩৩। (খ) কুরআনুল করীম, মাওলানা মহিউদ্দিন খান, পৃ-৬৫। (গ) সিরাতুন নবী আল্লামা শিবলী নোমানী, ২য় খণ্ড, পৃ-৬০৫। (ঘ) কাতেবীনে ওহী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ-১৬৬। এ কারণেই হাসবুনা কিতাব উল্লাহ্ বা কুরআনই বা যথেষ্ট এই তত্ত্বটি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য বা ভুল তথা বিভ্রান্তিকর। এ পর্যায়ে আমরা হযরত ওমর ও আবু বকর (রা.) এই তত্ত্ব তাদের জীবনে কিভাবে ব্যবহার করেছেন তা পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করব।

হযরত ওমর (রা.), রাসূল (সা.) এর লাশ মোবারককে দেখলেন। তিনি এ ব্যপারে হাসবুনা কিতাবাল্লাহ বিবেচনা করিবে বলেন না, বরং ঘোষণা করলেন, রাসূলে খোদা ইন্তেকাল করেন নি। তিনি মরতে পারেন না, যে বলবে রাসূল (সা.) ইন্তেকাল করেছেন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। অর্থাৎ তরবারির জোরে সত্য প্রকাশে বাধা দেওয়ার "শাস্তি" মৃত্যুদণ্ড কিন্তু কুরআন অনুমোদিত নয়।

হযরত আবু বকর এলেন, তিনি বললেন, "তোমরা যারা রাসূলের ইবাদত করতে তারা জেনে রাখ রাসূল (সা.) ইন্তেকাল করেছেন।" কুরআনের অনুসারীরা ঠিকই জানেন যে কুরআনই রাসূলের ভালবাসাকে ফরজ ঘোষণা করেছে এবং তার মান্যতা অত্যাবশক বিবেচনা করে। অথচ তিনি এই বিরোধী মতবাদ দাঁড় করালেন। অর্থাৎ রাসূলকে ভালবাসা বা মান্য করা অর্থ রাসূলের ইবাদত করা যা একশ্রেণীর রাসূলের দুশমন বুদ্ধিজীবীরা বলে থাকেন।

রাসূল (সা.) লাশ মোবারককে বিনা দাফন কাফনে ফেলে রেখে সকীফায়ে বনী সায়েদার দিকে রওয়ানা দিলেন। পবিত্র কুরআনে খিলাফতের ব্যাপারে নির্দেশনা বিশ্লেষণ ও গবেষণা না করে রাসূল (সা.) এর লাশ মোবারক কাফন-দাফন করার চেয়ে খলিফা নির্ধারণের কাজটিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে।

সকীফা-বনী সায়েদার কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে কত ধরণের না হক্বের দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল। রাসূল (সা.) বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হলো। কিন্তু এমন কথা বলা হলো না যে, এসো সবাই মিলে আল্লাহ্‌র সেই কিতাবর দিকে রুজু হয়ে যাই যে, কিতাবটি আমাদের জন্য যথেষ্ট। উক্ত যথেষ্ট কিতাবের মধ্যেই অনুসন্ধান করে দেখি যে সেখানে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খলিফা নিযুক্তির বিষয়ে কি কি শর্ত দেয়া হয়েছে। হাদী-ইমাম-নেতা-খলিফা নির্বাচনের জন্য কি কি ব্যবস্থাপত্র বা দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কেননা কুরআনের নিজস্ব দাবি হচ্ছে যে, এর মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান মজুদ রয়েছে। কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় সকিফাতে পবিত্র কুরআনের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা হলো না। অর্থাৎ কুরআনকে বাদ দিয়ে রাসূল (সা.) এর কথা আল আম্মাতু মিনাল কোরাইশকে অবলম্বন হিসাবে মেনে নেয়া হলো। অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর সম্মুখে আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট বলে তারই কথার বিরোধিতা করা হলো। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, কুরআনে বর্ণিত নীতি তাদেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখন তা (কুরআন) অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করে আবারো রাসূল (সা.) এর কথারই আশ্রয় গ্রহণ করা হলো এবং কুরআনের কথা বাদ দিয়ে নবী বংশের সাথে আত্মীয়তার মর্যাদা আলোচনা করে আত্মীয়তার গুরুত্বসহ আরবীয় গোত্রীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী এক ধরণের ভোটাভুটির বিষয়টি গৃহীত হলো।

হযরত আবু বকর (রা.) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। রাসূল (সা.) কর্তৃক মা ফাতেমা (আ.) কে প্রদত্ত বাগে ফেদাক রাষ্ট্রায়াত্ব করার দাবি উত্থাপিত হলো। ধর্মের ধ্বজাধারী, বেহেশতের সম্রাজ্ঞী ফাতেমা স্বয়ং দরবারে উপস্থিত হলেন এবং নিজ দাবির সমর্থনে পবিত্র কুরআনকেই মধ্যস্থতাকারী মানলেন এবং বললেন যে, কুরআনের উত্তরাধিকার আইন সবার জন্য প্রযোজ্য এবং এদের মধ্যে নবী-রাসূলরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। যা কুরআন দ্বারা সমর্থিত। দাউদের (আ.) পুত্র সোলায়মান (আ.) কে উত্তরাধিকার দেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য উদাহরণ কুরআন থেকে পেশ করা হলেও পবিত্র কুরআনের প্রকাশ্য নির্দেশ লংঘনপূর্বক রাসূলের (সা.) নামে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে মা ফাতেমার (আ.) দাবি নাকচ করা হলো। অর্থাৎ কুরআনের নির্দেশের বিপরীতে বা হাদিসকে গণ্য করে এক নতুন ফেতনার সৃষ্টি করা হলো। আবার এই হাদিসটি মা ফাতেমা (আ.) স্বয়ং বাতিল বলে মত প্রকাশ করেন। হাসবুনা কিতাবাল্লাহ্ উচ্চারণকারী এবং শ্রোতারা সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু সবাই চুপ। এখন কেউ বলছেন না যে, আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট। সেদিকেই রজু করা হোক। ফলে মা ফাতেমা (আ.) বুঝে নিলেন যে, এতো সেই দল, যারা না তো কুরআনের অনুসরণ করে, আর না হাদিস দ্বারা হেদায়েত লাভের ইচ্ছা পোষণ করে বরং যেদিকে নিজেদের স্বার্থ ও লাভ দেখা দেয় তারা সে ধরণের কথা বলে থাকে। সে কারণেই হযরত ফাতিমা (আ.) যতদিন এ ধরণীতে বেঁচে ছিলেন, তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত ছিলেন ও তাদের অভিশাপ দিতেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের কারো সাথে কথা বলেন নি। এমন কি তাদের সালামেরও উত্তর দেননি (সহীহ বোখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম খণ্ড, হাদিস নং ২৮৬৬/ অর্থ সংস্করণ, জুন ৫ পৃ. ২৮৪-২৮৯, হাদিস নং ২৮৭৪-৭৫), সহীস মুসলিম, ৫ম খণ্ড, হাদিস নং ৪৪২৮)।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) এর খেলাফতকাল যখন পূর্ণ হলো তখন তিনি হযরত ওমর (রা.)কে ওসীয়তের মাধ্যমে নিযুক্ত করলেন। তখনও কিন্তু ওমর (রা.) "যথেষ্ট কিতাবের কথা আবু বকর (রা.) কে মনে করিয়ে দেন নি যেমন রাসূল (সা.) এর ক্ষেত্রে করেছিলেন। বা একথাও বলেন নি জনাব ওসীয়ত লেখার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি কেন কষ্ট করছেন আমাদের জন্য তো আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট। বরং আবু বকর (রা.) সাক্ষরিত ওসীয়ত নামাটি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং তা মানার জন্য জনগণকে শাসাচ্ছেন। হযরত ওমর (রা.) এর যখন শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হলো

তখন তিনি একটি অসাধারণ "মজলিস-এ-শুরা" নিয়োগ করলেন। হাসবুনা কিতাবাল্লাহ বাক্যটি উচ্চারণকারী এখন আর কিতাবের নামও নিচ্ছেন না। সমস্ত রকম হেদায়েত ও দিক নির্দেশনা নিজেই দিচ্ছেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে (রা.) এমন ক্ষমতা দেওয়া হলো যে তিনি যাকে সমর্থন করবেন তিনিই খলিফা হবেন এবং তিন দিনের মধ্যে সমস্ত কর্মকাণ্ড শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দিলেন। এই সময়ের মধ্যে খলিফা নির্বাচনের কাজ শেষ করা না হলে মজলিশে সুরার সকল সদস্যকে হত্যা করার রায়ও ঘোষণা করলেন। তাছাড়া যে কোন সমস্যা মূল ধারার সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করবে তাকেই হত্যা করা হবে। এই ধরণের অপরাধে নর হত্যা করার কোন বিধান আল্লাহ্‌র কিতাবে নাই। আবার হযরত ওমর (রা.) এর নির্বাচিত আব্দুর রহমান আউফ (রা.) খলিফা নির্বাচনের জন্য হযরত আলী (আ.) কে এমন শর্ত দিলেন যা কুরআন হাদিসকে অতিক্রম করে যায় যা কুরআন বিরোধী। অর্থাৎ এই শর্তের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করার জন্যই আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) হযরত আলী (আ.) কে খলিফা হিসাবে নিয়োগের অযোগ্য ঘোষণা করলেন। ফলে কার্যত এই ধরণের চিন্তাধারা, মতামত/সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌র এর চেয়ে অধিক মর্যাদাও গুরুত্বের অধিকারী হিসাবে বিবেচিত হলো।

এই পরিস্থিতি সৃষ্টির মূল কারণ হলো আল্লাহ্‌র সেই বিধি বিধান যা কতইনা কষ্ট কাঠিন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা, যুদ্ধের মাধ্যমে রাসূল (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আবর্জনার স্তুপে পর্যবসিত হওয়া শুরু হয়ে গেলো যেহেতু সাহাবীরা রাসূল (সা.) এর শেষ ওসীয়তের প্রতি আমল করেননি এবং সাকলাইনের সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। উম্মতে ইসলামিয়াকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে ছিলেন যে কারণে উম্মাহ্ রাসূল (সা.) এর সত্যিকারের নায়েব বা খলিফাকে চিনতে পারেন নি। কুরআন ও রাসূল (সা.) এর শিক্ষা (সুন্নাহ্) মতে হাকীম বা শাসক হবে তো সেই সত্ত্বা যে সব রকমের গোনাহ্ ও পাপাচার থেকে মুক্ত ও পুতঃপবিত্র এবং তার আদেশ ও নির্দেশ এবং আমলসমূহ হুবহু কুরআনের আলোকে হবে যেন তার সমস্ত হুকমের প্রতি নির্দ্বিধায় আমল করা যেতে পারে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্‌র দুর্ভাগ্য সাহাবীরা উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে ভুলে গেলেন এবং পাপী-তাপী যাই থাকুক না কেন কোন বাছ-বিচার ছাড়াই তাদেরকে জায়েজ শাসক হিসাবে গ্রহণ করলেন উম্মত কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল আর এই বিভক্তি নিজেই একটি দলিল হয়ে গেল। ফলে রাষ্ট্র ও ক্ষমতাকে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিজস্ব সম্পত্তি বলে ঘোষণা দেয়া হলো। আর যেখানে নাফসনি খায়েশকে কিয়াস এবং বদমায়েশী ও ষড়যন্ত্রকে ইজতিহাদ এবং নিন্দনীয় শলা-পরামর্শকে ইজমা এবং সময়োপযোগী ষড়যন্ত্রকে শুরা বলে ঘোষণা দেয়া হয়ে থাকে। যেখানে শান্তি-শৃংখলার নামে বিশৃংখলা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজত্ব বিস্তারকে জিহাদ বুঝানো হয়ে থাকে এর বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি জুলুমকে জায়েজ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। আর কলমের জায়গায় তরবারি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খেলাফতের রাশিদার প্রকৃতি ও নিয়োগের বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের পত্রটি যা তিনি মুহাম্মদ বিন আবু বকরের নিকট লিখেছিলেন তা উল্লেখ করা হচ্ছে:

খেলাফতে রাশেদার বিশেষ প্রিয়ভাজন ছিল উমাইয়া বংশ। রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর উত্তরাধিকার নিয়ে যে মতবিরোধিতার সৃষ্টি হয় তখন হযরত আলী (আ.) এর পক্ষে সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করার ঘোষণা আবু সুফিয়ান দিয়াছিলেন, হযরত আলী (সা.) মুসলিমদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা করতে চাননি তাই এ প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করেন। তাই শাসকবর্গ উমাইয়াদের তোষন নীতি প্রবর্তন করে। এরই ধারাবাহিকতায় আবু সুফিয়ানের পুত্র ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে প্রথম সেনাপতি পরে সিরিয়ার গভর্নর হিসাবে হযরত আবু বকর (রা.) নিয়োগ করেন। ইয়াজীদ ইবনে আবু সুফিয়ান সিরিয়ায় প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণ করলে তার সুযোগ্য ভ্রাতা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে হযরত ওমর (রা.) সিরিয়ার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। মুয়াবিয়া হযরত ওমর (রা.) এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারণ মুয়াবিয়া হযরত ওমর (রা.) অনুমোদনক্রমেই রাজার মত আচরণ করতেন। তাই ওমর (রা.) মুয়াবিয়াকে স্নেহভরে আরবদের "সম্রাট" বলতেন।

হযরত ওমর (রা.) সাধারণভাবে বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নরদের কয়েক বছর পর পর বদলীর ব্যবস্থা করলেও অজ্ঞাত কারণে তিনি মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে সিরিয়া থেকে বদলী করেন নি। ফলে তিনি প্রচুর আর্থিক ও সামরিক ক্ষমতার অধিকারী হন। হযরত ওসমান (রা.) এর ১২ বছর শাসনকালে তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের মুখ্য সামরিক কর্মকর্তা (Commander in Chief) হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং সিরিয়া কায়কাস সহ ছোট ছোট প্রদেশের শাসনভারও তার উপর অর্পিত হয়। তিনি যেহেতু একজন প্রমাণিত দুনীতিবাজ কর্মকর্তা ছিলেন তাই হযরত আলী (আ.) ক্ষমতাসীন হয়ে তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূলের নিয়োগকৃত ওয়াসী (প্রতিনিধি) ও মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য গণভোটে নির্বাচিত একমাত্র খলিফার এই বৈধ নির্দেশ লংঘন করে হযরত আলী (আ.) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ধর্মভ্রষ্ট হন। তাই হযরত আবু বকর (রা.) এর পুত্র মুহাম্মদ যিনি হযরত আলী (আ.) এর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। তিনি মুয়াবিয়াকে ধর্মের পথে ফিরে এসে হযরত আলী (আ.) এর

নির্দেশ পালনের পরামর্শ দিয়ে একটি পত্র লিখেন। সেই পত্রের উত্তরে মুয়াবিয়া যে পত্র লিখেছিলেন তার নির্বাচিত অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

"তুমি (মুহাম্মদ বিন আবু বকর (রা.) যে, পত্রটি পাঠিয়েছ তার মধ্যে এমন অনেক কথাবার্তা আছে যার দ্বারা তোমারও তোমার পিতার (আবু বকরের) মানহানী ও বদনাম হয়। তুমি আমার বিরুদ্ধে আপত্তি করেছ এবং আমার দোষ ত্রুটি বয়ান করেছ। কিন্তু এসব কিছু অন্যের আলী ইবনে আবি তালিবের (আ.) ফাযায়েলের তুলনায় নাকি নিজের। আমি ও তোমার পিতা আবু বকর আলী ইবনে আবি তালেবের (আ.) ফাযায়েল ও অধিকার যা আবশ্যক ও ওয়াজিব ছিল তা স্পষ্ট করেই জানতাম। (কিন্তু) যখন রাসূল (সা.) এর চোখ বন্ধ হলো তখন তাঁর ফাযায়েলও অধিকারকে ভুলে গিয়ে তোমার পিতা আবু বকর (রা.) আর উমর (রা.) উভয়ে সর্বাগ্রে যোগসাজশে খেলাফত ও হুকুমত (শাসন ক্ষমতা) আলীর (আ.) কাছ থেকে কেড়ে নেন। উক্ত দলের তৃতীয় ব্যক্তি ওসমান (রা.) দাঁড়াল এবং সেও ঐ সবকিছুই করল যা প্রথম দু'জন আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিলেন।" (মুরুজুয যাহাব, মাসউদী, ইবনে আসীরের তারিখে কামিলের হাশীয়াতে পৃ-৬৬ ও ৭৮, হাদিসে কিরতাস এবং হযরত উমর (রা.) এর ভূমিকা লেখক আবদুল কারীম মুশ্‌তাক। বাংলা অনুবাদ ইরশাদ আহমেদ, র‍্যমন পাবলিশার্স প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১)। এই পত্রের আলোকে খিলাফতে রাশেদার প্রকৃত আইনগত অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া যায়।

মিথ্যা হাদিসের মাধ্যমে সত্য ইতিহাস অপহরণ

রাসূল (সা.) এর ওফাত, দাফন-কাফন সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকগণ এমন ধুম্রজাল সৃষ্টি করেছেন যে, রাসূল (সা.) এর অন্তিম সময় সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার বিষয়টি বিতর্কিত ও সীমিত হয়ে পড়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, কিছু সাহাবাদের অস্বাভাবিক এবং রাসূল (সা.) এর সাথে কখনও কখনও বেয়াদবী ও তার নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন তা গোপন করা এবং তাঁদের মর্যাদাকে সমুন্নত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখা। এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে মিথ্যা হাদিসের মাধ্যমে। অথচ এইসব হাদিস বর্ণনাকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) এর মত ব্যক্তিত্বকে যাতে একজন নিরপেক্ষ মুসলিম পাঠক এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থাপনই না করতে পারে।

হযরত আবু বকর (রা.) এর খেলাফত/ইমামত সম্পর্কিত বর্ণনা

কবি গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী' গ্রন্থে ৩৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, সেদিন (রবিউল আউয়াল) মাসের এগার তারিখ রবিবার। এশার আযান হলে রাসূল (সা.) আবু বকরকে নামায পড়াবার জন্য আদেশ পাঠালেন। আদেশক্রমে আবু বকর নামায আরম্ভ করলেন। কিন্তু হযরতকে অনুপস্থিত দেখিয়া ভক্তবৃন্দ উতলা হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন বুঝিবা হযরত আর ইহ জগতে নাই। হযরত তাহা বুঝিতে পারিয়া দুইজন আত্মীয়ের স্কন্ধে ভর দিয়া মসজিদে উপস্থিত হইলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া আবু বকর মিম্বর হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিরার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু হযরত তাহা নিষেধ করিলেন। আবু বকরের পার্শ্বে বসিয়াই সেদিন তিনি নামায পড়িলেন। সম্মানিত পাঠক ঘটনাটি অনুপুংখ বিশ্লেষণ করুন। হযরত আবু বকর (রা.) নামায আরম্ভ করলেন, এমন সময় রাসূল (সা.) মসজিদে প্রবেশ করলেন। নামায পাঠরত অবস্থায় তা আবু বকর (রা.) প্রত্যক্ষ করলেন এবং মিম্বর হতে নামিবার জন্য ব্যগ্র হলেন এবং রাসূল (সা.) তা নিষেধ করলেন এবং এই অবস্থায়ই রাসূল (সা.) আবু বকরের (রা.) পাশে বসেই নামায পড়লেন অথচ ইমাম হিসাবে আবু বকর (রা.) তখন নামায পাঠরত অবস্থায় মিম্বরের উপর দাঁড়ানো অথবা বসা অবস্থায় থাকার কথা। এটা কোন ধরণের নামায যে নামায পাঠরত অবস্থায় আবু বকর (রা.) সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন এবং মিম্বর থেকে নেমে আসার জন্য ব্যগ্রতা দেখাচ্ছেন আবার রাসূল (সা.) ইংগিত/নির্দেশ অনুযায়ী নামায জারি রাখছেন, অথচ মিম্বরে দুইজন লোক এক সাথে দাঁড়ানোর বা বসার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও রাসূল (সা.) তার পাশে বসে নামায পড়লেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, নামায মুসল্লীদের জন্য মিরাজ স্বরূপ অর্থাৎ দেহ, মন, আত্মা একনিষ্ঠ হয়ে নামায আদায় করাই প্রকৃত নামাযের আদব। যার উদাহরণ হিসাবে আমরা হাদিস থেকে জানতে পারি যে, হযরত আলী (আ.) এর পায়ে তীর বিদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথাজনিত কারণে তা খোলা যাচ্ছিল না। (রাসূল সাঃ) এর নির্দেশে আলী (আ.) এর নামাযরত অবস্থায় এই তীর খোলা হয়েছিল। অথচ তা তিনি জানতেও পারেন নি। একই ঘটনার ভিন্ন বর্ণনা শেখ আবদুর রহীম গ্রন্থাবলীর ৩৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '৯ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার তাহার (রাসূল সাঃ) এর পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইল। সেইদিন বেলাল আযান দিয়া হযরতকে নামায পড়িবার জন্য ডাকতে আসলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, বেলাল! তুমি আবু বকরকে ইমামের (আচার্য্য) কার্য করতে বল, আর তোমরা সকলে তাহার সাথে নামায পড়। তখন মসজিদে গিয়ে বেলাল আবু বকরকে বলেন, প্রেরিত মহাপুরুষ আপনাকে এমাম হইয়া সকলকে লইয়া নামায পড়তে

অনুমতি দিয়েছেন, ইহা শুনে হযরত আবু বকর দুঃখিত হইলেন এবং অন্যান্য শিষ্যগণ ক্রন্দন করতে লাগলেন। হযরত সেই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করে বিবি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ফাতেমা কি জন্য লোকে ক্রন্দন করতেছে? বিবি ফাতেমা বললেন, আপনাকে মসজিদে দেখতে না পাইয়া ক্রন্দন করিতেছে। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি হযরত আলী ও ফজলকে ডাকলেন। তিনি তাহাদের স্কন্দোপরি ভর দিয়া মসজিদে গেলেন এবং হযরত আবু বকরের পশ্চাতে বসিয়া নামায পড়িলেন। আবু বকর এমামের কার্য করিলেন।" এই ঘটনার পূর্বে যে হযরত আবু বকর (রা.) যে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে মদীনা নগরের বাইরে ছিলেন সে সম্পর্কে শেখ আব্দুর রহীম গ্রন্থাবলীতে লিখিত আছে, তিনি (রাসূল সাঃ) জায়েদের পুত্র ওসামাকে ২৬ শে সফর তার অধীনে সৈন্য দিয়া ওবনা নামক স্থানে পাঠানোর উদ্যোগ করতে লাগলেন। ২৮ শে সফর বুধবার তার পীড়া বৃদ্ধি হইল। তৎসত্ত্বেও তিনি পরদিন প্রাতে ওসামাকে সৈন্যগণের নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত করেন এবং তাহার হাতে পতাকা দেন। ওসামা সেই পতাকা পথিমধ্যে হোসাইয়েবের পুত্র বরিদার হস্তে অর্পন করেন। পরে তিনি মদীনার নিকটস্থ জোরফ নামক স্থানে সৈন্য সংগ্রহার্থে শিবির স্থাপন করেন। এদিকে হযরত মুহম্মদ, হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, সায়াদ বেন আবি ওয়াককাছ ও আবু ওবেদা বিন জারা প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকগুলিকে ওসামার সমভিব্যবহারে যাইতে অনুমতি দিলেন; কিন্তু হযরত আলীকে যাইতে বলিলেন না। ১০ই রবিউল আউয়াল তারিখে হযরতের পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে ওসামার সঙ্গে কথা বলতে পারলেন না, কেবল হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক ওসামার স্কন্ধোপরি নিক্ষেপ করলেন। ওসামা মনে করলেন যে হযরত তাহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন। সে দিন তিনি শিবির প্রত্যাবর্তন করলেন। আবার পরদিন প্রাতে তিনি হযরতের সাথে সাক্ষাত করতে আসলেন। সেই দিন হযরত একটু সুস্থ ছিলেন বলিয়া ওসামার সাথে কথোপকথনপূর্বক তাকে বিদায় দিলেন। পরদিন বারই রবিউল আউয়াল তারিখে ওসামা শিবির হতে ওবনায় যাত্রা করার উদ্যোগ করতেছেন এমন সময় তাহার জননী উম্মে আয়মন তাহাকে সংবাদ দিলেন যে, হযরত মুহম্মদ মুমুর্ষাবস্থাপন্ন হইয়াছেন। ওসামা এই মর্ম বিদারক সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রধান প্রধান সৈন্যসহ হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান ইত্যাদি মদীনায় প্রত্যাগমন করিলেন বুরিদা পবিত্র পতাকাটি হযরতের গৃহদ্বারে স্থাপন করিলেন।

সম্মানিত পাঠকগণ! অবশ্যই দুইজন খ্যাতিমান লেখকের বর্ণনার মধ্যে বহু পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করেছেন। ঘটনার তারিখের মধ্যে প্রভেদ এবং নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে প্রভেদ। রাসূল (সা.) আবু বকরের পার্শ্বে অথবা পিছনে বসে নামায পড়েছিলেন। সে বর্ণনায়ও প্রভেদ। তাই যে সব ব্যক্তিবর্গ খেলাফতের মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ়চেতা তাদের লিখিত/বর্ণিত হাদিস তথা ইতিহাসের বানোয়াট বর্ণনায় লেখকদ্বয় যে বিভ্রান্ত হয়েছেন তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। আবু বকর (রা.) তখন জোরফের তাবুতে ওসামার অধীনে। উভয় বর্ণনাতেই ওসামাসহ অন্যান্য সাহাবাগণের উবনা অভিযানে যেতে গড়িমসির পক্ষে সাফাই গাওয়া হয়েছে। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো রাসূল (সা.) এর এত কাছের লোক পর্যন্ত তাঁর ইশারা/ইংগিত "নির্দেশ ঠিকমত বুঝতেন না। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য ব্যাপার। আর ওসামা কি মনে করলেন তাও অন্য একজন লেখক বুঝে ফেললেন। রাসূল (সা.) এর নির্দেশ তাঁর সাহাবাগণ পর্যন্ত এত তাচ্ছিল্যের সাথে বা অবহেলা ভরে গ্রহণ করতেন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ছাড়া পাঠকদের কোন বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ আছে কি?

রাসূল (সা.) এর ওফাতকালীন বর্ণনা বিষয়ক বিভ্রান্তি

মিশকাত শরিফে বোখারী থেকে আয়শা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস, এটা আমার উপর আল্লাহ্‌র একটি আশীর্বাদ যে রাসূল (সা.) আমারই ঘরে আমার বুক এবং গলার মাঝখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন আর তাঁর মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ আমার মুখ নিসৃত রসের সঙ্গে তার মুখ নিসৃত রস মিশিয়ে দিয়েছিলেন। আবু বকরের পুত্র আবদুর রহমান একটি মেসোয়াক হস্তে আমার নিকট যখন এসেছিল সে সময় রাসূল (সা.) আমাকে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। আমি হযরতকে তার দিকে তাকাতে দেখলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, মেমোয়াকটি তিনি চান, আমি বললাম, আমি আপনার জন্য এটা নিব তিনি হ্যাঁ সূচক ইংগিত করলেন। আমি সেটা নিলাম, কিন্তু তা তার কাছে বড় শক্ত মনে হল, আমি বললাম, আমি কি এটা নরম করে দিব? তিনি আবার হ্যাঁ সূচক ইংগিত দিলেন। আমি তা নরম করে দিলে তিনি মেমোয়াকটি ব্যবহার করলেন। তার সামনে একটি পানির পাত্র ছিল। তিনি তার হাত সেটার মধ্যে ডুবাচ্ছিলেন এবং তদ্বারা মুখ মণ্ডল ধৌত করছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন; আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মৃত্যুর জন্য অবসাদ আছে। অতঃপর তিনি হাত উঠালেন এবং বিড়বিড় করে বললেন, সর্বোচ্চ বন্ধুর দিকে যে পর্যন্ত তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন এবং তার হাত পড়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে হযরত আয়েশা (রা.) এর নামে বর্ণিত এই হাদিসটি সম্পূর্ণ বানোয়াট, অসত্য ও প্রকৃত ঘটনার সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই।

একজন সতর্ক ও পর্যবেক্ষণশীল পাঠক ঘটনাবলীর বর্ণনা বিশ্লেষণ করলেই কয়েকটি অসংগতিপূর্ণ বিষয় সহজেই দৃষ্টিগোচর ও বুদ্ধিগোচর হবে। বলা হচ্ছে যে, (রাসূল

সাঃ) 'আমারই ঘরে, আমারই দিনে, আমার বুক ও গলার মাঝখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে আব্দুর রহমানের হাতে মেসোয়াক দেখে তিনি এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলে তা তাকে দেয়া হয় এবং তা তিনি ব্যবহার করলেন। ব্যবহারের সময় তার সামনে একটি পানির পাত্র ছিল তাতে তিনি তাঁর হাত পানির পাত্রে ডুবাচ্ছিলেন ও তদ্বারা তাঁর মুখ মণ্ডল ধৌত করছিলেন। মৃত্যুকালে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বুক ও গলার মাঝখানে শায়িত অবস্থায় এত কাজ করেন কিভাবে। আর আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির এভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া কি স্বাভাবিক বা সংগত বা ভদ্র জানোচিত না অস্বাভাবিক এই কথা কোন ব্যক্তিকে চিন্তা করার অবকাশও দেয়া হয় না। (রাসূল সাঃ) এর অন্তিম সময়ের সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণনা শেখ আব্দুর রহীম গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ডের ৩৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে: তাহার (রাসূল সাঃ) পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগল। এই সময় বিবি ফাতেমা সর্বদা তাহার নিকটে থাকিতেন। সেই সময় তিনি জামাতা হযরত আলীকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার অন্তিম সময় উপস্থিত, আমি অমুক ইহুদীর নিকট কিছু ঋণ গ্রহণ করিয়া ছিলাম তুমি তাহা পরিশোধ করিও। আমার মৃত্যুর পর পৃথিবীতে তোমার অনেক বিপদ উপস্থিত হইবে। কিন্তু তখন তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন করিও। এই সময়ে হযরত আবার প্রিয়তম দৌহিত্র হাসান, হোসাইনকে নিকটে ডাকিলেন এবং স্নেহ গদ গদভাবে আহ্বান করিয়া হস্তাপূর্ণপূর্বক আশির্বাদ করিলেন। একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিবসে জগতের শান্তিদাতা ন্যায়নিষ্ঠ সদাচারা সর্বৈব নিকেতন প্রেরিত পুরুষ প্রভাকর হযরত মুহম্মদ মোস্তফা আত্মীয় বন্ধু বান্দাদিগকে শোক সাগরে ভাসাইয়া এবং তার ভক্ত মণ্ডলীকে কাঁদাইয়া স্বর্গারোহন করিলেন। এই বিখ্যাত পুস্তকের ৩৭৫ পৃষ্ঠার বর্ণনা: তাহার পবিত্রাত্মার বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে গৃহ অপূর্ব স্বর্গীয় সৌরভে সুরভিত হইল। লোক ঘ্রাণে বিমুগ্ধ হইয়া অবাক হইয়া রহিল। বিবি উম্মে সালমা বলিয়াছেন: আমরা সেই গৃহে অনেকদিন পর্যন্ত সেই অপার্থিব সৌরভের ঘ্রাণানুভব করিয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে হযরত আয়শা (রা.) উক্ত কক্ষে উপস্থিতই ছিলেন না। যার বর্ণনা সম্পর্কে ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত ও আল্লামা মোত্তাকী তার কানজ্জল আমল কিতাবে যেমন বর্ণনা করেছেন "যখন ওমর বিন খাত্তাব (রা.)কে রাসূল (সা.) এর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হত তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে জবাব দিতেন আলীর নিকট যাও এবং তাকে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা কর। তিনিই রাসূল (সা.) এর শেষ সময়ে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ আনছারী বলেছেন, কাবুল আহ্বার ওমর বিন খাত্তাব (রা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাসূল করীম (সা.) এর শেষ কথাগুলো কি ছিল? ওমর (রা.) উত্তর দিয়েছিলেন প্রশ্নটি আলীকে জিজ্ঞাসা কর; তখন কাব আলীকে প্রশ্নটি করেছিলেন? তিনি আলী (আ.) বলেছিলেন: আমি রাসূলকে (সা.) আমার বুকের উপর হেলান দেয়া অবস্থায় রেখে ছিলাম। তিনি আমার কাঁধের উপর মাথা রেখেছিলেন আর বলেছিলেন: এটাই সকল নবীগণের শেষ উপদেশ তাদের অনুসারীদের প্রতি। তারা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এমন উপদেশ দেওয়ার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যেই তাদেরকে নবী হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। কাব আরো একটি প্রশ্ন ওমরকে করেছিলেন। কে তাঁকে শেষ গোসল করিয়েছিল? হে আমীরুল মোমেনীন, ওমর (রা.) উত্তরে বলেছিলেন আলীকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি আলীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "আমিই তাঁর শেষ গোসল করিয়েছিলাম। ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল্ লোকে বলে যে, ওফাতের সময় রাসূল (সা.) এর মাথা কোন ব্যক্তির কোলের উপর ছিল। এ বিষয়ে আপনি কি বলেন? ইবনে আব্বাস উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ যখন তিনি ইন্তেকাল করেন তিনি আলীর বুকের উপর এলায়িত ছিলেন তাকে বলা হয়েছিল যে, উরওয়া বলেছেন যে আয়েশা বলেছেন: তিনি সে সময় রাসূল (সা.) যখন আমার বক্ষদেশে এলায়িত ছিলেন তখন তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন ইবনে আব্বাস তখন অস্বীকার করেন এবং বলেন, তুমি কি এটা বিশ্বাস কর? আল্লাহ্‌র শপথ যে সময় রাসূল (সা.) যখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তিনি আলীর বুকের উপর এলায়িত ছিলেন এবং আলীই তাঁর শেষ গোসল করেছিলেন।

ইমাম হাকীম তার সহিহ মুস্‌তাদারাকে, আল্লামা জাহাবী তার তালখী ও মুসতাদরকে ইবনে আবি শায়বা তার সুনানে এবং আল্লামা মুত্তাকি তার কানজুল আম্মালে লিপিবদ্ধ করেছেন: উম্মে ছালামা বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ আলী যে কোন লোকের চেয়ে বেশী সময় রাসূল (সা.) এর সঙ্গে কাটিয়েছেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার সঙ্গে ছিলেন। রাসূল করীম (সা.) এর ইন্তেকালের দিনে আমরা সকলে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন: আলী এসেছে? আলী এসেছে? তার কন্যা ফাতেমা জবাব দিলেন: আপনি বোধ হয় কোন জরুরী কাজে তাকে পাঠিয়েছেন। অল্পক্ষণ পরেই আলী আসলেন। আমি মনে করলাম যে, তিনি বোধ হয় আলীর সাথে কোন গোপন কথা বলবেন। অতএব আমরা সবাই উঠে পড়ছিলাম এবং বাইরে চলে এলাম। উম্মে ছালামা আরো বলেছেন: আমি অন্য সকলের চেয়ে দরজার বেশি কাছে ছিলাম। আমি দেখলাম যে, রাসূল (সা.) আলীর বুকের উপর হেলান দিয়ে ছিলেন এবং মৃত্যু

পর্যন্ত তার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছিলেন। তাই আলী একাই রাসূল (সা.) এর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

ইবনে সাদ তাবাকাত কিতাবে এবং আল্লামা মুত্তাকি কানজুল আমল আলী (রা.) এর বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, আলী বলেছেন: জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোতে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বলেছিলেন আমার নিকট আমার ভাইকে ডাক। অতএব আমি তার নিকট গেলাম, তিনি আমাকে আরো নিকটে যেতে বলরেন। আমি তার অতি নিকটে গেলাম। তিনি আমার উপর হেলান দিলেন এবং আমার বুকের উপর এলায়িত থাকলেন, আর আমার সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন যে পর্যন্ত না তার পবিত্র থু থু আমার উপর পড়তে লাগল এবং তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হাফিজ আবু নাঈম তাঁর হুলিয়াতুল আউলিয়া কিতাবে আবু আহম্মদ আল কারজী তার নুছখা কিতাবে এবং অন্যান্য আরো অনেক মুহাদ্দিস আলীর একটি হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্বে শেষ সময় আমাকে জ্ঞানের এক হাজার অধ্যায় শিক্ষা দিলেন যার প্রত্যেকটি আমার জন্য আরো এক হাজারটি করে অধ্যায় খুলে দিল।

ইবনে সাদ তাবাকাত কিতাবে শোবি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূল করীম (সা.) ইন্তেকাল করেন তখন তার মাথা আলীর কোলের উপর ছিল এবং তিনিই তার শেষ গোসল করিয়েছিলেন। হযরত আলী তার বক্তৃতায় ও এসব কথা বলেছেন এ ব্যাপারে তাঁর বক্তৃতা সংকলন নাহজুল বালাগা এবং শরহে নাহজ্জল বালাগায় বিষয়টি তার নিজস্ব জীবনীতে স্পষ্টাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

রাসূল (সা.) এর দাফন ও নামায এ জানাজা বিষয়ক আলোচনা

রাসূল (সা.) কে কোথায় সমাহিত করা হবে কবি গোলাম মোস্তফা তার বিশ্বনবী গ্রন্থে এবং শেখ আব্দুর রহীম তাঁর হযরতের মুহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি পুস্তকে এর মীমাংসা আবু বকরকে দিয়ে করিয়েছেন এই বলে যে, পয়গম্বরগণ যে যেখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন সেখানেই তার কবর দেওয়া হয়েছে তাই নবী করীম (সা.) এর কবর তিনি যেস্থানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন সেখানেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে আমরা স্থির নিশ্চিতভাবে জানি রাসূল (সা.) এর ওফাতের কিছুক্ষণ পরেই আবু বকর ও ওমর (রা.) বনী সকীফায় সায়েদার খলিফা নিয়োগের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাই রাসূল (সা.) এর গোসল, দাফনের ব্যাপারে তাঁর কোন ভূমিকা থাকার প্রশ্নটিই অবান্তর।

প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সা.) স্বয়ং হযরত আলীকে তাঁর মাযার ও গোসলের ব্যাপারে ওসীয়ত করেছিলেন। রাসূল (সা.) বলেছিলেন যে, তার ওফাতের পর আলী (আ.) ব্যতীত অন্য কেহ যেন তার পবিত্র গোসল মোবারক না দেয় বা খোলা চোখে তাঁর পবিত্র দেহ মোবারক দর্শন না করে। এই নির্দেশ অমান্য করলে সে অন্ধ হয়ে যাবে। এই নির্দেশের আলোকে হযরত আলী (আ.) রাসূল (সা.) এর জানাজার গোসল সম্পন্ন করেন এবং ফযল ইবনে আব্বাস (রা.), ওসামা (রা.) চোখে কাপড় বেঁধে হযরত আলী (আ.) কে এ কাজে সহায়তা করেন। হযরত আলী (আ.), রাসূল (সা.) এর মাযার শরিফে অবতরণ করেন এবং তার পবিত্র দেহ মোবারক কবরে শায়িত করেন।

যা হোক, সকিফায়ে বনি ছায়েদায় তিনদিন পর্যন্ত ঝগড়া ঝাটি/ তর্কাতর্কি/ ধাক্কাধাক্কি করে বিভ্রান্তিকর যুক্তির মাধ্যমেও এক ধরণের বল প্রয়োগের মাধ্যমে আবু বকর (রা.) কে খলিফা নির্বাচন করে যখন তারা আবু বকর ও ওমর (রা.) নিজেদের দলবলসহ মদীনায় ফিরে এসে দেখলেন যে, রাসূল (সা.) এর লাশ নবী পরিবারের সদস্যগণ দাফন করে ফেলেছেন। তারা রাসূল (সা.) এর নামাযের জানাজা পড়েন নাই অথচ তারাই মুসলিমদের খলিফা হয়েছেন এই অপবাদ ঠেকানোর জন্য রাসূল (সা.) এর লাশ কবর থেকে তুলে পুনরায় জানাজার নামায পড়বেন বলে দাবি জানালেন। এতে শোকে দুঃখে মুহ্যমান আলী উম্মুক্ত তলোয়ার হাতে কবরের দুই পাশে দুই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন যে, তার জীবন থাকতে এই ধরণের ভয়াবহ বেআদবীর কাজ তিনি করতে দিবেন না। এই দৃশ্য দেখে আবু বকর (রা.) এর মনে পড়ছিল যে রাসূল (সা.) বলেছেন যে 'মাটির ঘোড়ার দুই দিকে দুই পা দিয়ে আলী (আ.) যখন খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াবে তখন যে তাকে আক্রমন করবে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।'

তাই তিনি হযরত আলীর (আ.) নিকট তাদের জানাজা পরার ব্যাপারে পরামর্শ চান। তখন হযরত আলী (আ.) তাদেরকে রাসূল (সা.) এর কবরকে সামনে নিয়ে জানাজা পড়তে বললেন। সেভাবেই আবু বকর (রা.), ওমর (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীগণ রাসূল (সা.) এর নামাযে জানাজা আদায় করেন। এই ঘটনার অনুসরণে মুজতাহেদগণ ফতোয়া দিয়েছিল যে, যদি কলেরা বা অন্য কোন মহামারীতে কোন লোক মারা যায় আর তার জানাজা পড়ার জন্য কোন লোক না পাওয়া যায় তবে বিনা জানাজায় লাশ কবরস্থ করে তিন দিনের মধ্যে কোন আলেমকে দিয়ে জানাজার নামায পড়া যাবে। রাসূল (সা.) এর সাহাবারা (আহলে বাইত নয়) যে রাসূল (সা.) গোসল বা জানাজায় শরিক ছিলেন না এ ব্যাপারে মওলানা রুমী স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন।

চুসাহাবা হুব্বে দুনিয়া দাস্তানদ, মোস্তফারা কে কফিনান দাখতানদ। আহলে দুনিয়া কাফেরানে মাতলাকান্, বাক বাকান, মাক মাকানদার বাক বাকান অর্থাৎ মোস্তফা (দঃ) কে বে কাফন রেখে সাহাবারা কোথায় ঘুরছে? দুনিয়াদার কাফের তারা দুনিয়ার শান শওকতকে সেরা জ্ঞান করে থাকে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে পবিত্র কুরআনের অপ/বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা

বিদায় হজ্ব সম্পন্ন করে এহরাম পরিহিত অবস্থায় ১৮ই জিলহজ্ব, ১০ই হিজরী, ২১শে মার্চ ৬৩২ খৃস্টাব্দে গাদীরে খুমে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁর উত্তরাধিকারী আলী (আ.) কে মনোনীত করে সোয়া লক্ষ সাহাবীকে তাঁর নিকট বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মানবজাতির দুর্ভাগ্য তাঁর দেহ ত্যাগের পর দুনিয়াদাররা খোদার নির্দেশ অমান্য করে মদিনা শহর হতে ৬ মাইল দূরে বনি সাকিফা নামক স্থানে তথাকথিত ইলেকশনের মাধ্যমে আবু বকর (রা.) কে তাদের নেতা বা খলিফা বানানো হলো। ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব যে একই ব্যক্তির উপর বর্তাবে এই মৌলিক ঐশীতন্ত্রের ধারণা (Theocratic Concept) চিরদিনের জন্য মুসলিম ধর্ম-রাজনীতি (Religo Politics) থেকে বিদায় নিল। এটাই ধর্মীয় নীতি হিসাবে চালু করা হলো। যা অদ্যাবধি চালু আছে।

এবং মানবীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্র প্রধান নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এটাই ধর্মীয় নীতি হিসেবে চালু করা হলো। যা অদ্যবধি চালু আছে।

এই রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল রাষ্ট্রীয় মিথ্যাচার। অর্থাৎ রাসূল (সা.) কোন উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন নাই এবং জনগণই রাষ্ট্র নায়ক নিয়োগের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এই কথা প্রচার করার জন্য প্রয়োজন ছিল এ সংক্রান্ত সমস্ত হাদিস গোপন করা। আর এই কাজের প্রথম প্রদক্ষেপ হলো বিদ্যমান হাদিস প্রচার ও প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা। এ কারণেই হাদিস সংকলন করতে এত দীর্ঘ সময় ক্ষেপন হওয়া এবং এই সব হাদিসের বিপরীতে পবিত্র কুরআনের নতুন ধরণের ব্যাখ্যাও মিথ্যা হাদিস প্রণয়ন।

যা হোক, নতুন সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো তাদের বিরুদ্ধবাদীদের নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রকরণ ও পররাজ্য লুণ্ঠন। রাসূল (সা.) এর রাজত্বে স্থানীয়ভাবে যে যাকাত (রাজস্ব) আদায় হতো তা স্থানীয়ভাবে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হতো তাই কেন্দ্রে খুব কম অর্থই পাঠানো হতো। নতুন খিলাফত যাকাতের নামে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করল। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বলিলেন, আমরা তো যাকাত সংগ্রহ করে তা জনগণের মধ্যে ব্যয় করেছি তাই আমাদের নিকট অতিরিক্ত টাকা নাই। তাছাড়া স্থানীয় নেতাদের অনেকেই গাদীরে খুমে হযরত আলী (আ.) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাদের ধারণা ছিল যে রাসূল (সা.) এর পর হযরত আলীই (আ.) খলিফা হবেন। কিন্তু যখন তারা জানতে পারলেন, আবু বকর (রা.) খলিফা হয়েছেন তখন তারা ধারণা করলেন খলিফা নির্বাচনে কোন ব্যাপক কারসাজি করা হয়েছে। তাই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যাকাত কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। কিন্তু সেনাবাহিনী জোর করে এই অর্থ আদায় করতে চাইলে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধকে এক শ্রেণীর দালাল ঐতিহাসিক রিদ্দার যুদ্ধ তথা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যাকাত যুদ্ধের পর এই দুর্ধর্ষ বাহিনী পাশ্ববর্তী দেশ রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা হলো। যুদ্ধে লব্ধ মালামালে ১/৫ রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা দিয়ে বাকী অর্থ সেনা সদস্যদের মধ্যে ভাগ করা হলো। একই সাথে বিশাল ভুখণ্ড ও দাসদাসী এদের নিয়ন্ত্রণে চলে এলো। ফলে ইসলামে পর্যায়ক্রমে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, পুঁজিবাদ, দাস ব্যবসা প্রভৃতি ইসলাম ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হলো এবং ইসলাম ধর্ম বিরোধী রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির রক্ষক হিসাবে এই নতুন ধরণের প্রশাসন দায়িত্বপ্রাপ্ত হলো। এরই ধারাবাহিকতায় ৬৪৪ খৃস্টাব্দে হযরত ওসমান খলিফা হিসাবে নিয়োজিত হলেন।

হযরত উসমান (রা.) এর নিম্ন লিখিত কাজগুলো নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের দাবি রাখে:

১. হযরত উমরকে হরমুজান নামক এক পারসিক হত্যা করে। তাকে বিচারের সম্মুখীন না করে উমরের পুত্র ওবাইদুল্লাহ্ বিন উমর আইন নিজের হাতে নিয়ে হরমুজানকে হত্যা করে এবং সেই সাথে আরো কয়েকজন নিরীহ ব্যক্তিকেও হত্যা করে। ফলে উবাইদুল্লাহ্ বিন উমর ইসলামের আইন অনুযায়ী হত্যার আসামী এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য অপরাধী। এই ব্যক্তিকে হযরত উসমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে তাকে ক্ষমা করে দেন। উবাইদুল্লাহ্ নিজেই জানত যে, তাকে অবৈধ সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাই ইসলামী রাষ্ট্রে থাকা তিনি নিরাপদ মনে করেন নাই, তাই তিনি মুয়াবিয়ার কাছে চলে যান।

২. হযরত উসমান (রা.) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসুদ (রা.) কে কোন অপরাধ ছাড়াই ব্যক্তিগতভাবে নির্যাতন করেন। (তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসুদ (রা.) কে লাথি মেরে তার অন্ডকোষ ফাটিয়ে দেন।

৩. হযরত আবুজর গিফারী (রা.) এই উঠতি ধনপতিদের অবৈধভাবে অর্থ জমা করে কুরআনের আইন ভঙ্গ করছেন এই বক্তব্য পেশ করায় তাকে মদীনা থেকে নির্বাসন দেন। ফলে তিনি রাবজার বিরান প্রান্তরে একাকী মৃত্যুবরণ করেন।

৪. পূর্ববর্তী খলিফাগণ কর্তৃক হাদিস প্রচারে নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখেন।

৫. তিনি কুরআনে বর্ণিত (সূরা আনফাল ৪২) এর মর্মানুযায়ী খুমস যা রাসূলের স্থলাভিষিক্ত ও আহলে বাইতদের প্রাপ্য তা তার নিজের আত্মীয়গণের মধ্যে বিতরণ করেন।

৬. হযরত উসমান (রা.) বিশিষ্ট সাহাবাদের পদচ্যুত করে আত্মীয় স্বজনদেরকে গভর্নর ও বিরাট বিরাট পদ দান করেন। উল্লেখ্য, তারা সবাই (তোলাকা তথা মক্কা বিজয়ের পর আত্মরক্ষা বা সুযোগ সন্ধানী নামমাত্র মুসলমান) ছিল। হযরত মুসা আল আসআরী বসরার গভর্নর পদ হতে সরিয়ে তাঁর (উসমানের (রা.) মামাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমেরকে, আমর ইবনুস আসকে মিশরের গভর্নর পদ হতে সরিয়ে উহায় তার দুধ ভাই আব্দুল্লাহ্ ইবনে সা'আদ ইবনে আবি সারাহকে নিয়োগ দেন (যার সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর নির্দেশ ছিল যে, সে যদি কাবার গিলাফের নীচেও আশ্রয় নেয় তবুও তাকে হত্যা করা বৈধ)। তিনি হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাসকে কুফার গভর্নর পদ হতে সরিয়ে পবিত্র কুরআনে মোনাফেক হিসেবে ঘোষিত অলিদ ইবনে উকবাহ্কে বায়তুল মাল রাষ্ট্রীয় কোষাগার) হতে এক লক্ষ দিরহাম প্রদান এবং তাকে কুফার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এই ওলীদই মদ পান করে নামায পড়ানোর সময় ফজরের চার রাকাত আদায় করে এবং বলে আরো নামায পড়াবো কি? এ কারণে তাকে অপসারণ করে আরেকজন মোনাফেক সাঈদ ইবনে সামকে কুফার গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

৭. উসমান (রা.) তাঁর কন্যা উম্মে সাবানকে মারওয়ান ইবনে হাকাম (যে রাসূল (সা.) কর্তৃক নির্বাসিত ছিল) ও আয়শাকে হারিছ ইবনে হাকামের সাথে বিয়ে দিয়ে প্রত্যেককে বায়তুল মাল থেকে এক লক্ষ দিরহাম করে প্রদান করেন।

৮. আফ্রিকা থেকে খুমস হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ থেকে পাঁচ লক্ষ দিরহাম মারওয়ানকে প্রদান করেন।

কেন্দ্রে মারওয়ান ইবনে হাকামের মত কুচক্রী প্রধানমন্ত্রী ও তার অপশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মিশর, বসরা, কুফা প্রভৃতি প্রদেশের জনগন উসমানী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং এই অপশাসনের অবসানের জন্য স্মারক পেশ করে। হযরত উসমান বিদ্রোহীদের দাবী অনুযায়ী মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে মিশর এ গভর্নর হিসাবে নিয়োগপত্র জারী করেন এবং দৃশ্যত গণবিদ্রোহের অবসান ঘটে। কিছুদিন পর মদীনার গলিতে গলিতে বিদ্রোহীদের স্লোগান শোনা যায় 'প্রতিশোধ' 'প্রতিশোধ' ঘটনার বিবরণে প্রকাশ পায় যে, খলিফা নিযুক্ত নতুন গভর্নর মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর কিছু দূর অগ্রসর হলে দেখা যায় যে, খেলাফতের একজন কর্মচারী দ্রুত গতিতে তাদের অতিক্রম করে যাচ্ছে। তার গতিবিধি নবনিযুক্ত গভর্নর ও তার সাথীদের কাছে সন্দেহজনক বিবেচিত হওয়ায় তারা তাকে খানা তাল্লাসী করে তার কাছ থেকে হযরত উসমান (রা.) এর সীল ও স্বাক্ষরিত একটি পত্র উদ্ধার করে। পত্রে উল্লেখ করা হয় মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে যেন তাৎক্ষনিকভাবে হত্যা করা হয় ও অন্যান্যদের বিভিন্ন ধরণের শাস্তি দেয়া হয়।

খলিফার বিরুদ্ধে এই ভয়াবহ অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয় যে, উসমান (রা.) প্রকৃত পক্ষে নির্দোষ। কিন্তু তার মন্ত্রী মারওয়ান তার নাম জাল করে এই চিঠি প্রেরণ করেছেন। বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে দাবী করা হয় যে, মারোয়ানকে শাস্তি দিতে হবে অথবা তাদের হাতে তুলে দিতে হবে যেন তার এই জঘন্য কাজের বিচার করা যায়। উসমান (রা.) তাদের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে বিদ্রোহীরা বুঝতে পারে যে, উসমানের (রা.) মাধ্যমে কোন ধরণের সুবিচার পাওয়ার কোন সুযোগ নাই। তাই তাদের মধ্যে একটি গ্রুপ উসমান (রা.) বাড়ির পিছনে দিক থেকে ঢুকে হযরত উমসানকে শহীদ করে। (ইন্না লিল্লাহে---রাজেউন)।

হযরত উসমান (রা.) এর শাহাদতের পর বিদ্রোহীগণসহ সবাই হযরত আলী (আ.) কে খলিফা হবার জন্য দাবি করলে হযরত আলী বলেন যে, মসজিদে নববীতে প্রকাশ্য স্থানে গণভোটের মাধ্যমে এই নির্বাচন হতে হবে। অতঃপর সবাই আলী (আ.) খলিফা হিসাবে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এ কারণে প্রচলিত খিলাফতে রাশেদার তিনিই একমাত্র খলিফা যিনি মসজিদে প্রকাশ্য গণভোটে ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। খলিফা হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে তিনি সর্ব প্রথম হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক নিয়োজিত প্রমাণিত দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্য গভর্নরদের বরখাস্ত করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া কেন্দ্রিয় খিলাফতের এই নির্দেশ অমান্য করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হযরত আলী (আ.) এর পক্ষ থেকে অনেক লেখালেখি, প্রতিনিধি প্রেরণসহ সকল প্রকার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে উভয় পক্ষ ৬৫৭ খৃস্টাব্দে সিফফিনের প্রান্তরে উপনীত হয়।

সিফফিনের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়। এই যুদ্ধ দেড় বৎসর স্থায়ী হয়। মুয়াবিয়া হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের জন্য হযরত আলীকে দায়ী করে ব্যাপক প্রচারণা চালান। যা ছিল একটি জঘন্য মিথ্যাচার। প্রকৃতপক্ষে বিগত ২৫

বৎসরে যেসব নব্য পুঁজিপতি অভিজাত শ্রেণী, সামরিক নেতৃবৃন্দের একাংশ সিরিয়ার সহযোগী হয়। যারা রাসূল (সা.) এর আনীত ইসলামের অনুশাসন সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। বরং তারা রোম ও পারস্যের মডেলে রাজতন্ত্রের মুসলিম নামধারী একটি শ্রেণী ভিত্তিক সমাজ তৈরী করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, হযরত আলী (আ.) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণকারী জুবাইর (রা.) ও তালহা (রা.) সর্বপ্রথম আলী (আ.) এর খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ঘটনাচক্রে উম্মুল মুমেনীন আয়শা (রা.) কে তারা তাদের সহযোগী হিসাবে পান। এতে করে বোঝা যায় যে, প্রথম তিন খলিফার শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। রাসূল (সা.) (Religo Politics) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ইসলামী সমাজ সেই আদর্শে আর বহাল নাই। এরই ধারাবাহিকতায় মুয়াবিয়ার এই বিদ্রোহে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপক অবনতি ঘটে। তাছাড়া মুয়াবিয়া তথা উমাইয়া শাসকগণ কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ও হাদিস প্রচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের বিধি নিষেধ ও সেন্সরশীপ আরোপ করেছিল। মুয়াবিয়া স্বয়ং হযরত আলী (আ.)কে ইমানহারা হিসেবে মসজিদে মসজিদে প্রচার করেছিল যা উমাইয়া শাসক উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (৭১৭-৭২০) এর আমলে বন্ধ ছিল এবং পুনরায় তা উমাইয়া শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত চালু ছিল। ফলে কুরআন ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা জনিত সমস্যার সৃষ্টি করেছে যা অদ্যাবধি বিরাজমান। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআনের তাফসির প্রণয়ন ও হাদিসের সংকলন সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত হতে এত দীর্ঘ সময় লেগেছে। এ বিষয়টি আমরা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করব।

নবম অধ্যায়

কুরআনের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে রাসূল (সা.) এর মর্যাদার অবমূল্যায়ন

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আল্লাহ্ স্বয়ং এর সংরক্ষক। তাই কুরআনের ব্যাখ্যাজনিত ভিন্নতা তথা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে রাসূল (সা.) এর সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা উমাইয়া শাসকদের রাজত্বকালের একটি স্থায়ী নীতি ছিল। রাসূল (সা.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে যেসব মন্তব্য/বক্তব্য ঘোষণা করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন। তিনি নূরের নবী। তিনি ও কুরআন অবিচ্ছিন্ন। তিনি "সবাক কুরআন" স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নবীদেরকে সাধারণ মানুষ মনে করা কুফরী। কোন ধর্মেই তাদের নবীকে সাধারণ মানুষ বা কোন স্কুল কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ছাত্র বা শিক্ষক মনে করা হয় না। বরং তাদেরকে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মহান ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাদের পদবী "নবী" শব্দের অর্থ ঐশী উৎস থেকে যিনি জনগণকে "নতুন বাণী" বা তথ্য শোনান তিনিই নবী। "রাসূল" শব্দের অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে যিনি আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অনুরূপভাবে ইংরেজীতে 'প্রফেট' শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐশী জ্ঞানের মাধ্যমে যিনি ভবিষ্যত বলতে সক্ষম ব্যক্তিত্ব। "অবতার" শব্দের অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যিনি পৃথিবী তথা ধরণীতে অবতরণ করে আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাই কেবল মাত্র কাফেরগণই নবী ও রাসূলকে তাদের মত সাধারণ মনে করে যা পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কথা জানা থাকা সত্ত্বে রাসূল (সা.) এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনের শানে নযুল নামে কথিত অনেক বর্ণনা ও কুরআনের কিছু আয়াতকে অপব্যাখ্যা করে রাসূল (সা.) এর মর্যাদাহানি করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পবিত্র কুরআনের ৮০ নম্বর সূরা "আবাসা" নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা হিসাবে বেশীর ভাগ তাফসিরকারগণ যা বলেন, রাসূল (সা.) তাঁর মক্কী জীবনে একদা কোরাইশ বংশের উচ্চ শ্রেণীর কিছু লোকের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক অন্ধ ও গরীব সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম এসে রাসূল (সা.) কে দ্বীন শিক্ষা দেবার জন্য অনুরোধ জানান। যেহেতু তিনি প্রভাবশালী লোকদের সাথে দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাই এই অন্ধ ও গরীব সাহাবীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অন্ধ সাহাবী বিষয়টি না দেখে বা না বুঝে রাসূল (সা.) এর নিকট পুনঃপুনঃ একই অনুরোধ করায় রাসূল (সা.) তার প্রতি বিরক্ত হন ও হযরত (সা.) আব্দুল্লাহ্র প্রতি ভ্রুকুটি করেন। তক্ষুনি মহান আল্লাহ্তালা তার রাসূল (সা.) কে উপদেশ/ভৎর্সনা হিসাবে এই সূরা নাজিল করেন। অতঃপর রাসূল (সা.) যখনই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মকতুমকে দেখতেন, তখনই বলতেন, স্বাগত জানাই তাকে। যার ব্যাপারে আমার প্রতিপালক আমাকে ভৎর্সনা করেছেন। এই শানে নজুল এত ব্যাপকভাবে গৃহীত যে, কুরআনের অধিকাংশ অনুবাদক এই সূরার প্রথম আয়াতকে এভাবে অনুবাদ করেছেন। সে রাসূল (সা.) ভ্রূকুটি করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল "বা রাসূল ভ্রূকুটি করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল" অন্ধ এতিম গরীব কাউকে উপেক্ষা কর বা ভ্রূকুটি করা সাধারণ মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও একটি অমানবিক আচরণ। এই ধরণের আচরণ কি "উসাওতুন হাসানা", "খুলুকুন আজীম" আল্লাহ্র বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের পক্ষে সম্ভব? পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে তুমি অবশ্যই মহান চরিত্র অধিষ্ঠিত (৬৮:৪)। এটাই কি মহান চরিত্রের নমুনা?

প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয় তা তাহলে: একদা রাসূল (সা.) একদল উমাইয়া নেতাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, এমন সময় অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্ম মাকতুম এসে তাকে কুরআনের শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তখন মহানবী (সা.) তখন ঐ উদ্ধত (Arrogant) উমাইয়া নেতাদেরকে দাওয়াত স্থগিত রেখে তার প্রিয় সাহাবীকে কুরআনের শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এতে উমাইয়া নেতাগণ বিরক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে কেউ ভ্রূকুটি করে রাসূল (সা.) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

যেহেতু এই আয়াতে কারো নাম উল্লেখ নাই তাই উমাইয়রা দরবারী আলেমেরা রাসূলকে আল্লাহ্ ভৎর্সনা করেছেন, উমাইয়া সর্দারকে ভর্ৎসনা করা হয় নাই এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এ ধরণের আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে।

অসত্য/জাল হাদিসের মাধ্যমে রাসূল (সা.) কে কুরআন অমান্যকারী হিসাবে উপস্থাপন ও আহলে বাইত এ রাসূলদের অবমূল্যায়ন

হাদিস শব্দের শাব্দিক অর্থ কথাবার্তা। নতুন কিছু যা পূর্বে ছিল না। পরিভাষায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর কথাবার্তা ক্রিয়াকলাপ এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মৌন সম্মতিকে হাদিস বলা হয় অনুরূপভাবে সাহাবা ও তাবেয়ীন এর কথা কাজ এবং মৌন সম্মতিকেও হাদিস বলা হয়। অথচ অনেক সাহাবীর জীবনীও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন তবে কুরআন ও সুন্নাহর সেই সব দলিলের যা পরকালের সাথে সম্পর্কিত যেমন রমযানের রোযা, কিবলার দিকে মুখ ফিরিযে নামায পড়া। ফরজ নামাযের সংখ্যা, দৈনিক নামাযের

রাকাত সংখ্যা, নামাযের পদ্ধতি কাবা ঘরের চারিদিকে সাতবার তাওয়াফ করা। এই ধরণের পরকালীন জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তারা কুরআনও সুন্নাহ্‌র অনুসারী হলেও ক্ষমতা, নেতৃত্ব, রাজনীতি ও শাসনকার্য সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, সামরিক ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে কাজ করতেন না ও তদনুযায়ী ফয়সালা দিতেন না। বরং এক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও নিজস্ব মতানুযায়ী কাজ করতেন। এমনকি তাঁদের ব্যক্তিগত মত ও ইজতিহাদ যদি কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিলের বিপরীতও হত কিন্তু নিজস্ব ক্ষমতা ও হুকুমতের জন্য কল্যাণকর মনে করতেন তাহলে তাই করতেন। সম্ভবত তারা দুনিয়াবী তথা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে রাসূলের জ্ঞান তাদের চেয়ে বেশী ছিল বলে আন্তরিকভাবে মনে করতেন না। অথবা ধর্ম বলতে তারা নামায-রোজাকেই বুঝাতেন, সামাজিক, রাজনেতিক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ঐশী নির্দেশনার ভূমিকা খুবই সীমিত বলে মনে করতেন।

উদাহরণ স্বরূপ হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূল (সা.) এর সাথে বাড়াবাড়ি, হুনায়ন যুদ্ধের গণীমত বিতরণে বিতর্ক, বদরের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ আদায়, তাবুকের যুদ্ধের সময় অনাহারের কারণে বেশ কিছু উট জবাইয়ের জন্য রাসূলের নির্দেশ অমান্য করা। উহুদের যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন, যে কেউ তাওহীদের ইমান নিয়ে আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হবে সে বেহেশ্‌তের সুসংবাদ পাবে আবু হুরাইরার এই ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ, মুনাফিকের উপর জানাজার নামায পড়ার ব্যাপারে তর্ক, সদকার বিষয়ে বিতর্ক ও রুক্ষতার সঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপন, যাকাত ও খুমসের আয়াতের অর্থের বিকৃতি, হজ্বে তামাত্তু ও মুতা বিয়ের বিধান পরিবর্তন, তালাকের আয়াতের বিধান পরিবর্তন, রমযান মাসের তারাবীহ সম্পর্কে সুন্নাহর পরিমাণ ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধন, আযানের বাণীতে পরিবর্তন, হাইয়াআলা খাইরিল আমালকে আযান হতে বাদ দেয়া, জানাজার নামাযের তাকবীরের সংখ্যা হ্রাস ইত্যাদি। এছাড়া ইবনে বালতাআর ঘটনায় বিরোধীতা, মাকামে ইবরাহীমের স্থান পরিবর্তন। বনি হাশীমের সম্পত্তি জোরপূর্বক মসজিদের আওতাভুক্ত করা। আবু খারাগ হাজলীর রক্তপণের ক্ষেত্রে ইয়ামানীদের প্রতি অবিচার, নাসর ইবনে হাজ্জাজি সালমীর নির্বাচন, জোদা ইবনে সালিমের উপর হদজারী, ইরাক ভূখণ্ডে খারাজ প্রবর্তন, জিজিয়া আদায়ের পদ্ধতিতে পরিবর্তন, শুরা গঠনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব, রাত্রিতে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে শরীয়তের সীমা লংঘন। দিনে অনুসন্ধান ও গুপ্তচর বৃত্তি, উত্তরাধিকার আইনে নিজ মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান। এ বিষয়গুলোতে তারা কুরআন ও সুন্নাহর বিধান হতে নিজ মত জনসাধারণের জন্য অধিকতর কল্যাণময় মনে করে তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এই ধারাবাহিকতায় ইসলাম ধর্মে একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, দাস-দাসী প্রথা, রাজ প্রাসাদ নির্মাণ ও হেরেম সৃষ্টি ইত্যাদি ইসলামী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনুসঙ্গ হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা সত্ত্বেও সাহাবীদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবার্জিত পদ্ধতিতে। ইমাম বোখারী সাহাবাকে (এক বচনে সাহাবী) সংজ্ঞায়িত করেছেন এই বলে যে, যেসব ব্যক্তি প্রফেটের সদা সঙ্গী ছিলেন, অথবা শুধুমাত্র তাঁকে দেখেছেন। ইবনে হাম্বল, যিনি তাঁর কেতাবে বোখারীর চেয়ে বেশী হাদিস সংকলন করেছেন। বোখারীকৃত এই সংজ্ঞাকে অনুমোদন করেছেন এবং ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি সাহাবী যিনি প্রফেটের সঙ্গে এক বছর, এক মাস, এক দিন বা এমন কি এক ঘণ্টা কিংবা ক্ষণিকের জন্য দেখেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবন ওমরের মতে: বালেগ হয়ে যে কেউ ধর্ম বুঝে মুসলমান হয়ে প্রফেটকে (এমনকি) এক ঘণ্টার জন্য দেখলেও সাহাবী বলে গণ্য হয়। এই সংজ্ঞায় যারা প্রফেটকে দেখেছে কিন্তু বালেগ হয়নি তারা সাহাবী নয়।

আল তাবেঈ সাঈদ ইবনে আল মুসীর এর সংজ্ঞা মতে কেবলমাত্র ঐসব ব্যক্তি যারা প্রফেটের সঙ্গী ছিলেন এক অথবা দুই বছর এবং তাঁর সঙ্গে একটা বা দুটো যুদ্ধ করেছেন তাদেরই সাহাবী বলা যেতে পারে। সাহাবীদের শুধুমাত্র বিষয়টি এই সংজ্ঞার উপর নির্ভরশীল নয় বরং হাদিস সংকলকগণের সমস্ত যুক্তির মূলধারা বা Principle গ্রহণ করেছেন তা হলো:

ক. এই সব সাহাবাগণের পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব এবং তাদের প্রত্যেকেই 'আদল' বা ন্যায় বিচারের মডেল।

খ. কতগুলো কথা বা সংবাদ এমন আছে যা অবগত হতে হলে, হয় তা হযরতের মুখে শুনতে হবে, অথবা ইহুদী বা খৃস্টানদের মুখে শুনতে হবে, অথবা ইহুদী বা খৃস্টানদের পুস্তকাদি পাঠে যা তাদের প্রমুখাত অবগত হতে হবে।

গ. কোন সাহাবী যখন এরূপ কোন কথা বলবেন বা, কোন অতীত বা ভবিষ্যত সংবাদ প্রদান করবেন, তখন নিশ্চিতরূপে মনে করতে হবে যে, হয় তিনি প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্রাদি পাঠ করে কিংবা ইহুদী বা খৃস্টানদের মুখে শুনে তা অবগত হয়েছেন অথবা হযরতের মুখ থেকে ঐ সংবাদ শ্রবণ করে জ্ঞাত হয়েছেন। সাহাবীদের ভক্তি করার অর্থ অন্ধভক্তি বোঝায় না, অনুসরণের অর্থ ধর্মশাস্ত্র এবং জ্ঞান ও বিবেকের মুণ্ডুপাত নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই শ্রেণীর অন্ধ ভক্তি থেকেই মানব পূজা তথা ব্যক্তি পূজা তথা এ ধরণের

শিরকের সৃষ্টি হয়। 'গায়রে মাসুমকে মাসুম' বলে বিশ্বাস করা তা যেন ভ্রমের অতীত এরূপ বিশ্বাস এক ধরণের শির্ক।

স্মরণ রাখা দরকার যে, সাহাবীগণ সবাই মানুষ। কেউ অভ্রান্ত নন। নিষ্পাপ বা নবী-রাসূলও নন। বোখারীর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) তিনবার মিথ্যা কথা বলেছেন। ইমাম বোখারী আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী হযরত ইব্রাহীমকে (আ.) মিথ্যাবাদী লিখতে দ্বিধা করেন নি। অথচ তাঁর আরোপিত সাহাবীর সংজ্ঞায় একজন সাধারণ মাপের সাহাবীকেও মিথ্যাবাদী হওয়ার কোন সুযোগ নাই। অর্থাৎ এই ধারাবাহিকতায় ১ লাখ দশ হাজার সাহাবীকে "গায়রে মাসুম" ব্যক্তিকে কার্যত মাসুম-নিষ্পাপ অনুসরণীয় এবং তাঁদের সবাইকে রাসূলের সমকক্ষ হিসাবে বর্ণনা তাদের শতাব্দীব্যাপী কৃতকর্মের গুরুভার ইসলামের উপর চাপিয়ে দেওয়া বা মডেল হিসাবে বিবেচনা করতে বাধ্য করার কোন হেতুবাদ বা কোন যুক্তি প্রমাণ নেই।

ইমাম বোখারীর সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রফেটকে দেখলেই যে সাহাবী হওয়া যায় এ কথার সাপোর্ট কুরআনে এমনকি প্রাথমিক ইসলামের কোন পণ্ডিত ব্যক্তি সে কথার উল্লেখ করেন নি। বিশেষ করে যেখানে পবিত্র কুরআনে অনেক সাহাবীকে মুনাফিক হিসাবে গণ্য করে তাদের উদ্দেশ্যে সূরা মুনাফিকুন নাযিল করেছেন। এছাড়া সূরা আহযাব এর ৬০ নম্বর আয়াতে আছে- মোনাফেকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহারা মদিনায় মিথ্যা গুজব ছড়াইয়া বেড়ায়, তাহারা যদি বিরত না হয়, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তোমাকে তাহাদের পিছনে লাগাইয়া দিব। উহার পর তাহারা এই শহরে তোমার প্রতিবেশী হিসাবে অতি অল্পকালই থাকবে।" এই সব মোনাফেক এবং দুষ্ট প্রকৃতির লোক যারা প্রফেটকে দেখেছিল এবং তার কথা শুনেছিল। ইমাম বোখারী ও তার অনুসারীদের সংজ্ঞা মতে, বহু মোনাফেকই দুষ্ট প্রকৃতির লোক যারা প্রফেটকে দেখেছে ও তার কথা শুনেছে তাহলে এসব লোক সাহাবার পর্যায়ভুক্ত। আর বোখারীর দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী এ ধরণের লোকেরা 'হাদিস' সংগ্রহের কাজে ভূমিকা পালন করেছে।

বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ-ইব্রাহীম মোস্তাফা বলেছেন এর কারণ হল বোখারী আব্বাসীয়দের সাথে নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং রাজনৈতিকভাবে তিনি ছিলেন 'তালিবীনদের' অর্থাৎ আলী ইবনে আবি তালেব ঘরানার বিরুদ্ধে। এ কারণেই বোখারী আলী (আ.) বিরোধী সাহাবীদের বর্ণিত হাদিসসমূহ তাঁর গ্রন্থে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। "সিহাহ সিত্তা" বলতে হাদিসের ছয়খানা বিশুদ্ধ সংকলিত গ্রন্থকে বোঝায়। এই গ্রন্থগুলি দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দীর হিজরী সংকলিত হয়েছিল। এইসব হাদিস-সংকলিত গ্রন্থগুলো হলে (১) সহীহ বোখারী ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী (হি ১৯৪-২৫৬) (২) সহীহ মুসলিম রচনা করেছেন আবুল হোসাইন ইবনে হাজ্জাজ আল কুশাইরী (হিঃ ২০৪-১৬১)। (৩) সহীহ নাসায়ী রচনা করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে শোয়েব আনসারী (হি: ২১৫-৩০৩)। ৩. সহীহ তিরমিজী রচনা করেছেন আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিজী (হি: ২০২-২০১৭)। ৪. সহীহ আবু দাউদ, রচনা করেছেন আবু দাউদ সোলায়মান ইবনে আস-আম সিজেসতানী (হি: ২০৪-২০৫) এবং সহীহ ইবনে মাজা, রচনা করেছেন আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজা কায়বেনী (হি: ২০৩-২৭১), উপরোক্ত হাদিসগুলো বিভিন্ন পর্ব ও অধ্যায় আকাবে লেখা হয়েছে। এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে সহীহ বোখারী সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বলে গণ্য। তাই বোখারীর অনুসারীদের কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব (ফরমান) এর পরেই সহীহ বোখারী বিশুদ্ধতম কেতাব। বোখারীর দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী "সাহাবী" বর্ণিত হাদিস সমূহের অন্তর্ভুক্তির ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে প্রখ্যাত মুসলিম বুদ্ধিজীবী ইব্রাহীম মোস্তফা বলেছেন- "From the above three definitions, any Sincere and guided Muslim can sense the corruption and confusion of Bukhary, a reason for him, to get all these corrupted hadiths included in his book: With corrupted hadiths. the Muslims after Bukhary changed their religion from the religion of the Prophet Muhammad (The Quran), to the religion of Bukhary and his likes (the fabricated hadiths and Sunna)." (সূত্রঃ হাদিস সাহিত্যের ইতিহাস লেখক সা'দ উল্লাহ্, সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৪, পৃ-৪২)।

"সাহাবীদের পূর্বোক্ত তিনটি সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে একজন প্রকৃত ইমানদার মুসলিম অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, বুখারীর তার পুস্তকে যেসব জাল ও সংশয়পূর্ণ হাদিস বর্ণিত হয়েছে তার মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্মের পরিবর্তে এই ধর্ম বোখারীর ধর্মে পরিণত হয়েছে।" এই সিহাসিত্তাহ হাদিস সংকলনের ব্যাপারে নাজীর আহমদ তাঁর পুস্তক Quranic and Quanic Islam এ উল্লেখ করেছেন উমাইয়া (৬৬১-৭৫০) এবং আব্বাসীয়া (৭৫০-১২৫৮) রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উভয় বংশীয় শাসকবর্গ আহলে বাইতের কোন সদস্যকে বা আলীর কোন বংশধরকে ক্ষমতায় আসতে দেয় নি বা আসার ধর্মীয় রাজনৈতিক সকল পথ বন্ধ করেছিল। শুধু তাই নয়, কুরআনের বাণী-আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে মান্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ

থেকে অনুরূপ (ইমামত/ বেলায়েত সুফিদের ভাষায় গাউসুল আযম বা অনুরূপ ঐশ্বরিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত) তাদেরকে মান্য করা। (৪:৫৯)

এখানে উভয় বংশের শাসকদের চামচা আলেম তথা বুদ্ধিজীবীরা এর অর্থ করলেন বৈধ-অবৈধ যে কোন পদ্ধতিতে বল প্রয়োগের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতায় যিনি অধিষ্ঠিত হন তাকেই এই ধরণের ঐশী ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ফলে শাসন ক্ষমতায় যে কোন ব্যক্তি এই ঐশী ক্ষমতার অধিকারী বলে নিজেদেরকে দাবি করতে থাকেন। কুরআনের এই বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলিম শাসকরা জালেমশাহীকে Corrupted Theocracy এবং Divine Rights of King এই কুনীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে বল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কুরআন ও হাদিস অপব্যাখ্যার মাধ্যমে এই নতুন ধর্ম মত তাত্ত্বিকভাবে প্রচার করে জনপ্রিয় করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তাই এই বংশের খলিফাদের রাজত্বের সময় যত হাদিস তৈরী হয়েছে সবই রাজকীয় ক্ষমতার ইঙ্গিতে এমনকি- Another Important Publication, which belong to this Period is the first ever biography of the Holy Prophet (SAW) written around a century and a quarter after his death...has suffered severe disfigurement. এই সিরাতটির প্রণেতা ইবনে ইসহাক।

সিহাহ্-সিত্তাহ্কে রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, It was under this dispensation that during the last fifty years of this phase (4th phase covering 250 year), the 'correct six' (সিহাহ্ সিত্তাহ্) were compiled and enfored on the tip of the imperial sword as yet another primal source of Islam. (সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃ-৪০)

আব্বাসীয় খলিফা আল মুতাযাকিকল (৮৪৭-৮৬১) যুক্তিবাদী মুতাজিলা ও আহলে বাইতদের ঠেকাবার জন্য হাদিস রচনার মাধ্যমে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে বিকল্প আহলে বাইতদের পরিবর্তে সাহাবাও শাসকদের তুষ্ট করার ধর্ম বিকল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে উৎসাহ যোগান দেন, যাতে তারা খেলাফত ও স্বৈরাচারিতা চালিয়ে যেতে পারেন। এই খলিফার হেরেমে ৪ হাজার উপপত্নী ছিল এবং বলা হয় যে, তিনি প্রত্যেকের সাথে বিছানার ভাগীদার ছিলেন (সূত্রঃ মাসুদী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৬)। মুতাওয়াক্কিল ২৩৬ হিজরীতে শহীদের নেতা ইমাম হোসাইন (আ.) এর রওজা মোবারক এবং পাশ্ববর্তী ভবনসমূহ ধ্বংস করার নির্দেশ দেয় এবং ঐস্থানে চাষাবাদ করার আদেশ দেন এমনকি জনগণকে ঐ পবিত্র স্থান যিয়ারত করতে কঠোরভাবে বাধা প্রদান করে। এমনকি বর্ণিত আছে যে, মুতাওয়াক্কিল ১৭ বার ইমাম হোসাইন (আ.) এর রওজা মোবারক ধ্বংস করে এবং যিযারতকারীকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখান। রওজার পাশে দুটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। বাগে ফেদাক [যা ফাতিমা (আ.)] এর নামে রাসূল (সা.) কর্তৃক জমি পুনরায় রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়। মুতাওয়াক্কিল কি ধরনের আহলে বাইত বিরোধী ব্যক্তি ছিল তা তাঁর পুত্রদ্বয়ের গৃহ শিক্ষকের সাথে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি ইবনে সিক্কিত যাকে আরবী ব্যকরণের ইমাম বলা হত। তিনি মুতাওয়িকেকলের সন্তানদের গৃহ শিক্ষক ছিলেন। একদা মুতাওয়াকিকল তার দুই সন্তান মৌতায় এবং মুতায়নের দিকে ইশারা করে ইবনে সিক্কিকের কাছে প্রশ্ন করল এ্ দুজন তোমার অধিক প্রিয় না ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হোসাইন (আ.) ইবনে সিকিকতির তৎক্ষনাত জবাব ছিল: কাম্বার [হযরত আলীর (আ.)] এর গোলাম, তুমি ও তোমার দুই সন্তানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মুতাওয়াকিকল ইবনে সিককতের জিহ্বা তার পিছনে দিয়ে বের করে কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়। এভাবে ইবনে সিক্কিত শাহাদাত বরণ করেন। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই সিহাহ সিত্তাহ্র হাদিস বিশারদ কোন ইমাম আহলে বাইতদের কোন ইমাম যারা আল্লাহ্র নির্দেশে ও রাসূলের ঘোষণার মাধ্যমে ইমাম হিসাবে নিয়োজিত এবং তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কুরআন ও হাদিস বিশেষজ্ঞ ছিলেন তাদের কাছে কখনও কোন হাদিসের সত্যতা যাচাই বা তাদের কাছে কোন বিতর্কিত বিষয় জানার জন্য গিয়েছেন বলে কোন ঐতিহাসিক তথ্য নাই।

মুতাওয়াকিকল এই সিহাহসিত্তাহকে কুরআনের বিকল্পরূপে (Substitute) রাজকার্যে সিদ্ধান্ত নেয়ার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য মতলব করেন। বিগ্রেডিয়ার (অবঃ) নাজির আহমদ বলেন- "It (Correct six) consisted in providing a set of scriptures as a substitute for the Quran, there by freeing it of its role as a complete guide and a book of criteria and judgement. The strategy included use of the idiom of the Quran and attributing oral authorship of the six new scriptures to none else than the Holy Prophet (SAW) himself. (Quranic and non-Quranic Islam, Page-48)

সিহাহ সিত্তাহ সংকলণের পর সরকারী ডিক্রি জারি হল এবং কড়াকড়িভাবে তা প্রয়োগ ও প্রচলিত হল। সরকারী নির্দেশে বলা হলো এই ছয়টি কিতাব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করলে বা এর সত্যতাকে অস্বীকার করলে তাকে ধর্ম ও আল্লাহ্র রাসূলের বিরুদ্ধে কটুক্তি করার অপরাধে অপরাধী গণ্য করে কঠোর শাস্তির (Condign Punishment) সম্মুখীন হতে হবে।

ডিক্রি জারীর সাথে সাথে এও জারি করা হলো যে, এই সংকলন ব্যতীত ইসলামে বাণী অসম্পূর্ণ ছিল অর্থাৎ প্রফেটের ওফাতের তিনশ বছর পরে ইসলামিক মেসেজ সম্পূর্ণ

হল, যদিও কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছিল-আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করিলাম। (সূরা মায়েদা: ৩)।

আমরা আত্ম সমর্পণকারীদের জন্য এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি-সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং হেদায়েত ও রহমত এবং সুসংবাদ স্বরূপ (১৬:৮৯) প্রশ্ন উঠতে পারে এর পরেও কি এই ছয়টি "সহিহ কেতাব" এর প্রয়োজন ছিল? কারণ আল্লাহ্‌র কিতাব বলছে যে, যারা আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুযায়ী ফায়সালা না করে তারা অবিশ্বাসী (মায়েদা : ৪৪) তবে ইমাম সাহেবদের এই ছয়টি সহিহ কিতাব সংকলন না করে উপায় ছিল না, কারণ রাজনৈতিক এমন চাপ ছিল যাকে এড়ানো সম্ভব ছিল না। সরকারি নির্দেশ অমান্য করে বিপদ ডেকে আনার মত সাহস কারও ছিল না। এ কারণে রাজতন্ত্রের স্বার্থ, সংস্কৃতির, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় ফলে কুরআন নাযিলের সময় রাসূল (সা.) এর আমলে যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ছিল তা চাপা পড়ে যায়। এই যাঁতাকলের থেকে মুসলিম সমাজ আজ পর্যন্ত পরিত্রাণ পায়নি।

বিগ্রেডিয়ার (অবঃ) নাজির আহমদ বলেছেন- The best that may possibly be said about 'the correct six' is that they faithfully represent what the muslims of the third century after the death of the Holy Prophet (SAW) wrongfully attributed to him, they offer a treasure for research to determine how the Quranic culture was debased, perverted or marginalised by the monarchical culture.

আল হাদিসের ব্যাপারে বলা যায় যে, সিহাহ সিত্তাহর ৬জন ইমাম ২৩ লাখ হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু ইমাম বোখারীর পুনরাবৃত্তির অংশ ইত্যাদি বাদ দিলে এই ৬টি পুস্তকে মোট পাওয়া যাবে ২৩,৩৪৬ টি হাদিস অর্থাৎ ১% এর কিছু বেশী। তাহলে ধারনা করা যায় যে, কি পরিমাণ জাল/মিথ্যা হাদিসের সংখ্যা রাবীরা ব্যক্ত করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি তিনটি কারণে হাদিস জালকরণের ফিতনার উদ্ভব হয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১। রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য স্থাপন। নিজেদের আচরণ রাজনৈতিক মতাদর্শকে সপ্রমাণিতকরণ ও জনগণের কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্য হাদিস জালকরণ।

২। জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচার, ওয়াজ নসিহত দ্বারা জনগণকে উৎসাহী করে তোলা ও পরকালের ভয়ে অধিক ভীত করে তোলার উদ্দেশ্যে হাদিস জাল করা।

৩। ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভকে সহজসাধ্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে মনগড়া কথাকে হাদিস নামে চালিয়ে দেওয়া।

হাদিস প্রসঙ্গে যে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, রাসূল (সা.) এর ঘোষণা অনুযায়ী রাসূলের পর হযরত আলী ইসলাম ধর্মীয় জ্ঞান সবচেয়ে পারদর্শী ব্যক্তিত্ব। সকল ত্বরীকাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এলমে শরিয়ত, হাকিকত, ত্বরিকত ও মারিফতের জ্ঞান হযরত আলী (আ.) থেকে বিচ্ছুরিত। এ কারণেই হযরত আলী ও তাঁর বংশীয় এগারজন ইমামের কাছ থেকে প্রাপ্ত হাদিস যা প্রধান গ্রন্থ হিসাবে আলকাফী, মানলাযাসতাহদি, রুহুল ফকীহ তাহাযীবুল আহকাম ও নাহযুল বালাগা অন্যতম (সূত্র: ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রকাশিত) এই মহামূল্যবান হাদিসসমূহ আব্বাসীয় খলিফা ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের ধর্মীয়, সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চাপে আজ পর্যন্ত সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা বা প্রাপ্যতা নাই।

কুরআনের বক্তব্য/নির্দেশ বিরোধী হাদিস

হাদিস সম্পর্কিত এই প্রেক্ষাপটও ধারাবাহিকতায় আমরা কুরআন বিরোধী কয়েকটি হাদিসের উদাহরণ পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি। কুরআন বলছে: ১. তোমরা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদেরকে ভুলে থাক? তোমরা কুরআন পড় অথচ তোমরা বোঝ না। (২:৪৪) ২. তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সহজ-সরলভাবে ব্যক্ত করেছেন। যাতে তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পার (২:২২১) ৩. এভাবেই আল্লাহ্‌ তার বিধান পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার (২:২৩২)। ৪. যারা বুঝতে চেষ্টা করেনা, তাদের উপর আল্লাহ্‌ তার কোপ বর্ষণ করেন (১০:১০০)। ৫. তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে গবেষণা করে না? না উহাদের অন্তর তালাবদ্ধ (৪৭:২৪)। আল্লাহ্‌তালা এই সব নির্দেশের মাধ্যমে কুরআন পঠন, পাঠন, অনুধাবন, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও গবেষণা করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ এবার এই বিধানের বিপরীতে হাদিস ১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি হরফ (অক্ষর) পাঠ করে সে তার বদলায় এক নেকি পাবে। আর একটি নেকি হবে দশ নেকির সমান।

আমি আলিফ, লাম, মিমকে একটি হরফ বলছি না, বরং আলিফ একটি, লাম একটি ও মিম একটি হরফ। (তিরমিজি)। অর্থাৎ কুরআন বুঝার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই শুধু পাঠ করলেই নেকি। এই হাদিসের মাধ্যমে কার্যত কুরআন বুঝা, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা

ও গবেষণার পথ রুদ্ধ করে মুসলিম জাতিকে একটি ধর্মীয় জ্ঞানে "মুর্খ" জাতিতে পরিণত করা হয়েছে তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। এ কারণেই আজ পর্যন্ত কুরআনে হাফেজ অথচ কুরানিক জ্ঞান নাই এমন হাফেজ অসংখ্য।

কুরআন বলছে, লোকে আপনাকে হায়েজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। হে রাসূল (সা.)! আপনি বলুন; উহা অশুচি। সুতরাং তোমরা হায়েজকালে স্ত্রী-সঙ্গ বর্জন করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম করবে না?। অতএব তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়, তখন তাদের নিকট গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন, আল্লাহ্ তওবাকারীকে ভালবাসেন। যারা পবিত্র থাকে তাদের ভালবাসেন (২:২২২)।

এই আদেশের বিরুদ্ধে হাদিস: ক. বিবি আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী (সা.) অপবিত্র অবস্থায় একই পাত্র হতে পানি নিয়ে একই সঙ্গে গোসলখানায় গোসল করতাম, অতঃপর তিনি আমার সঙ্গে মিশামিশি করতেন। (বোখারী, ১ম খণ্ড সাইয়েদ মোঃ আলীসহ ৫জন অধ্যাপক, পৃ. ১৫৯)। খ. বিবি আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কেউ ঋতুবতী হলে এবং সে অবশ্যই রাসূলাল্লাহ্ (সা.) তাঁর সঙ্গে মিশামিশি করতে চাইলে তাকে ঋতুর প্রাবল্যের সময় ঋতুর কটিবেশ পরার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গে মিশামিশি করতেন। গ. মায়মুনা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ্ (সা.) তাঁর কোন স্ত্রীর সঙ্গে ঋতু অবস্থায় মিশামিশি করতে চাইলে তাঁকে ঋতুর কটিবেশ পরার নির্দেশ দিতেন। এ ব্যাপারে একজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী তাঁর মন্তব্যে বলেছেন: কুরআনের আয়াতের প্রধান দুটি নির্দেশ। ১. স্ত্রীসঙ্গ বর্জন এবং ২. সঙ্গম বর্জন। বিশ্বে কোন অনুবাদেই এর মতান্তর বা মতবিরোধ নাই। মাসের মাত্র ৩/৪ দিন ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা কোন মোমেন এমনকি সাধারণ লোকের পক্ষেও অসম্ভব কিছু নয়। যাদের একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকে তাদের পক্ষে বিষয়টি কোন বড় ব্যাপার নয়। পক্ষান্তরে রাসূল (সা.) এর মত সর্বশ্রেষ্ঠ সংযমকারী ব্যক্তি যে নবী আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে সবচেয়ে তৎপর তদুপরি তার একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকতে ঋতুবর্তী স্ত্রীদের সাথে মিশামিশি করতেন বলে হাদিস রচিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে হযরত আয়েশা (রা.) হযরত মায়মুনা (রা.) এর মত উম্মুল মুমেনিন গায়রে মাহরম ব্যক্তির নিকট এই ধরণের একান্ত ব্যক্তিগত কথা অকপটে বর্ণনা করছেন যা সাধারণ অভিজাত ভদ্র মহিলার জন্য অসংগত ও উম্মুল মুমেনিনদের জন্য তা অন্য হাদিস অনুযায়ী নিষিদ্ধ। হাদিস বর্ণনাকারী নির্বিকারভাবেই এই ধরণের আরো বহু হাদিস বর্ণণা করেছেন যা অবান্তর, অযৌক্তিক বা অসত্য বলে মনে করাই যুক্তি সঙ্গত।

আহলে বাইতের মর্যাদাহানিকর হাদিস

একদা রাসূল (সা.) হযরত আলী (আ.) ও ফাতেমা (রা.) এর বাসায় যেয়ে তারা নামায (সম্ভবত তাহাজ্জুদ) আদায় করছে না কেন জিজ্ঞাসা করলে, আলী (আ.) জবাব দেন। তিনি (আল্লাহ্) আমাদের জাগানোর ইচ্ছা করলেই তো আমরা জাগতে পারি। একথা শুনে তিনি ফিরে গেলেন ও বলতে লাগলেন যে মানুষ খুব ঝগড়াটে স্বভাবের।" যিনি মহান পাক পাঞ্জাতনের নেতা। রাসূলের জ্ঞানের ও বেলায়তের ওয়াসী, উত্তরাধীকারী। যার সাথে রাসূলের সম্পর্ক হারুনের (আ.) সাথে মুসা (আ.) এর অনুরূপ। পবিত্র কুরআনে যাকে নফসে পয়গম্বর হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। যিনি রাসূলের (সা.) এর জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন মর্মে সর্বজনবিদিত। রাসূল (সা.) যাকে বাল্যকাল থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন যিনি জ্ঞান নগরীর দরজা। তিনি রাসূল (সা.) কে রাগান্বিত করবেন বা এরূপ কথা বলতে পারেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া রাসূল (সা.) এর সাধারণ কথোপকথনের প্যাটার্নের সাথে এই বক্তব্যের কোন সামঞ্জস্য নাই। কারণ কেহ কোন উত্তর দিলেই রাসূল (সা.) তার উপর রাগান্বিত হতেন না। তাই হযরত আলী (আ.) কর্তৃক উক্ত কথা বলা হয়ে থাকলেও সাধারণভাবে রাসূল (সা.) এভাবে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তেজিত হয়ে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির সম্পর্কে এ ধরণের কটুক্তি করবেন যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে হযরত আলীর (আ.) দুশমনরা রাসূল (সা.) এর সাথে হযরত আলীর সম্পর্কের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যই এ ধরণের হাদিস জাল করা হয়েছে মর্মে ধারণা করা যায়। (বুখারী ১ম খণ্ড ১০৫৬ নম্বর হাদিস আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ খণ্ড ৪৩৬৩, ষষ্ঠ খণ্ড ৬৮৩৪, ৬৯৪৭)

একদা রাসূল (সা.) হযরত ফাতেমা (আ.) এর বাড়িতে গিয়ে দরজায় ছবিযুক্ত পর্দা লাগানো দেখে ভিতরে প্রবেশ না করে ফিরে যান। (বোখারী ২য় খণ্ড, ২৪২৪ নম্বর হাদিস)। যিনি বেহেশতের সম্রাজ্ঞী, পাক পাঞ্জাতনের সম্মানিত সদস্য যারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (৬৩:৩৩) নিষ্পাপ ও চিরপবিত্র হিসাবে সনদপ্রাপ্ত তারা ইসলাম বিরোধী অর্থাৎ আল্লাহ্র ও রাসূল (সা.) এর অসন্তুষ্টিমূলক কোন কাজ করতে পারেন তার কোন বিশ্বাসযোগ্যতা থাকার সম্ভাবনা নিয়ে অবশ্যই সন্দেহ থেকে যায়। কেহ যদি বোখারী হাদিস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে তাহলে তার ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে বিভিন্ন ধরণের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। এই বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য আমরা পাঠকদের অনুগ্রহপূর্বক "জনাব এম এ রহমান লিখিত" আমরা কি প্রকৃত সুন্নাহ্ অনুসরণ করছি পুস্তকটি" পুস্তকটি অধ্যয়ন করার জন্য অনুরোধ জানাই।

সুফিবাদ-তাসাওউফ

১। অবশ্যই আল্লাহ্ ইমানদারদের অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের জন্য তাদের (জাতির/ গোত্রের) থেকেই এক রাসূল প্রেরণ করেছেন যে তাদের নিকট আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তেলওয়াত করে শুনিয়ে থাকে। তাদের (নফস/আত্মা) পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে গ্রন্থ (গভীর তত্ত্ব জ্ঞান) ও প্রজ্ঞা ইলমে লাদুনী কাশফ, ইলহাম তথা আল্লাহ্র সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জ্ঞান/শিক্ষা দেয় নিশ্চয় তারা এর পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল (সূরা আল ইমরান-১৬৪)।

আলোচ্য আয়াতে রাসূল (সা.) তাঁর উম্মত বা অনুসারীদেরকে কুরআনের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক জ্ঞান দান করবেন। কিতাব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। অনেক বিজ্ঞজন কিতাব হিসাবে মানব দেহতত্ত্ব অর্থাৎ মানবদেহ রহস্য তথা মানবদেহের অভ্যন্তরে আল্লাহ্র অবস্থান বা কার্যক্রম রহস্য। মানবের আত্মা বা নফসের পবিত্রকরণ বিষয়ক বিদ্যা ও হুকুমতের জ্ঞান অর্থাৎ আল্লাহ্র বিশ্ব পরিচালনা বিষয়ক প্রশাসনিক জ্ঞান। উল্লেখ্য নবী-রাসূলগণ হলেন আল্লাহ্র প্রতিনিধি তাই তারা আল্লাহ্র বিশ্ব পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। নবী-রাসূলের অনুপস্থিতিতে তাদের বৈধ ও উপযুক্ত প্রতিনিধিদের অনুরূপ ক্ষমতা প্রদানের পূর্বে এ ব্যাপারে যথাযথ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমই প্রকৃতপক্ষে সুফিবাদ। এভাবে আমি (আল্লাহ্) তোমাদের মধ্যপন্থী জাতি (সম্প্রদায়) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানজাতির জন্য সাক্ষী হতে পার, আর রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবে (সূরা বাকারা: ১৪৩)।

তখন তাদের কি অবস্থা হবে যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব, আর তোমাকেও (রাসূলকে) তাদের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করব (সূরা নিসা: ৪:৪১)।

বল, আল্লাহ্ ও যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট (সূরা রাদ: ৪৩)।

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ রাসূল (সা.)কে মানবজাতির জন্য সাক্ষী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক ধরণের বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হলেই সেই ব্যক্তি জনগণের সাক্ষী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যিনি সাধারণ লোকের সার্বিক কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন এবং এর বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। কোন মানুষের ন্যায় ও অন্যায় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিই কেবল মানুষের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য কর্মকাণ্ড ও চিন্তা/চেতনা ও ধারণা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ্ নিয়োজিত সাক্ষী হয়ে থাকেন। মানবজাতি তথা সৃষ্টি সম্পর্কে এই ধরণের পূর্নাঙ্গ জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত সাক্ষী তিনিই প্রকৃত সুফি। আর এতদ বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ বিদ্যা বা জ্ঞানকে সুফিতত্ত্ব বা সুফিবাদ হিসাবে অভিহিত।

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে আরবী ভাষায় যিনি বিশুদ্ধভাবে কুরআন ও হাদিস বুঝতে পারেন। এই ধারণা যে একটি বিভ্রান্তিকর ধারণা তা যে কোন সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন লোকই জানতে, বুঝতে ও দেখতে পারেন। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে আলেম, ইমাম, আরবী ভাষায় বাঘা বাঘা পণ্ডিত এই জ্ঞানের অধিকারী নন। বরং ভিন্ন ধরণের জীবন যাত্রার অধিকারী ব্যক্তি এই বিরল জ্ঞানের অধিকারী হয়ে সমাজে অসাধ্য সাধন করেছেন। তথা জনসাধারণকে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী হিসাবে বাস্তব প্রমাণ দিয়েছেন। তাই আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, প্রচলিত অর্থে ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে এই বিদ্যার কোন সম্পর্ক নাই। তাই মাদ্রাসা, মক্তব, স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটিতে এই জ্ঞানের চর্চার কোন সুযোগ নাই। আমরা জানতে পারলাম যে, চার মাযহাবের নেতৃবৃন্দগণ মুসলিম উম্মাহকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে পাঠক্রম চালু করেছেন এর মধ্যে আল্লাহ্র সাথে যোগাযোগের কোন বিদ্যা অন্তর্ভুক্ত নাই। তাই সুফিবাদ ভিন্ন ধরণের ব্যক্তি যথা সুফি, দরবেশ, মাস্তান, পীর মাশায়েখ প্রভৃতি ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজে প্রকাশ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত হয়। আর প্রশ্ন অজ্ঞ হলে আলেম কেমনে হয়। আলেম হলে অজ্ঞ হয় কি করে? তাদের বিদ্যা বহির্ভূত বিষয় বলে তাদেরকে বেশরাহ, শরীয়ত মানে না, পীরের কার্যক্রম কুরআন হাদিসে নাই বলে অন্যায় অভিযোগ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পীর-মাশায়েখদের বিরুদ্ধে এই সব তথাকথিত জাহেরী আলেমদের অন্যায় অভিযোগ। আপাতদৃষ্টিতে এসব কুরআন বিশেষজ্ঞগণ যে গভীর ধর্মতত্ব তথা মারফত, ইলমে লাদুন্নি কাশফ ইলহাম কি বা কিভাবে এই জ্ঞান ব্যক্তির মধ্যে কার্যকরী হয় তা জানেন না ও বুঝেন না। বরং যার মধ্যে এই জ্ঞান প্রকাশিত ও বিকশিত হয় তাকে গালি বা ক্ষেত্র বিশেষে প্রহার করে সকল সমস্যার সমাধান করতে চান। এ পর্যায়ে আমরা রাসূল (সা.) জীবন থেকে এই বিদ্যার চর্চা অনুসন্ধান করব।

পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতের বর্ণনা মোতাবেক ইসলাম ধর্মের প্রথম সুফি হিসাবে আমরা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) কে ধরতে বাধ্য। সাধারণ সুফি ও নবী করীম

(সা.) এর পার্থক্য এই যে, সুফিগণ শুধু বেলায়েতে সুগরা তথা আল্লাহ্‌র প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নবীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কর্ম দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হন। পক্ষান্তরে, আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ (সা.) নবুওত বেলায়েত কুবরার পূর্ণ অধিকারী। বিশ্বের সকল নবী রাসূল ও আউলিয়াগণের সকল নবুওত ও বিলায়েতের বণ্টন ও বিতরণকারী। এই জন্য সকল নবী ও অলিই হযরতের নিকট ঋণী ও তাঁর অধীন। কাজেই রাসূল (সা.) কে প্রথম সুফি হিসাবে ধরে তাঁকেই সুফি স্রষ্টা বা তাসাওউফের জনক বলা যায়। এরই ধারাবাহিকতায় সুফিগণের মূল সাধনার বিষয় হলো আল্লাহ্‌র সাথে রাসূল (সা.) সম্পর্কের স্বরূপের উদ্‌ঘাটন এবং রাসূল (সা.) এর চিন্তা, চেতনা, জীবন দর্শন, অনুসন্ধান ও অনুসরণ। রাসূল (সা.) এর আচার-ব্যবহার, ইবাদত ও উপাসনা তথা সার্বিক শিক্ষার বাস্তব অনুশীলন তথা প্রশিক্ষণ। এদিক দিয়ে সুফিবাদ বা তাসাওউফ তথা বিলায়েতের স্বত্ত্বাধিকারী এবং নবুওতের প্রকৃত জিম্মাদার হলেন হযরতের মহান আহলে বাইত। যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী চির পবিত্র (আহযাব-৩৩), আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও রাসূল (সা.) এর ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর খেলাফত (পার্থিব ক্ষমতা ও রাজত্ব) ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব এর বৈধ উত্তরাধিকারী বা ওয়াসী। আর আহলে বাইতের প্রধান পুরুষ হলেন হযরত আলী বিন আবি তালেব (সা.)।

হযরত আলী মুরতজা (সা.) থেকে তিন শতাধিক ত্বরিকা প্রকাশ পেয়েছে। এ জন্য সুফিবাদী সাহিত্যে শেরে খোদা হযরত আলী কারমা আল্লাহ্‌ ওয়াজহু (সা.) কে সুফিদের সম্রাট হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আলী (সা.) কে অকৃত্রিম ভালবেসে তাকে মান্য করা ওয়াজেব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে : 'হে রাসূল, আপনি আপনার উম্মতকে বলিয়া দিন যে, আমি রেসালতের বিনিময়ে তোমাদের নিকট হইতে কোন পারিশ্রমিক চাহিনা। কিন্তু আত্মীয়দের অটুট ভালবাসা এবং সৎ কাজ করে আমি তাহার জন্য তাহাতে আরও শ্রী বৃদ্ধি করি।" (সূরা শুরা: ২৩) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্‌ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াত নাযিল হইলে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূল্লাহ (সা.) আপনার নিকট আত্মীয় যাদের ভালবাসা আমাদের উপর ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) করা হয়েছে, তাহারা কারা? নবী পাক (সা.) ফরমাইলেন: আলী, ফাতেমা হাসান ও হোসাইন। (তাফসীরে যামাখশারী, ২য় খন্ড, পৃ- ৩৩৯, সাওয়াকে মুহরিকা, পৃ: ১০১)। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী (সা.) হলেন রাসূল (সা.) এর নফস-সত্ত্বা, আত্মা-জীবন-প্রাণ। রাসূল যে হযরত সালমান ফারসী (রা.) কে, অতঃপর তোমার নিকট যখন জ্ঞান (কুরআন) এসে গেছে, এরপরও যদি কেউ (খ্রিস্টান) তোমার সাথে তার (ঈশ্বর') সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করে, তবে বল, (আচ্ছা ময়দানে এস), আমরা আহবান করি, আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের এবং আমাদের নফস (সত্ত্বা, আত্মা-জীবন) এবং তোমাদের সত্ত্বাদের অতঃপর সকলে মিলে (আল্লাহ্‌র দরবারে) নিবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষণ করি" (সূরা আলে ইমরান : ৬১)। রাসূল (সা.) হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে নাজরানের খ্রিস্টানদের অনেক বুঝালেন যে, তাঁকে যেন আল্লাহ্‌র পুত্র না বলে, তিনি হযরত আদমের উদাহারণ ও দিলেন। কিন্তু তারা কোন কথাই শুনল না। অবশেষে তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে পরস্পরের বিরুদ্ধে দোয়া ও মিথ্যাবাদীদের উপর অভিশাপ বর্ষনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যাকে মুবাহিলা বলে, স্থির করা হল যে, নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে উভয়ে নিজ-নিজ পুত্রদের, নারীদের (কন্যা সন্তানদের) এবং তাদের নিজেদের নফস-জীবন-সত্ত্বা-আত্মা হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য) ব্যক্তিদের নিয়ে একত্র হবে এবং প্রত্যেকে অপরের প্রতি অভিসম্পাত ও আল্লাহ্‌র শাস্তি কামনা করবে। মুবাহিলার দিন সাহাবীরা সুসজ্জিত হয়ে রাসূলের গৃহে এ আশায় জমা হলেন যে, হযরত রাসুলে (সা.) তাদের কাকে সাথে নেবেন। কিন্তু রাসূল যে হযরত সালমান ফারসী (রা.) কে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইমাম হুসাইনকে (সা.) কোলে নিয়ে ইমাম হাসানের (আ.) হাত ধরলেন এবং হযরত ফাতিমা (আ.) কে নিজের পিছনে, আর হযরত আলী কে (সা.) তাঁর পিছনে রাখলেন। অর্থাৎ ছেলেদের স্থানে তিনি নাতিদের, নারীদের স্থানে নিজ কন্যাকে এবং সত্ত্বা-নফস-জীবন বলে গন্যের স্থানে আলী (সা.) কে নিলেন এবং দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্‌ প্রত্যেক নবীর আহলে বাইত থাকে, এরা আমার আহলে বাইত, এদের সকল দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত ও পাক-পবিত্র রেখ। বস্তুত তিনি এরূপ ভঙ্গীতে ময়দানে পৌঁছলে খ্রিস্টানদের নেতা আকিব তা দেখে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি এমন নুরানী চেহারা দেখছি যে, যদি এরা পাহাড়কে নিজ স্থান হতে সরে যেতে বলেন, তবে তা অবশ্যই সরে যাবে। সুতরাং মুবাহিলা হতে হাত গুটিয়ে নেওয়াই সম্মত হল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম। এরা যদি মুবাহিলা করত, তবে আল্লাহ্‌ তাদের বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দিতেন এবং ময়দান আগুনে পরিণত হয়ে যেত আর নাজরানের একটি প্রাণীও, এমনকি পাখি পর্যন্ত রক্ষা পেতনা। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলীকে নফসে পয়গম্বর হিসাবে ঘোষণা করায় তার মর্যাদা কোনা সাহাবা তো নয়ই এমনকি সমুদয় নবীর

থেকেও শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলেন। (তাফসীবে জালালাইন, ১ম খন্ড, পৃ-৬০, বায়দ্বাভী, ১ম খন্ড, পৃ-১১৮, তাফসীরে দুররুল মানসুর, ২য় খন্ড, পৃ-৩৯ মিশর মুদ্রন)।

এরই ধারাবাহিকতায় হযরত রাসূল (সা.) হযরত আলীকে নিজের সাথে অভেদ ও অদ্বৈত নূর বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত বারআ বিন আজেব (রা.) হতে বর্ণিত আছে গাদীরে খুম নামক স্থানে রাসূল (সা.) আলী (আ.) এর হাত ধরে তিনবার বললেন, তোমরা কি জাননা যে আমি মোমিনদের জীবন হতেও অধিকতর প্রিয় ? তারাও সবাই তিনবার বললেন, হ্যাঁ। হুজুর (সা.) বললেন, হে আল্লাহ্, আমি যার বন্ধু আলী ও তার বন্ধু। হে আল্লাহ্ আমি যার মওলা, আলীও তার মওলা। হে আল্লাহ্ যে তাঁকে বন্ধু জানে, তুমিও তাকে বন্ধু জেনো। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বললেন, হে আবু তালিবের তনয়, আপনি এখন, রাতে ও সন্ধ্যায় প্রত্যেক বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীর বন্ধুরূপে আপনি কাল যাপন করুন। এছাড়া অন্য একটি হাদীসে হযরত আলী (আ.) এর সাথে শত্রুতা পোষণকারীকে মুনাফিক ও ভালবাসা পোষণকারীকে মুমিন বলে রাসূল (সা.) বর্ণনা করেছেন। হযরত আদম (আ.) ছিলেন আল্লাহ্র খলিফা এ ব্যাপারে সূরা বাকারার ৩০ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেছেন:-

'আল্লাহ্তালা ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিব। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ফরমাইয়াছেন যে, কুরআনে তিনজনকে আল্লাহ্পাক নিজের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেছেন: হযরত আদম (আ.) ও হযরত দাউদ- (আ.) কে যথাক্রমে ফরমাইয়াছেন: হে দাউদ! আমি তোমাকে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করেছি। কুরআনে বলা হয়েছে যে, তাহাদেরকে স্থলাভিষিক্ত (খলিফা) করা হইবে পৃথিবীতে যেমন তাদের পূর্বে স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছিল (সূরা নূর : ৫৫), (কানযুল উম্মাল ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ-১৫৪)।

উল্লেখিত পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বর্ণনা মতে আমীরুল মুমিনুল শেরে খোদা আসাদুলাহল গালিব হযরত আলী ইবনে আবীতালেব (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কথাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে। শুধু তাই নয়, তাঁকে "বেলায়তের সম্রাট" বলেও প্রকৃত সুফি তাত্ত্বিকগণ অভিহিত করে থাকেন। এর প্রধান কারণ হলো হযরত আলী (আ.) আহলে বাইত পাক পাঞ্জাতনের অন্যতম। (হযরতের আহলে বাইত হলেন, হযরত আলী (আ.), হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমা যাহরা (আ.), হযরত হাসান (আ.) ও হযরত হুসাইন (আ.)। আহলে বাইত সম্পর্কে হযরত নূর নবী (সা.) আমি তোমাদের মধ্যে, এমন কিছু রেখে যাচ্ছি, যা ধরে থাকলে আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র কিতাব, আকাশ হতে পৃথিবীর দিকে একটি রজু, অপরটি আমার আহলে বাইত। তারা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হাউজে কাউসারে না আসা পর্যন্ত তাঁরা পৃথক হবে না। অন্যত্র আহলে বাইতকে হযরত নূহ (আ.) এর নৌকার সাথে তুলনা করেছেন। মহাবিপদের সময় যারা ঐ নৌকায় উঠেছিল, শুধু তারাই, রক্ষা পেয়েছিল যারা সেটি প্রত্যাখান করেছিল তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। অনুরূপভাবে আহলে বাইত হলো রূপ কাঠের সেই নৌকা যা ডুবার ভয় নাই। তাই যারা আহলে বাইতকে আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী অকৃত্রিম ভালবেসে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছে, ইমান এনেছে তাঁদের প্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণ করেছে তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে যারা এই মত ও পথকে পরিহার করে ভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিজেদের আদর্শ হিসাবে গণ্য করে আহলে বাইতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের প্রকৃত পরিচয়জনিত জ্ঞান লাভ করে নাই, মর্যাদা বুঝবার ব্যাপারে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করে নাই কিংবা বিশ্বাসও করে নাই, তাদের ভালোবাসেও নাই, বরং তাদের যারা প্রশংসাকারী তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে তারা জাহান্নামে যাবে। নূর-এ-মোহাম্মদী যেমন সমস্ত সৃষ্টির মূল, তেমনি হাকীকতে আহলে বাইত ও সৃষ্টির মৌলিক উপাদান, অর্থাৎ আহলে বাইতের সংখ্যা চার ও এর সঙ্গে আছেন হাকীকতে খাস মুহাম্মদ (সা.) যার যোগফল দাঁড়ায় পাঁচ। এই মহান ৫ জনকে সূফি সাহিত্যে পাক-পাঞ্জাতন অভিন্ন ও মহান একের (আল্লাহ্) প্রকাশ ও বিকাশ স্থল হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ কারণেই হযরত মুহাম্মমদ ও হযরত আলী (সা.) হাকীকতে অদ্বৈত সত্তা বিশিষ্ট। তাই হযরত আলী তুলনাবিহীন ও রাসূল (সা.) এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ।

হযরত মুহাম্মদ (সা.), হযরত আলী সম্পর্কে বলেছেন 'আনা মদিনাতুল ইলমি ওয়া আলীয়্যু বাবুহা'। আমি জ্ঞান রূপ, শহর আর আলী (আ.) সেই নগরীর সিংহদ্বার।

হযরত আলী (আ.), রাসূল (সা.) এর জাহিরি ও বাতিনী সকল প্রকার জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলেই রাসূল (মো:) হযরত আলী (আঃ) কে সর্ব প্রকার জ্ঞানের দরজা বা চাবিকাঠি বলে ঘোষণা করেছেন। বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হয় হযরত জাবের (আ.) বর্ণিত অন্য একটি হাদিসের মারফত। হযরত যাবের (রা:) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, তায়েফের দিনে হযরত আলী (আ.) কে ডেকে হযরত রাসূল (সা.) গোপনে কিছু কথা বললেন। লোকে বলে যে, তার চাচাত ভাই এর সাথে তাঁর দীর্ঘ আলাপ হলো। তখন রাসূল (সা.) বললেন, আমি তাঁর সাথে গোপনীয় ও গুপ্ত বিষয় আলাপ করি নাই; বরং স্বয়ং আল্লাহ্, আলীর সাথে গুপ্ত কথা বলেছেন। এই যে, গোপনীয় গুপ্ত বিষয় আলাপ-আলোচনা, এটাই হলো বেলায়েতের সর্বোচ্চ বা গভীর তত্ত্ব ও ভেদ, যা শুধু [আহলে বাইতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই বিষয়টি হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ

আনসারী বর্ণিত এই হাদিসের মধ্যে যে স্থির নিশ্চিত হওয়া যায়। তিনি বর্ণনা করেন যে, যখন পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযিল হলো।

"হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত্য কর, এবং রাসূল (দ.) ও তোমাদের মধ্যে যারা নির্দেশের অধিকর্তা, তাদের আনুগত্য কর (সূরা নিসা : ৫৯)। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে চিনতে পেরেছি এবং উলিল আমর যার অনুসরণকে আল্লাহ্ নিজের অনুসরন এবং নিজের পয়গম্বরের অনুসরণ বলে ঘোষণা করেছেন তাঁরা কাহারা? তখন রাসূলে (সা.) ফরমাইলেন: তাহারা আমার স্থলাভিষিক্ত এবং আমার উম্মতের ইমাম। তাহাদের প্রথম ইমাম আলী ইবনে আবি তালেব। তাহার পর আল হাসান ইবনে আলী মুজতবা, তাহার পর হোসাইন ইবনে আলী তাহার পর আলী ইবনে আল হোসাইন (জয়নুল আবেদীন), তাঁহার পর মোহাম্মদ ইবনে আলী "বাকের"-যিনি "বাকের" নামে প্রসিদ্ধ "হে যাবির, তুমি তাহার দেখা পাইবে, যখন তুমি তাহার সাক্ষাত পাইবে তখন তাহাকে আমার সালাম বলিবে, তাঁহার পর জাফর ইবনে মোহাম্মদ আস সাদিক, তাহার পর মুসা ইবনে জাফর আল সাদিক, তাহার পর আলী ইবনে মুসা আর রিজা, তাহার পর মোহাম্মদ ইবনে আলী জাওয়াদ (আততাকী) তাহার পর আল হাসান ইবনে আলী নকী, তাহার পর হাসান ইবনে আলী আল আসকারী, তাহার পর আমার নাম এবং উপাধি বহনকারী যে জগতে খোদার প্রমান এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের মানবের মধ্যে চিহ্ন বহন করবেন। আল্লাহ্‌তালা তাহার মাধ্যমে পূর্ব-পশ্চিম জয় করিয়া দিবেন। তাহার শুভ নাম হইবে মোহাম্মদ আল মাহদী (ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ, পৃ-৪২৭)।

উল্লেখ্য জালেম শাসকগণ কর্তৃক এই আয়াতের ব্যাখ্যা পরিবর্তন করে "উলিল আমর" এর অর্থ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাছাড়া রাসূল (সা.) এরপর যেহেতু শত শত বছর যাবত আহলে বাইত বিরোধী শাসকগণ ক্ষমতায় ছিলেন। তাই তাদের দালাল আলেমদের তথা এজিদী ইসলামে আহলে বাইতদের মর্যাদা বর্ণনামূলক হাদিস প্রচার নিষিদ্ধ থাকায় ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণ লোকের এক ধরণের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় যা অদ্যাবধি বিরাজমান। উপরন্তু আল্লাহ্ ও রাসূল কর্তৃক ঘোষিত দ্বীন-ইসলামের এক-একজন স্তম্ভ হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে তাদের ব্যাখ্যা ও তাদের বর্ণিত হাদিস বা সিদ্ধান্ত/ মতামত ঐ শাসক গোষ্ঠীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত আলেম শ্রেণীর নিকট অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে তাছাড়া তাঁদের বক্তব্য/মতামতের এমনকি তাদের কবর জিয়ারতের উপর নিষেধাজ্ঞা, সাক্ষাত ও যোগাযোগে বিধি নিষেধ আরোপ করে ইসলাম ধর্মের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তা বলাই বাহুল্য।

এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে তাহলো বিদ্যমান সুফি সাহিত্যে তাদের অনুপস্থিতি তথা ইতিহাস বিকৃতি। আমরা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি যে এসব ইমামগণ ছিলেন আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত ও রাসূল (সা.) কর্তৃক ঘোষিত সর্বজন মান্য মুসলমানদের ইমাম তথা ধর্মীয় নেতা। অথচ তাঁদের জীবন চরিত্র বা শিক্ষা, ধর্ম সম্পর্কে তাদের অভিমত, বক্তব্য, মন্তব্য বা তাঁদের বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে আমাদের কোন ধারনাই নাই। সুফিবাদের যে বিকৃত ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। তা থেকে সুফিবাদে যে সব বিভ্রান্তিকর ধারনা সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কারণ এই বাস্তবতার মধ্যেই নিহিত।

প্রকৃত পক্ষে শুধুমাত্র সুফিবাদই নয় বরং সার্বিকভাবে ইসলাম ধর্মই একমহা বিকৃতির শিকার। কারণ পবিত্র কুরআন রাসূল (সা.) এর ঘোষণা অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের বিশ্ব জাহানের প্রভু কর্তৃক নিয়োজিত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী এবং তা বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য যিনি এবং যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন কিংবা জীবন্ত কুরআন, "ধর্মের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি" তাদেরকে ইসলাম ধর্মীয় জ্ঞান জগত থেকে যে সুপরিকল্পিত উপায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে সেই ইতিহাস ধর্মীয় সাহিত্যে বর্ণনা করা হয় নাই। ফলে সাধারণ মুসলমানদেরকে যে ইসলাম জানানো হয়েছে বা হচ্ছে তা এই মহান আহলে বাইতদের খুনীদের চিন্তা ধারার অনুসরণে রচিত কুরআনের অপব্যাখ্যা ও বিকৃত হাদিস এবং এর উপর ভিত্তি করে রচিত ফিকাহ ধর্ম সাহিত্যের উৎস যা এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা জানতে পারি যে, রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর যারা ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন তাদের সাথে হযরত আলীর সাথে বিরোধিতার এক পর্যায়ে আলী বিরোধী চক্র জয়লাভ করে। পরবর্তীতে মাত্র ৬৫৬-৬৬১ পর্যন্ত আলী ক্ষমতাসীন ছিলেন।

ইতোমধ্যে কুরআন বিরোধী, রাসূল (সা.) বিরোধী, আলী বিরোধী তথা ধর্মদ্রোহী ব্যক্তিবর্গ ধর্মের নামে ৬৬১ খৃস্টাব্দ থেকে ১২৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমতাসীন হয় এবং তারা এই নাম সর্বস্ব ইসলাম নিয়ে অসাধারণ মানবিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক যোগ্যতার কারণে বিশ্বের প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাদের তৈরী ধর্মকেই প্রকৃত ও সঠিক ইসলাম বলে বিশ্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। তাই প্রকৃত সুফি যাঁরা প্রকৃত পক্ষে মূল কুরআন, সঠিক হাদিস ও সঠিক ইসলামের ধারকদের সাথে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীনদের বিরোধ একটি অনিবার্য ব্যাপার হিসাবে দেখা দেয়। যেহেতু এই সব শাসকরা তাদের রাজ্য পরিচালনার জন্য ধর্ম হিসাবে ইসলামকে ব্যবহার করতো। তাই সুফিগণ সাধারণভাবে এই রাজশক্তির সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতেন বরং তারা মুসলিম প্রজা সাধারণকে মূল বা প্রকৃত ধর্মের

দিকে আহবান জানাতেন। এ কারণেই সুফিরা ধর্ম সম্পর্কে যে ধর্মীয় বিশ্বাস, ইবাদত, আমল বর্ণনা করতেন তাকেই তরীকা হিসাবে সুফিরা নাম করণ করেছেন, বাহ্যিকভাবে বা সাধারণভাবে তা প্রচলিত ধর্ম ইসলাম নামে পরিচিত থাকলেও এদের মত, চিন্তাধারা ও কর্মকান্ডের সাথে Main Stream অর্থাৎ সামাজিক ইসলাম ও রাজা বাদশাহ্দের প্রচারিত ও পালনকৃত ধর্মের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হযরত আলী (আ.) এর ৬ জন খলিফা ছিলেন এরা হলেন হযরত হাসান (আ.), হযরত হোসাইন (আ.), হযরত ওয়াইস করনী, হযরত হাসান বসরী, হযরত কুমায়েল ও হযরত মিকদাদ।

এসব খলিফাদের মধ্যে হযরত কুমায়েলকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ শহীদ করে। হযরত মিকদাদ থেকে কোন ত্বরিকা প্রচারের কথা জানা যায় না। হযরত খাজা ওয়ায়েস করনী থেকে যে ত্বরিকা চালু আছে তা হলো ওয়ায়েশিয়া ত্বরীকা এটি কিছুটা কম প্রচারিত ত্বরীকা। সাধারণভাবে যেসব ত্বরিকা প্রচলিত আছে তার বেশীর ভাগ তরীকাই হযরত হাসান বসরীর নামে প্রচারিত তরীকা এবং ত্বরীকতের ইতিহাসে তিনিই সর্বাধিক প্রচারিত ব্যাক্তি। অথচ অতি দুঃখের কথা যে হযরত হাসান ও হোসাইন (আ.) যারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুফি ও মহান আহলে বাইতের নিস্পাপ সদস্য, বেহেশতে যুবকদের সর্দার যেখানে কোন বৃদ্ধ লোকের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। তাঁদেরকে সুফিবাদের ইতিহাস ও তালিকা থেকে ইসলামের দুশমানরা যে কূটচালের মধ্যেমে বাদ দিয়েছে তা সুফিবাদের তাত্ত্বিক লেখকরা বিবেচনাও করেন নি। অনুরূপভাবে রাসূল (সা.) কর্তৃক বর্ণিত সেসব ইমামদের জীবনীও সুফিতত্ত্বের ইতিহাস থেকে বাদ রাখা হয়েছে অর্থাৎ ইসলামের মূল শিক্ষাই সুফি তাত্ত্বিক চিন্তাধারায় অনুপস্থিত রয়ে গেছে।

দশম অধ্যায়

নবুওত-রেসালাত-খেলাফত-ইমামত-বেলায়েত

পবিত্র কুরআনে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন "স্মরণ কর। যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে নিজের খলিফা (স্থলাভিষিক্ত) নিয়োগ করব। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে অরাজকতা, বিপর্যয় সৃষ্টি ও খুন খারাবি করতে থাকবে। যে ক্ষেত্রে আমরা আপনার সপ্রশংস মহিমা বর্ণনা ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জাননা" (সূরা বাকারা : ৩০)।

উপর্যুক্ত আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, এই ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। তাহলো পৃথিবীর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে বর্তাবে। আল্লাহ্ নিজের পক্ষ থেকে সকল ক্ষমতা মানুষকে প্রদান (Delegate) করবেন এবং সে (মানুষ) এই কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করে এটাই তার পরীক্ষার বিষয় হিসাবে বিবেচিত হবে। বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন। সকল কাজের কর্মকর্তা হিসাবে মানুষের ভূমিকাই মুখ্য হিসাবে দৃশ্যমান ও বিবেচিত হবে। পৃথিবী পরিচালনার তথা মালিকানা দেওয়া হবে সৎ কর্মশীল আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা: 'তোমাদের মধ্যে যাহারা সৎ কর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব (স্থলাভিষিক্ত) দান করিবেন। যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহাদের দ্বীনকে যাহা তিনি তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন" (সূরা নূর : ৫৫)।

আমি 'যবুর' কিতাবে উপদেশের পর লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার বিবেচনায় যোগ্য ব্যক্তিগণকে এই পৃথিবীর মালিকানা দান করা হইবে। নিশ্চয়ই ইহাতে বাণী রহিয়াছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা ইবাদত করে (সূরা আম্বিয়া : ১০৫)।

বিশ্ব পরিচালনা কর্মকাণ্ডে খলিফাগণই মূল চালিকা শক্তি। তাই খলিফা নিয়োগ বিশ্বের সর্বময় মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন স্বয়ং তার নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। এই বিষয়টি হযরত দাউদ (আ.) কে খলিফা হিসাবে ঘোষণার মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে : (আমি বললাম), হে দাউদ আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা (স্থলাভিষিক্ত) করেছি অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর ও খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, করলে এ তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে সরিয়ে দেবে।" (সূরা সা'দ ১৭-২৬)।

আমি অবশ্যই দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম আর তারা বলেছিল। প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদের তার বহু বিশ্বাসী দাসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (সূরা বনি ইসরাইল : ৫৫)।

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ্র নিকট খলিফা হওয়ার বিশেষ যোগ্যতা আছে। আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত এই সব খলিফারা দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে অতি সতর্ক থাকেন, যেন তাদের মাধ্যমে কখনও কোন প্রকার ভুলত্রুটি অন্যায়, অবিচার সংঘটিত না হয়। এটি নিশ্চিত করার জন্য নিয়োজিত খলিফাদের বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়। এই জ্ঞান কোন সাধারণ জ্ঞান নয় বরং বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহ্র যে জ্ঞান অর্থাৎ হুকুমত তথা সঠিক ব্যবস্থা বিষয়ক জ্ঞান। এই জ্ঞানকে 'হিকমত' বলা হয়। এই জ্ঞানে প্রত্যেক দৃশ্যমান-অদৃশ্য বস্তু পদার্থের সৃষ্টি তত্ত্ব সার্বিক বৈশিষ্ট্য, রাসায়নিক গুণাবলী পদার্থের আন্তঃসম্পর্ক সর্বোপরি অদৃশ্য ও ভবিষ্যত দেখার জ্ঞান। এই জ্ঞানের অধিকারী থাকেন বিধায় নবীদেরকে Prophet বা ভবিষ্যবাণী করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়।

আল্লাহ্র দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসাবে এই সব নবী রাসূল খলিফাগণ আল্লাহ্র নির্ধারিত আচরণবিধি (Code of Conduct) মেনে চলতে বাধ্য অন্যথায় তাদের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে মর্মে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে: সে কোন নবী রাসূল খলিফা বা আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত, আমি অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম এবং কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন-ধমনী, অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে (সূরা হাক্কা : ৪৪-৪৬)।

নবী রাসূলের পদবীর দায় দায়িত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে-"তিনি সেই আল্লাহ্ যিনি তাদের ভেতর থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াত পড়ে শোনান, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন" (জুমায়া : ২)।

পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি সূরা বাকারা ১২৯, সূরা আল-ইমরানের ১৬৪ ও সূরা জুমায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে বার বার যে কথা বলা হয়েছে তা এই যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে শুধু কুরআনের আয়াত পড়ে শুনিয়ে দেবার জন্য পাঠান নি বরং তাকে পাঠানোর আরও কারণ আছে। প্রথম তিনি মানুষকে কিতাব শিক্ষা দেবেন। দ্বিতীয়ত উক্ত কিতাব সঠিকভাবে শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষপ গ্রহণ করবেন। তৃতীয়ত হিকমত বা প্রজ্ঞা জ্ঞান তথা বিশ্ব পরিচালনায় খোদায়ী বিশেষ জ্ঞান

শিক্ষা দেবেন। চতুর্থ অনুসারীদের আত্মিক বা আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করবেন। অর্থাৎ কলবের জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে তাকে পবিত্র করণের মাধ্যমে তাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করবেন। যাকে আমরা বর্তমানে ত্বরিকতের জ্ঞান তথা মারফতি জ্ঞান বলে থাকি। শুধুমাত্র আরবী ভাষা জানা থাকলেই পবিত্র কুরআনের সঠিক ব্যাখাকারী হওয়া যায় না তাই আল্লাহ্‌ স্বয়ং এই কিতাবের ব্যাখ্যাকারী হিসাবে রাসূলকে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং এই দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে তিনি স্বয়ং কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন মর্মে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ তাড়াতাড়ি ওহী, আয়ত্ত করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সহিত সঞ্চালন করিওনা। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং, যখন আমি পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। অতঃপর ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই (সূরা কিয়ামা- ২২ : ১৫-১৯)।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কিতাব ও নবী-রাসূলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কারণ কিতাবের সঠিক ব্যাখ্যা তথা জ্ঞান আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। তাই এটা একটি মৌলিক বিষয় যে, সকল যুগে আল্লাহ্‌র নিয়মিত অর্থাৎ হেদায়েতের জ্ঞান লাভের প্রধান দুইটি উৎস রয়েছে। এক আল্লাহ্‌র কালাম, দুই নবী রাসূল (খলিফা, ইমাম, ওলী, হাদী, মহসিন, সালেহীন ইত্যাদি) এর মহান ব্যক্তিত্ব। নবী রাসূলগণকে আল্লাহ্‌তালা শুধুমাত্র বাণী পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব দিয়ে পাঠান নি। বরং সেই শিক্ষা উপলব্ধি করার ব্যাপারে সহযোগিতা ও তাদেরকে বাস্তব নেতৃত্ব দান ও বাস্তব কার্যপদ্ধতি প্রদর্শনের নির্দেশও দিয়েছেন যাতে করে তারা আল্লাহ্‌র বাণীর সঠিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানুষ ও সমাজের সংস্কার ও সংশোধন করতে পারেন এবং বিকৃত সমাজ-ব্যবস্থার সংশোধন করতে পারেন এবং বিকৃত সমাজ ব্যবস্থার সংশোধন করে একটি সৎ ও সুস্থ সমাজ পূর্ণগঠিত করতে পারেন।

ঐশী কিতাবের সাথে ঐশী ব্যক্তির এই গভীর সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, হে মানব সকল, এ আলী ও আমার সন্তানদের মধ্য থেকে যারা মাসুম (নিষ্পাপ)–, তারা সকলেই শিকলে আসবার (হালকা ওজন বিশিষ্ট) আর কুরআন হলো সিকলে আকবর (ভারী ওজন বিশিষ্ট)। এ দুটো কখনোই আলাদা হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার নিকট পৌঁছবে। এরা হলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তারা আমিন (বিশ্বস্ত বা সত্যবাদী) এবং আল্লাহ্‌র জমিনে তারই মনোনীত হাকীম।"

[গাদীরে খুমে প্রদত্ত রাসূল (সা.)] এর বক্তৃতাংশ (সূত্রঃ গাদীর খুম থেকে দামেস্ক, সংকলন ও সম্পাদনা, ডা. এ এন এম এ মোমিন, প্রকাশকাল ২০১৫ প্রকাশনায় আলে রাসূল পাবলিকেশন) উপরন্তু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ যে নির্দেশ, আদেশ, পরামর্শ ও উপদেশ দিয়েছেন তার সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করাও নবীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। একজন সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন লোকও অন্ততপক্ষে এ কথাটি বুঝতে পারে যে, শুধুমাত্র তেলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন শুনালেই ব্যাখ্যাকারীকে কুরআনে লিখিত কথার চেয়ে বেশী কিছু বলতে হয় যাতে শ্রোতা কুরআনের অন্তর্নিহিত বক্তব্য ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। যদি কুরআনের কোন কথা ব্যবহারিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে ব্যাখ্যাকারী বাস্তব কর্মসম্পাদন বা (Practical Demonstration) পদ্ধতি প্রণয়নের এর মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, প্রকৃত পক্ষে আইন প্রণেতা এভাবেই কাজ করতে পছন্দ করেন।

তা না হলে কেউ যদি কুরআনের বিষয়বস্তুর অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জিজ্ঞাসা করে এবং তাকে কুরআনের শব্দগুলোই শুনিয়ে দেয়া হয় সেক্ষেত্রে কেউ তা ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করবেন না। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই সকল দেশের শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যার দায়িত্ব সরকারীভাবে দেশের সুপ্রিম কোর্ট বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের উপর এই গুরু দায়িত্ব দেয়া হয়ে থাকে।

বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তার নবী রাসূল এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটিকে অন্যটি আলাদা করলে মানুষ না দ্বীনের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে আর না পেরেছে সে হেদায়ত লাভ করতে। আল্লাহ্‌র কিতাবকে নবী থেকে আলাদা করলে তা কাণ্ডারী বিহীন তরী হয়ে পড়বে। একজন পথভ্রান্ত পথিক তা নিয়ে কিছুইতেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে না। আবার আল্লাহ্‌র নিয়োজিত ব্যক্তি থেকে কিতাবকে আলাদা করলে মানুষ জীবন্ত ধর্মের (Living Religion) অনুপস্থিতির কারণে পথভ্রষ্ট হয়। এই অসুবিধা দুরকরণের জন্য আল্লাহ্‌তালা তার সকল নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে জননেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ এবং তাহাদিগকে (নবী-রাসূল) করিয়াছিলাম নেতা, তাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করিতঃ তাহাদিগকে ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করিতে, তাহারা আমারই ইবাদত করিত (সূরা আম্বিয়া : ৭৩)।

এ প্রসঙ্গে নবী ও রাসূল এর পার্থক্য সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হচ্ছে।

নবী রাসূলদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মহান রাব্বুল আলামিন হঠাৎ করে কোন ব্যক্তিকে তাঁর কিতাব মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেন না। অথবা কাউকে খণ্ডকালীন

কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেন না। আবার এ দায়িত্ব পালন করা হলে নবী-রাসূলের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি ও প্রদান করেন না। তাই নবী-রাসূলদের জন্ম মৃত্যুতে দায়িত্বের বা কাজের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটেনা। তাই তিনি হায়াতুন্নবী। তাই দেখা যায় যে, নবুয়ত ও রেসালতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখেন এমন ব্যক্তিকেই এ দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং তাঁকে সেভাবেই সৃষ্টি করা হয়। যিনি সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠতম মানসিক, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী। এই পবিত্র দায়িত্ব অর্পণের পূর্বে তাঁকে সব রকমের চারিত্রিক ত্রুটি, বিচ্যুতি, গোমরাহি ও অসৎ কাজ কর্ম থেকে সুরক্ষা করা হয় এবং তাঁকে এমন পরিবেশেই লালন-পালন করা হয়।

নবী-রাসূলগণ যে জন্মের পূর্ব থেকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত ও নির্বাচিত এবং তাদেরকে বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়। তা বিশেষ কয়েকজন নবী-রাসূল সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। হযরত ইসহাক (আ.) এর জন্মের পূর্বেই ইব্রাহীম (আ.) কে তার জন্ম ও নবুয়ত লাভের সুসংবাদ এভাবে দেয়া হয়েছিল। "আমি ইব্রাহিমকে একজন পূণ্যবান নবী হিসাবে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম এবং তার ও ইসহাকের উপর বরকত নাজিল করেছিলাম (সূরা: সাফ্ফাত: ১১২-১১৩)।

হযরত ঈসা (আ.) যখন মায়ের কোলে তখন তাঁকে দিয়ে ঘোষণা করানো হয়: "তিনি আমাকে বরকতের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন– সেখানেই আমি থাকি না কোন আর আজীবন নামায ও যাকাত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমার মায়ের হক আদায়কারী করে পয়দা করেছেন। আমাকে বল প্রয়োগকারী ও অসৎ বানান নি (সূরা মরিয়াম: ৩১-৩২)।

নবী শব্দের অর্থ সম্পর্কে অভিধানিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ একে নবীউন শব্দ থেকে নির্গত বলে মনে করেন। এর অর্থ সংবাদ বাহক। আবার কারো কারো মতে এর মূল নবীউন অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদাবান ও উন্নত মানসম্পন্ন।

আজহারী কাসায়ীর মতে আসলে এই শব্দটি হচ্ছে নবী-ই। এর অর্থ হলো পথ ও পন্থা বা রাস্তা। নবী-রাসূলগণকে নবী বলা হয় এই জন্য যে, তাঁরাই হচ্ছেন আল্লাহ্‌র দিকে যাওয়ার পথ প্রদর্শক। কুরআন মজীদে কোন কোন নবীর ক্ষেত্রে নবী ও রাসূল উভয় শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন হযরত মুসা সম্পর্কে বলা হয়েছে– সে ছিল এক নিষ্ঠুপূর্ণ ও মনোনীত ব্যক্তি। আর নবী-রাসূলও ছিলেন তিনি (সূরা মরিয়াম: ৫১)।

রাসূল শব্দের অর্থ প্রেরিত। এই অর্থের দৃষ্টিতে আরবী ভাষায় দূত, বাণীবাহক, সংবাদদাতা বা সংবাদবাহক ইত্যাদি অর্থ বোঝানোর জন্য এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআন মজীদে এই শব্দটি সেই সব ফেরেশতাদের জন্য ব্যবহৃত হয় যারা অলি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন।

নবী-রাসূলের ভিতর পার্থক্যের রূপ বা প্রকৃতি সম্পর্কে মতবিরোধ থাকলেও এ ব্যাপারে সবাই একমত পোষণ করেন যে, রাসূল শব্দটি নবী অপেক্ষা একটি বিশেষ গুণের ইঙ্গিতবহ। অন্য কথায় সব রাসূল নবী ও কিন্তু সব নবী রাসূল নয়। আরও বলা যায়, যে, নবীগণের মধ্যে রাসূল শুধু সেই সব মহান মর্যাদাবান ব্যক্তিগণ, যাঁদেরকে সাধারণ নবীগণের অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। নবী-রাসূলগণ জননেতা বা ইমাম এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে। যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কিছু বিষয়ে পরীক্ষা করলেন (আগুনে নিক্ষেপের সময় ধৈর্য্য ধারণ, আল্লাহ্‌র নির্দেশে স্ত্রী হাজরা ও পুত্র ইসমাঈলকে জনবসতিহীন, উদ্ভিদ ও পানি শূন্য মরুপ্রান্তরে রেখে আসা এবং স্বীয় পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হওয়া) এবং সেগুলো সে (সফলতার সাথে) সম্পাদন করল তখন (আল্লাহ্) বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা (ইমাম) মনোনীত করলাম, সে বলল, আর আমার সন্তানদের মধ্য হতেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ তবে আমার প্রতিশ্রুতি (ইমামতের বিষয়টি) জালেম বা অবিচারকদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। (সূরা: বাকারা ১২৪)। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত হওয়া ব্যতীত জননেতা তথা ইমাম হতে পারবে না। নেতা বা ইমাম যে কেউ হতে পারে না। বরং যিনি ইমাম হবেন তিনি নিষ্পাপ তথা মাসুম হবেন, কেননা যদি একটি গুণাহও করে থাকেন তবে তিনি নিজের প্রতি অবিচার করলেন এবং জালিম বা অবিচারক হয়ে গেলেন। অন্যথায় আল্লাহ্‌র আদেশ অনিবার্য থাকবেনা।

ইমামত

"এ পর্যায়ে আহলে বাইতের মহান অষ্টম ইমাম হযরত রেযা (আ.) কর্তৃক ইমামতি ইমাম ও তার মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা: তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর নবীকে মৃত্যু দান করেন নি যতক্ষন না স্বীয় দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যার মধ্যে সবকিছুরই বর্ণনা রয়েছে। হালাল, হারাম, দণ্ডবিধি বিধি-বিধানসহ মানুষের যা কিছু প্রয়োজন রয়েছে সামগ্রিকভাবে তিনি তার বিবরণ দিয়েছেন এবং বলেছেন, কোন কিছুই আমি বাদ দেই নি এ কিতাবে। (সূরা আনআম: ৩৯) আর বিদায় হজ্বে যা তার জীবনের শেষ ভাগে ছিল, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেন-আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদা : ৩)

ইমামতের বিষয়টি হলো দ্বীন পূর্ণ হওয়ার শর্ত। আর নবী (সা.) ইন্তেকাল করেন নি যতক্ষণ না পর্যন্ত তার উম্মতের জন্য দ্বীনের সমুদয় শিক্ষা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের পন্থাসমূহ বাতলে দিয়েছেন ও তাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করেছেন। আর আলী (আ.)কে তাদের ইমাম ও নেতা নির্বাচন করেছেন। আর উম্মতের এমন কিছু বাদ রাখেন নি তার ব্যাখ্যা করা ব্যতীত। যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে, আল্লাহ্ তার দ্বীনকে পূর্ণ করেন নি। সে আল্লাহ্র কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করল। (যেমন এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ধারণা করেন যে, আল্লাহ্র রাসূল ধর্ম-রাজনৈতিক বিষয়ে উত্তরাধিকারের নীতি-নিয়ম-বিধান দিয়ে যান নি)। আর যে আল্লাহ্র কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করে সে কাফের হয়ে যায়। তারা কি ইমামতের গুরুত্ব ও তার মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। যে এ ব্যাপারে তাদের নির্যাচন বৈধ হবে?

ইমামতি এমন একটি মর্যাদা যা মহান আল্লাহ্ ইবরাহীম খলিলুল্লাহ্ (আ.) এর জন্য বিশেষায়িত করেছেন। নবুওয়াত ও বন্ধুত্বের (খলিল হওয়ার) মর্যাদা অর্জন করার পরে। একে তাঁর তৃতীয় অর্জন হিসাবে দেখেছেন এবং তাকে তা দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন। আর তার নামকে করেছেন সমুন্নত। মহা মহিম আল্লাহ্ বলেন এবং স্মরণ কর। যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলো সে পূর্ণ করেছিলো; তখন তিনি আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করলাম (সূরা বাকারা ১২৪)। এতে আনন্দিত হয়ে খলিল্লাহ্ বললেন। আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও (নেতা মনোনীত করুন) তিনি (আল্লাহ্) বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়, সুতরাং এ আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত যে কোন যালিমের জন্য ইমামতকে নাকচ করে দিয়েছে এবং একে শুধু বিশেষ নির্বাচিতদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ একে সম্মানিত করেছেন এবং শুধু নির্বাচিত ও পবিত্রদের বংশধরদের মধ্যে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর বলেছেন: এবং আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক এব পৌত্র রূপে ইয়াকুব আর তাদের প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎ কর্মপরায়ন এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শন করত, তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎ কর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে যাকাত প্রদান করতে তারা আমারই ইবাদত করত (সূরা আম্বিয়া: ৭২-৭৩)। অতঃপর এই বংশধারা একের পর এক শতাব্দী থেকে শতাব্দী ধরে উত্তরাধিকার লাভ করেছে। এভাবে তা পৌঁছায় নবী (সা.) পর্যন্ত। তখন আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয় মানুষের মধ্যে তাঁরাই ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠ এমন যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ইমান এনেছে (সূরা আলে ইমরান : ৬৮)। ইমামত শুধু তাদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল এবং নবী (সা.) তা আলী (অছি) এর উপর অর্পণ করেন। অতঃপর এ দায়িত্ব তার বংশধরের নির্বাচিত সেই ব্যক্তিদের হাতে অর্পিত হলো যাঁদেরকে আল্লাহ্ জ্ঞান ও ইমান দান করেছেন। এটা তাঁর বাণীতেই এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে", কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ইমান দেয়া হয়েছে তারা বলবে: তোমরা তো আল্লাহ্র বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছো। এটা তো পুনরুত্থান দিবস। কিন্তু তোমরা জানতে না। (সূরা রুম: ৫৬)। ঐ একই প্রথায় আল্লাহ্ তার (রাসূলের) সন্তানদের মধ্যেই ইমামত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। কারণ মুহাম্মদ (সা.) এর পরে কোন নবী নাই। কোথা থেকে এসব মূর্খ তাদের নিজেদের রায়ের মাধ্যমে ইমামতকে নির্বাচন করে? নিশ্চয় ইমামত হলো নবীদের স্থান আর ওয়াসিগণের উত্তরাধিকার। নিশ্চয়ই ইমামত হলো আল্লাহ্র খেলাফত ও তার রাসূলের খেলাফত এবং আমীরুল মুমেনীনের (আ.) এর মর্যাদা এবং হাসান ও হোসাইন (আ.) এর খেলাফত নিশ্চয় ইমামত হলো দ্বীনের লাগাম মুসলমানদের শৃংখলা, দুনিয়ার কল্যাণ আর মুমিনদের সম্মান স্বরূপ। ইমাম হলেন ক্রমবর্ধমান ইসলামের ভিত্তি আর তার বিকশিত শাখা। ইমামের দ্বারাই নামায, যাকাত, রোযা, হজ্ব ও জিহাদ সঠিক ও প্রতিষ্ঠিত হয়। আর খাজনা ও সাদাকাসমূহ প্রাচুর্য লাভ করে আর দণ্ডসমূহও বিধি বিধান বাস্তবায়ন হয়। আর সীমান্ত ও প্রদেশসমূহ সুরক্ষিত থাকে। ইমামই আল্লাহ্র হালালকে হালাল গণ্য করেন আর হারামকে হারাম গণ্য করেন। দন্ডকে কার্যকর করেন এবং আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতিরক্ষা করেন আর আল্লাহ্র পথে আহ্বান করেন প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশ এবং যথার্থ প্রমাণ সহযোগে।

ইমাম হলেন কিরণময় সূর্য-যার আলোকে পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে এবং দিগন্তে তার অবস্থা যেখানে দৃষ্টিসমূহ ও হাতসমূহ পৌঁছায় না।

ইমাম হলেন আলোময় চাঁদ, শিখাময় প্রদীপ, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে পথ নির্দেশক নক্ষত্র, হেদায়েতের পথ প্রদর্শনকারী আর ধ্বংস থেকে মুক্তিদাতা, ইমাম হলেন টিলা, শৃঙ্গের অগ্নিশিখা, প্রত্যেক শীতার্তের উষ্ণতা প্রদানকারী, প্রত্যেক বিপর্যয় থেকে মুক্তির দিশা, যে ব্যক্তি তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে সে ধ্বংস হবে।

ইমাম হলেন বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ, তীব্রবেগী বৃষ্টি, ছায়া বিস্তারকারী আকাশ, মসৃণ ভূমিতল, প্রবাহমান ঝরণা ধারা, জলাধার ও উদ্যান।

ইমাম হলেন বিশ্বাসীদের সহচর, দয়ালু, পিতা, সহোদর ভাই এবং দুগ্ধ পোষ্য শিশুর মমতাময়ী মাতা স্বরূপ আর আল্লাহ্র বান্দাদের আশ্রয়।

ইমাম হলেন আল্লাহ্‌র ও তার সৃষ্টির মাঝে তাঁর আমানতদার (বিশ্বস্ত রক্ষক) আর তার বান্দাদের উপরে তাঁর হুজ্জত (প্রমান) এবং তাঁর দেশে দেশে তারই খলিফা এবং আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী আর আল্লাহ্‌র (দ্বীনের) সীমার প্রতিরক্ষাকারী। ইমাম গোনাহ্ থেকে পবিত্র এবং ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত, জ্ঞানে বিশেষয়িত ও সহিষ্ণুতায় খ্যাত, দ্বীনের শৃংখলা বিধায়ক মুসলমানদের সম্মান প্রতিষ্ঠাকারী। মুনাফিকদের ক্রোধের কারণ, আর কাফেরদের ধ্বংসকারী।

ইমাম তাঁর যামানার একজনই (সৃষ্টি জগতে) কেউ তার সমকক্ষ নয় এবং তার সমান কোন জ্ঞানী নাই তার কোন বদলা ও সদৃশ্য ও দৃষ্টান্ত নাই। তিনি কিছু চাওয়ার পূর্বেই তাঁকে সকল মর্যাদার বৈশিষ্ট দান করা হয়েছে। এ বৈশিষ্টসমূহ কৃপাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কেবল তার জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাই কে আছে যে, ইমামের পরিচয়ে পৌঁছতে পারে ও তার গুণের মর্ম অনুধাবন করতে পারে?

অনেক দূরে! অনেক দূরে!! তার একটি মর্যাদা ও গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে মেধাসমূহ হয়রান। বক্তাদের ভাষা কবিদের মন শান্ত, সাহিত্যিকরা ব্যর্থ, বিশুদ্ধ ভাষীরা বোবা, পণ্ডিতরা নিশ্চুপ ও (তাদের) মাথা হেঁট, সকলেই তার মর্যাদার বৈশিষ্ট্যসমূহ হতে এমনকি একটি গুণ বর্ণনাও নিজের অপারগতা ও ত্রুটি স্বীকার করে, তার সকল পূর্ণতার বর্ণনা তো দূরের কথা। কীভাবে তারা তার প্রকৃতির পূর্ণ বর্ণনা দান করবে? কেউ কি আছেন যে, তার স্থলে দাঁড়াতে পারে কিংবা তাঁর ন্যায় উপকার সাধন করতে পারে? কোথা থেকে পারবে? যখন তিনি হলেন নক্ষত্রের মতো এমন উচ্চ স্থানে অবস্থানশীল যে, সে স্থান হস্ত প্রসারকারীদের নাগাল থেকে ও গুণ বর্ণনাকারীদের থেকে অনেক দূরে। তারা কি মনে করে যে, ইমাম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অলি বংশধর ব্যতীত পাওয়া যায়? আল্লাহ্‌র কসম। (যদি তারা এ ভিন্ন চিন্তা করে তবে) তাদের নিঃশ্বাসগুলোও তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে গণ্য করবে। আর তারা অলিক আশা করেছে সে তারা এমন উঁচু ও কঠিন গিরিপথে আরোহন করেছে এবং পিচ্ছিল স্থানে পা রেখেছে যা তাদেরকে নিক্ষিপ্ত করবে। এ জন্য যে, তারা চায় নিজের জন্য একজন ইমাম বানাবে। কিভাবে পারে নিজের জন্য ইমাম নির্বাচন করতে যখন তখন একজন জ্ঞানী ইমাম আছেন যাঁর কোন মূর্খতা নেই, এমন এক অভিভাবক আছেন যিনি কখনও ধোকা দেন না। যিনি নবুওতের খনি তার বংশধারায় কোন কলুষ নাই এবং অন্য কেউ বংশ মর্যাদায় তাঁর সামনে পৌঁছাতে পারেনা। তার পরিবার কুরাইশ থেকে এবং বনি হাশীম বংশীয় রাসূল (সা.) এর ইবাদাত থেকে মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আবদে মানাফের প্রশাখা প্রবৃদ্ধিমান জ্ঞান সম্পন্ন পরিপূর্ণ সহিষ্ণু, ইমামতের কাজে শক্তিমান আর রাজনীতিতে পণ্ডিত, প্রধান কর্মকর্তা হওয়ার যোগ্য এবং আবশ্যিক আনুগত্যের পাত্র আল্লাহ্‌র নির্দেশ বাস্তবায়নকারী এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের শুভাকাঙ্ক্ষী।

নবীগণও ওয়াসীগণকে আল্লাহ্ তৌফিক দেন ও সাহায্য করেন এবং স্বীয় প্রজ্ঞার ভাণ্ডার থেকে তাঁদেরকে দান করেন যা অন্যদেরকে দেন না। তার জ্ঞান সে যুগের সকলের চেয়ে শ্রেয়। মহামহিম আল্লাহ্ বলেন, যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর হকদার। না যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না সে? তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেমন বিচার করে থাক? (সূরা ইউনুস ৩৫)। আর তালুতের কাহিনীতে আল্লাহ্ বলেন: নবী বলল: আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন (সূরা বাকারা : ২৫৭)। আর দাউদের কাহিনীতে বলেছেন: দাউদ জালুতকে সংহার করল। আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও হেকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা থেকে শিক্ষা দিলেন। (সূরা বাকারা: ২৫১)। আর তার নবীর জন্য বলেছেন: আর আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনি যা জানতে সক্ষম ছিলেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ (সূরা নিসা: ১১৩)। আর তাঁর নবীর আহলে বাইতের ইমামগণ ও তার ইতরাত ও বংশধরদের বলেছেন: তবে নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন সে জন্য মানুষরা কি তাদের প্রতি ঈর্ষা করে? আমি ইবরাহীমের বংশধরদেরকে তো কিতাব হিকমত প্রদান করিয়া ছিলাম এবং তাহাদিগকে বিশাল রাজত্ব দান করিয়াছিলাম। অতঃপর তাহাদের কর্তব্য উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট (সূরা নিসা: ৫৪-৫৫)। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ যখন তার কোন বান্দাকে বান্দাদের কার্য পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করেন তখন তার বক্ষকে একাজের জন্য প্রসারিত করিয়া দেন এবং প্রজ্ঞার প্রস্রবন সমূহকে তার অন্তরে সোপর্দ করেন। আর তার জিহ্বাকে বাগ্মী করে দেন যাতে এরপরে যে উত্তর প্রদানে ব্যর্থ না হয় এবং সঠিক ছাড়া না বলে। আর সব সময় সফলকাম, অপরাজেয় ও মদদপুষ্ট হয়। ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি থেকে নিরাপদ থাকে। আল্লাহ্ তাঁকে এ স্থানে স্বতন্ত্র দিয়েছেন যাতে তার সৃষ্টির উপরে হুজ্জাত হয় এবং তার বান্দাদের উপর হন সাক্ষী। তারা কি এরূপ ক্ষমতা রাখে যে, এরূপ ইসলামকে নির্বাচন করা এবং তাদের কর্তৃক নির্বাচিত যে সে এসব গুণের অধিকারী থাকবে? (তথ্য সূত্র: রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মূল: শেখ আবু মুহাম্মদ আল-হাসান ইবনে আলী ইবনিল হুসাই ইবনে সূরা আল হাররানি (রহঃ) অনুবাদ আব্দুল কুদ্দুস বাদশা, প্রকাশকালে: এপ্রিল, ২০১৪। আইএসবিএন 978-984-33-6700-6)

উল্লিখিত বর্ণনার আলোকে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়ত-রেসালতের ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্‌র মনোনীত ও নির্বাচিত ইমামগণ বিশেষ ক্ষমতা ও দয়িত্বপ্রাপ্ত যা আল্লাহ্‌তালার পক্ষ থেকে হেদায়েত প্রদানের সাথে সামঞ্জষ্যপূর্ণ। "সুফি পরিভাষায় যাদেরকে ওলী-মুর্শিদ বলা হয় প্রকৃত পক্ষে তারা স্বয়ং ইমাম অথবা ইমামের প্রতিনিধি। উমাইয়া আব্বাসীয়রা আলেমগণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্বাচিত এই ঐশী প্রশাসকদের অস্তিত্বই স্বীকার না করে নিজেরা বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং আমাদেরকেও বিভ্রান্ত করছেন।"

ইতিহাসের ছাত্ররা অবগত আছেন যে, রাসূল (সা.) ওফাতের পরে যারা রাজনেতিক খেলাফতের অধিকারী হয়েছিলেন তারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিয়োজিত কোন খলিফা ছিলেন না। বরং তারা বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় মুসলিমদের নেতা হয়েছেন। তাছাড়া রাসূলের (সা.) পর তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতবাদ চালু করা হয়। ঐশী খিলাফত বা ইমামত ও পার্থিব শাসন ক্ষমতা ঐকীভূত করার সর্বশেষ চেষ্টা হিসাবে হযরত ইমাম হোসেন (সা.) কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন। ফলে প্রকৃত ইসলামী শাসনের যে অবসান হয় তা থেকে মুসলিম উম্মাহ্‌ আজ পর্যন্ত ফিরে আসতে সক্ষম হয়নি। ফলে মুসলিম জাতি বর্তমানে অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। অথচ তাদের এই রোগ পার্থিব প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ঐশী নির্দেশের কার্যত অনুপস্থিতিই বিশ্বের মুসলমানদের এক মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেছে, তা তারা জানতে বুঝতে বা বিশ্বাস করতে পারছে না। আমরা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি যে, খিলাফত বা ইমামতের উত্তরাধিকার কুরআনের নির্দেশ ও রাসূল (সা.) এর ঘোষণা অনুযায়ী রাসূল (সা.) এর পবিত্র আহলে বাইতের মাসুমদের হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে। এই ক্ষমতা সরাসরি আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রাধীন। তাই আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি নির্দেশে তাদের অনেক এমন অনেক কথাই বলেন বা অনেক কাজ করে থাকেন যা আমাদের সীমাবদ্ধ শরীয়তের জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত। যার উদাহরণ আমরা সূরা কাহফের হযরত মুসা (আ.) ও খিজির (আ.) এর ঘটনায় দেখতে পাই (সূরা কাহাফ : ৬০-৮২)।

আল্লাহ্‌ নিয়োজিত এই সব খলিফা-ইমামগণ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী তথা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তাই তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজা, বাদশাহ্‌-সম্রাটকে কোন রকম তোয়াক্কা করেন না। বরং অনেক পার্থিব রাজা-মহারাজা এদের কাছে দোয়া প্রার্থী বা তাঁদের মুরীদ হয়ে সৎ জীবন-যাপন করে কিছুটা হলেও ইসলামী ভাবধারায় রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রখ্যাত ভারত বিজয়ী বীর শিহাব উদ্দিন ঘোরী খাজা মঈনুদ্দীনের (রহঃ) দোয়ায় ও দয়ায় ১১৯২ খ্রিস্টাব্দের দিল্লী-আজমীরের রাজার (পৃথ্বিরাজ) সাথে তরাইনের যুদ্ধ বিজয়ী হয়ে প্রকৃত পক্ষে ভারতে মুসলিম রাজত্বের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তার পূর্বসূরী সুলতান মাহমুদ গজনবী (৯১৭-১০৩০ খ্রিস্টাব্দে) হযরত খারকানী (রহঃ) এর আশীর্বাদে ১৭ বার ভারত আক্রমন করে বিজয়ীর বেশে দেশে ফিরে গেছেন। খাজা বাবার খলিফা কুতুবুদ্দিন (১১৭৩-১২৩৫) বখতিয়ার কাকীর (রহঃ) এর মুরীদ ছিলেন সুলতান শামস্‌ উদ্দিন ইলতুতমিস (যিনি) তার মুর্শিদের নাম চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে কুতুব মিনার নির্মাণ করেন। আবার অনেক রাজা-বাদশা এই সমস্ত আল্লাহ্‌ নিযুক্ত খলিফাদের অসন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে খোদায়ী গজবের শিকার হয়ে অকাল মৃত্যু বা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। "সুলতান উল হিন্দদে"র পদবী স্বয়ং রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত। খাজা মঈন উদ্দিন এর সাথে বে আদবী ও শত্রুতা করে পৃথ্বিরাজ রাজ্য ও প্রাণ উভয় হারান। হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ) এর সাথে বিরোধিতা ও বেআদবী করে গিয়াস উদ্দিন তুগলক (১৩২৫) অকালে প্রাণ হারান। অনুরূপভাবে সিলেটের হযরত শাহ জালাল ইয়ামিনীর (১২৭১-১৩৪৬ সাথে বেআদবী করার জন্য রাজা গৌর গোবিন্দ রাজত্ব ও প্রাণ উভয়ই হারান।

আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিয়োজিত খলিফা ইমামদের জন্য আরও কয়েকটি পদবী নির্ধারিত রয়েছে মর্মে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলো অলি-মুর্শেদ-হাদী, মুহসেন, সালেহীন ইত্যাদি। অলি শব্দটি আরবী অলা শব্দ থেকে আগত। যার অর্থ নৈকট্য লাভ, প্রেম, মুহাব্বত, ভালবাসা। 'ফাউয়াযেদুল ফেকাহ্‌' কিতাবে আল্লামা মুফতি সৈয়দ আমিনুল ইহসান (রহঃ) বলেন, অলি হলেন যিনি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য সব কিছু ভুলে গিয়ে তারই প্রেমে নিজের সব কিছু বিসর্জন দেয়ার মাধ্যমে স্থায়ী জীবনের মালিক হয়েছেন। আবার বলা হয়েছে বেলায়ত তথা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী হলেন অলি। আল্লাহ্‌তালার এই বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথা খলিফা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন: জেনে রাখ আল্লাহ্‌র বন্ধু (অলি) না ভীতি থাকবে আর না তারা দুঃখিত হবে। তারা সে সব মানুষ যারা বিশ্বাস করে আর পরহেযকারিতা অবলম্বন করে। তাদের জন্য ইহকালের জীবনে ও পরকালের সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণীসমূহের (প্রতিশ্রুতি-বিধান) কোন পরিবর্তন হয় না। এটাই তো মহা সাফল্য (সূরা ইউনুস : ৬২-৬৪)।

যারা আল্লাহ্‌র পথে আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের কখনও মৃত মনে করোনা, বরং তারা জীবিত ও তারা জীবিকা পেয়ে থাকে (সূরা আলে ইমরান ১৬৯)।

আমাদের তো আর মৃত্যু হইবে না, প্রথম মৃত্যুর পর আমাদের উপর শাস্তিও দেয়া হইবেনা। ইহাই তো মহা সাফল্য। এই রূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের সাধনা করা উচিত (সূরা সাফফাত : ৫৮-৬১)।

আল্লাহ্ যাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং যিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী (অলি বা মুর্শেদ) অভিভাবক পাইবেনা (সূরা কাহফ : ১৭)।

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহের মর্মানুযায়ী জানা যায় যে, আল্লাহ্র এইসব বান্দারা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেমন নবী-রাসূলদের আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করা হতো। যেহেতু তারা নবুওতী-রেসালতের কাজের উত্তরাধিকারী তাই এদেরকেও এ ধরণের অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। এদের সান্নিধ্য ছাড়া আল্লাহ্ মানুষকে হেদায়েত দান করেন না। দৃশ্যত তাঁরা মৃত্যুবরণ করলেও তাদেরকে মৃত বলা আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী নিষিদ্ধ। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্যই জনগণ রাসূল (সা.) এবং আল্লাহ্র অলিদের মাজারে যায়। তাই তাদের মাজারে দোয়া, বরকত, মাগফেরাত ও সাহায্যের জন্য যাওয়ার কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা শুধুমাত্র খোদায়ী জ্ঞানে অজ্ঞ মুর্খদের কাজ আর তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে তাদের সান্নিধ্যে যাওয়া থেকে বিরত রাখা শয়তানের কাজ। যেহেতু এঁরা হলেন আল্লাহ্র নিয়োজিত ব্যক্তি তাই তাদের সান্নিধ্যে যাওয়ার সাথে শির্ক বেদাতের কোন সম্পর্ক নাই। এই মহামানবদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) এরশাদ করেন : আল্লাহ্তালা বলেন- যে কেউ আমার কোন অলি তথা বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আমার কোন বান্দা আমার নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম পন্থা তার উপর অর্পিত ফরজ-ইবাদত। আর আমার কতিপয় বান্দা নফল তথা অতিরিক্ত ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, ফলে আমি (আল্লাহ্) তাকে ভালবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে, তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে প্রিয় বান্দা যদি আমার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে অবশ্যই আমি তাকে তা দান করি। সে যদি আশ্রয় চায় তবে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি। (তথ্যসূত্র : বোখারী শরিফ, হাদিস নং ৬৫০২, মিশকাত শরিফ, হাদিস নং ২৪৬৬)। মহান আল্লাহ্ ও তাঁর এই বিশেষ শ্রেণীর বান্দাদের সাথে সম্পর্ক বিশেষ স্পর্শকাতর তাই তা সাধারণভাবে প্রকাশ করা হয় না। তবে সাধারণ লোকদের এ বিষয়ে ধারণা দেওয়ার জন্য বিষয়টি প্রকাশও করেন এবং নিজের জীবন দিয়ে হলেও তার বাস্তব নমুনা উপস্থাপন করে তারা যে তাদের দাবি শতভাগ সত্যি তার প্রমাণ দিয়ে থাকেন। যেমন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ), হযরত মনসুর হাল্লাজ (রঃ), হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) ও খাজা মঈনুদ্দীন (চিশ্তী (রা.) বিভিন্নভাবে তা প্রকাশ, প্রচার ও প্রমাণ করেছেন।

একাদশ অধ্যায়

হযরত ইমাম আলী বিন আবিতালিব (আ.) (৬০০-৬৬১ খ্রিঃ)

জন্ম : হযরত আব্বাস ইবনে মুত্তালিব বলেন, আমি অন্যান্যদের সাথে কাবা শরীফের সম্মুখে বসেছিলাম। হযরত আলী (আ.) এর মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ কাবা গৃহের নিকটবর্তী হলেন, তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বলেন : হে আল্লাহ্, আমি তোমাকে, তোমার নবীগণ ও তাদের গ্রন্থসমূহের উপর বিশ্বাস করি। আরো বিশ্বাস রাখি আমার পিতাসহ ইব্রাহীমের (আ.) কথার উপর, যেমন বিশ্বাস করি যে, তিনি তোমার আদেশে এ গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। তোমাকে ইব্রাহীমের (আ.) কসম, আর কসম আমার গর্ভে বিদ্যামান এই শিশুর, তাকে প্রসব করা আমার জন্য সহজ কর। এ সময় আমরা আশ্চর্য হয়ে স্বচক্ষে দেখলাম যে, কাবাগৃহের প্রাচীরের একাংশ বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং ফাতিমা বিনতে আসাদ সেই বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া কাবা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর সেই প্রাচীর পূর্বের জায়গায় ফিরে গেল। আমরা অনতিবিলম্বে গৃহদ্বার খোলার জন্য উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু দ্বার খুললো না। আমরা অনুধাবন করলাম যে, এ ব্যাপারে আল্লাহ্র কোন হিকমত রয়েছে। তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বাহু যুগলে এক শিশু জড়িয়ে কাবাগৃহ থেকে বাইরে এলেন এবং বললেন গায়েব থেকে এ সংবাদ শ্রবন করলাম যে, এ শিশুর নাম রাখবে আলী। এ ঘটনাটি ঘটে ১৩ রজব, ৩০ শে আমূল ফিল শুক্রবার (হিজরতের ২৩ বছর পূর্বে) ৬০০ খৃস্টাব্দ।

শৈশবে তিনি নবী (সা.) এর আশ্রয়ে থাকতেন, স্বয়ং আলী (আ.) তাঁর শৈশবের দিনগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, শৈশবে নবী (সা.) আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বুঁকের সাথে আঁকড়ে ধরতেন। খাবার চিবিয়ে আমার মুখে দিতেন এবং স্বীয় সুগন্ধিতে আমাকে সুগন্ধিময় করতেন। তিনি আমার কথায় মিথ্যা, কর্মে ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা কখনো দেখতে পাননি। হযরত আলী (সা.) আরো বলেন যে আমি নবী (সা.) কে সেরূপ অনুসরণ করতাম যেমন করে কোন দুগ্ধপোষ্য শিশু তার মাকে অনুসরণ করে। তিনি সর্বদা আমাকে আদেশ করতেন আর আমি তাঁর সকল কর্মের পদাংক অনুসরণ করতাম। প্রতি বছর তিনি হেরা পর্বতে যেতেন এবং তখন আমি ব্যতীত তাঁকে আর কেউ দেখতে পেতো না....যখন ইসলাম কোন গৃহে প্রবেশ করেনি এবং কেবল মাত্র নবী (সা.) ও তাঁর পত্নী হযরত খাদিজা (রা.) মুসলমান ছিলেন আর আর আমি তৃতীয় মুসলমান ছিলাম। মহানবী (সা.) তাঁর নবুওত লাভের পর, তিন বছর পর্যন্ত কোন আদেশ প্রাপ্ত হননি যে, প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করবেন। তখন হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র ইমান এনেছিলেন এবং আলী (আ.) পুরুষদের মধ্যে প্রথম। এমতাবস্থায় যখন এ আয়াত নাযিল হলো যে, অর্থাৎ আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন, তখন

আলী (আ.) মহানবীর আদেশে তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে ৪০ জনকে নিমন্ত্রণ করলেন, এদের মধ্যে আবু লাহাব এবং হামজা (রা.) এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।
একজনের পরিমানেও যথেষ্ট নয় এ পরিমানের খাবার তৈরী করা হলো। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে সকলে পরিতৃপ্ত হলেন। অথচ ঐ খাবারের কোন ঘাটতি হলো না। যেহেতু নবী (আ.) চেয়েছিলেন তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করবেন, আবু লাহাব বলল, মোহাম্মদ তোমাদেরকে যাদু করেছে আর তার এ বক্তব্যের ফলেই উপস্থিত সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল অনুষ্ঠান ব্যর্থ হয়ে গেল। মহানবী (সা.) অন্য একদিন সকলকে নিমন্ত্রণ এবং ভোজন শেষে বক্তব্য শুরু করলেন, "ওহে আবদুল মোত্তালিবের সন্তানগণ। আরব যুবকদের মধ্যে এমন কাউকে আমি চিনি না যে, তোমাদের জন্য আমি যা এনেছি তার চেয়ে উত্তম কোন কিছু তোমাদের জন্য এনেছে। আমি ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের সুসংবাদ এনেছি। আমি মহান আল্লাহ্‌র দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। অতএব তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমাকে সাহায্য করবে, সে আমার ভাই, ওয়াসী ও উত্তরাধিকারী হবে? মহানবী (সা.) এই প্রশ্নটি তিনবার পুনরুক্তি করলেন এবং প্রতিবারই আলী (আ.) উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং স্বীয় প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেছিলেন। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন এই হল আমার ভাই, ওয়াসী ও উত্তরাধিকারী তার কথা তোমরা শ্রবণ করবে ও তার আদেশ পালন করবে।
(সূত্র : তারিখে তারাবি খ:৩, পৃ-১১৭১-৭৪, মাজমায়ুল বাহরাইন খ:৭, পৃ-২০৬)।
তাই রাসূল (সা.) এর উত্তরাধিকারী সম্পর্কে যে বিতর্ক তা একেবারেই অমূলক ও ভিত্তিহীন। এ পর্যায়ে আমরা ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, পবিত্র কুরআন, হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ হযরত আলী (আ.) এর বক্তব্য থেকে জানার চেষ্টা করবো। রাসূল (সা.) উত্তরাধিকার ও খেলাফত সম্পর্কে "সাবধান" আল্লাহ্‌র কসম আবু কোহাফার পুত্র আবু বকর (রা.) নিজেকে এটা দ্বারা (খিলাফত) ভূষিত করেছিলেন এবং তিনি নিশ্চিতরূপে জানতেন যে, এটার সঙ্গে আমার অবস্থার চাক্কির মধ্যবর্তী পেরেক থেকে যা তার অবস্থানের ন্যায়। আমি খিলাফতের বিপরীতে একটা পর্দা রেখে দিয়েছি এবং আমাকে এটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তারপর আমি ভাবতে লাগলাম যে, আমি প্রচণ্ড আক্রমণ করব নাকি দুর্দশার চোখের অন্ধকার নীরবে সহ্য করব যার মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি দুর্বল হয়ে যায় আর যুবক হয়ে যায় বৃদ্ধ আর সত্যিকার বিশ্বাসী চাপের মুখে কাজ করে যায় যে, পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করে (তার মৃত্যুর পর) আমি দেখেছিলাম যে সহ্য করে যাওয়াই অধিকতর বিচক্ষণতা। অতএব আমি ধৈর্য্য অবলম্বন করলাম যদিও চোখে খোঁচা মারা যন্ত্রণা হচ্ছিল আর গলায় শ্বাসরোধ হচ্ছিল (অপমানের কারণে) আমি আমার উত্তরাধিকার লুণ্ঠিত হওয়া প্রত্যক্ষ করছিলাম যে পর্যন্ত না প্রথমজন তার পরে প্রস্থান করেছিলেন কিন্তু তারপর খিলাফত হস্তান্তর করেছিলেন ইবনে খাওাব (রা.) এর নিকট।"
সূত্র : নাহজুল বালাগা, মূল মাওলা হযরত আলী (আ.) বাংলা অনুবাদ বজলুর রহমান জুল কারনাইন ওরফে জালাল উদ্দিন ওয়ায়সী প্রথম প্রকাশ কাল ১লা জিলহজ্ব ১৪২৩, পৃ-২৬)।
আবু লুলু কর্তৃক হযরত উমর (রা.) যখন আহত হন তখন তিনি পরবর্তী খলিফা নিয়োগের জন্য নির্বাচনী কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সদস্য ছিলেন- আলি বিন আবু তালিব, উসমান বিন আফফান, আব্দুর রহমান বিন আউফ, জুবাইর বিন আওয়াম, সাদ বিন আবিওয়াক্কাছ এবং তালহা বিন উবায়দুল্লাহ' (রা.)। ওমর (রা.) অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে তার গোলাম সুহাইব নামাযের ইমামতিসহ খলিফার দায়িত্ব পালন করেন। এই বিশেষ মর্যাদার জন্য তাকে সার্চ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। অথচ বলা হয়ে থাকে রাসূল (সা.) এর অনুপস্থিত জনিত কারণে আবু বকর (রা.) মুসলমানদের নামাযে ইমামতি করেছিলেন বিধায় তিনি রাসুলের উত্তরাধিকারী হিসাবে বিবেচনা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যা হোক তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তিন দিনের মধ্যে নির্বাচন কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং তা না হলে অথবা কেহ দ্বিমত পোষণ করলে তাকে হত্যা করা হবে মর্মে বলা হয়। এই নির্বাচনী কমিটি সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) এর মূল্যায়ন, সাদ কঠোর প্রকৃতির এবং মাথা গরমলোক, আব্দুর রহমান হলো জাতির ফেরাউন, জুবাইর, যদি খুশী থাকে তবে একজন প্রকৃত বিশ্বাসী কিন্তু যদি অসন্তুষ্ট হয় তবে এক অবিশ্বাসী, তালহা হলো অহংকার এবং উদ্ধত্যের প্রতিমূর্তি তাকে যদি খলিফা করা হয় তবে সে খেলাফতের আংটি তার স্ত্রীর হাতে পরিয়ে দেবে, আর উছমান তার সগোত্রীয় লোকদের বাইরে কিছু দেখবে না। আলীর ব্যাপারে সে খিলাফতের প্রতি অনুরক্ত যদিও আমি জানি যে কেবলমাত্র সেই এটাকে সঠিক পথে চালাতে পারে।
হযরত আলী সম্পর্কে এ ধারণা থাকা সত্ত্বেও তিনি এসব অযোগ্য লোকদের নিয়ে নির্বাচনী কমিটি গঠন করেছিলেন এবং আলী যেন খলিফা না হতে পারেন সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিলেন।
এ ব্যাপারে হযরত আলী (আ.) ইবনে আব্বাসের নিকট বলেছিলেন "খিলাফত আমাদের দিক থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে (কারণ) উসমানকে ও আমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে অধিকাংশকে সমর্থন করতে

হবে। কিন্তু যদি দুইজন একজনকে এবং দুইজন অন্য জনকে, তাহলে সমর্থন ঐ দলকে দিতে হবে যেটার মধ্যে আব্দুর রহমান বিন আউফ আছে, এখন সাদ তার জ্ঞাতি ভাই আব্দুর রহমানকে সমর্থন করবে, যে বাস্তবিক উসমানের বোনের স্বামী।

হযরত উমর (রা.) এর খলিফা নির্বাচনের নির্দেশে আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে সর্বসময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। যখন প্রার্থী হিসাবে হযরত আলী ও হযরত উসমানের (রা.) মধ্যে সীমিত হয়ে গেছিল। তখন আব্দুর রহমান বিন আউফ হযরত আলী (আ.) কে বলেন যে, আমি আপনার প্রতি আমার আনুগত্য দিচ্ছি এই শর্তে যে, আপনি আল্ল-াহ্‌র কুরআন, রাসূলের সুন্নাত এবং দুই সর্দার আবু বকর ও উমররের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি অনুসরণ করবেন।" হযরত আলী (আ.) উত্তর করলেন, বরং আল্লাহ্‌র কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং আমার তদন্তের পর প্রাপ্ত তথ্য অনুসরণের শর্তে, "আব্দুর রহমান বিন আউফ পর পর তিনবার প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করার পর যখন একই জবাব পেলেন তখন তিনি উসমানের দিকে ফিরে বলেন, "তুমি কি এই শর্তগুলি গ্রহণ করছ? উসমান (রা.) এই অভিনব শর্ত গ্রহণপূর্বক খলিফা হলেন। যেহেতু তৃতীয় শর্তটি একটি শরীয়ত বিরোধী শর্ত ছিল তাই হযরত আলী উভয়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন আল্লাহ্ যেন তোমাদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করে দেন," আল্লাহ্ তাঁর নিয়োজিত খলিফা তথা ইমামের প্রার্থনা কবুল করেন এবং তারা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হন এবং আব্দুর রহমান মৃত্যু পর্যন্ত কখনো উসমানের সাথে কথা বলেন নি। এমন কি মৃত্যু শয্যায় ওসমান (রা.) তাকে দেখতে গেলেও আব্দুর রহমান তার মুখ ফিরিয়ে নেন।

হযরত 'ওসমান (রা.) এর শাহাদতের পর হযরত আলী মসজিদে নববীতে গণ ভোটের মাধ্যমে খলিফা নির্বাচিত হন। মুহাজির ও আনসারদের সবাই হযরত আলী (আ.) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করে। হযরত আলী, ওসমান (রা.) কর্তৃক নিয়োজিত দুর্নীতিবাজ প্রাদেশিক শাসনকর্তা তথা গভর্নরদেরকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর নিয়োজিত গভর্নরদের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। অন্যান্য গভর্নরগণ তাদের দায়িত্ব নব নিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তাদের নিকট হস্তান্তর করেন। কিন্তু ইসলামের দুশমন আবু সুফিয়ানের পুত্র মুয়াবিয়া ওসমানের সময় সবচেয়ে ক্ষমতাসীন শাসনকর্তা, সে হযরত আলীর খিলাফত অস্বীকার করে কেন্দ্রিয় সরকারে বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মুয়াবিয়া সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে দাবী করতে থাকে যে, হযরত আলী হযরত ওসমানের শাহাদাতের জন্য দায়ী। তাই এর উপযুক্ত বিচার করতে হবে অন্যথায় ওসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের মুয়াবিয়ার হাতে তুলে দিতে হবে এবং এই ইস্যুতে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। ওসমানের আমলে নিয়োজিত সকল দুর্নীতিবাজ-কমকর্তা ও তাদের ছত্র ছায়ায় সৃষ্টি এলিট শ্রেণী, সামরিক কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ মুয়াবিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে আলী (আ.) বিরোধী শিবিরে যোগদান করেন।

এদের মধ্যে অনেক সাহাবীই সামিল ছিলেন। কিন্তু যেহেতু মুয়াবিয়ার সাথে হযরত আলী (আ.) সাথে সংঘটিত সিফফিনের যুদ্ধে ও পরবর্তীতে সালিসকারকদের বিভ্রান্ত প্রতারণা (ধোকাবাজিতে হযরত আলী কার্যত প্রতারিত হন এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মুয়াবিয়া জয়ী হন এবং উমাইয়া বংশ ৬৬১ খৃস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিল)। তাই উমাইয়াদের চামচা আলেম ও ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাসে মুয়াবিয়ার ঐসব ধর্মহীনতা, যুক্তিহীনতা, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে অগ্রহণযোগ্য দাবী সম্পর্কে হযরত আলী (আ.) এর কি বক্তব্য ছিল তা জানা যায় না। তাই বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য মুয়াবিয়ার নিকট এ ব্যাপারে লিখিত হযরত আলীর নির্বাচিত কিছু বক্তব্য পত্র আমরা উল্লেখ করব।

আল্লাহ্‌র কসম, মুয়াবিয়া আমার চেয়ে অধিক চালাক নয় কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং নীতি বিগর্হিত কাজ করে। যদি আমি প্রতারণা করাকে ঘৃণা না করতাম তবে অবশ্যই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে চতুর হতাম। কিন্তু প্রবঞ্চনাই সত্য পথ থেকে বিচ্যুতি এবং প্রত্যেক সত্য পথ থেকে বিচ্যুতিই কুফরি (আল্লাহ্‌কে অস্বীকৃতি) এবং প্রত্যেক প্রবঞ্চকের একটি চিহ্ন থাকবে যার দ্বারা সে কিয়ামতের দিন পরিচিত হবে। আল্লাহ্‌র কসম আমি প্রতারণা দ্বারা গাফেলদের অন্তর্গত হতে পারিনা অথবা বিপদাপদ দ্বারা বশীভূত হতে পারিনা।"

মুয়াবিয়ার কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা রাগীব ইসফাহানী লিখেছেন : সব সময় তার (মুয়াবিয়ার) উদ্দেশ্য ছিল তার বৈধ বা অবৈধ যে কোন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা, সে ধর্মের কোন তোয়াক্কা করত না আর না সে কখনো আল্ল-াহ্‌র শাস্তির ব্যাপারে মাথা ঘামাত। এভাবে সে তার ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে সত্য বিকৃতি ও কল্পকাহিনী তৈরীর আশ্রয় গ্রহণ করত, সকল রকম শঠতা ও কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করত। যখন সে দেখল আমীরুল মুমিনীন (আ.) কে যুদ্ধে জড়াতে না পারলে তার কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সে তালহা এবং জোবাইরকে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করল। যখন এই উপায়ে ও সফলকাম হওয়া গেলনা জঙ্গে জামালে তাদের পরাজয়ের মাধ্যমে সে সিরিয়াবাসীকে উত্তেজিত করল এবং সিফফিনের গৃহযুদ্ধ সংঘটিত করল। আর যখন তার বিদ্রোহী অবস্থান হযরত আম্মার (রা.) কে হত্যা করার ফলে জানা গেল, (রাসূল (সা.) এর হাদিস আম্মারকে বিদ্রোহীরা (ধর্মোদ্রোহী) হত্যা করবে।" সে রাসূল (সা.) হাদিসের অপব্যাখ্যা করে জনগণকে এই বলে প্রতারণা

করল যে হযরত আম্মারের মৃত্যুর জন্য আলী (আ.) ই দায়ী। যেহেতু তিনি আম্মারকে (রা.) যুদ্ধে এনেছিলেন। অন্যদিকে রাসূল (সা.) কর্তৃক উল্লেখিত "বিদ্রোহী" শব্দের অপব্যাখ্যা সে এইভাবে করেছিল যে শব্দটির অর্থ হবে "প্রতিশোধ গ্রহণ কারী" ছিল এই কথা প্রমাণের অভিপ্রায় যে, যে আম্মারকে ঐ দলের লোকেরা হত্যা করবে যারা উসমানদের (রা.) রক্তের বদলা নিতে চাইবে, যদিও এই হাদিসের বাকী অংশটুকু ছিল এই যে, "সে (আম্মার) তাদেরকে বেহেস্তের দিকে আহবান করবে আর তারা তাকে দোজখের দিকে আহবান করবে।" যার মধ্যে ভিন্ন কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নাই। যখন এইসব চাতুরীপূর্ণ উপায়েও বিজয়ের কোন আশাই ছিলনা সে বর্শার আগায় কুরআন ঝুলানোর মত শয়তানীর আশ্রয় নিয়েছিল, যদিও তার দৃষ্টিতে কুরআনের বা তাঁর কোন ঐশী আদেশের সামান্যতম গুরুত্ব বহন করে নাই। যদি কুরআনের দ্বারা তার সে রকম কোন ফয়সালার উদ্দেশ্য থাকত তা হলে যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বেই তার এই দাবী উত্থাপন করা উচিত ছিল। আর যখন এটা তার জানা হয়ে গিয়েছিল যে সিদ্ধান্তটি লাভ করা হয়েছে আমর বিন আছ কর্তৃক আবু মুছা আশআরীকে (রা.) (হযরত আলীর পক্ষের শালিস কারক) প্রতারণার মাধ্যমে এবং কুরআনের সঙ্গে এই প্রতারণার সামান্যতম সম্পর্ক নাই, তখন তার এটা গ্রহণ না করা উচিত ছিল এবং আমর বিন আছকে এই শঠতার শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অন্যদিকে আমর বিন আসকে তার শঠতা, প্রতারণা, মিথ্যা, ওয়াদা ভঙ্গ ও প্রবঞ্চনার পুরস্কার স্বরূপ মিশরের গভর্ণর বানানো হয়েছিল।

আবু সুফিয়ানের পুত্র মুয়াবিয়ার নিকট লিখিত আলী ইবনে আবু তালিবের পত্র

যারা আবু বকর, উমর এবং উসমানের নিকট শপথ গ্রহণ করেছিল সেই একই ভিত্তিতে তারা সকলে আমার নিকটও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছে। যারা উপস্থিত ছিল তাদের কোন বিকল্প নাই আর যে অনুপস্থিত ছিল তার এটা প্রত্যাখ্যান করার কোন অধিকার নাই এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সীমাবদ্ধ। যদি তারা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে একমত হয় এবং তাকে খলিফা হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে সেটাকেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আছে বলে মনে করা হবে। যদি কোন ব্যক্তি এই ব্যাপারে প্রতিবাদী হিসাবে বা নতুন প্রথা (বিদ্‌আত) হিসাবে বাইরে থাকে তবে তারা তাকে সেখানে ফিরিয়ে আনবে যেখান থেকে সে বাইরে চলে গেছে। যদি সে অস্বীকার করে তবে মুমিনগণের থেকে আলাদা পথ অনুসরণের জন্য তারা তার সাথে যুদ্ধ করবে আর আল্লাহ্‌ তাকে ফিরিয়ে আনবেন। যেখান থেকে সে পলায়ন করেছিল। আমার জীবনের শপথ, হে মুয়াবিয়া, যদি তুমি তোমার জানা অনুসারে চিন্তা কর কোন রকম মানসিক উত্তেজনার বশবর্তী না হয়ে তুমি আমাকে উসমানের রক্তের ব্যাপারে সবচেয়ে নির্দোষ পাবে। আর তুমি জানতে পারবে যে আমি তার নিকট থেকে দুরে ছিলাম অবশ্যই তুমি যদি ছাপিয়ে (গোপন না কর) না রাখ যা তোমার নিকট সম্পর্ণ উন্মুক্ত।

আমি তোমার নিকট থেকে এক মোড়ক অসংলগ্ন উপদেশ এবং সুসজ্জিত পত্র পেয়েছি। তুমি এটা লিখেছ তোমার পথভ্রষ্টতার কারণে এবং এটা পাঠিয়েছ তোমার জ্ঞানের অভাবের জন্য। এটা এমন মানুষের চিঠি যার না আছে পথ দেখার মত আলো (সে যে প্রকৃত পক্ষে কুরআনের অনুসারী ছিলনা তার প্রতি ইঙ্গিত) আর না আছে তাকে সত্য পথে পরিচালনা করার মত নেতা। (রাসূল (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আলী (আ.) কে মান্য করার মুয়াবিয়ার জন্য ফরজ ছিল)। মানসিক উত্তেজনা তাকে উত্তেজিত করেছে। আর সে তাতে সাড়া দিয়েছে। বিপথগামিতা তাকে পরিচালিত করেছে এবং সে উহা অনুসরণ করেছে। ফলে সে প্রলাপ বকা শুরু করেছিল এবং পরিনাম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে সে বিপদগামী হয়েছে।

(এটা সর্বজনবিদিত যে) বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) একবারই হয়। এটা পুনর্বিবেচনার জন্য উন্মুক্ত থাকে না, আর নির্বাচনের নতুন কার্যধারার কোন অবকাশও থাকেনা। সে এটার বাইরে থাকে , তাকে ইসলামের সমালোচক বলে ধরা হয়, যেহেতু সে এতে সন্দেহ পোষণ করে সে একজন মুনাফিক (মুয়াবিয়া)।

উসমানের হত্যাকারীদেরকে তোমার হস্তের সমর্পণের ব্যাপারে আমি বিষয়টি ভেবে দেখেছি এবং তাদেরকে তোমার হাতে বা অন্য কারো হাতে তুলে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব বলে মনে করিনা। আমার জীবনের শপথ, যদি তুমি তোমার ভ্রান্ত পথ এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ পরিত্যাগ না কর তুমি নিশ্চয় তাদেরকে চিনবে। তারা শীঘ্রই তোমাকে খুঁজবে এবং তাদেরকে খুঁজতে জমীনে, সমুদ্রে, পর্বতে এবং সমভূমিতে তোমাকে কোন কষ্টই স্বীকার করতে দিবে না। কিন্তু এই অনুসন্ধান হবে তোমার জন্য খুবই অপ্রীতিকর এবং তাদের পরিদর্শন তোমাকে আনন্দ দিবেনা। তাদের জন্য শান্তি হোক যারা এর যোগ্য।

মুয়াবিয়ার প্রধান উপদেষ্টা আমর ইবনুল আস

সিফফিনের যুদ্ধের পরাজয় রোধ করার জন্য বর্শার আগায় কুরআন বিদ্ধ করার পরামর্শ যে দিয়েছিল সেই আমর ইবনুল আস এর প্রতি আমিরুল মোমেনীন (রা.) এর পত্র।

তুমি তোমার ধর্মকে দুনিয়ার অনুগত বানিয়ে দিয়েছ প্রকাশ্যে ভাবে এমন লোকের (মুয়াবিয়া) নিকট যার বিপথগামীতার বিষয় গোপন নাই এবং তার পর্দা উন্মোচিত। সে এমন একজন সম্মানীত লোককে অপমাণিত করেছে তার পরামর্শকারীদের দ্বারা এবং ধৈর্য্যশীল লোককে বেকুফ বানিয়েছে তার স্তাবককারীদের দ্বারা। তুমি তার পদাংক অনুসরণ করছ আর তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছ একটি কুকুরের মত যে একটা সিংহের অনুসরণ করে তার খাবার দিকে তাকিয়ে এবং তার শিকারের যেটুকু উচ্ছিষ্ট পড়ে যায় সেটুকুর অপেক্ষায়। এভাবে তুমি তোমার আখেরাতের সাথে দুনিয়াকেও ধ্বংস করেছ পরন্তু যদি তুমি সত্যকে ধরে থাকতে তাহলে যেটা অন্বেষণ করছ তা লাভ করতে পারতে। আল্লাহ্ যদি আমাকে ক্ষমতা দেন তোমার উপর এবং আবু সুফিয়ানের পুত্রের উপর আমি তোমাদের উভয়কে তার প্রতিফল প্রদান করব। যা তোমরা উভয়ে পূর্বে করেছ। আর যদি তোমরা আমার হাত থেকে উদ্ধার পাও এবং বেঁচে থাকো তবে তোমাদের সম্মুখে যা আছে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মাত্র। ওয়াস সালাম। হযরত আলী (আ.) এ সমস্ত পত্রের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, সাহাবাদের মধ্যে অনেকেই সত্যনিষ্ঠ ছিলেন না।

রাসূল (সা.) এর উত্তরাধিকারী হিসাবে হযরত আলী (আ.) ছিলেন ইসলাম ধর্ম কুরআন, হাদিস, ধর্মের ইতিহাস, খোদাতত্ত্ব তথা সুফি তত্ত্ব অর্থাৎ একই সাথে শরীয়ত, তরীকত, হাকিকত ও মারফাত সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানী, তাই তিনি (আ.) বলেছিলেন, "হে লোক সকল আমি তোমাদের সম্মুখ থেকে হারিয়ে যাওয়ার পূর্বেই আমাকে জিজ্ঞাসা কর। কারণ আমি পৃথিবী সম্পর্কিত বিষয়ের চেয়ে আসমানের বিষয়াদির ব্যাপারে বেশী অবগত আছি।" তাই আমরা ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁর, মতামত বক্তব্য/মন্তব্য/ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। আকাশ, পৃথিবী, আদম, সৃষ্টি ও রেসালত, নবুওতের উত্তরাধীকার সম্পর্কে হযরত আলী (আ.)-এর অভিমত।

যা কিছু প্রশংসা সবই আল্লাহ্র জন্য। যার প্রশংসা সমস্ত বক্তারা ও শেষ করতে পারেনা যার অসংখ্য দান সমূহ বর্ণনা করার মধ্যে সমস্ত হিসাব যন্ত্রেরও নাই এবং যার আনুগত্যের দাবী পূরণ করা কোন প্রচেষ্টকারীর প্রচেষ্টাই সম্ভব করতে পারে না। যাঁকে বুদ্ধিবৃত্তির উচ্চ সাহসিকতা যথাযথ তারিফ করতে পারে না তাঁকে কোন গভীরতায় পৌছাতে সক্ষম হয় না, কোন তীক্ষ্মবুদ্ধির ডুবুরী ও যার নাগাল পায় না, তিনি এমন সত্ত্বা যার বিবরণ কোন সীমারেখা দ্বারা সীমায়িত নয়, কোন উচ্চ প্রশংসাই যার জন্য উচ্চ নয়, কোন সময় সীমা যার জন্য নির্ধারণ করা নাই। যার স্থায়িত্বের সীমাও নির্ধারিত নাই। তিনি বিশ্ব জগত সৃষ্টি করেছেন। তার নিজ কুদরতের (শক্তির) দ্বারা। তিনি বাতাসকে প্রবাহিত করেছেন তাঁর রহমতের (করুণার) দ্বারা, কম্পমান পৃথিবীকে তিনি বড় বড় পর্বত দ্বারা স্থিরতা দান করেছেন। তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাই সর্বোত্তম ধর্ম। (ইমান-ইবাদত, সুফিবাদ ধর্মের শুরু এখান থেকে) ও অন্তর দ্বারা সত্যতা প্রতিপাদন করাই হলো তার সম্পর্কে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা, অন্তর দ্বারা তার সত্যতা প্রতিপাদনের পরিপূর্ণতা হলো তার একত্বে বিশ্বাস, তার একত্বে বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা হলো তার প্রতি কোন বিশেষণ আরোপ না করা, কারণ প্রত্যেক আরোপিত বিশেষনই প্রমান করে যে, সেটার যার প্রতি আরোপিত হয় তার থেকে পৃথক এবং প্রত্যেক জিনিস যাতে কোন কিছু আরোপ করা হয় উক্ত জিনিস ঐ আরোপিত বস্তু থেকে পৃথক। সে মতে যে কেউ আল্লাহ্র প্রতি কোন বিশেষণ যোগ করে সে কেবল সাদৃশ্যকে চিনতে পারে, সে তাঁকে দুই হিসাবে বিবেচনা করে এবং যে তাঁকে দুই হিসাবে বিবেচনা করে তাঁর অংশ সমূহ আছে বলে স্বীকার করে এবং যে তাঁর অংশ সমূহ স্বীকার করে সে তাঁকে বুঝতে ভুল করে এবং যে তাকে ভুল বুঝে তার দিকে ইঙ্গিত করে মাত্র এবং যে তার দিকে ঈশারা করে তার সীমাবদ্ধতা মেনে নেয় এবং যে তাঁর সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে সে তাঁর সংখ্যা নির্ণয় করে। যে কেউ বলে যে তিনি কিসের মধ্যে আছেন তাহলে সে তাকে কোন কিছুতে অন্তর্ভুক্ত বলে ধারণা করে এবং যে কেউ বলে যে তিনি কিসের উপরে আছেন সে ধরে নেয় যে তিনি অন্য কিছুর উপর নাই। তিনি এক সত্তা কিন্তু কোন দৃশ্যমান বিষয়ের মাধ্যমে আগত সত্তা নয়। তাঁর অস্তিত্ব আছে তবে অনস্তিত্ব থেকে নন। তিনি সব কিছুর সাথে আছেন, তবে শারীরিক নৈকট্য দ্বারা নন। তিনি সবকিছু থেকে পৃথক কিন্তু শারীরিক বিচ্ছিন্নতা দ্বারা নন। তিনি কার্য সম্পাদন করেন কিন্তু নড়াচড়া বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে নয়। যখন তার সৃষ্ট বস্তুর কোন কিছু তাকাবার মত না থাকে তখনও তিনি দেখেন, তিনি কেবলমাত্র একজন এরূপে যে, এমন কেউ নাই যার সাথে তিনি সঙ্গ করতে পারেন অথবা যার অনুপস্থিতির অভাব তিনি বোধ করতে পারেন। তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টির সূত্রপাত করেন এবং তা আদি থেকে শুরু করেছেন। কোন চিন্তার কষ্ট সহ্য না করে, কোন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে কোন গতি সঞ্চার না করে এবং মনের কোন আকাংখা অনুভব না করে। তিনি সমস্ত জিনিসের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাদের জাতীয় চরিত্রের ব্যতিক্রমে সামঞ্জস্য করে দিয়েছেন। তাদের নির্ধারণ দান করেছেন, তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদেরকে তিনি তাদের অবয়ব নির্ধারণ করেছেন, তাদের সীমাবদ্ধতা ও স্বকীয়তা সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করে এবং তাদের প্রবৃত্তি সমূহ এবং জটিলতা সমূহ যথোচিতভাবে মূলায়ন করে। যখন সর্বশক্তিমান আবহাওয়া মন্ডলের রন্ধ্র

সমূহ সৃষ্টি করলেন এবং আকাশের বিস্তৃতি ও বাতাসের স্তর সমূহ তিনি এর মধ্যে পানি প্রবাহিত করলেন। যার ঢেউ ছিল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এবং যার তরংগ সমূহ একটার উপর আর একটা লাফিয়ে পড়েছিল। তিনি এটাকে বেগবান বাতাসের উপর এবং ধংসকারী ঘূর্ণিবায়ুর উপর বোঝাই করলেন, তাদেরকে আদেশ করলেন পুনরায় ফেলে দিতে (বৃষ্টি রুপে) বৃষ্টির বেগের উপর বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ দান করলেন। বাতাস এর নীচে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল যখন পানি এর উপর দিয়ে ভয়ংকর ভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। তারপর সর্বশক্তিমান বাতাসকে বাইরে সৃষ্টি করলেন, তার গতিকে নিস্ফল করলেন, তার অবস্থানকে স্থায়ী করলেন, তার চলনকে তীব্রতর করলেন এবং তাকে চতুর্দিকে বিস্তৃত করলেন। তারপর তিনি বাতাসকে আদেশ করলেন গভীর পানি উত্তোলন করতে এবং সমুদ্রের ঢেউকে তীব্রতর করতে। অতএব বাতাস দধির মন্থনের মত তাকে মন্থন করল এবং ভয়ংকরভাবে এটাকে আকাশের দিকে ধাক্কা মারল। তার সামনের অবস্থাকে পিছনে নিল আর স্থির অংশকে চলমান অংশে নিক্ষেপ করল যাতে তার উচ্চতা বৃদ্ধি পেল আর বহির ভাগ ফেনায় পরিপূর্ণ হল। তৎপর সর্বশক্তিমান ঐ ফেনাকে খোলা বাতাসে এবং বিস্তৃর্ণ আকাশে উত্তোলন করলেন আর তা থেকে সাত আসমান সৃষ্টি করলেন এবং নীচের দিকে নিশ্চল ঢেউএর ন্যায় আর উপরের দিকে আশ্রয় পদ ছাদ করলেন এবং একটি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করলেন এটাকে ধারণ করার কোন খুঁটি ছাড়াই আর একে একত্র রাখার কোন পেরেক ছাড়াই। অতঃপর তিনি এদেরকে তারকা দ্বারা এবং উল্কাপিন্ডের আলো দ্বারা শোভিত করলেন এবং দীপ্তিময় সূর্য ও জমকালো চন্দ্র ঝুলিয়ে দিলেন আবর্তনশীল নভোমন্ডলের চলমান ছাদ চক্রাকারে ঘূর্ণনশীল আকাশের নীচে। তারপর তিনি উচ্চ আকাশসমূহের মধ্যের রন্ধ্রসমূহ সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর সকল শ্রেণীর ফেরেস্তা দ্বারা সেসব পূর্ণ করলেন। তাদের কতক সেজদারত আছে, তারা জানু পেতে বসেনা। অন্যরা জানু পেতে বসা অবস্থায় আছে, তারা দাঁড়ায় না, তাদের কতক সারিবদ্ধভাবে আছে, তারা তাদের অবস্থান ত্যাগ করেনা। অন্যান্যরা আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রশংসায় নিরত আছে। তারা কখনো ক্লান্ত হয় না। চোখের নিদ্রা অথবা বুদ্ধির বিভ্রম অথবা শরীরের অবসন্নতা অথবা অমনোযোগিতার ফল তাদেরকে কোনরূপ প্রভাবিত করে না। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে যারা তাঁর বিশ্বস্ত সংবাদ বাহক হিসাবে কাজ করে যারা তাঁর নবীগণের জন্য কথা বলার জিহ্‌বা হিসাবে কাজ করে এবং যারা এদিক ওদিক তার আদেশ ও নির্দেশ বহন করে। তাদের মধ্যে তাঁর সৃষ্টজীব রক্ষাকারী ও বেহেস্তের প্রহরী আছে। তাদের মধ্যে এমনও আছে যাদের পদক্ষেপ মাটির উপর স্থির কিন্তু তাদের ঘাড়সমূহ আকাশের মধ্যে উন্নত হচ্ছে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল দিকে বের হয়ে যাচ্ছে, তাদের স্কন্ধসমূহ আল্লাহ্‌র আরশের স্তম্ভ সমূহের ন্যায় কাজ করছে তাদের চক্ষুসমূহ উহার সম্মুখ অবনত, তারা তাদের পাখাসমূহকে এর নীচে বিস্তৃত করে রেখেছে এবং তারা তাদের এবং সকলের মধ্যে সম্মানের যবনিকা এবং ক্ষমতার পর্দা তৈয়ার করেছে, তারা তাদের স্রষ্টা সম্বন্ধে উপমার মাধ্যমে ধারণা করে না। সৃষ্টি বস্তুর কোন গুণ তাঁর মধ্যে আরোপ করেনা, তাকে কোন বাসস্থানে আবদ্ধ করেনা এবং উদাহরণ দ্বারা তার দিকে ইঙ্গিত করে না।

আদম সৃষ্টির বিবরণ

আল্লাহ্‌ শক্ত, নরম, মিষ্টি ও টক মাটি থেকে কর্দম সংগ্রহ করলেন যা তিনি পানিতে ধৌত করলেন যে পর্যন্ত উহা না পবিত্র হল এবং তা তিনি ময়দার ন্যায় জলীয় বাষ্পের সহযোগে মাখালেন ওঠালেন যতক্ষণ ওটা আঠালো হলো। এটা থেকে তিনি বক্র আকার, গ্রন্থি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং খন্ড সমূহ সহকারে একটি প্রতিমূর্তি গঠন করলেন। তিনি এটাকে ঘন অবস্থায় পরিণত করলেন যে পর্যন্ত না এটা শুকিয়ে গেল, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এবং একটা জানা স্থিতিকাল পর্যন্ত। অতঃপর তিনি এর মধ্যে তাঁর রুহ থেকে ফুঁকে দিলেন যাতে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার মত মন এবং বুদ্ধি যা সে কাজে লাগাতে পারে। অঙ্গ-প্রতাঙ্গ যা তাকে সাহায্য করে, দেহযন্ত্রসমূহ তার অবস্থান পরিবর্তন করে। বিচক্ষণতা যা সত্য থেকে অসত্যকে পার্থক্য করে এবং স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ এবং প্রজাতি পার্থক্যকারী একটা মানবীয় ছাঁচ পেল। সে বিভিন্ন রংএর কাদার সংযোগশীল পদার্থ সমূহের যেমন তাপ, শৈত্য, কোমলতা ও কঠোরতার সংমিশ্রন। তৎপর আল্লাহ্‌ ফেরেশতাগণকে তাদের সাথে তার অংগীকার পূরণ করতে বললেন এবং নির্দেশের চুক্তি সম্পাদনের জন্য তাদের সম্মানিত অবস্থানের প্রতি নত মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করতে অদেশ করলেন।

অতএব আল্লাহ্‌ বললেন, "আদমকে সেজদা কর" এবং তারা সকলেই সেজদা করল ইবলিশ শয়তান ছাড়া। আত্মগৌরব তাকে প্রতিরোধ করল এবং পাপ তাকে পরাভূত করল। তার ফলে সে নিজে আগুনের সৃষ্টি বলে অহংকার করল এবং মাটির সৃষ্টিকে সে অবজ্ঞা করল। অতএব আল্লাহ্‌ তাকে অবকাশ দিলেন যাতে সে তাঁর লানতের উপযুক্ত হয় এবং মানুষকে পরীক্ষা করা পরিপূর্ণ হয় আর তার প্রতিজ্ঞা পূরণ হয় (যেটা তিনি শয়তানের সঙ্গে করেছিলেন) অতঃপর তিনি বললেন অবশ্যই তোমাকে ঐ নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হলো।" তারপর আল্লাহ্‌ আদম (আ.) কে একটি গৃহে বাস করতে দিলেন। যেখানে তিনি তার জীবনকে করলেন সুখময় এবং তার অবস্থানকে

করলেন নিরাপদ এবং তিনি তাকে (আ.) সতর্ক করে দিলেন ইবলিশ এবং তার দুশমনী সম্পর্কে। তারপর তার শত্রু ইবিলিস তার বেহেস্ত বাসের জন্য এবং ধার্মিকদের সঙ্গে তার সংস্পর্শের জন্য তার প্রতি হিংসা পোষন করল। অতএব সে তার দৃঢ় বিশ্বাসকে দ্বিধাগ্রস্ত এবং দৃঢ় সংকল্পকে দুর্বলতায় পর্যবসিত করে দিল। সে এমনিভাবে তার সুখকে ভয়ে তার মর্যাদাকে লজ্জায় রূপান্তরিত করে দিল। তৎপর আল্লাহ্ আদম (আ.) কে অনুশোচনা করার প্রস্তাব দিলেন, তাকে তাঁর কৃপা উদ্রেককারী কথা শিক্ষা দিলেন, তাকে পুনরায় বেহেস্তে ফিরিয়ে নেওয়ার অংগীকার করলেন, তাকে পরীক্ষাগারে এবং বংশধর প্রজননের স্থানে নামিয়ে দিলেন। তার বংশধরগণের মধ্য থেকে আল্লাহ্ নবীগণকে মনোনীত করলেন এবং তাদের অংগীকার গ্রহণ করলেন। তার প্রত্যাদেশের জন্য তার বার্তা তাদের জিম্মা হিসাবে বহন করার জন্য। কালক্রমে অনেক মানুষ তাদের সাথে আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্বকে দূষিত করে ফেলেছিল আর মর্যাদাকে অগ্রাহ্য করেছিল এবং তার সঙ্গে দেব-দেবির মুর্তি গ্রহণ করেছিল। শয়তান তাদেরকে তাঁকে চিনা-জানা পথ থেকে দূরে সরিয়ে এবং তাঁর ইবাদত থেকেও দূরে সরিয়ে ফেলেছিল।

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবী-রাসূল প্রেরণ

এরপর আল্লাহ্ রাসূলগণকে এবং একের পর এক নবীগণকে মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করেছিলেন তাদের দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অংগীকার পূরণ করাতে, তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করাতে। প্রচারের মাধ্যমে প্রণোদিত করতে, জ্ঞানের গুপ্ত তত্ত্বসমূহ তাদের কাছে উন্মোচিত করতে এবং তাদেরকে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা প্রদর্শন করতে যেমন আকাশকে তাদের উপর উত্তোলিত করা হয়েছে। জমিন তাদের নীচে স্থাপন করা হয়েছে। বেঁচে থাকার উপায়সমূহ যা তাদেরকে রক্ষা করে, মৃত্যু যার তাদের নিস্প্রাণ করে, রোগ শোক যা তাদেরকে বার্ধ্যকে উপনীত করে এবং দৈব ঘটনাবলী যা তাদের একের পর এক করে আপতিত হয়। আল্লাহ্ কখনই তাঁর সৃষ্টির জন্য কোন নবীকে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ ব্যতীত অথবা তাঁর নিকট থেকে প্রেরিত একটি পুস্তক (ঐশী দিক নির্দেশনা) অথবা বাধ্য করা সওয়াল জবাব অথবা একটি প্রতিষ্ঠিত ও ওজর ব্যতীত রাখেন নাই। এইসব পয়গম্বরগণ এমন ছিলেন যে তারা কোন সময়ই নিজেদের সংখ্যালুতার জন্য বা তাদের অস্বীকারকারীদের সংখ্যাধিক্যের জন্য ক্ষুদ্র ভাবেন নাই। তাদের মধ্যে হয় একজন পূর্ববর্তী ছিলেন যিনি তার পরবর্তী জনের নাম বলে যেতেন অথবা একজন অনুসরণকারী যাকে তার পূর্ববর্তীজন পরিচিত করিয়ে যেতেন। এভাবেই যুগ সমূহ অতিক্রান্ত হয়েছিল এবং সময় গড়িয়ে গিয়েছিল। পিতৃ পুরুষগণ মরে গিয়েছিলেন এবং তদস্থলে তাদের সন্তানেরা তাদের স্থান দখল করেছিল যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা.) কে তার রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করতে এবং তাঁর নবুয়াত সমাপ্ত করতে। তার চুক্তি গ্রহণ করা হয়েছিল নবীগণের নিকট থেকে। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট সমূহ ছিল সুবিখ্যাত এবং তার জন্ম ছিল সম্মানিত। পৃথিবীর মানুষেরা এই সময় বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন এবং পন্থাসমূহ ছিল বিচ্ছিন্ন। তারা আল্লাহ্কে তাঁর সৃষ্টির মত মনে করত। না হয় তাঁর নাম সমূহকে বিকৃত করত অথবা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরাত। মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্তি থেকে সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন এবং তার চেষ্টায় তাদেরকে অজ্ঞতা থেকে বের করেছিলেন। তৎপর আল্লাহ্ সোবহান তায়ালা মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশাবলীর (আহলে বাইত) উপর তাঁর মুলাকাত (দর্শন) পছন্দ করলেন এবং তাঁকে অধিক মহিমান্বিত মনে করলেন দুনিয়ায় অবস্থান করার চেয়ে এবং তিনি তাঁকে এই পরীক্ষার স্থান থেকে তাঁর নিকট সরিয়ে নিতে মনস্থ করলেন। অতএব তিনি তাকে সম্মানের সাথে তাঁর নিকট টেনে নিলেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর এবং তার বংশাবলীর উপর রহমত বর্ষণ করুন। কিন্তু রাসূল (সা.) সেই বস্তু তোমাদের মধ্যে ছেড়ে গেলেন যা অন্যান্য নবীগণ তাদের লোকদের মধ্যে ছেড়ে গিয়েছিলেন। কারণ নবীগণ তাদেরকে অন্ধকারে ফেলে যান না। একটি পরিষ্কার পথ ব্যতীত এবং একটি প্রতিষ্ঠিত নিদর্শন ব্যতীত যেমন তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কিতাব যাতে আছে হালাল ও হারাম এর ব্যাখ্যা, এর অবশ্য পালনীয় এবং বিবেচনা যোগ্য এর বাতিল যোগ্য ও বাতিলকৃত আদেশ এর জায়েজ ও অবশ্য করণীয় বিষয় সমূহ এর স্বতন্ত্র ও সাধারণ গুলি এর শিক্ষণীয় বিষয় ও উদাহরণ এর দীর্ঘ ও হ্রস্ব বিষয়সমূহ এর স্পষ্ট ও অস্পষ্ট বিষয় এবং সংক্ষেপ সমূহের সবিশেষ বর্ণনা ও দুর্বোধ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা। এর মধ্যে কতক আয়াত আছে যার সম্পর্কে জ্ঞান বাধ্যতামূলক আর অন্যান্যগুলি যাদের সম্পর্কে লোকদের অজ্ঞতা অনুমোদনীয়। এর মধ্যে কিতাব অনুযায়ী বাধ্যতামূলক বলে মনে হয় তেমন কিছু আছে কিন্তু এদের রহিত হওয়া প্রকাশ পেয়েছে নবী করীম (সা.) এর কার্যদ্বারা অথবা যেসব বিষয় রাসূল (সা.) এর কার্যদ্বারা বাধ্যতামূলক বলে মনে হয় কিন্তু কিতাব ওসব মান্য করাকে অনুমতি দেয় না। অথবা এমন সব আছে যা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাধ্যতামূলক কিন্তু ঐ সময়ের পরে তা নয়। এদের নির্দিষ্টকরণেও পার্থক্য আছে। কোন কোনটা গুরুত্বপূর্ণ যাদের সম্পর্কে দোজখের ভয় দেখানো হয়েছে এবং অন্যান্য গুলি তুচ্ছ, যাদের জন্য ক্ষমা লাভের

আশা আছে। আরো কিছু আছে যার মধ্যে অল্প সংখ্যক আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য কিন্তু সেগুলো বিস্তারিত বর্ণনার যোগ্যতা সম্পন্ন।

আহলে বাইত সম্পর্কে হযরত আলী বলেছেন যে, পৃথিবীর মধ্যে কোন ব্যক্তিই তাদের সমকক্ষ নয়, আর না কোন ব্যক্তিকে মহিমাময়তায় তাদের সমান বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ পৃথিবী তাদের অনুগ্রহের বোঝায় ভারী হয়ে গেছে এবং কেবলমাত্র তাদের পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে চিরস্থায়ী আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হয়েছে। তারাই ধর্মের মূলগতি এবং বুনিয়াদ আর এর জীবন ধারণের জন্য এবং টিকে থাকার জন্য পুষ্টিকর উপাদান। তারা জ্ঞানের এবং বিশ্বাসের এমন মজবুত স্তম্ভ যে কেবল তারাই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার ঝটিকা সংকুল প্রবাহ ফেরাতে সক্ষম। তারা বাড়াবাড়ি ও পশ্চাদপদতার মধ্যে এমন মধ্যপন্থা যে যদি কেহ বাড়াবাড়িতে অতিরণুনে অধিক দূর এগিয়ে যায় অথবা পশ্চাতে পড়ে থাকে তখন সে যদি ফিরে না আসে অথবা অগ্রগামী না হয় ঐ মধ্য পথের উপর তাহলে সে ইসলামের অনুসারী হতে পারে না। তাঁরা এমন সব বিশেষত্বের অধিকারী যা তাদেরকে খিলাফত এবং নেতৃত্বের অধিকারের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। ফলে উম্মতের জন্য কোন শক্তিই পৃষ্ঠপোষকতা ও অভিভাবকদের জন্য অগ্রাধিকার লাভ করতে পারে না। সেকারণেই রাসূল (সা.) তাঁদেরকে তাঁর প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করেছেন।"

আলেমগণের মতভেদ/মতবিরোধিতা সম্পর্কে মওলা আলী (আ.)

এই ধরণের মতভেদের নিন্দা জানিয়ে মওলা আলী বলেন : যখন কোন সমস্যা তাদের যে কোন জনের সামনে উপস্থাপন করা হয় সে এটার উপর তার নিজের কল্পনা থেকে রায় দিয়ে দেয়। যখন সেই একই সমস্যা তাদের অন্য একজনের নিকট পেশ করা হয় সে বিপরীত রায় প্রকাশ করে। তখন এই বিচারকেরা তাদের প্রধানের নিকট যায়। যে তাদেরকে নিয়োগ করেছিল আর সে সব গুলি রায়ই অনুমোদন করে। যদিও তাদের আল্লাহ্‌ এক (এবং অভিন্ন) তাদের নবী এক (এবং অভিন্ন) তাদের কিতাব (আল কুরআন) এক, (এবং অভিন্ন) আল্লাহ্‌ কি তাদেরকে মতভেদ করার আদেশ দিয়েছেন আর তারা সেই আদর্শ পালন করেছে ? অথবা তিনি তাদেরকে এরুপ করতে নিষেধ করেছেন আর তারা সেটা অমান্য করেছে? অথবা (এটা কিযে) আল্লাহ্‌ একটি অসম্পূর্ন ধর্ম বিশ্বাস প্রেরণ করেছেন আর সেটা সম্পূর্ণ করতে তাদের (আলেমদের) সাহায্য চেয়েছেন? অথবা তাঁর বিষয়াবলীতে তারা অংশিদার, আর সেজন্য তাদের কর্তব্যের অংশ হচ্ছে ঘোষণা করার সেটাতে তাঁকে একমত পোষন করতে হবে? অথবা এরুপ যে মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ একটা পূর্ণাঙ্গ ধর্ম বিশ্বাস পাঠিয়েছেন আর নবী সেটা জ্ঞাত করাতে অপরাগ হয়েছেন, আর লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন? আসল কথা হল যে, আল্লাহ্‌তালা বলেছেন:

'আমরা কুরআনের মধ্যে কোন কিছুই অবহেলা করি নাই' (কুরআন ৬:৩৮) এবং তিনি বলেন যে কুরআনের এক অংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমান করে এর মধ্যে কোন বিচ্যুতি নাই যেমন তিনি বলেছিলেন :

এটা যদি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও নিকট থেকে আগত হত তাহলে তারা এর মধ্যে অধিক গরমিল পেত (কুরআন ৪:৮৪)।

নিশ্চয়ই কুরআনের বাহির বা আশ্চর্যজনক আর এর ভিতরটা গভীর (অর্থের দিক থেকে)। এর বিস্ময় সমূহ কখনই অদৃশ্য হবে না, এর আশ্চর্য জনক বিষয় সমূহ কখনো মুছে যাবে না আর এর জটিলতাসমূহ এটার (কুরআনের) মাধ্যমে ছাড়া বোধগম্য হবে না (নাহজুল বালাখা-ভাষণ : ১৮)।

প্রকৃতপক্ষে আলেমগণের মধ্যেকার বিরোধের মূল কারণ হলো কুরআন সম্পর্কে তাদের সীমাহীন অজ্ঞতা তথা কুরআন ব্যাখ্যা সম্বলিত আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান তথা ঐশীজ্ঞানের অভাব।

জাল হাদিস সম্পর্কে হযরত আলী (আ.)

জনৈক প্রশ্নকর্তা হযরত আলীর (আ.) নিকট পরস্পর বিরোধী হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন :

নিশ্চয়ই মানুষের সম্মুখে যা আছে যার মধ্যে ঠিকও আছে, বেঠিকও আছে, সত্য ও আছে মিথ্যাও আছে, বাতিলকারকও আছে, বাতিলকৃতও আছে, সাধারণও আছে নির্দিষ্টও আছে, সুনির্ধারিত ও আছে আবার জটিলতাও আছে কণ্ঠস্থও আছে, আবার ধারণায়ও আছে। এমনি রাসূল (সা.) এর অঙ্গীকারের উপরেও মিথ্যারোপ করা হয়েছিল এই পর্যন্ত যে, তিনি খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে জাহান্নামে তার আবাসস্থলে তৈরী করে।" তোমাদের মধ্যে হাদিসসমূহ এসেছে চার শ্রেণীর লোক থেকে। তাদের কোন পঞ্চম নাই। ১। প্রথম, মুনাফিক যে ঈমানের বেশ ধারণকারী এবং ইসলামের সাথে শিষ্টাচারী (বাহ্যিক ভাবে নামায, রোজা, হজ, যাকাত পালনকারী), অথচ সে পাপ করতে ইস্তঃত করে না আর লাম্পট্যে অভ্যস্ত। সে ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূল (সা.) এর উপর মিথ্যা আরোপ করে। কিন্তু মানুষেরা জানতে পেরেছে যে, সে মুনাফিক এবং

মিথ্যা আরোপকারী তার নিকট থেকে তাদের কিছুই গ্রহণ করা উচিত না এবং তার কথার সত্যায়ন করাও উচিত না কিন্তু তারা বলে সে/ তারা রাসূল (সা.) এর সাহাবী। সে তাকে দেখেছে, তাঁর কথা শুনেছে এবং তার নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছে। তার নিকট থেকে তার কথা তারা গ্রহণ করে। আল্লাহ্ অবশ্য মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ভালভাবে সতর্ক করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যা দ্বারা তিনি তাদেরকে তোমার জন্য বিবৃত করেছেন। তৎপর ও তারা নবী (সা.) এর পর অবস্থান করেছে। তারা পথভ্রষ্ট নেতাদের এবং মিথ্যা দোষারোপের মাধ্যমে জাহান্নামের পথে আহবানকারীদের নৈকট্য লাভ করেছে। আর তারা তাদেরকে নির্দেশ দানকারী ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেছে, আর মানুষের ঘাড়ের উপর তাদেরকে কর্মকর্তা বানিয়ে দিয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে দুনিয়ার ধনদৌলত উদরস্থ করেছে। নিশ্চয়ই মানুষেরা সব সময়ই শাসকদের সঙ্গে থাকে এবং দুনিয়াদারীতে লিপ্ত থাকে কেবলমাত্র আল্লাহ্ যাদেরকে রক্ষা করেন তাদের ব্যতীত এরাই চার দলের একদল।

২। তারপর ঐ সব লোক যারা রাসূল (সা.) এর কাছে কিছু শুনেছে কিন্তু মুখস্থ করে নাই যে উহার মধ্যে কেবল ধারনা করেছে। সে ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা বলেনা। এখন সে ঐ কথা তার সাথে বহন করে, উহা বর্ণনা করে, সে অনুযায়ী কাজ করে আর সে দাবী করে যে সে উহা রাসূল (সা.) এর নিকট থেকে শুনেছে। যদি মুসলমানেরা জানতে পারে যে সে উহার মধ্যে ভুল করেছে তবে তারা এটা তার নিকট থেকে গ্রহণ করবে না এবং সে নিজে যদি জানতে পারে যে উহা এরুপ তবে সে উহা পরিত্যাগ করবে।

৩। তৃতীয় ব্যক্তি যে সে রাসূল (সা.) এর নিকট থেকে শুনেছে তিনি কোন ব্যাপারে আদেশ করেছেন তৎপর উহা নিষেধ করেছেন আর সে তা জানে না, অথবা সে কোন জিনিস সম্পর্কে নিষেধ করতে শুনেছে তৎপর তিনি তা করতে আদেশ করেছেন আর সে তা জানে না তখন সে যা বাতিলকৃত তাই স্মরণ করে রেখেছে আর যা রদ করা হয়েছে তা স্মরণ রাখে নাই। সে যদি জানতে পারত উহা রহিত হয়ে গেছে তা হলে সে উহা পরিত্যাগ করত অথবা যদি মুসলমানেরা জানত, যখন তারা তার নিকট থেকে উহা শুনত যে উহা বাতিল হয়ে গেছে, তা হলে তারা তা পরিত্যাগ করত।

৪। সর্বশেষ চতুর্থ জন সে কখনই আল্লাহ্ বা তার রাসূল সম্পর্কে কোন মিথ্যা আরোপ করে না। সে আল্লাহ্র ভয়ে এবং রাসূল (সা.) এর সম্মানের জন্য মিথ্যাকে ঘৃণা করে এবং কখনও কল্পনার আশ্রয় দেয় নাই। বরং সে যা ঠিক ঠিক শুনেছে তাই মুখস্থ রেখেছে, অতঃপর সে যা শুনেছে তাই বর্ণনা করেছে উহার মধ্যে কোন কিছু যোগও করে নাই এবং উহা থেকে কোন কিছু বাদও দেয় নাই। সে যদি কোন পরবর্তিতে হাদিস শুনত তাহলে সে উহা মনে রাখত এবং সে অনুযায়ী কাজ করত। আর যদি সে রদ করা হাদিস শ্রবণ করত তা হলে সে সেটা বর্জন করত। সে কোনটা বিশেষ এবং কোনটা সাধারণ তা বুঝত আর সে অনুযায়ী প্রত্যেকটার গুরুত্ব প্রদান করত। সে সহজও জটিল বিষয় সমূহ বুঝত।

রাসূল (সা.) এর কথা সমূহ দুই ধরণের ছিল। বৈশিষ্টপূর্ণ কথা এবং সাধারণ কথা। তাকে এমন লোক শুনত যা সে বুঝত না এদ্বারা আল্লাহ্তালা কি বুঝাতে চেয়েছেন বা রাসূল (সা.) কি বুঝাতে চেয়েছেন। এমন অবস্থায় শ্রবণকারী উহা বহন করে এবং মুখস্থ করে তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝা ছাড়াই অথবা এর প্রকৃত অভিপ্রায় না জেনে, রাসূল (সা.) এর আসহাবগণের মধ্যে সকলেই তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন না বুঝতে চাইতেন না এবং এটাই পছন্দ করতেন যে, বেদুইন আরবদের কেউ বা কোন আগন্তুক আমার এবং তাকে (সা.) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন আর তারা শুনে নিবেন। আমার সম্মুখ দিয়ে উহার এমন কোন বিষয় অতিক্রম করনা। আমি উহা সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত এবং উহা আমার স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা ব্যতীত। এটাই হলো কারণ, লোকেরা যার জন্য বিভিন্নতা করত এবং তাদের বর্ণনায় বিকৃতি ঘটত (ভাষণ : ২০৮)।

হযরত আলীর পর (৬৬১ খৃস্টাব্দ) প্রায় সকল শাসকই ছিল আলী (আ.) তথা আহলে বাইত বিরোধী তাই তাদের শান, মান, মর্যাদা হ্রাস ও অন্যান্য সাহাবাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যে হাদিস সাহিত্যকে ব্যবহার করা হয়েছে তা সর্বজন বিদিত। অথচ এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে এক শ্রেণীর আলেম সমাজ সব ধরণের হাদিসকে সমান গুরুত্ব দিয়ে তা মানতে আমাদের বাধ্য করেছেন তা ঈমানের দাবীতেই সমর্থন যোগ্য নয়।

সাধারণভাবে ধর্ম ও রাজনীতিকে দুইটি আলাদাভাবে গণ্য করে এক শ্রেণীর আলেম ধর্মকে শুধুমাত্র নামায, যাকাত, রোজা, হজ, তথা দৃশ্যমান কাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দৃশ্যমান ও করণীয় নামাযকেই ধর্ম হিসাবে বর্ণনা করে থাকে এবং মানবীয় বিচারে সেই তথাকথিত নামাযী যদি নীতিহীন, মিথ্যাচারী, ঘুষখোর, কালোবাজারী অথবা চিন্তার / আকীদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী বা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে কুরআন বিরোধী অর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতি নীতিতে বিশ্বাসী, আস্থাশীল বা অনুশীলনকারী হয়ে থাকেন। তাহলে সেই ব্যক্তির প্রতি ঐ আলেম শ্রেণী কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করেন না। আমরা ইতোমধ্যে কুরআন ও হাদিসের আলোকে জানতে পেরেছে যে, ধর্ম ও রাজনীতি কোন

আলাদা বিষয় নয় বরং ইমান তথা ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো রাজনীতি অথবা সমাজে বিদ্যমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা, অর্থনৈতিক মতবাদ, সামাজিক পরিস্থিতি অর্থাৎ ধনী-গরীবের ব্যবধান, কুরআনিক শাসন ব্যবস্থার ব্যবহারিক প্রয়োগ তথা বাস্তবায়ন, সামাজিক অসংগতি, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এ সবই ধর্মের তথা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে যে ধর্মকে (দ্বীন) অস্বীকার করে? সেতো সেই যে ইয়াতীনকে রুঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীর, যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন। যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট–খাট সাহায্য দান থেকে বিরত থাকে (সূরা মাউন : ১-৭)। অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী সমাজের আর্থ-সামজিক দায়িত্ব পালনও দৃশ্যমান নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর এই সামাজিক দায়িত্ব পালনে যিনি বিশ্বাসী নন তিনি প্রকৃতপক্ষে ধর্মে অবিশ্বাসী তথা কার্যত বেইমান এবং তার নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় না। বরং সে একজন ভন্ড বা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে লোক দেখানো নামাযী। এই বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য আমরা রাসূল (সা.) এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হযরত আলী (রা.) কেন বা কোন পর্যায়ে মুসলমানদের সাথে তিন তিনটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছেন তা পর্যালোচনা করব হযরত রাসূল (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আলী তিন ধরণের মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেছেন।

মুসলমানদের সাথে হযরত আলীর যুদ্ধ

১) বাইয়াত ভঙ্গকারী, ২) বিদ্রোহী তথা অবৈধ উপায় এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ৩) ধর্ম অপব্যাখ্যাকারী হিসাবে ধর্মপ্রাণ ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রীয়/ধর্মীয় নেতাকে উৎখাত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। হযরত আলী (আ.) কে এক শ্রেণীর সাহাবাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হয়। তাই সকল সাহাবীই যে সত্যের মাপকাঠি তা বাস্তবতা বিবর্জিত এক শ্রেণীর অজ্ঞ আলেমদের দাবী। আলী (আ.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী সাহাবাগণ যে অবশ্যই তাদের বিশ্বাসে (ঈমানে) ও কার্য (আমলে) ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন না তা বলাই বাহুল্য। তবে হযরত আলী (আ.), ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী, ধর্মান্ধ ও উগ্র মুসলিম যারা ইতিহাসে খারেজী নামে কুখ্যাত তাদের সাথে কেন যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের ধর্মীয় অবস্থান কোথায় এ সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব। কারণ এই উগ্র মুসলিম ধর্ম অপব্যাখ্যাকারীগণ বিভিন্ন নামে সকল যুগেই রয়েছে। হযরত ওসমান (রা.) এর সময়ে উমাইয়াদের ধর্মহীনতা, ধনলিপ্সা ও অন্যান্য শরীয়ত বিরোধী কর্মকান্ডে ক্ষুদ্ধ হয়ে যে সকল সংশোধনকামী গ্রুপ ছিল খাবেজীগণ তাদের অন্যতম। তারা পবিত্র কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে হিজরত করে নিজেদের আল্লাহ্‌র পথে বহির্গত বলে দাবী করে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র পথে বহির্গত তথা খারেজী হিসাবে দাবী করে। পক্ষান্তরে ইসলাম সম্পর্কে তাদের অপব্যাখ্যা এবং তৎপ্রেক্ষিতে উগ্রভাব ধারা, উশৃংখল ও নিষ্ঠুর কার্যাবলীর জন্য প্রকৃত মুসলমানরা তাদের ইসলামের সীমা হতে বহির্গত তথা খারেজী হিসাবে অভিহিত করে। আবার খাওয়ারজ বা খারজ অর্থাৎ বিদ্রোহ শব্দটি এসেছে খুরজ শব্দ থেকে অর্থ বিদ্রোহ ও রাজদ্রোহিতা। খারেজীরা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শ্লোগান হিসাবে ব্যবহার করে। তাহলো তোমরা যে জন্য খুব তাড়াহুড়ো করছো। তাতো আমার কাছে নেই। সব ব্যাপারেই ফয়সালা করার হুকুম দেওয়ার অধিকারও কারোরই নেই। এক আল্লাহ্ ছাড়া, তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী (সূরা আনআম : ৫৭)।

হুকুমদানের আইন-বিধান রচনার চূড়ান্ত অধিকার কারোরই নাই, এক আল্লাহ্ ছাড়া। সেই আল্লাহ্‌ই কুরআন দিয়েছেন যে, হে মানুষ তোমরা কারোরই দাসত্ব করবে না, করবে কেবল মাত্র এক আল্লাহ্‌কে" (সূরা ইউসুফ)।

পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্‌র সর্বময় কর্তৃত্ব তথা সার্বভৌম ক্ষমতার বর্ণনা সম্পর্কে অনেক আয়াত রয়েছে। বর্তমানেও এক শ্রেণীর নব্য খারেজীগণ এ ধরণের আয়াতকে তৌহিদের মূল ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ করে তারা অদৃশ্য আল্লাহ্‌কে ছাড়া নবী রাসূল, উলিল আমর, হাদী, মুর্শেদ, ওলী, পীর, বুজর্গ প্রভৃতি কাউকে মান্য করা নিষেধ এবং তাদের আদেশ মান্য শিরক বা বিদআত বলে থাকে। তাদেরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা, এমনকি নবীর নামে মিলাদ, জীবনী আলোচনা, নবীর মাযারে যাওয়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা ওলী মুর্শীদ যাদের বিষয়টি পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ আছে তাদের কাছে যাওয়া বা মান্য করা শিরক, বিদআত, না জায়েজ, কবীরা গুণাহ্ ইত্যাদি বলে থাকে। এ কারণে আমরা পবিত্র কুরআনের এ ধরণের কিছু আয়াতের নিরপেক্ষ, অর্থ, তাৎপর্য, মর্মার্থ বিশ্লেষণ করব। পবিত্র কুরআনের "হুকুম" শব্দটির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর একটি বিশেষ দিকের কথা বলা হয়েছে। এই "হুকুম" শব্দটির প্রকৃত অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবনের প্রয়োজন রয়েছে। সন্দেহাতীত ভাবে এ কথা বলা যায় যে, এখানে হুকুম (শাসন/নির্দেশ/বিচার/সরকার ব্যবস্থা) হচ্ছে মানুষের জীবনের আইন ও শৃঙ্খলা। এখানে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আইন জারীর ক্ষমতা বা অধিকার নাই বলে উল্লেখ

করা হয়েছে কথাটি অবশ্যই সত্য। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে আল্লাহ্তালা সরাসরি প্রতিটি লোকের নিকট তার বাণী বা নির্দেশ পৌছে দেন না। বরং আল্লাহ্র নির্বাচিত ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেন। আর তারাই হলেন নবী, রাসূল, উলিল, আমর, অলি মুর্শিদ। তাই এ ধরণের সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই আল্লাহ্র নিয়োজিত/নির্বাচিত ব্যক্তি হতে হবে। যার কথা সর্বজন বিদিত হতে হবে এবং যাকে আল্লাহ্র নির্বাচিত ব্যক্তি হিসাবে সেই জীবিত ব্যক্তির আদেশ/নির্দেশ (যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মর্মে দাবীকৃত) সর্বজন মান্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতি পালন করার অর্থই হচ্ছে নবী-রাসূল, ইমাম, উলিল আমর, হাদী, ওলী, মুর্শীদ তথা আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত/ নির্বাচিত ব্যক্তির আদেশ/ নির্দেশ মান্য তথা অনুসরণ করা। তাই আল্লাহ্ ছাড়া কোন ফয়সলাকারী নাই কথাটির বাস্তব তাৎপর্য হচ্ছে এর মাধ্যমে নবী-নায়েবে নবী/রাসূলগণের একটি পর্যায়কে অবশ্যই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। কিন্তু খারেজী বা তাদের অনুসারীরা "হুকুম" শব্দের অর্থ সরকার তথা হুকুম করার মধ্যস্থতাকারীর অস্তিত্বকে তারা সালেহের বা বিতর্কের ইস্যু হিসাবে সৃষ্টি করে বলে এই ধরণের মধ্যস্থতাকারীকে মান্য করা জায়েজ নাই মর্মে বলে থাকে। এ থেকেই তারা যে শ্লোগানের সৃষ্টি করেছে তা হলো: লা-হুকমা-ইল্লাবিল্লাহে অর্থাৎ সরকার (হুকুমত) মধ্যস্থতা (আহয়াত) এবং নেতৃত্ব, আইন জারির ক্ষমতার মতই আল্লাহ্র বিশেষ ক্ষমতা এবং আল্লাহ্তালা ছাড়া আর কোন মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা বা মানুষের শাসন করার অধিকার নাই। বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তৌহিদ বা একত্ববাদ ও রবুবিয়াতের স্বীকারোক্তি প্রত্যেক নেক ও বদ সকলেই রোজ-এ-আজলে (রুহ সৃষ্টির সময়) "আলাস্তু বি রাব্বি কুম" বাক্য উচ্চারনের মাধ্যমেই করেছে। শয়তানও আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস করে। কিন্তু আল্লাহ্র মনোনীত/নির্বাচিত খলিফা/প্রতিনিধি তথা নবীকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা স্বীকার না করার কারণে আল্লাহ্ তাকে "কাফের" হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্র বিবেচনায় ইবলিসের সবচেয়ে বড় অপরাধ আল্লাহ্কে অস্বীকার করা নয় বরং আল্লাহ্র মনোনীত/নির্বাচিত ব্যক্তিকে না মানা। অর্থাৎ ইবলিস নিজের বুদ্ধিবৃত্তির পূজা তথা আত্মপূজার মাধ্যমে সে আল্লাহ্র নিকট অভিযুক্ত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টীকরণের জন্য বলা যায় যে, আল্লাহ্র ক্ষমতা তথা আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হিসাবে নায়েবে রাসূল, ইমাম, অলী, মুর্শেদকে বাদ দিয়ে নিজের বুদ্ধি-জ্ঞান অনুযায়ী অন্যকোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে মান্য করাই প্রকৃত শিরক। এ প্রসঙ্গে বলা যায় এসব ব্যক্তিবর্গ যারা আল্লাহ্র সাথে বান্দার মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কোন নায়েবে রাসূলের কনসেপ্টই স্বীকার করে না। অথচ মানবীয় পদ্ধতিতে নিয়োগ প্রাপ্ত রাষ্ট্র প্রধান/রাজাকে তারা ঠিকই মান্য করে এবং তাদের মধ্যে "আল্লাহ্র ছায়া" দেখতে পায় বিধায় তাদের কার্যকলাপকে সমালোচনার উর্ধে বলে মানে এবং অন্যকেও মানতে বাধ্য করে। অর্থাৎ এইসব ফেরাউনের উত্তরাধিকারী রাজাদের মান্য করা ও যে এক ধরণের ভয়াবহ শিরক সে কথা এরা কখনও প্রকাশ বা প্রচার করে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র একত্যবাদের প্রচার প্রসার লাভ হয় নবুওতের আয়নায় এবং নবী পরবর্তী যুগে নায়েবে নবী, ইমাম, অলী, মুর্শেদদের মাধ্যমে যদি এদেরকেই অস্বীকার করা হয় তাহলে আল্লাহ্র পরিচিতি জানার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসাবে কে দায়িত্ব পালন করবে সে সম্পর্কে এই মতবাদের প্রবক্তারা কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারেন না। ফলে যার যার খেয়াল খুশী অনুযায়ী তারা ধর্মকে ব্যাখ্যা করে নিজে বিভ্রান্ত হয় ও অন্যকে বিভ্রান্ত করে। এ কারণেই শুধুমাত্র আল্লাহ্ তথা তৌহিদ বা রবুবিয়াতের উপর বিশ্বাসকে পূর্ণাঙ্গ ইমান বলা হয় নাই। বরং প্রকৃত ইমান হলো আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসের পাশাপাশি রাসূল (সা.) কে বিশ্বাস তথা মুসলমানদের পবিত্র কলেমা লা-ইলাহা-ইল্লাহু-মুহাম্মদুর-রাসূল্লাহ্কে পূর্ণাঙ্গ ইমান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শয়তানের ক্ষেত্রে যেমন আদম (আ.) কে সেজদা তথা চূড়ান্ত মান্যতা না প্রকাশ করে শুধুমাত্র আল্লাহ্কে বিশ্বাস বা মান্য করায় ইবলিশকে ইমানদার হিসাবে স্বীকৃতি আল্লাহ্তালা দেন নাই। এরই ধারাবাহিকতায় রাসূল (সা.) কে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী হলে তাঁকে ইমানদার বলার কোন সুযোগ নাই। বরং সে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে কাফের, অনুরূপভাবে রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত/নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি ও তাদের মান্যতা ব্যতীত ইমানের পূর্ণতা অর্জন করার সম্ভব নয় এবং এই ধরণের চিন্তাধারা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এক ধরণের খোদাদ্রোহিতা বা আল্লাহ্কে অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক কোন না কোন ভাবে বিশ্ব পরিচালনায় সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হিসাবে এক মহাশক্তি হিসাবে আল্লাহ্ বা অনুরুপ ক্ষমতাসীনের অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু রাসূল (সা.) এর নবুওত স্বীকার না করার কারণে তারা কোন প্রকার সামাজিক বা ব্যক্তিগত জীবনে ঐশী নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব স্বীকার করে না ফলে তারা কার্যত খোদাদ্রোহী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাই শুধুমাত্র আল্লাহ্কে মৌখিকভাবে বিশ্বাস করার মধ্যে কোন প্রকার সামাজিক কল্যাণ নাই। কারণ এই বিশ্বাসের প্রয়োগিক দিক হচ্ছে ঐশী নির্দেশের আলোকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিগত চরিত্র সংশোধন পদ্ধতি সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। যারা এই মতবাদ অস্বীকার

করে তারা পাথিব/ সামাজিক/ রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্‌র কোন ভূমিকা রয়েছে বলে বিশ্বাস করেনা। তাই তারা কার্যত খোদাদ্রোহী ছাড়া আর কেউ নয়। এই প্রেক্ষাপটে আমরা খারেজীদের সাথে হযরত আলী ও আলী যে চিন্তাধারা পোষন করতেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

হযরত আলী (আ.) ও খারেজী

একবার হযরত আলী (আ.) কে লক্ষ্য করে খারেজীরা বলে উঠে লাহুকমা ইল্লাহবিল্লাহ্‌। লাকাওয়াল আম হাবিকা। অর্থাৎ হে আলী (আ.) শাসন একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই অধিকার, "শাসন ও মধ্যস্ততা করার অধিকার আপনার বা আপনার বন্ধুদের নাই" জবাবে তিনি বলেন, কথাটি ঠিক, কিন্তু এর যে অর্থ তারা করেছে তা ভুল। এটা সত্য যে, আইন জারী (হুকুম-বিচার) একমাত্র আল্লাহ্‌র অধিকার। কিন্তু এসব লোক বলছে শাসন একমাত্র আল্লাহ্‌র। বাস্তব পরিস্থিতি হলো সমাজে নিরাপদ বসবাস করতে হলে মানুষের একজন শাসনকর্তা দরকার এবং ঐ শাসনকর্তা ভাল হতে পারেন বা খারাপ ও হতে পারেন, তার শাসনাধীনে বিশ্বাসী লোকেরা সৎকাজ করে এবং অবিশ্বাসীরা পার্থিব সুবিধা আদায়ের চেষ্টায় করে এবং আল্লাহ্‌ সব কাজেরই সমাপ্তি টানেন। শাসনকর্তার মাধ্যমে কর আদায় করা, শত্রুদের দমন করা হয়, রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা রক্ষিত হয় এবং সবলের নিকট থেকে দুর্বলের অধিকার আদায় করা হয় যাতে পুন্যবান ব্যক্তিরা শান্তিতে থাকতে পারেন এবং দুষ্ট লোক থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারেন। মানবীয় ইচ্ছা নির্ভর আইন তথা নির্দেশনাবলী স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। বরং এমন একজন বা একদল লোক অবশ্যই থাকা অবশ্যক যারা ঐশী বিধানকে ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করবে ও সমাজে তা প্রতিষ্ঠিত করবে। খারেজীরা হযরত আলী (আ.) এর কাছে দাবী করলো যে, আল্লাহ্‌র ধর্মের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার জন্য দুজন মানুষকে বিচারক নিযুক্ত করাই আলাহ্‌র বিধানের বিরোধিতা হয়েছে এবং এভাবে তারা অবিশ্বাসের কাজ করেছে। কারন একমাত্র বিচারক হচ্ছেন আল্লাহ্‌, মানুষ নয়, তারা আরো বলে যে, আমরা বুঝতে পারিনা যে, একজন মানুষকে সালিশ কারক নিয়োগ করে সিফফিনের যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তারা আলীকে বাধ্য করে এবং তাদের পছন্দ অনুযায়ী (আলীর বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসা আল আশআরীকে সালিশকারক নিয়োগ করা হয়। তাই তাদের বিবেচনায় আলী (আ.) ও একজন অবিশ্বাসী হয়েছেন এবং আমরাও অবিশ্বাসী হয়েছি। তবে আমরা অনুতপ্ত এবং আপনিও অনুতপ্ত হোন। তওবা করুন।

হযরত আলী বলেন, যে কোন পরিস্থিতিতে অনুতাপ বা তওবা করা ভালো। আমরা আমাদের পাপের জন্য সব সময় তওবা করছি। কিন্তু খারেজীরা বলল, না এটাই যথেষ্ট নয়। বরং হযরত আলীকে (আ.) স্বীকার করতে হবে যে সালিশী ব্যাপারটাই পাপ। আর এই পাপের জন্য তাঁকে অনুতাপ করতে হবে। হযরত আলী (আ.) খারেজীদেরকে বলেন যে, সালিশী তো তিনি চাননি বরং তাদের দাবী অনুযায়ী সালিশ কারক নিয়োগ করা হয়েছে এবং তার করুন পরিনিতি ও তারা দেখেছে। তবুও কুরআন যে কাজকে বৈধ ঘোষণা করেছে এ ধরণের একটি কাজকে তিনি পাপ হিসাবে কিভাবে ঘোষণা করবেন অথবা যে পাপ তিনি করেন নি তা স্বীকার করার কারণই বা কি করে ?

উল্লেখ্য পবিত্র কুরআনে দাম্পত্য বিরোধ নিরসনে উভয় পক্ষ থেকে সালিশকারক নিয়োগের বিধি বিধান রয়েছে (সূরা নিসা : ৩৫)।

তাই সালিশ নিয়োগ ব্যাপারটি কোন ক্রমেই শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়। অথচ তাদের বিবেচনায় এটা একটি অবৈধ কাজ তাই হযরত আলী (আ.) কে তওবা করতে হবে।

প্রকৃত পক্ষে খারেজীদের ধর্মীয় মতবাদ ছিল অত্যন্ত উগ্র। তারা মনে করতো যে, তাদের মতবাদ যারা মানে না, তাদের মতে তারা সকলেই কাফের এবং তাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। তাদের মতে ছোট বা বড় গোণাহ্‌ যে কোন প্রকারের গুনাহ মানুষকে ধর্মচ্যুত করে এবং এ ধরণের পাপীকে দোজখের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাদের মতে কেবল তারাই আল্লাহ্‌র পথের যাত্রী এবং যারা গৃহে থাকে এবং তাদের স্বার্থে আল্লাহ্‌র পথে বের হয় না তারা কাফের। তারা তাদের বিরোধিতাকারী নারী শিশুসহ সকলেই হত্যা করার পক্ষপাতি। তারা ধর্ষণের কোন শাস্তি অনুমোদন করে না। তাদের মতে এর জন্য কোন শাস্তি কুরআনে বর্ণিত হয় নি। তাদের বিবেচনায় কাফেরদের সন্তানেরা তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে দোজখের আগুনে জ্বলবে। তাদের ধারণা অনুযায়ী তাদের মনোনীত কার্য ছাড়া ধর্ম নাই। আর বাস্তব কর্মছাড়া ঈমানের কোন মূল্য নাই। খারেজীদের মতে যে সকল মুসলিম নিয়মিত নামায পড়ে না, রোজা রাখে না, বা অন্যান্য ধর্মীয় আহকাম-আরকান পালন করে না তারা কাফের এবং মৃত্যুদন্ড শাস্তির উপযুক্ত তাদের মতে মৃতের জন্য কাঁদা নিষিদ্ধ। তারা মনে করতো কবীরা গুণাহ্‌ করা ব্যক্তি মুমিনও নয় কাফেরও নয়। খলিফার আনুগত্যকে তারা রীতিমত গুনাহর কাজ বলে মনে করতো কারণ এটাও এক ধরণের ব্যক্তি পূজা তথা শিরক। খলিফার অনুবর্তী বললেই নর/নারী নির্বিশেষে সবাইকে তারা হত্যা করতো অত্যন্ত নির্দয়ভাবে। এদেরই মতাদর্শের বর্তমান অনুসারীরা যেমন পীর-মুর্শীদকে মান্য করাই শিরক বলে মনে করে

এবং তাদেরকে বেইমান বা কাফের বলে মনে করে তাদেরকে হত্যা করার জায়েজ বলে ঘোষণা দেয়।

সাধারণভাবে অমুসলমানদের তারা কিছুতেই রেহাই দিতনা। এভাবে যারা দেশে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে, খারেজীরা বিশ্বাস করতো আল্লাহ্‌র শাসন কায়েম করার জন্য তাদের বিদ্রোহ/সংগ্রাম এবং তাদের পতাকা খোদাই পতাকা। অতএব তাদের কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য নেমে আসবেই, তাদের সংগ্রামেই ন্যায়ের সংগ্রাম। তাই জয় তাদের সুনিশ্চিত, আর এ শয়তান দুনিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যদি তাদের মৃত্যু ঘটে তাতেও ক্ষতি নাই- বেহেস্ত তথা পরকালের সাম্রাজ্য তাদের জন্য অবধারিত। এ ধরণের ভ্রান্ত বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহারিক ও বাস্তব জীবনে তারা এক বিপজ্জনক ও ভয়াবহ সম্প্রদায় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তারা একদিকে যেমন আপোষহীন গোঁয়ার আর চরম ধর্মান্ধ অন্যদিকে ভয়ানক নীতিবাগীশ। ধর্মের নামে নরহত্যা, লুটতরাজ করতে ওদের বিবেক একটু বাধত না। ধর্মতথা কুরআনের অন্তর্নিহিত অর্থ না বুঝে বাহ্যিক তথা আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করলে যা হয় খারেজীদের কার্যকলাপ তাই হয়ে দাঁড়াল। এদের সম্পর্কে হযরত আলী (আ.) বলেছেন : আমি এবং কেবল আমিই এসব ধর্মান্ধদের দিক থেকে ইসলামের সামনে যে বিপদ আসতে পারে তা বুঝতে পেরেছিলাম। তাদের কপালের দাগ অথবা ধর্ম ভীরুদের পোশাকের মত তাদের পোশাক অথবা তাদের ঘন ঘন আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ এমনকি (আপাত দৃষ্টিতে) আল্ল-াহ্‌র প্রতি তাদের দৃঢ় ও অবিচল বিশ্বাস তাদের সম্পর্কে আমার অন্তর্দৃষ্টির পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি। আমি প্রথমে বুঝতে পেরেছিলাম যে, তারা যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহলে হয়ত সবাই তাদের রোগে (মতবাদে বিশ্বাসী) আক্রান্ত হবে। যার ফলে মুসলিম জাহান অত্যন্ত অনমনীয় হয়ে এবং ধর্মের বাহ্যিক প্রাণহীন দিকগুলোর প্রতিই বেশী করে ঝুঁকে পড়বে যার উল্লেখ্য দিক হলো ফলে ইসলামের মেরুদন্ডই বেঁকে যাবে এ কথাগুলো রাসূল (সা.) এভাবে বলেছিলেন : দুটো দল ইসলামের পৃষ্ঠদেশ ভেঙ্গে দেবে- একদল যারা জানে কিন্তু অবিবেকীর মত (মুয়ারিয়ার দল), অপর দল-যারা অজ্ঞ, কিন্তু ধার্মিকতার ভান করে। অর্থাৎ হযরত আলী যদি বিশ্বে খারেজী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করতেন তাহলে আর কেউ এমন ছিলনা যিনি দেখতে পেতেন যে, সেজদা দিতে দিতে যাদের কপালে দাগ পড়েছে তারা ইসলামের পথে একটি প্রতিবন্ধক যারা মনে করেছে যে, তারা ইসলামের খেদমতে কাজ করছে, প্রকৃত পক্ষে তারাই ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন। প্রকৃত পক্ষে খারেজীরা ছিল অজ্ঞ, অশিক্ষিত এবং তারা তাদের অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার জন্য ধর্মীয় বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারেনি এবং ইসলামের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের অপব্যাখ্যা করে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের এই ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণাগুলোই তাদের ধর্ম বিশ্বাসে পরিনত হয় এবং এই পরিণতি লাভের প্রক্রিয়ায় তারা সর্বাত্মক আত্মত্যাগ করছে বলে মনে করে খারেজীদের মত একটি দলের অজ্ঞতার বিপদ এই যে, এরা অতি সহজেই চতুর লোকদের হাতে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইসলামের উচ্চতর মহান স্বার্থ হাসিলের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মহীন, কপটচারীরা সহজেই সরল ধর্মান্ধদেরকে ইসলামের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে পারে। তারা এই সব কপটচারীদের হাতে তরবারি হিসাবে এবং তাদের ধনুকের তীর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হযরত আলী (আ.) অত্যন্ত সুন্দর ও সঠিকভাবে খারেজীদের বৈশিষ্ট এভাবে বর্ণনা করেছেন :

তোমরা হচ্ছ সর্বাধিক খারাপ লোক, তোমরা শয়তানের হাতের তীর, শয়তান তার লক্ষ্য বস্তুর বিরুদ্ধে তোমাদেরকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে এবং তোমাদের মাধ্যমেই সে লোকদেরকে হতবুদ্ধি ও সন্দিহান করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল সংকীর্ণমনা ও ক্ষীন দৃষ্টির মানুষ তারা ইসলাম ও মুসলমানদের তাদের নিজস্ব সীমিত ধারণার চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। সকল সংকীর্ণমনা মানুষের মত তারাও দাবী করতো যে অন্যরা সবাই ভুল বুঝেছে অথবা কিছুই বোঝেনি। সবাই ভুল পথে চলেছে এবং দোজখে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে। তারা আল্লাহ্‌র দয়াকে সংকুচিত করে ফেলে। তারা মনে করে আল্লাহ্‌ একটি ক্রোধের সিংহাসনে বসে আছেন, অপেক্ষা করছেন তার বান্দাদের ভুলের জন্য যাতে তিনি তাদের উপর চিরস্থায়ী শাস্তি আরোপ করতে পারেন। খারেজীদের মৌলিক বিশ্বাস ছিল কবীরা গোনাহ করলে মানুষ অবিশ্বাসী বা কাফের হয়ে যায় এবং তারা ইসলামের বাইরের লোক, কাজেই সীমিত সংখ্যক লোক ছাড়া সবাই দোজখবাসী হবে।

খারেজীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও গোঁড়া মন মানসিকতা। তারা সবাইকে অধার্মিক বলতো তার মূলেও ছিল তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীতে হযরত আলী (আ.) বলেছেন : রাসূল (সা.) কাউকে শাস্তি দিয়েছেন, আবার তার জানাজার নামাযও পড়েছেন। যদি বড় ধরণের পাপ করলেই লোক কাফের হয়ে যেত, তাহলে রাসূল (সা.) এটা করতেন না, কারণ কাফেরের জানাজা পড়া জায়েজ নয়। পবিত্র কুরআনেই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল (সা.) সুরাসক্ত ব্যক্তিকে চাবুক মেরেছেন। পরে আবার তাদের সবাইকে ধর্মীয় মজলিসে ঠাঁই দিয়েছেন। বায়তুল মাল থেকে তাদের ভাতা বন্ধ করেন নি এবং তাদেরকে অন্য মুসলিমদের সাথে বিয়েও দিয়েছেন। রাসূল (সা.) ইসলামের নির্দেশ

অনুযায়ী অন্যায়ের শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মুসলমানের তালিকা থেকে বাদ দেন নি।

খারেজীদের কাছে হযরত আলী (আ.) এর প্রশ্ন ছিল যে তাদের তরবারি নিষ্পাপ ও পাপীকে সমানভাবে বিদ্ধ করে কেন ?

অর্থাৎ তারা নিরপরাধ লোকদেরকেও পাপীদের সাথে একাকার করে ফেলেছে এবং পাপ করেছে এমন সবাইকে তারা নাস্তিক বলে ধরে নিয়েছে এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দিতে চেয়েছে। তাই তারা ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে এবং বলে দিয়েছে যে, কেউ ইসলামের কোন নিয়ম নীতির সীমা অতিক্রম করলে ইসলাম থেকেই সে বেড়িয়ে গেছে বলে গন্য করা হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ইসলামের ভিত্তি সম্পর্কে হযরত আলী

হযরত আলী (আ.) এর খলিফা কুমাইল ইবনে যিয়াদ বলেন; আমি আমীরুল সুমিনীল (আ.) কে প্রশ্ন করি ইসলামের ভিত্তি কী কী ? তিনি বললেন : ইসলামের ভিত্তি সাতটি যথা :

১. বুদ্ধি যার উপর ধৈর্য্য প্রতিষ্ঠিত।

২. সম্ভ্রম রক্ষা ও সত্যবাদিতা।

৩. যথাযথভাবে ও মনোযোগের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা।

৪. আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা আর আল্লাহ্‌র জন্য বন্ধুত্ব।

৫. মুহাম্মদ (সা.) এর পরিবারের অধিকার এবং তাদের বেলায়েত তথা কর্তৃত্বকে জানা।

৬. ভাইদের অধিকার ও তাদের সমর্থন করা।

৭. মানুষের সাথে সৌহার্দ্যভাবে প্রতিবেশী থাকা।

আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন, কোন বান্দা পাপে আক্রান্ত হয় এবং তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ক্ষমা চাওয়ার পরিমান কতটুকু? তিনি বললেন: হে ইবনে যিয়াদ তওবা। আমি বললাম : এটুকুই। তিনি বললেন : না ! বললাম : তাহলে কিরুপ ? তিনি বললেন : বান্দা যখন পাপ করবে তখন বলবে : আস্তাগফিরুলাহ এবং নড়াবে। আমি বললাম : নড়ানো কী ? তিনি বললেন : ঠোঁটদ্বয় এবং জিহবাকে এই নিয়তে (নড়াবে) যেন এর পিছনে হাকীকাত (সত্য) নিহিত থাকে। আমি বললাম হাকীকাত কী ? তিনি বললেন : অন্তর থেকে বলতে হবে এবং সংকল্প করবে যেন যে পাপ থেকে ইস্তিগফার করেছে তাতে আর প্রত্যবর্তন না করে।

কুমাইল বললেন : যদি এরূপ করি তাহলে আমি কি মুস্তাগফিরিন (ক্ষমা প্রাপ্তদের) মধ্যে হয় ?

তিনি বললেন : না।

কুমাইল বললেন : এটা কেমন?

তিনি বললেন : কারণ তুমি এখনো শিকড়ে পৌঁছাতে পার নি।

কুমাইল বললেন : তাহলে ইস্তিগাফারে মূল কি ? তিনি বললেন : যে সব পাপ থেকে ইস্তিগফার করেছ সেগুলো থেকে তওবায় প্রত্যাবর্তন। আর এটা হলো ইবাদতকারীদের প্রথম স্তর এবং পাপ বর্জন করা। ইস্তিগফার হলো একটি নাম যার ছয়টি অর্থ রয়েছে। প্রথমত অতীত থেকে অনুতপ্ত হওয়া, দ্বিতীয়ত, কখনো তার প্রতি প্রত্যাবর্তন না করার সংকল্প গ্রহণ করা, তৃতীয়ত যাদের কাছে তুমি ঋণী রয়েছ তাদের পাওনাদি বুঝিয়ে দেওয়া, চতুর্থত প্রত্যেক ফরজ বিষয়ে আল্লাহ্‌র হক আদায় করা, পঞ্চমত, হারাম খাওয়ার মাধ্যমে তোমার শরীরে যে গোশ্‌ত জমেছে তা গলিয়ে ফেলতে হবে যাতে হাড়ের গায়ে চামড়া জোড়া লেগে যায় এবং তাদের মাঝে নতুন গোশত গজায়, ষষ্ঠত শরীরকে আনুগত্যের (ইবাদতের) বেদনা ভোগ করাতে হবে যেরুপ তাকে পাপের তৃপ্তি আস্বাদন করিয়েছে।

ইমান ও কুফরের শক্তি ও শাখা-প্রশাখার বিবরণ

ক) ঈমানের শক্তি ও শাখা-প্রশাখা

নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছুর সূচনা করেছেন এবং তন্মধ্যে থেকে যা কিছু চেয়েছেন, নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। আর যা কিছু পছন্দ করেছেন, নিজের জন্য বিশেষ করে নিয়েছেন। আর যেগুলো পছন্দ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে ইমান, যাকে স্বীয় নাম থেকে নিঃসৃত করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ভালোবেসেছেন তাকেই তা (ইমান) দান করেছেন। অতঃপর তার ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন আর যে তাতে প্রবেশ করতে চায় তার পথ মসৃণ করে দিয়েছেন, আর আগন্তুকদের বিরুদ্ধে তার স্তম্ভসমূহকে মজবুত করে দিয়েছেন। আর যে তা ভালবাসে তার জন্য সম্মানের কারণ করে দিয়েছেন। আর যে তাতে দাখিল হয় তার জন্য নিরাপত্তার কারণ করে দিয়েছেন। আর যে তা অনুসরণ করে তার জন্য হেদায়েতের মাধ্যম করেছেন। আর যে তাতে সজ্জিত হয় তার জন্য অলংকার এবং যে সেটাকে স্বীয় জীবনের পথ হিসাবে অবলম্বন করেছে তার জন্য দ্বীন স্বরূপ করেছেন। আর যে তাতে আশ্রয় নেয় তার জন্য সুরক্ষা, যে তা আঁকড়ে ধরে তার জন্য রশি, তাতে যে কথা বলে তার জন্য প্রমাণ; যে তা চিনেছে তার জন্য মর্যাদা, তার বিষয়ে যে বক্তৃতা দেয় তার জন্য প্রজ্ঞা, যে তার দ্যুতি অন্বেষণ করে তার জন্য আলো, যে সেটাকে নিজের সঠিকতার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে তার জন্য প্রমাণ, যে সেটার উপর নির্ভর করে যুক্তি উপস্থাপন করেছে তার জন্য হাদিস, যে তদনুযায়ী রায় প্রদান করেছে তার জন্য জ্ঞান, যে তার বর্ণনা করেছে তার জন্য সহিষ্ণুতা, আর যে কোন পরিকল্পনা করে তার জন্য বুদ্ধি যে কোন চিন্তা করে তার জন্য উপলব্ধি, যে বুদ্ধি প্রয়োগ করে তার জন্য নিশ্চিত বিশ্বাস, যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার জন্য বিচক্ষণতা, যে অনুসন্ধান করে তার জন্য চিহ্ন, যে উপদেশ গ্রহণ করে তার জন্য শিক্ষা, যে তা অবলম্বন করে তার জন্য মুক্তি, যে যোগ্য হয় তার জন্য আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব, যে অগ্রসর হয় তার জন্য নৈকট্যের মাধ্যমে যে ভরসা করে তার জন্য আস্থা, যে আল্লাহ্‌র প্রতি সঁপে দেয় তার জন্য স্বস্তি, যে পর উপকার করে তার জন্য সম্ভ্রম, যে

ধাবিত হয় তার জন্য কল্যাণ, যে ধৈর্য্য ধারণ করে তার জন্য ঢাল। যে পরহেজগার হয় তার জন্য পরিচ্ছেদ, যে পথ খুঁজে পায় তার জন্য পবিত্রতা, যে ইসলাম গ্রহণ করে তার জন্য নিরাপত্তা এবং সত্যবাদীদের জন্য করেছেন প্রাণ। ইমান হলো সত্যের মূল। আর সত্যের মূল পথ হলো হেদায়েত, তার বৈশিষ্ট হলো সৌন্দর্য। তার চিহ্ন হলো মহানুভবতা, ইমানের স্পষ্ট ও উজ্জ্বল কর্মসূচি রয়েছে এবং (তা) আলোময় প্রদীপের অধিকারী। তার লক্ষ্য উন্নত, প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী, পুরস্কার জয়ী। প্রতিযোগিতার ময়দান ঈর্ষণীয়, পুরনো বন্ধুর অধিকারী আর (এর) আরোহীরা মর্যাদাবান, নেক কাজ সমূহ তার মিনার স্বরূপ। শ্লীলতা তার প্রদীপ, মৃত্যু তার পরিসমাপ্তি, দুনিয়া তার প্রতিযোগিতার ময়দান। কিয়ামত হলো তার প্রতিযোগীদের একত্র হওয়ার স্থল। বেহেশত হলো তার পুরস্কার, আর দোজখ হলো তার পশ্চাদপদতা। তাকওয়া হলো তার সহযোগী, সৎকর্মশীলরা হলো তার বীর পুরুষ, সুতরাং ইমানকে অবলম্বন করেই উত্তম কাজসমূহের পথ অর্জন করা যায় আর উত্তম কাজ সমূহের দ্বারাই দ্বীনি বিচক্ষণতা ও উপলব্ধি মৃত্যুভয়ের কারন হয়। মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়া পরিসমাপ্তি হয়, আর দুনিয়ার পশ্চাতে রয়েছে পরকাল। আর কিয়ামতের মাধ্যমে বেহেশত নাগালে আসে। আর বেহেশত দোযখবাসীদের জন্য আফসোসের কারণ হয়। দোযখ হলো তাকওয়ার জন্য একটি উপদেশ। আর তাকওয়া হলো সদাচারের শ্রেণীভুক্ত। আর তাকওয়া হলো এমন এক লক্ষ্যবস্তু, যে তার পেছনে ধাবিত হয়, সে ধ্বংস হয় না এবং যে তাকে কাজে লাগায়, সে অনুতপ্ত হয় না। কারণ তাকওয়ার মাধ্যমেই মানুষেরা সফল হয়েছে। আর অবাধ্যতার মাধ্যমেই ক্ষতিগ্রস্ত লোকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতএব বুদ্ধিমানদের উচিত বিরত হওয়া আর তাকওয়াবানদের উচিত উপদেশ গ্রহণ করা।

ইমান চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত : ধৈর্য, নিশ্চিত বিশ্বাস, ন্যায়পরায়নতা ও জিহাদ।

ধৈর্যের চারটি শাখা রয়েছে : আগ্রহ, ভয়, সংযম এবং প্রহরা। যে ব্যক্তি বেহেশতের প্রতি লালায়িত, সে ইন্দ্রিয় কামনার প্রতি মন দেয় না। আর যে দোজখ থেকে ভয় করে, সে হারাম থেকে সংযত হয়। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি সংযমশীল হয়, বিপদাপদ তার জন্য সহজ হয়ে যায় আর যে মৃত্যুর ব্যাপারে সজাগ সে উত্তম কাজের প্রতি ধাবিত হয়।

নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) এর চারটি শাখা রয়েছে। তীক্ষবুদ্ধিতা, সঠিকরূপে পরিমাণ যাচাই, শিক্ষণীয় বিষয়াদি থেকে উপদেশ গ্রহণ এবং পূর্ববর্তীদের সুন্নাতের (অনুসৃত/রীতি/নীতি) প্রতি মনোযোগ। যে ব্যক্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধির হয় সে কাজের পরিনাম সঠিকভাবে পরিমাপ করে, আর যে ব্যক্তি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয় যে শিক্ষনীয় নির্দশনাদিকে চিনতে সক্ষম হয়। আর যে ব্যক্তি সে গুলোকে চিনতে পারে, যে ভালো ও মন্দ সুন্নত (পন্থা) সনাক্ত করতে পারে এবং যেন পূর্ববর্তীদের সাথে জীবন কাটিয়েছে।

ন্যায়পরায়নতার রয়েছে চারটি শাখা : গভীর বোধ, জ্ঞানের স্রোত, বিকাশিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সহনশীলতার বাগান, যে ব্যক্তি উত্তমভাবে উপলব্ধি করে, যে সকল জ্ঞানকে ব্যাখ্যা বিশেষন করতে পারে আর যে হুকুম (নির্দেশ) সম্পর্কে অবগত। সে পথ ভ্রষ্ট হয় না, আর যে অসহিষ্ণু হয় সে তার কাজ কর্মে ছাড় দেয় না এবং জনগণের মাঝে সুনামের সাথে জীবন যাপন করে।

জিহাদের চারটি শাখা রয়েছে : সৎকাজের নির্দেশ, অসৎ কাজ নিষেধ, রণাঙ্গনে অটলতা, ফাসেকদের সাথে শত্রুতা। যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয়, সে মোমিনের পৃষ্ঠপোষক। আর যে অসৎকাজে নিষেধ করে, সে কাফেরদের লাঞ্ছিত করল। আর যে রণাঙ্গনে যে অটল থাকে সে তার উপর যা কিছু ন্যাস্ত তা পালন করল, আর যে ব্যক্তি ফাসেকদের সাথে শত্রুতা করে, সে আল্লাহ্‌র কারণেই ক্রোধান্বিত হয়, আল্লাহ্ তার জন্য ক্রোধান্বিত হন। এ হলো ইমান, তার শক্তিশালীকারী উপকরণ এবং শাখাসমূহ।

কুফরের শক্তি ও শাখা-প্রশাখা

কুফরীর চারটি স্তম্ভ রয়েছে : ফাসেকী, বাড়াবাড়ি, সন্দেহ আর বিভ্রান্তি। ফাসেকীর (দুষ্কৃতি) চারটি শাখা-অইমান করা, অন্ধত্ব, উদাসীনতা এবং অবাধ্যতা, অইমানকারী মুমিনের অধিকার বিনষ্ট করে এবং ফকীহদের ঘৃণা আর কবীরা গুণাহ্‌র উপর অটল থাকে। আর যার অন্তর্চক্ষু অন্ধ যে কুরআনকে বিস্মৃত হয় এবং নির্লজ্জ হয় এবং স্বীয় স্রষ্টার সাথে যুদ্ধ করে। শয়তান তার উপর চেপে বসে। আর যে আত্মভোলা সে নিজের প্রতি খেয়ানত করে এবং উল্টে যায়, আর পথভ্রষ্টতাকে সঠিক পথ লাভ বলে মনে করে। আর তার প্রত্যাশা সমূহ তাকে ধোকা দেয়। আর যখন সময় হাতছাড়া হয়ে যায় তখন আফসোস করতে থাকে। তার সামনে থেকে পর্দা সরে যায় এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার জন্য এমন সব বিষয় নেমে আসে যা সে ধারনাও করতে পারেনা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশের অবাধ্য হয়, সে সন্দেহে পড়ে যায়। আর যে সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়ে তার উপর আল্লাহ্ চড়াও হন এবং নিজ কর্তৃত্ব বলে তাকে পর্যুদস্ত করেন এবং স্বীয় পরাক্রমতা বলে তাকে বিচুর্ণ করেছেন। কেননা, সে নিজের জীবনে দোষ করেছে এবং মহামহিম প্রতি পালকের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করেছে।

বাড়াবাড়ির চারটি শাখা রয়েছে : দোষ ধরা, বিবাদ করা, বক্রমনা আর ভেদ সৃষ্টি করা। যে ব্যক্তি দোষ ধরে বেড়ায় সে সত্যে পৌছতে পারে না এবং এর চক্রজালে নিমজ্জিত

হওয়া ছাড়া কোন লাভ তার হয় না। আর এক ফেতনা থেকে বের হতেই আরেক ফেতনার করলে পড়ে, সে এক দূষনময় কাজে লিপ্ত।

আর যে জনগোষ্ঠিই পরস্পর কলহ বিবাদ করে, বিচ্ছিন্নতা তাদের বিভক্ত করে ফেলে এবং তাদের কার্য কলাপ দীর্ঘ জেদ ও পীড়াপীড়িতে নষ্ট হয়ে যায়। আর যে বক্রমনা হয় যে ভালোকে মন্দ আর খারাপ কাজকে উত্তম বলে গণ্য করে এবং পথভ্রষ্টতায় মত্ত হয়ে যায়। আর যে বিভেদ সৃষ্টি করে তার পর অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তার কাজ বিড়ম্বনাকর ও সংকীর্ণতার সম্মুখীন। আর যে মানুষের পথ ভিন্ন পথে চলে সে তার বক্র পথ থেকে ফিরে আসতে ব্যর্থ হয়। সন্দেহের চারটি শাখা রয়েছে: তর্কাতর্কি, ভীতি, সংশয় এবং আত্মপরাজয় তর্ককারীরা তোমার প্রতিপালকের কোন নেয়ামত নিয়ে তর্ক করে? যে ব্যক্তি তার সামনে আসা সম্পর্ককে ভয় করে সে উৎখাত হবে। যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীনের বিষয়ে সংশয় পোষণ করে সে এমন ভাবে নিশ্চল হয়ে পড়ে যে পূর্ববর্তীরা তাকে অতিক্রম করে চলে যায়। আর পরবর্তীরা ও তাকে নাগালে পায় এবং শয়তানের বিষোদগীরণে সে বিচূর্ণ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ও পরকালের ধ্বংসকারী বস্তুর সামনে আত্মসমর্পন করে সে উভয় ক্ষেত্রেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর যে ধ্বংস থেকে মুক্তি পায় সে ইয়াকীনের (নিশ্চিত বিশ্বাসের) ছায়ায়ই তা পেয়ে থাকে।

বিভ্রান্তির চারটি শাখা রয়েছে: আত্মঅহমিকার সজ্জা, রিপুর কুমন্ত্রণা, বক্র ব্যাখ্যা আর মিথ্যাকে সত্যরুপে প্রতিপাদন করা। আর এটা এজন্য হয়, যথা প্রকৃত অবস্থার প্রতিবন্ধক। আর রিপুর কুমন্ত্রণা ইন্দ্রিয় বাসনায় ঠেলে দেয়। আর বক্রতা উক্ত ব্যক্তিকে মারাত্মকভাবে বিচ্যুত করে দেয়। আর মিথ্যাকে সত্য রুপে প্রতিপন্ন করা হলো এমন সব আচ্ছন্নতা যা একের পর এক জমা হয়। এ হলো কুফরী ও তার শক্তিশালী শাখাসমূহ মুনাফেকীর চারটি স্তম্ভ : রিপুপূজা (আত্মপূজা, প্রবৃত্তি/নফসের ইবাদত), শৈথিল্য, বিদ্বেষ ও লোভ। রিপুপূজার আবার চারটি প্রশাখা রয়েছে : সীমা লংঘন, শত্রুতা, ইন্দ্রিয় কামনা ও অবাধ্যতা। যে লোক সীমা লঙ্ঘন করে তার বিপদের শেষ নেই, যে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে এবং তার উপর (অন্যরা) বিজয়ী হয়। আর যে ব্যক্তি সীমা ছাড়িয়ে যায় সে তার কুপরিনতি থেকে রেহাই পায় না এবং তার অন্তর পবিত্র থাকে না। আর যে ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয় বাসনা থেকে দূরে থাকে না সে দুঃখের সাগরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তার মধ্যে দাপাদাপি করে। আর যে নির্দেশ অমান্য করে যে ইচ্ছাকৃত পথভ্রষ্ট হয়েছে, তার কোন অজুহাত ও যুক্তি নেই।

আর শৈথিল্যের শাখাগুলো হলো : গাম্ভীর্য, ধোকা, কাজে গড়িমাসি এবং আকাঙ্ক্ষা। এটা এ কারণে যে, গাম্ভীর্য ও ভয় সত্য থেকে বিমুখ করে দেয়। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধোকা খাওয়ার পরিণতি হলো পরকালের ব্যাপারে অবহেলা করা। আর কাজে গড়িমাসি করা হলো অন্ধতের প্রান্তসীমায় নিক্ষিপ্ত হওয়া। আর যদি আকাংঙ্খা না থাকত, তাহলে মানুষ যা কিছুর মধ্যে আছে তার হিসাব জানত, আর যদি মানুষ যার মধ্যে রয়েছে তার হিসাব জানত, তাহলে ভয়ে মারা যেত।

আর বিদ্বেষের শাখাগুলো হলো: অহংকার, গর্ব, আত্মশ্লাঘা এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি। যে ব্যক্তি অহংকার করে, সে পিছু হটে, আর যে গর্ব করে, সে অশ্লীল কর্ম করে আর যার মধ্যে আত্মশ্লাঘা আছে সে একরোখা হয়। আর যে, গোঁড়ামি করে, সে অবিচার করে। কাজেই এগুলো কতই না মন্দ বৈশিষ্ট যা পিছুইটা এবং আকাঙ্ক্ষা এটা এ কারণে যে গাম্ভীর্য ও ভয় সত্য থেকে বিমুখ করে দেয় ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার অধিকাংশ ধোকাবাদ খাওয়ার অর্থ হলো পরকালের ব্যাপারে অবহেলা করা। অশ্লীল কর্ম, এক গুয়েমি এবং অবিচারে পর্যবাসিত হয়। **আর লোভের শাখাগুলো হলো :** আনন্দমত্ততা, ফুর্তি, এক গুঁয়েমি আর অহংকার, আনন্দময়তা আল্লাহ্‌র নিকট অপছন্দনীয়। আর ফূর্তি হলো আত্মপ্রেম এবং একগুঁয়েমি হলো এমন আপদ যা মানুষকে গোনায় লিপ্ত হতে বাধ্য করে। আর অহংকার মানুষকে আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া কৌতুক এবং এমন কর্মে ব্যস্ত রাখে যা উত্তমের স্থলে নিকৃষ্টকে গ্রহণ করার শামিল। এ হলো মুনাফেকী, তার শক্তিশালী উপকরণও শাখা প্রশাখা।

মহামহিম আল্লাহ্ যাঁর স্মরণ অতি উচ্চ তাঁর বান্দাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর ক্ষমতা অবিচল এবং তার শক্তি সুদৃঢ়। তাঁর কল্যাণ প্রবহমান তার প্রজ্ঞা দ্যুতিময়, তাঁর কলেমা সঠিক। তাঁর উত্তম কর্মসমূহ অগ্রবর্তী, তাঁর সম্পর্ক স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। তাঁর দাড়িপাল্লা ন্যায়সঙ্গত। তাঁর রেসালত (বার্তা) প্রেরিত। তাঁর প্রহরীরা উপস্থিত।

অতঃপর খারাপ কাজকে গোনাহ আর গোনাহকে ফেতনা এবং অপবিত্র ও পংকিল সাব্যস্ত করেছেন। আর ভালো কাজকে গনীমত (বিশাল লাভ) গন্য করেছেন। আর ক্ষমা চাওয়াকে তওবা এবং তওবাকে করেছেন পবিত্রকারী। যে ব্যক্তি তওবা করে সে সুপথ পায়। আর যে ধোঁকা খায় সে পথভ্রষ্ট হয় যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র দরবারে প্রত্যাবর্তন করে এবং স্বীয় পাপ স্বীকার করে এবং বেহেশতের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর আল্লাহ্‌র সুন্নাত (ঐশী বিধান) অনুযায়ী যে নিজেকে ধ্বংসের মুখোমুখি করেছে সে ছাড়া কেউ ধ্বংস হয় না।

জ্ঞানই শ্রেষ্ঠতম বলেছেন, হযরত আলী (আ.) হে লোক সকল! জেনে রাখ, দ্বীন হলো অন্বেষণ এবং তদনুযায়ী আমল করা। নিশ্চয় তোমাদের উপর জ্ঞানার্জন করা সম্পদ অর্জন করার চেয়েও বেশী আবশ্যক, কেন না দুনিয়ার সম্পদ তোমাদের মধ্যে বন্টন

করা হয়েছে এবং আমাদের জন্য জামানতকৃত। এক ন্যায়পাল (মহান স্রষ্টা) তোমাদের মাঝে তা ভাগ করে দিয়েছেন এবং শীঘ্রই তা দ্বারা তোমাদের প্রতি প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করবেন। আর জ্ঞান তার উপযুক্ত পাত্রের কাছে তোমাদের জন্য রয়েছে। তোমরা তাদের থেকে তা অন্বেষণ করতে আদিষ্ট হয়েছ। কাজেই তা অন্বেষণ কর। আর জেনে রেখ যে, অত্যধিক সম্পদ দ্বীনকে ধ্বংস করে। অন্তরসমূহকে পাষান করে দেয়, আর অধিক জ্ঞান যদি আমল সহকারে হয় তাহলে দ্বীনকে সংশোধন করে এবং বেহেশতে লাভের কারণ হয়। আর ব্যয় করার ফলে সম্পদ হ্রাস পায়। কিন্তু জ্ঞান ব্যয় করার ফলে তা বৃদ্ধি পায়। জ্ঞান ব্যয় করার অর্থ হলো হাফেজ ও রাবীদের মাঝে তা ছড়িয়ে দেওয়া আর জেনে রেখ যে, জ্ঞানীর সহযাত্রী হওয়া এবং তা মেনে চলা হলো এমন দ্বীন (উপায়/পন্থা) যাদ্বারা আল্লাহ্‌র উপাসনা ও ধর্ম পালন করা হয়। আর তার আনুগত্য করা পুন্য অর্জনের কারণ হয়। আর পাপসমূহকে বিদূরিত করে। আর মুমিনদের জন্য সঞ্চয় স্বরূপ এবং তাদের জীবনে মর্যাদার কারণ হয় এবং মৃত্যুর পর তাদের উত্তমরূপে স্মরণ করা হয়। নিশ্চয় জ্ঞানের অনেক গুণ রয়েছে, এর মাথা হলো বিনয়, এর চক্ষু হলো হিংসা বর্জন করা, এর কর্ন হলো উপলব্ধি এর জিহবা হলো সত্যালাপ, এর মেধা হলো অনুসন্ধান (গবেষনা) এর মন হলো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, এর অন্তর হলো কার্যাদির কারণসমূহ অবগত হওয়া, এর হাত হলো দয়া, এর চেষ্টা হলো সুস্থতা, এর পা হলো পন্ডিতদের (ধর্মীয় জ্ঞানী) সাক্ষাত লাভ, এর প্রজ্ঞা হলো সংযমশীলতা, এর অবস্থানস্থল হলো মুক্তি, এর নেতা হলো নিস্কৃতি, এর বাহন হলো বিশ্বস্ততা এর হাতিয়ার হলো মনোগ্রাহীবচন, এর তলোয়ার হলো তুষ্টি, এর ধনুক হলো আপসে চলা, এর সৈন্য হলো জ্ঞানীদের সাথে আলাপ-আলোচনা, এর সম্পদ হলো শিষ্টাচার, এর সঞ্চয় হলো পাপ পরিহার করে চলা, এর পাথেয় হলো পরোপকার করা এবং আশ্রয়স্থল হলো আপোসও সন্ধি, এর পরিচালনাকারী হলো হেদায়েত আর বন্ধু হলো পুন্যবানদের সহচর হওয়া।

রাসূল (সা.) এর জন্য আত্মউৎসর্গকৃত ও স্থলাভিষিক্ত হযরত আলী

কোরাইশদের গোত্রপতিরা দারুন মদওয়া (মক্কার পার্লামেন্ট) স্থানে মিলিত হয়ে মহান নবীকে (সা.) হত্যা করার জন্য পরামর্শ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে নির্বাচন কর, রাতের অন্ধকারে মহানবীর (সা.) বাড়ীতে আক্রমন করে তাঁকে সম্মিলিত ভাবে হত্যা করবে। মহানবী (সা.) মহান (সা.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে অবগত হলেন এবং ঐ রাতে বিছানায় না ঘুমানোর জন্য ও ঐ রাতেই হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হলেন। মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র আদেশ সম্পর্কে হযরত আলী (আ.) কে অবহিত করলেন এবং হযরত আলী (আ.) কে মহানবীর (সা.) এর শয্যায় এমনভাবে ঘুমানোর নির্দেশ দিলেন যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে যে, তিনি রাসূল (সা.) এর শয্যায় ঘুমিয়েছেন। আলী (আ.) তাঁর নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে প্রিয় নবীর (সা.) শয্যায় ঘুমিয়েছেন। আলী (আ.) নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রিয় নবীর (সা.) জীবন রক্ষা করলেন এবং এ মহান কর্মের জন্য সম্ভাব্য বিপদের ভার নিজ স্কন্ধে ধারণ করলেন। আর এ কর্মটি এতই আকর্ষনীয় ও আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় ছিল যে মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নাযিল করলেন। এরশাদ হচ্ছে : এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রয় (উৎসর্গ/মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে) করে দেয় এবং আল্লাহ্ (এরুপ) বান্দাদের প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল (সূরা বাকারা : ২০৭)। রাসূল (সা.) বলেন যে, আল্লাহ্ জিব্রাইল ও মিকাইল এর প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন, আমি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব রচনা করেছি এবং একের পরমায়ু অপরের থেকে বেশী করেছি। তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, নিজ আয়ু ভাইকে দিয়ে দেবে, কিন্তু উভয়েই অস্বীকার করলেন। তখন আল্লাহ্ তাদের বললেন, আমি আমার ওলী আলী এবং আমার নবী মুহাম্মদ এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব রচনা করেছি। তাকিয়ে দেখ, আমার ওলী আমার নবীর জন্য কিরুপে নিজ জীবন উৎসর্গ করতে উদ্যত হয়েছে এবং নবীর শয্যায় নির্ভয়ে ঘুমিয়ে আছে। তোমরা উভয়ে এখন পৃথিবীতে অবতরণ কর এবং আলীকে (আ.) শত্রুদের থেকে রক্ষা কর। এ কথা শুনেই তাঁরা উভয়ে পৃথিবীতে আগমন করলেন এবং জিব্রাইল আলীর মাথার দিকে এবং মিকাইল তার পায়ের দিকে বসলেন। তখন জিব্রাইল হযরত আলী (আ.) কে বললেন. "হে আবু তালিবের সন্তান" ধন্যবাদ। আপনার তুলনা কোথায় আছে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ নিজ ফেরেশতাদের কাছে আপনার কারনে গর্ব করেছেন। (তাফসীরে ফকরুদ্বীন রাজী, তাফসীরে সালবী এবং ইমাম গাজ্জালী রচিত ইহ ইয়াও উলুমুদ্বীন দ্রষ্টব্য)।

গভীর রাতে শত্রুরা রাসূল (সা.) কে হত্যার জন্য তাঁর গৃহকে চারদিক থেকে দ্রুত পরিবেষ্টন করল। মহানবী (সা.) সূরা ইয়াসীনের একটি আয়াত পড়তে পড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ভিন্ন এক পথে সাউর বা সউর পর্বতের গুহার দিকে দ্রুত ধাবিত হলেন.. ঘাতকরা উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে মহানবী (সা.) শয্যাপাশে উপস্থিত হলো, আলী (আ.) শায়িত অবস্থা থেকে উঠে শয্যার উপর বসলেন- ঘাতকরা হত-চকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল মুহাম্মদ কোথায় ? আলী (আ.) জবাবে বললেন : আমি কি তাঁকে

নজরদারী করার জন্য আদিষ্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলাম কি? ঘাতকদল আলী (আ.) কে প্রহার করতে করতে কাবা গৃহে নিয়ে এবং সেখানে কিছুক্ষন রাখার পর মুক্তি দিয়েছিল। মহানবী (সা.) স্বয়ং কোরাইশদের আস্থাভাজন হিসাবে "আল-আমিন" নামে ভূষিত ছিলেন তাই রাসূল (সা.) এর কাছে কেরাইশদের "ব্যাংক" হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হলেন, তখন তাঁর গোত্র ও গৃহে আলী (আ.) অপেক্ষা বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল আর কাউকে পাননি। সুতরাং তিনি আলী (আ.) কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলেন যাতে মানুষের যে আমানত তার কাছে গচ্ছিত ছিল সেগুলো সঠিকভাবে তাদের প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে পারেন। আর সেই সাথে ঋণ পরিশোধ করতে পারেন এবং তাঁর নবী (সা.) কন্যা, নারীগণকে মদীনায পৌছাতে পারেন। আলী এ সকল গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের পর তাঁর মাতা ফাতিমা, মহানবীর কন্যা ফাতিমা এবং যুবাইরের কন্যা ফাতিমা ও অন্যান্যদেরকে নিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করলেন।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সেনা নায়কদের একজন হযরত আলী (আ.)

ইসলাম শান্তির ও প্রানবন্ত ধর্ম। নরহত্যাকে ইসলাম সমর্থন করে না। আর এ জন্য যে ব্যক্তি অকারণে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যাক্তিকে হত্যা করে তার জন্য ইসলাম অনন্ত শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করে সে নিশ্চিত জাহান্নামে যাবে। কোরআন, কিন্তু প্রথম থেকেই কিছু সংখ্যক লোক যারা ইসলাম গ্রহণ এবং এর বিস্তৃতিকে ব্যক্তিগত/গোত্রীয় স্বার্থের জন্য হুমকি স্বরুপ মনে করতো তারা এর বিরোধিতা শুরু করেছিল। আর একারণেই এ ধর্মে, ধর্ম যুদ্ধের বা জিহাদের নিয়ম আল্লাহ্ প্রবর্তন করেন, যাতে ইসলামের প্রতি যারা শত্রুতা পোষণ করে তাদের নির্মূল করা যায়।

অনুরূপভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোন থেকেও যেখানে শত্রুরা মুসলমানদের প্রতি আক্রমন করবে সেখানে আত্মরক্ষা করাটাও অপরিহার্য। ফলে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও আত্মরক্ষা করা ইসলামী ধর্ম যুদ্ধের একটি শাখারুপে পরিগণিত হয় যার বৈধতা সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তি, মানবীয় স্বাভাবিক প্রবণতা ও ন্যায় চিন্তা স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে। আর মহানবীর অধিকাংশ যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষামূলক। মহানবীর হযরত আলী (আ.) অধিকাংশ যুদ্ধেই উপস্থিত থাকতেন। তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় পেতেন না। তিনি যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অগ্রপথিক। সিংহ সম গর্জন ও ঝড়োগতিতে শত্রু পক্ষকে ঘুর্নি-বার্তার মত নাস্তানাবুদ ও ধ্বংস করতেন। সমরাঙ্গনে থেকে কখনোই তিনি পিছু হটতেন না বলে তাঁর বর্মের পশ্চাদেশ ছিল শুন্য। তিনি শত্রুদেরকে কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেন না। তাঁর তীক্ষ্ম তরবারির আঘাত শত্রুর জন্য নিশ্চিত মৃত্যু বয়ে আনত। একাধিক আঘাতের কোন প্রয়োজন হতনা। তাঁর তরবারি আঘাত হানলে শত্রুর জীবন হরন ব্যতীত উত্থিত হত না।

খন্দকের যুদ্ধ (৬২৭ খ্রিস্টাব্দ)

ইসলামের শত্রুদের একাধিক দল ও গোত্র সম্মিলিতভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা আক্রমন করে ইসলামকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিল। মহানবী (সা.) বিখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.) এর পরামর্শে মদীনার চারিদিকে পরিখা খননের নির্দেশ দিলেন। তদানীন্তন যুদ্ধরীতি অনুযায়ী দু'পক্ষের সৈন্যরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শত্রু সেনাদের মধ্যে আরবদের অত্যন্ত খ্যাতিমান যোদ্ধা আমর ইবনে আব্দেওয়াদ বীরত্ব গাঁথা গেয়ে ছুটাছুটি করে ক্রোধান্বিত হয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানাল। মুসলমানদের মধ্যে এক ত্রাসের সঞ্চার হলো। কেহই এই আরব বীরের সামনে যেতে সাহস করলো না। হযরত আলী (আ.) তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য রাসূল (সা.) এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাসূল (সা.) অনুমতি দিলে তিনি আমর এর সম্মুখীন হলেন। হযরত আলী আমরকে ইসলাম গ্রহণ ও রাসূল (সা.) উপর ইমান আনার প্রস্তাব দিলেন। আমর এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন এবং ঘোড়া থেকে নেমে আসল এবং আলী (আ.) এর উপর তরবারির আঘাত হানল। আলী (আ.) ঢাল দিয়ে তা প্রতিহত করলেন এবং তাকে আক্রমণ করলেন। আমর আলী (আ.) এর হাতে নিহত হল। আরব এই বীরের পতন দেখে অন্যান্যরা ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে পলায়ন করল। আলী (আ.) বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে বললেন, সাবাস আলী! যদি ইসলামের অনুসারীদের সকল পুন্যকে তোমার আজকের যুদ্ধের সাথে তুলনা করা হয় তবে তোমার কর্মই সর্বোৎকৃষ্ট হবে। কারণ এর মাধ্যমে কাফেরদের জন্য অসম্মান ও হতাশ ব্যতীত কিছুই রইল না। অপরদিকে মুসলমানদের জন্য তা বয়ে এনেছে সম্মান ও গৌরব (বিহারুল আনওয়ার খ: ২০, পৃ-২০৫)।

খায়বর যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিস্টাব্দ)

মহানবী (সা.) ইহুদীদের প্রধান ঘাটি খায়বরের আক্রমণ পরিকল্পনা করে অগ্রসর হলেন। মহানবী (সা.) আবু বকরকে ডেকে পতাকা দিলেন। আবু বকর (রা.) যুদ্ধে গেলেন কিন্তু দুর্গ জয় না করেই ফিরে আসলেন। পরদিন একইভাবে ওমর (রা.) যুদ্ধ

করতে গেলেন এবং বিফল হয়ে ফিরে আসলেন। মহানবী (সা.) বললেন, আলী (আ.) কে আসতে বল। উত্তরে বলা হলো তিনি চক্ষু যন্ত্রণায় কাতর। মহানবী (সা.) বললেন : তাঁকে নিয়ে আস। আলী (আ.) এমন ব্যক্তি থাকে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। আর তিনিও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন। আলী (আ.) রাসূল (সা.) এর নিকট আসলেন ও তার চক্ষু যন্ত্রণা ও মাথা ব্যাথার কথা বললেন। রাসূল (সা.) তাঁকে দোয়া করলেন এবং স্বীয় মুখের লালা দিয়ে তার চোখ ও মাথা মালিশ করে দিলেন। ব্যথা দূর হলো। আলী (আ.) ইসলামের পতাকা ধারণ করলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে বললেন, জিবরাইল (আ.) তোমার সাথে, বিজয় তোমার জন্য অনিবার্য, মহান আল্লাহ্ শত্রুদের অন্তরে ভয় ও ভীতি সঞ্চার করেছেন। জেনে রাখ : যে ইহুদিদের পরাজিত করবে তার নাম হবে আলী (ইলিয়া/এলিয়া)। এ রকমই তাদের কিতাবে লিখা আছে। যখনই তাদের কাছে পৌঁছাবে বলবে যে, আমার নাম আলী। মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় তারা লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হবে। আলী (আ.) সমরাঙ্গনে গেলেন। প্রথমে ইহুদিদের নেতৃস্থানীয় মারহাবের মুখোমুখি হলেন এবং যুদ্ধে পরাস্ত করলে মারহাব নিহত হয়। ইহুদীরা দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিল। আলী দুর্গের সিংহ দরজার সম্মুখে এলন এবং এক টানে দুর্গের দরজা খুলে ফেললেন। এই দরজা বন্ধ করতে বিশ জন লোকের প্রয়োজন হয়েছিল। অতঃপর দরজা দুর্গের পরিখার উপরে ছুড়ে ফেললেন যাতে অন্যান্য সৈন্যরা তার উপর দিয়ে দু'র্গের ভিতরে আক্রমন করতে পারে। অবশেষে খায়রব দুর্গ জয় করলেন ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে তার বীরত্বের মর্যাদা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়ে হযরত আলী (আ.) এর নাম দেওয়া হয় "হায়দার" তথা আল্লাহ্র সিংহ। এই পদবী পৃথিবীতে একমাত্র হযরত আলী (আ.) এর ভাগ্যেই বর্তেছিল। অথচ রাজনৈতিক কারণে খালিদ ইবনে অলিদের বীরত্বের কথা মুসলিম সমাজে বেশী চালু করা হয়েছে।

তিন খলিফার শাসনকালে হযরত আলী (আ.)

আমরা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি যে, রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর আলীকে বাদ দিয়ে কিছু সংখ্যক সাহাবী আবু বকর (রা.) কে খলিফার পদে সমাসীন করে এবং এই ধারা প্রায় পচিশ বছর অব্যহত থাকে। উমাইয়াদের প্ররোচনা উপেক্ষা করে তিনি বল প্রয়োগ বা কোন অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা না করে ইসলামের কল্যাণার্থে এবং যেহেতু ইসলামের তখনো নব বিকাশমান অবস্থা এবং তখনও ইসলাম যথেষ্ট পরিমাণ স্থিতিশীলতা লাভ করেনি, তাই রাষ্ট্র প্রধান যখন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘোরতর অসুবিধার সম্মুখীন হতেন তখনই তাঁরা আলী (আ.) এর শরণাপন্ন হতেন এবং তিনি তাঁদেরকে সৎ ইসলামী পরামর্শ দিযে দ্বীন ইসলামের তথা রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করতেন। এ বিষয়টি কৃতজ্ঞতা ভরে স্বীকার করে ওমর (রা.) প্রায় ৭০ বার বলেছেন। "যদি আলী (আ.) না থাকত তবে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত"। এ পর্যায়ে আমরা এ ধরণের কিছু ঘটনা উল্লেখ করব।

আবু বকর (রা.) এর সময় (৬৩২-৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ)

ইহুদীদের কিছু আলেম আবু বকরের নিকট এসেছিল এবং তাকে জিজ্ঞেস করেছিল। আমরা তৌরাতে পড়েছি যে, নবী (সা.) এর উত্তরসুরী হবে সর্বপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি, যদি তুমি এ উম্মতের নবীর (সা.) এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে তবে আমাদেরকে বল যে, আল্লাহ্ কি আকাশে আছেন না ভূপৃষ্ঠে? আবু বকর (রা.) জবাব দিলেন, তিনি আকাশের উপর অধিষ্ঠিত আছেন। ইহুদী আলেমরা বলল, তাহলে ভূপৃষ্ঠে তিনি নাই। সুতরাং (তোমার বক্তব্য অনুযায়ী) জানা গেল যে, আল্লাহ্ কোথায় ও আছেন আবার কোথাও বা নেই। আবু বকর (রা.) বললেন; এটা কাফেরদের কথা, তোমরা এখান থেকে চলে যাও, নতুবা তোমাদের হত্যা করার নির্দেশ দিব। তারা ইসলাম ধর্ম ও তার নেতাকে উপহাস করতে করতে ফিরে যাচ্ছিল। হযরত আলী (আ.) তাদের একজনকে বললেন: আমি জানি, তোমরা কী জিজ্ঞাসা করেছ এবং কী জবাব পেয়েছ। জেনে রেখ যে, ইসলাম বলে: মহান আল্লাহ্ স্বয়ং স্থানের অস্তিত্ব আনয়নকারী সুতরাং তিনি কোন স্থানে সীমাবদ্ধ নন এবং কোন স্থান তাকে ধারণ করতে অক্ষম, কোন প্রকার সংলগ্ন বা স্পর্শ ব্যতীতই তিনি সর্বত্রই অস্তিত্ববান এবং তাঁর জ্ঞান সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে,....। ইহুদী পন্ডিতগণ আলী (আ.) এর কথা শুনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল এবং বলল : আপনিই প্রকৃত পক্ষে রাসূল (সা.) এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী আর কেউ নয়।"

খলিফা ওমর (রা.) এর সময় (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ)

কোদামত ইবনে মাযয়ুন নামক এক ব্যক্তি শরাব পান করেছিল। ওমর (রা) তার উপর শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। (অর্থাৎ এক্ষেত্রে ৮০টি চাবুক দিতে হবে) কোদামা বলল, আমার উপর চাবুক প্রয়োগ করা অপরিহার্য নয়, কারণ মহান আল্লাহ্ বলেন, যারা ইমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করেছে তারা যতক্ষন পর্যন্ত তাকওয়া অবলম্বন ও সৎকর্ম করতে থাকবে, তারা যা ভক্ষণ করে তার জন্য তাদের কোন আশংকা বা ভয় নেই (সূরা মায়িদা : ৯৩)। তার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ওমর (রা.)

তাকে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন। হযরত আলী (আ.) এর কাছে এ সংবাদ পৌছল। তিনি ওমর (রা.) এর নিকট জানতে চাইলেন কোদামাকে শাস্তি না দেওয়ার কারণ কি? ওমর (রা.) উল্লিখিত আয়াতের মর্মানুযায়ী তাকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়। আলী (আ.) বললেন, কোদামাহ এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি নয়। কারণ যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও কল্যাণ কর্ম সম্পাদন করে তারা আল্লাহ্‌র হারামকে হালাল করে না। কোদামাহকে তওবা করতে বল। যদিও বা করে তবে তার উপর আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর কর। নতুবা তাকে হত্যা করতে হবে। কারণ শরাব পানের নিষিদ্ধতাকে যে অস্বীকার করে সেই ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। কোদামাহ একথা শুনে তওবা এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকল। ওমর (রা.) এ পর্যায়ে কোদামাহর শাস্তি কি হবে জানতে চাইলে হযরত আলী (আ.) সিদ্ধান্ত দিলেন ৮০ টি চাবুক।

ওসমান (রা.) এর শাসনকালে (৬৪৪-৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ)

আল্লামা, মজলিসি, কাশশাফ, ছালাবী ও খাতবির আরবাইন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক নারী ওসমান (রা.) এর শাসনকালে ছয় মাসে বাচ্চা জন্ম দিয়েছিল। ওসমান (রা.) ধারনা করলেন যে, এই মহিলা অবৈধ সন্তানের মা বিধায় যিনাকারীনি, তাই তার শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড। হযরত আলী (আ.) ওসমান (রা.) কে বললেন : কুরআনের ফায়সালা অনুযায়ী মহিলাকে প্রস্তাবিত শাস্তি সঠিক নয়। কারণ কুরআনের উল্লেখ আছে : গর্ভ ধারণ থেকে স্তন্য পান সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সময় হলো ত্রিশ মাস। অন্যত্র স্তন্য পানের সময় ২৪ মাস উল্লেখ করা হয়েছে (সূরা আহকাফ-১৫)।

এরশাদ হচ্ছে : যে স্তন্য কাল পূর্ন করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাবে" (সূরা বাকারা : ২৩৩)।

অতএব যদি নিশ্চয়রুপে চব্বিশ মাস নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে প্রথম আয়াতের মতে গর্ভধারণ ও স্তন্য প্রদানের মোট সময়কাল ত্রিশ মাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ গর্ভধারণ ও দুদ্ধ পানের সময় সীমা (ত্রিশ মাস- চব্বিশ মাস) "গর্ভধারণ সময় ৬ মাস। যা গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময় কাল যা পবিত্র কুরআন কর্তৃক সমর্থিত। তাই মহিলাকে ব্যভিচারিনী গণ্য করা ঠিক হবে না। সংগত কারণেই প্রস্তাবিত শাস্তি প্রত্যাহার করতে হবে।" হযরত আলী (আ.) কর্তৃক প্রদত্ত এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আলেম ও ফকীহগণ গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ৬ মাস বিবেচনা করে বিচার ফয়সালা করে আসছেন।

উপরোল্লিখিত ঘটনা পর্যালোচনা করে আমরা সন্দেহতীতভাবে জানতে পারি যে, এক শ্রেণীর মুসলিম বুদ্ধিজীবী যেমন অতি সরলীকরণ প্রক্রিয়ায় হযরত আলী (আ.) যেহেতু চতুর্থ নম্বর খলিফা ছিলেন তাই মর্যাদায়ও তিনি চার। এই ধারণা আদৌ সত্য বা সঠিক নয়। বরং তিনিই রাসূল (সা.) এর পর উম্মতের কান্ডারী বা ধর্মীয় নেতা ছিলেন অন্য কেহ নয়।

হযরত আলী (আ.)'র কেরামত

সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আলী (আ.) যখন অশ্বারোহনের সময় ঘোড়ার রেকাবে পা রাখতেন তখন কুরআন তেলওয়াত শুরু করতেন এবং দ্বিতীয় বেকারে পা রাখার সময় কুরআন শরীফ খতম করে নিতেন। অন্যান্য বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ঘোড়ার পিঠে পূর্ণরূপে বসার পূর্বেই কুরআন পাক খতম করে নিতেন।

আসমা বিনতে ওয়াযস (রা.) ফাতেমা (আ.) থেকে বর্ণনা করেন, যে রাতে হযরত আলী (আ.) আমার সাথে বাসর রাত্রি অতিবাহিত করেন, আমার খুব ভয় হতে থাকে। কেন না, আমি যমিনকে তার সাথে কথা বলতে শুনেছি। সকাল হলে আমি এই ঘটনা রাসূল্লাহ (সা.) কে শুনালাম। রাসূল (সা.) একট দীর্ঘ সেজদা করত মাথা তুলে বললেন, ফাতেমা, তুমি পবিত্র সন্তানের সুসংবাদ গ্রহণ কর। যাকে আল্লাহ্‌ পাক সমগ্র সৃষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং জমিনকে আদেশ করেছেন যাতে সে আলীকে তার সন্তানের উপর ভবিষ্যত নির্যাতন মূলক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করে দেয়।

অস্তগামী সূর্যের পুনঃ উদয়

আল্লাহ্‌তালা আলী (আ.) এর খাতিরে দুবার সূর্যকে পশ্চিম থেকে ফিরিয়ে আনেন। প্রথমবার রাসূল (সা.) এর আমলে এবং দ্বিতীয়বার রাসূল (সা.) এর ওফাতের পরে। প্রথম বারের ঘটনা এই : হযরত উম্মে সালিমা আসমা বিনতে ওমায়েস, জাবের ইবনে আব্দুলাহ ও সায়ীদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা.) একদিন আলী (আ.) এর গৃহে অবস্থানরত ছিলেন। তিনি হুযুর (সা.) এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ জিররাইল (আ.) ওহী নিয়ে আগমন করলেন। ওহীর ভারের কারণে রাসূল (সা.) আপন মস্তক আলী (আ.) এর উরু থেকে উত্তোলন করলেন না। হযরত আলী (আ.) বসে বসেই ইশারায় নামায আদায় করলেন। ওহীর ভার খতম হলে পর রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন : হে আলী, তোমার আসরের নামায কাযা হয়ে গেছে কি? তিনি আরজ করলেন, হুযুর, আমি বসে বসে ইশারায় নামায আদায় করে নিয়েছি। রাসূল

(সা.) বললেন: তুমি যাতে ঠিক সময়ে আসরের নামায আদায় করতে পার, সেজন্য, আমি সূর্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করছি। সেমতে হুজুর (সা.) দোয়া করলে সূর্য ফিরে এল। মনে হচ্ছিল যে এই মাত্র আসরের সময় হয়েছে। এভাবে আলী (আ.) যথা সময়ে নামায আদায় করলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা এই : হযরত আলী (আ.) বাবেলের (ইরাকের ব্যাবিলন) দিকে গমন করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি ফোরাত নদী পার হয়ে সাথীদের সাথে আসরের নামায আদায় করবেন। তাঁর সঙ্গীরা ফোরাত নদীতে নিজ নিজ সওয়ারী পারাপার করতে শুরু করলেন। ফলে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল এবং তাদের আসরের নামায কাযা হয়ে গেল এবং তারা আফসোস করতে লাগল। আলী (আ.) একথা শুনে আল্লাহ্‌তালার কাছে সূর্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য দোয়া করলেন, যাতে তাঁর সঙ্গীরা নামায আদায় করতে পারেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর দোয়া কবুল করলেন, যাতে তাঁর সঙ্গীরা নামায আদায় করে নিতে পারেন। সূর্য উদ্‌িত হলো এবং আসরের সময় হয়ে গেল। তিনি যখন সালাম ফিরালেন, তখন সূর্য আবার অস্তমিত হয়ে গেল এবং তা থেকে ভয়ংকর আওয়াজ আসতে লাগল। লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে লাগল।

হযরত আলী (আ.) মর্যাদা অস্বীকারকারীর খোদায়ী শাস্তি

"আমি যার মওলা, আলীও তার মওলা : একদিন আলী (আ.) মজলিসে উপস্থিত সকলকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর এই এরশাদ "আমি যার মওলা, আলীও তার মওলা" যে শুনেছে যে সাক্ষী দিক! তখন বার জন আনসারী উপস্থিত ছিলেন। তারা সকলেই সাক্ষ্য দিলেন , কিন্তু এক ব্যক্তি এই হাদিস শুনা সত্ত্বেও সাক্ষি দিলেন না। আলী (আ.) বললেন : তুমি সাক্ষ্য দাও না কেন? তুমিও তো রাসূল (সা.) এর মুখ থেকে একথা শুনেছ। সে বলল : আমি শুনেছি কিনা, এক্ষনে তা মনে নেই। আলী (আ.) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্ যদি লোকটি মিথ্যা বলে থাকে তার মুখে ধবল কুষ্ঠের চিহ্ন প্রকাশ করে দাও, যাতে পাগড়ীও তা গোপন করতে না পারে।

রাবী বলেন : আমি সেই ব্যক্তিকে দেখেছি। তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে ধবল কুষ্ঠের চিহ্ন প্রকাশমান ছিল।

যায়দ বিন আরকাম (রা.) বলেন, আমিও সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলাম এবং আমিও হাদিসটি শূনে রেখেছিলাম। কিন্তু এর সাক্ষ্য দিলাম না এবং বিষয়টি গোপন করে গেলাম। আল্লাহ্‌তালা আমাকে দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত করে দিলেন। কথিত আছে, তিনি সর্বদা সাক্ষ্য না দেওয়ার কারণে লজ্জা প্রকাশ করতেন এবং আল্লাহ্‌তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

আলী (আ.) একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন : আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁরা রাসূলের ভ্রাতা। রহমতের নবীর ওয়ারিশ, আমি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নারীর স্বামী আমি। ওসিগণের সর্দার আমি, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ওসি। অন্য যে কেউ এ দাবী করবে আল্লাহ্ তাকে অনিষ্টে লিপ্ত করুন। এক ব্যক্তি বলল : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তার রাসূলের ভ্রাতা বলে, তার প্রতি কে সন্তুষ্ট হতে পারে ? লোকটি স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটল। লোকেরা তাকে মসজিদের বাইরে নিয়ে গেল।

ফোরাত নদীতে বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণ

একবার কুফার অধিবাসীরা আরজ করলো, হে আমীরুল মুমেনীন, এ বছর ফোরাতে জলোচ্ছ্বাসের কারণে আমাদের ফসলাদি বিনষ্ট হতে চলেছে। নদীর পানি হ্রাস পাওয়ার জন্য আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলে খুবই উপকার হতো। হযরত আলী (আ.) উঠে গৃহে গেলেন। লোকজন গৃহের দরজায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তিনি রাসূল (সা.) এর জুব্বা পরিধান করে মাথায় পাগড়ি বেঁধে এবং পবিত্র লাঠি হাতে নিয়ে হঠাৎ বাইরে এলেন (রাসুলের উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি আলীকে দান করেছিলেন) এবং একটি ঘোড়া আনিয়ে তাতে সওয়ার হলেন। লোকজনও পায়ে হেঁটে তাঁর পিছনে পিছনে আসলেন। ফোরাতের তীরে পৌছে তিনি ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন এবং দুরাকাত নামায আদায় করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে পবিত্র লাঠি হাতে নিয়ে ফোরাতের পুলের উপর এসে গেলেন। তখন হাসান, হোসাইন (আ.) ও তাঁদের পিতার সাথে ছিলেন। তিনি লাঠি দিয়ে পানির দিকে ইশারা করতেই পানির উচ্চতা একফুট কমে গেল। হযরত আলী (আ.) লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন : এতটুকু পানি যথেষ্ট হবে কি ? লোকেরা বলল না আমীরুল মুমেনীন, তিনি আবারও লাঠি দিয়ে পানির দিকে ইশারা করলেন। এবার পানি আরও একফুট কমে গেল। এভাবে পানির উচ্চাতা যখন তিন ফুট কমে গেল, তখন লোকেরা বলল, ব্যস এতটুকু যথেষ্ট (তথ্য সূত্র : শাওয়াহেদুন নবুওত অনুবাদ মুহিউদ্দীন খান, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৩)।

হযরত আলী (আ.) এর শাহাদাত

চল্লিশ হিজরীতে খারেজীদের একজন, মক্কায় মিলিত হল। তারা এক চক্রান্তমূলক পরিকল্পনা করেছিল যে, আলী (আ.), মুয়াবিয়া ও আমর ইবনে আসকে যথাক্রমে

কুফা, শাম ও মিশরে নির্দিষ্ট সময়ে হত্যা করবে। পবিত্র রমযান মাসের ১৯ তারিখের রাতে হত্যার তারিখ নির্ধারণ করা হলো। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য এরুপে পরিকল্পনা নির্দিষ্ট করা হলো : আব্দুর রহমান বিন মুলজাম, আলীকে (আ.) হত্যা করবে, মুয়াবিয়াকে হত্যা করবে হাজ্জাজ বিন আব্দুল্লাহ সূরাইমী এবং আমর ইবনে আসকে হত্যা করবে আমর বিন বাকর তামীমী। এ উদ্দেশে আব্দুর রহমান কুফায় আগমন করল। অবশেষে সে বিষাদ রজনী উপস্থিত হল ইবনে মুলজাম তার দুএকজন একান্ত সহযোগীর সাথে এই জঘন্য চিন্তা নিয়ে মসজিদে রাত্রি যাপন করল। এ বিষাদময় রজনীর ত্রিশ বছরেরও অধিক আগে হযরত আলী (আ.) রাসূল (সা.) এর নিকট জানতে পেরেছিলেন যে তিনি রমজান মাসে শহীদ হবেন।

হযরত আলী (আ.) বলেন : মহানবী (সা.) রমযান মাসের ঐ বিখ্যাত খোতবাটি পাঠ করলেন, আমি উঠে দাঁড়ালাম ও জানতে চাইলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! এ মাসের উৎকৃষ্ট কর্ম সমূহ কি কি ? তিনি বললেন, পাপ থেকে দূরে থাকা। অতঃপর মহানবী (সা.) বেদনাগ্রস্ত হয়ে কাঁদলেন এবং এ মাসে আমার শাহাদাত সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করলেন। ইমামের কথাবার্তা ও আচার আচরণেও সুস্পষ্ট ছিল যে, এ মাসে তিনি শাহাদত বরণ করবেন। এ কথা তিনি জানতেন, ঐ বছরেই তিনি বলেছিলেন : এ বছর হজ্জের সময় আমি তোমাদের মাঝে থাকব না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো কেন ইফতারে সময় স্বল্প খাবার গ্রহণ করেন ? তখন তিনি বলতেন : খালি পেটে মহান আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে যেতে চাই। উনিশের রাত্রিতে বিন্দুমাত্র নিদ্রাগ্রহণ করেন নি। অধিকাংশ সময় বলতেন : আল্লাহ্‌র শপথ মিথ্যা বলব না ও আমাকেও মিথ্যা বলা হয় নি, অদ্য রজনী সে প্রতিশ্রুতি রজনী।

হযরত হাসান (আ.) বর্ণনা করেন সকাল বেলা আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি বলতে লাগলেন, বৎস রাত্রি ভর এতটুকু ঘুমাইতে পারি নাই। একবার বসিয়া বসিয়াই একটু তন্দ্রার ভাব হইলে রাসূল (সা.) কে স্বপ্নে দেখিলাম। বলিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আপনার উম্মত দ্বারা আমি বড় কষ্ট পাইয়াছি। তিনি বললেন দোয়া কর যেন খোদা তোমাকে উহাদের কবল হইতে মুক্তি দেন। তারপর আমি দোয়া করিলাম : হে খোদা আমাকে উহাদের চাইতে উত্তম সঙ্গী দাও এবং উহাদিগকে আমার চাইতে নিকৃষ্ট সঙ্গীর কবলে পতিত কর। হযরত হাসান (আ.) আরো বললেন, এই সময় ইবনুল বান্না (মুয়াজ্জেন) আসিয়া নামাযের জন্য ডাকিতে লাগিলেন। আমি পিতার হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া মসজিদের দিকে যাইতে শুরু করিলাম। লোক সকল নামায। বরাবর তাঁহার নিয়ম ছিল লোকদিগকে মসজিদে আসার জন্য নিদ্রা হইতে ডাকিয়া জাগাইতেন। তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে মসজিদের দিকে রওয়ানা হইলেন : মৃত্যুর জন্য কোমর বাঁধিয়া লও কারণ মৃত্যু অবশ্যই তোমার সহিত মিলিত হইবে। মৃত্যুকে ভয় করিও না, যদি মৃত্যু আসিয়া উপনীত হয়। মসজিদের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুইটি তরবারি একত্রে চমকিতে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি আওয়াজ শোনা গেল। রাজ্য আল্লাহ্‌র, হে আলী তোমার নয়। শাবীর (ব্যক্তির নাম) লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো। কিন্তু স্রষ্টার নিকৃষ্ট সৃষ্টি খারেজী আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিমের তরবারি তার ললাট দেশে বিদ্ধ হয়ে মস্তিষ্কক পর্যন্ত এসে পৌছল। আহত হয়ে তিনি চীৎকার করে বললেন, কাবার প্রভুর শপথ, আল্লাহ্‌র শপথ আমি কৃতকার্য হয়েছি।" অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সিজদার সময় তাকে আঘাত করা হয়।

আমীরুল মুমেনীন, হযরত হাসানকে বললেন, এই ব্যক্তি (হত্যাকারী) বন্দি উহার সহিত সদ্ব্যবহার করে। ভাল খাইতে দাও, নরম বিছানা দাও, যদি বাঁচিয়া থাকি তবে আমি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করব। অথবা ক্ষমা করিয়া দিব। আর যদি মরিয়া যাই তবে উহাকে আমার পিছনেই প্রেরণ করিয়া দিও। আল্লাহ্‌র দরবারে উহার নিকট জওয়াব চাহিব। হে বনী আব্দুল মোত্তালিব, সাবধান, আমার হন্তা ব্যতীত আর কাহাকেও হত্যা করিওনা। হে হাসান (রা.) উহার এই আঘাতে যদি আমার মৃত্যু হয়। তবে উহাকেও এক আঘাত দ্বারা শেষ করিয়া দিও। ইহার নাক, কান কর্তন করিয়া লাশ বিকৃত করিও না। আমি রাসূল (সা.) কে বলিতে শুনিয়াছি সাবধান নাক, কান, কাটিও না যদি কুকুর হয় (তাবারী)। হযরত আলী (আ.) ৬৬১ খৃষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর হত্যাকারীর সাথে আচরণ বা ব্যবহার প্রমাণ করে প্রকৃত ইসলামের স্বরূপ কি তাঁর পরবর্তীতে কারবালার যুদ্ধে ইসলাম হোসাইন (আ.) ও পরিবারের সাথে তথাকথিত মুসলিম শাসকদের আচরণ তুলনা করলেই বোঝা যায় যে, এই শাসক প্রকৃত পক্ষে মুসলমানই ছিল না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হযরত ইমাম হাসান (আ.) (৬২৪-৬৭২)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র হযরত আলী (আ.) ও হযরত ফাতিমা (আ.) এর প্রথম সন্তান তৃতীয় হিজরীর (৬২৪ খৃস্টাব্দ) পবিত্র রমজান মাসের পনের তারিখে এই ধরনীতে পদার্পন করেন। নবী করীম (স:) অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য হযরত আলী (আ.) এর গৃহে আগমন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত হারুন (আ.) এর পুত্রের নাম "সাব্বার" (সুন্দর) এর অনুসরণে হযরত হাসান (সুন্দর) এর নাম করণ করেন।

হযরত ইমাম হাসান (আ.) রাসূল (সা.) এর পুত্র হওয়া সম্পর্কে কুরআন

"আপনার কাছে এই জ্ঞান আসার পর এ নিয়ে (ঈসা (আ.) কে নিয়ে) কেউ বিতর্ক করতে এলে তাকে বলুন, এসো আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের। আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজ সত্তাদের জীবন /সত্মা/প্রাণ ও তোমাদের নিজ সত্তাদের অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লানত (অভিশাপ) সূরা আল (ইমরান : ৬১)।

রাসূল (সা.) হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে নজরানের খ্রিস্টানদের অনেক বুঝালেন যে, তাঁকে যেন আল্লাহ্‌র পুত্র না বলে, তিনি হযরত আদমের উদাহরণও দিলেন, কিন্তু তারা কোন কথাই শুনলেন না। অবশেষে তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে পরস্পরের বিরুদ্ধে দোয়া ও মিথ্যাবাদীদের উপর অভিশাপ বর্ষনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যাকে "মুবাহিলা" বলে। স্থির করা হল যে, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে নিজ নিজ পুত্রদের, নারীদের (কন্যা সন্তানদের) এবং তাদের নিজেদের সত্তাপ্রাণ বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একত্র হবে এবং প্রত্যেকে অপরের প্রতি অভিসম্পাত ও আল্লাহ্‌র শাস্তি কামনা করবে। মুবাহিলার দিন সাহাবীরা সুসজ্জিত হয়ে রাসূলের গৃহে এ আশায় জমা হলেন যে হযরত রাসূল (সা.) তাদের কে সাথে নিবেন। কিন্তু তিনি প্রত্যুষে হযরত সালমান ফারসী (রা.) কে একটি লাল কম্বল ও চারটি কাঠের খুঁটি দিয়ে ময়দানে একট ছোট সামিয়ানা টাঙ্গাতে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূল (সা.) ইমাম হোসাইনকে কোলে নিয়ে ইমাম হাসানের হাত ধরলেন এবং হযরত ফাতিমাকে নিজের পিছনে, আর হযরত আলীকে (আ.) তাঁর পিছনে রাখলেন। অর্থাৎ ছেলেদের জায়গায় নাতিদের, নারীদের স্থানে কন্যাকে এবং সত্তা/প্রাণ বলে গণ্যদের স্থানে আলীকে নিলেন এবং দোয়া করলেন। হে আল্লাহ্‌ প্রত্যেক নবীর আহলে বাইত থাকে, এরা আমার আহলে বাইত। এদের সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত রাখুন। বস্তুত তিনি এরূপ ভঙ্গীতে ময়দানে পৌছালে খ্রিস্টানদের

নেতা আকিব তা দেখে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি এমন নুরানী চেহারা দেখছি যে, যদি এরা পাহাড়কে নিজ স্থান হতে সরে যেতে বলেন, তবে অবশ্যই তা সরে যাবে। সুতরাং মুবাহিলার এই প্রতিযোগিতা থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়াই কল্যাণকর, অন্যথায় কিয়ামত অবধি খ্রিস্টানদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। পরিশেষে খ্রিস্টানরা জিজিয়া কর দিতে সম্মত হল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম। যদি মুবাহিলা করত, তবে আল্লাহ্ তাদের বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দিতেন এবং ময়দান আগুনে পরিণত হতো আর নজরানের একটি প্রাণীও এমনি কি পাখি পর্যন্ত রক্ষা পেত না। এই ঘটনাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে ১) আহলে বাইতদের মর্যাদা সাহাবাদের থেকে বেশী, ২) হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন রাসূল (সা.) এর পুত্র হিসাবে বিবেচিত, ৩) হযরত আলী রাসূল (সা.) এর অনুরূপ সত্তা (নফ্‌স) বিধায় অন্যান্য নবী থেকেও শ্রেষ্ঠ। (তাফসীরে জালালাইন, ১ম খন্ড, পৃ: ৬১, বায়দ্বাভী, ১ম খন্ড পৃ-১১৮, তাফসীরের দুররে মনসুর, ২য খন্ড, পৃ-৩৯, মিসরে ছাপা)।

হযরত ইমাম হাসান (আ.) এর চেহারা মোবারক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

রাসূলের (সা.) পুত্র হিসাবে ঘোষিত হযরত ইমাম হাসান (আ.) এর চেহারা মোবারক সৌজন্য বোধ ও মহত্তে রাসূলের সাথে যে সাদৃশ্য ছিল তা অন্য কারো মধ্যে ছিলনা। কথিত আছে তাঁর মুখ মন্ডল থেকে নাভি পর্যন্ত দেহ অবযব হযরত মুহাম্মদের সা:) এর মত ছিল। তাঁর গায়ের রং ছিল লাল আভাযুক্ত ফরসা। চোখ গভীর কালো রংয়ের, মসৃন গন্ডদেশে ঘন দাড়ি, ঢেউ খেলানো প্রচুর ঘন চুল। তাঁর ঘাড় ছিল শ্বেত শুভ্র সাদা রংয়ের। সুন্দর দেহ চওড়া কাঁধ, মোটা ও লম্বা হাড়যুক্ত শরীর। তার পবিত্র দেহ মোবারক ছিল মধ্যম উচ্চতার। অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী। যে কোন জন সমাগমে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর ব্যক্তি।

ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) পবিত্রতা, মর্যাদা ও এদের প্রতি ভালবাসা ও মান্যতা ফরজ

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে : হে নবী পরিবার আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের নিকট থেকে সকল অপবিত্রতা দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে পুত পবিত্র রাখতে (সূরা আহযাব : ৩৩)।

আলোচ্য আয়াতে "আহলে বাইত" তথা নবী পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নবীর পরিবারে মূল সদস্যগণ হলেন আলী (আ.) , মা ফাতেমা যাহরা (আ.), ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন এবং তাদের বংশধরগণ তাই এটা তর্কাতীত যে, এদের পবিত্রতা কিয়ামত পর্যন্ত একটি স্বীকৃত ব্যাপার। তাই এই পরিবারেরর সদস্যগণই প্রকৃত পক্ষে অন্যদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব বা আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ। এ কারণেই এরা ইমাম, হাদী, পথ প্রদর্শক, ওলী, মুর্শিদ হওয়া এদের জন্য নির্ধারিত।

আমরা ইতোমধ্যে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে দেখতে পাই যে, নবী রাসূলদের অন্যতম দায়িত্ব হলো মানুষের নফ্‌স পরিশুদ্ধ করন। এ কারনেই নায়েবে রাসূল তথা নবী-রাসূলের উত্তরাধিকারী হতে হলে অতি অবশ্যই তাকে এই ক্ষমতার/মর্যাদার অধিকারী হতে হবে। এই ধারবাহিকতায় আহলে বাইতগণই এই ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ্‌তালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ; এটাই সেই বিষয় যার সুসংবাদ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের দান করেন, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে। হে রাসূল আপনি বলে দিন, আমি এর (ধর্ম প্রচার বা জ্ঞান বিতরণের জন্য তোমাদের নিকট থেকে আমার পরমআত্মীয়দের প্রতি সৌহার্দ (মোয়দ্দাত বা অকৃত্রিম ও চিরস্থায়ী ভালবাসা) ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান (গুরু দক্ষিণা) চাহিনা এবং যে ব্যক্তি উত্তম কার্য করবে আমি তাঁর জন্য এতে কল্যাণ বৃদ্ধি করে দেব নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু (সূরা : ২৩)।

তাফসীরে কাশশাফ, রুহুল বায়ান, তাফসীরে কবীর, তাফসীরে দুররে মানসুর প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে আয়াত নাযিল হলে মহান নবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের ভালবাসার উপর মৃত্যুবরণ করে সে শহীদের মৃত্যুবরণ করে, সে পূর্ণাঙ্গ ইমান সহ মারা যায় তাঁকে মালাকুল মওত ও মুনকীর-নাকীর বেহেস্তের সুসংবাদ দান করেন। তাকে বেহেশতে সেভাবে প্রেরণ করা হবে যেমন "নববধু" স্বামীর গৃহে যায়। আর যারা তাদের প্রতি শত্রুতায় মৃত্যুবরণ করে। কিয়ামতে তাদের ললাটে কাফের লেখা থাকবে, "এরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত। স্মরণ রেখো তারা কাফির, তারা বেহেস্তের সুগন্ধও পাবে না।" উল্লেখ্য এরই ধারাবাহিকতায় নবী-অলিদের মৃত্যু দিবসকে উরস বলা হয়। এটি পবিত্র কুরআন সমর্থিত কার্যক্রম অথচ এক শ্রেণীর আলেম এটিকে শিরিক বিদআত বলে থাকেন। তখন জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, তারা কারা, যাদের ভালোবাসা আল্লাহ্ আমাদের জন্য ফরজ করেছেন? জবাবে রাসূল (সা.) বলেন, আলী (আ.), ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (তদীয় বংশধরগন)। তিনি আরো বলেন যারা এদের উপর জুলুম করবে এবং এদের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেবে তাদের জন্য বেহেস্ত হারাম হয়ে যাবে। কারণ বেহেস্তের মালিকানা এদের হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে। তফসীরে সালাবীতে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত "উত্তম কর্ম"

বলতে মহানবী (সা.) এর বংশধরদের প্রতি ভালবাসাকে বুঝানো হয়েছে। তাফসীরে কাশশাফ থেকে রেওয়াতটি নকল করা হয়েছে।

আমীরুল মুমেনীন হযরত ইমাম হাসান (আ.)

আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও হযরত রাসূল (সা.) এর সুন্নত মোতাবেক হযরত আলী (আ.) ওসিয়তনামা রেখে যান। সিফফিনের যুদ্ধের পর এটা লিখা হয়। এটি আল্লাহ্‌র বান্দা আলী ইবনে আবু তালিবের (আ.) ওসীয়ত নামা। আল্লাহ্‌র রহমত হাসিলের জন্য তার সম্পত্তি কিভাবে ব্যয়িত হবে এটা তারই নির্দেশ। যে রহমত তাকে দেবে শান্তি আর বেহেস্তের প্রবেশাধিকার। আমার পর আমার পুত্র হাসান হবেন আমার সম্পত্তির মুতওয়ালী বা তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালক। তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম আর ইসলামী আইন অনুসারে গরিব, দুঃখী, অভাবগ্রস্তদের সাহায্যে এ সম্পত্তি থেকে ব্যয় করতে পারবেন। যদি হাসানের কিছু ঘটে আর হোসাইন জীবিত থাকেন তাহলে হাসানের পর তিনিই মুতওয়ালী ও তত্ত্বাবধায়ক হবেন। (তথ্য সূত্র হযরত আলী, আবুল ফজল, পৃ: ১৬১)

এই ওসীয়তের মর্মানুযায়ী হযরত আলী (আ.) এর শাহাদাতের পর হযরত ইমাম হাসান (আ.) মুসলমানের বৈধ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ইবাকী জনগণের পক্ষ থেকে তাঁকে আমিরুল মোমেনীন হিসাবে ঘোষণা এবং হিজাজ, ইয়েমেন, পারস্য থেকে কোন প্রতিবাদের অনুপস্থিতি ছিল মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের জন্য একটি বিরাট ভয়ের কারণ। কারণ তার অবৈধ ক্ষমতা দখলের জন্য এটা ছিল পর্বত প্রমাণ বাধা। মুয়াবিয়া হযরত হাসানকে আমিরুল মুমেনীন বা মুসলিম উম্মাহ্‌র খলিফা হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করার দ্রুত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া মুয়াবিয়া হাসান (আ.) এর অধীনস্থ এলাকায় হাসানের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য বহ গুপ্তচর নিয়োগ করেন। এই সব গুপ্তচররা কুরআনের অপব্যাখ্যা, মিথ্যা হাদিস প্রচার, তার সেনানায়কদের ঘুষ, ভয় দেখিয়ে, আবার ক্ষেত্র বিশেষে গুপ্ত হত্যা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এক ধরণের ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন এবং সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও ট্রান্স জর্ডানের সেনাপতিদের ডেকে ব্যাপক যুদ্ধের আয়োজন করেন। অল্প দিনের মধ্যে মুয়াবিয়া প্রায় ষাট সহস্রের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হাসানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে। খিলাফতের প্রকৃত ইতিহাস, ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক, ইসলামের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উত্তরাধিকার প্রকৃতি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হযরত ইমাম হাসান ও মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে এই সময়কার পত্রালাপ বর্তমান সময়ে আমাদের ইতিহাস বিকৃতির শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং তা অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক ও আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস। হযরত ইমাম হাসান (আ.) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে পত্রালাপ।

রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর হযরত হাসান (আ.) তাঁর পত্রে আহলে বাইতদেরকে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে অত্যন্ত অন্যায় ও নীতি বিগর্হিত পদ্ধতিতে তাদের খিলাফতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ঘটনাকে পুনর্ব্যক্ত করে তিনি তার পত্রের শেষাংশে লিখেছিলেন, "কজন ব্যক্তি ইসলামের দিক থেকে অগ্রগামী ও বিভিন্ন গুনাবলী সম্পন হওয়া সত্ত্বেও প্রথম তিন খলিফা সম্পর্কে" আমাদের (আহলে বাইত) থেকে জোর করে খিলাফতের অধিকার কেড়ে নেওয়া দর্শনে আমরা মর্মাহত হয়েছিলাম। আর এখন হে মুয়াবিয়া, তোমার অধিকার চর্চার দৃশ্য দেখাটি কি গভীর মর্মবিদারকও কি অদ্ভুত। দ্বীনের ক্ষেত্রে তোমার কোন খ্যাতি নাই। তোমার মধ্যে ইসলামের এমন কোন আসন নেই যা কখনো প্রশংসিত হয়েছে। বরং তুমি হচ্ছো গিয়ে "হিযবে মিনাল আযহাবো" (মুয়াবিয়া ও তার কুখ্যাত পিতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে অনেকগুলি দল একত্রিত হয়ে মদীনাকে ধ্বংস করার যে সর্বশেষ প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতি ইংগিত)। এর পুত্র। তোমার পিতা ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে হতে রাসূল (সা.) এর সবচেয়ে বড় শত্রু। সুতরাং বাতিলের পক্ষে সংগ্রাম করা থেকে বিরত হও এবং অন্যদের মত তুমিও আমার আনুগত্য স্বীকার করে নাও। কারণ তুমি নিশ্চয় জানো যে, খোদা ও সমস্ত ভালো লোকদের চোখে তোমার চেয়ে আমি খলিফা হওয়ার জন্য অনেক বেশী উপযুক্ত। কারণ গাদীরে খুমে রাসূল (সা.) এর নির্দেশ ও বৈধ খলিফা আলীর মনোনয়ন ও সংশিষ্ট সকলের মান্যতার জন্য হাসান (আ.) কে খলিফা স্বীকার করা সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য পালনীয় ছিল)। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং বিদ্রোহ ও মুসলমানদের রক্তক্ষরণের দায় নিয়ে তোমার প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তুমি কোন ভাল প্রতিদান লাভ করতে পারোনা (মাকাতিল পৃ- ৫৬, আবু মিখনাফ হতে, ইবনে আসেম, ৪, পৃ- ১৫১)।

হযরত হাসান (আ.) এর পত্রের প্রত্যুত্তর ছিলো : তুমি রাসূল (সা.) এর ওফাতের এবং সে সময়ে মুসলমানদের মধ্যে উপস্থিত বিবাদের কথা উল্লেখ করেছো। (এক শ্রেণীর মুসলিম বুদ্ধিজীবী এই মত বিরোধের মূল কারণ জানেন না ও স্বীকার করেন না, এটা যে আল্লাহ্‌ ও রাসূল (সা.) এর নির্দেশের প্রত্যক্ষ লংঘন তা অনেকেই মানতে রাজী নন)। এতে তুমি সুস্পষ্টভাবে আবু বকর, উমর ও আবু উবায়দার এবং মুহাজের ও আনসারদের মধ্য হতে নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছো। (ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের জঘণ্যতম

শত্রুর পরিবারের সদস্য এবং মহান নবী বংশীয় ইমামের কথা অগ্রাহ্য করা হচ্ছে)। সে, সমস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করাকে আমি ঘৃণা করি। কারণ তার পরিবারের ক্ষমতায়ন ও সৌভাগ্যের কারণ এরাই)। নবীজীর পরে নের্তৃত্ব নিয়ে উম্মাহের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় তখন তারা তোমার পরিবারের গুণাবলী, যোগ্যতা, রাসূলের (সা.) সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কের ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন না, কিংবা তারা ইসলামী গুণাবলী সম্পর্কে অসেচতন ছিলেন না। কিন্তু তারা দেখতে পেলেন এ জিনিষটি খেলাফত সাধারণ কুরাইশর জন্য উপযুক্ত তাই তারা আবু বকর (রা.) কে মনোনীত করেন। (অর্থাৎ তাঁরা জেনে বুঝেই আল্লাহ্ ও তার রাসূলের নির্দেশ লংঘন করেছিলেন)। তুমি আমাকে বিষয়টির শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হয়ে আত্মসমর্পন করতে বলেছো, কিন্তু তোমার আর আমার অবস্থান এমন একস্থানে উপনীত হয়েছে ঠিক যেমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিলো রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর তোমার পরিবার (হযরত আলী) ও আবু বকর (রা.) এর মধ্যে। যদি আমার মনে হতো যে জনগণের ব্যাপারে আমার চেয়ে তোমার জ্ঞান বেশী, তুমি আমার চেয়ে ভালোভাবে উম্মাহর রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে। আমার চেয়ে ভালোভাবে মুসলমানদের জানমালের হেফাজত করতে এবং শত্রুদের পরাভূত করতে সক্ষম হবে তাহলে তুমি আমাকে যা করতে বললে আমি ঠিক তাই করতাম। কিন্তু আমি অনেক বেশী সময় ধরে শাসন কাজ চালিয়েছি। তোমার চাইতে নীতি নির্ধারণে আমি পাকা ও বয়সে বড়। তাই তুমি আমাকে যা বলছ সেটার উপর বেশী জোর করে কোন লাভ হবে না। তুমি যদি এখন আমার আনুগত্য স্বীকার করে নাও তাহলে আমার পরে তুমিই হবে খলিফা। (মাকাদল, পৃ: ৫৭, আবু মিখনাফ, ইবনে আসেম, ৪, পৃ-১৫২)। উল্লেখ্য , মুয়াবিয়া প্রদর্শিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিয়ষটি যে ঐশী নির্দেশনার নেতৃত্বের যোগ্যতা বিবেচনায় অগ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ্র নির্দেশে রাসূল (সা.) কর্তৃক জায়েদ ও তাঁর পুত্র ওসামার নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধুমাত্র যারা ধর্মহীন ও নীতিহীন ঐশী জ্ঞান বিবর্জিত ব্যক্তিরাই বর্তমান সময় পর্যন্ত নেতৃত্বের এসব মর্যাদা ধর্ম রাজনীতিতেও প্রযোজ্য বলে আসছেন।

হযরত হাসান আমীরুল মোমেনীন হয়েছেন, এই সংবাদ জানা মাত্র মুয়াবিয়া ইরাকের উপর আক্রমন পরিচালনার আদেশ দেন। হযরত হাসান (আ.) উহার মোকাবিলার জন্য একটি সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু খিলাফত নিয়ে এভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ আরও রক্তপাত ঘটাতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। উপরন্ত দুইটি বিবদমান গ্রুপের মধ্যে শান্তি স্থাপন সম্পর্কে হযরত হাসান (আ.) এর ব্যাপারে সম্পর্কে রাসূল (সা.) যে ওসীয়ত করেছিলেন তার আলোকে হযরত হাসান মুয়াবিয়ার সাথে কয়েকটি শর্তে সন্ধি স্থাপন করেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, হযরত আলী (আ.) এর সাথে সন্ধির পর দামেসকে ফিরে এসে তার সকল আস্থাভাজন লোকদের সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন। তাদের সকলের উপস্থিতিতে মুয়াবিয়া দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন "হে লোকেরা" আল্লাহ্র নবী আমাকে বলেছিলেন, অবশ্যই তুমি আমার পরে ক্ষমতা পাবে। ন্যায়পরায়ন লোকদের দ্বারা শাসন কাজ চালাবে। আমি তোমাকে মনোনীত করলাম। আবু তোরাবকে অভিসম্পত করবে (কি জঘন্য মিথ্যাচার)। এর পর থেকে হযরত আলীর প্রতি লা'নত বর্ষণের প্রথা চালু করা হয়। এরপর থেকে মুয়াবিয়ার অধীনস্থ এলাকার সকল মসজিদের মিনার থেকে একযোগে জুমাহ্ ও হযরত আলী (সা.) মুয়াবিয়া নামাযের খুতবায় হযরত আলীর প্রতি অভিসম্পাতের প্রথা রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করা হয়। অভিসম্পাতে মুয়াবিয়া যা শিক্ষা দেয় তাহলো : হে আল্লাহ্, আলীর প্রতি লা'লত বর্ষণ করো (নাউজুবিলাহ মিন জালিক) কারণ সে তোমার দ্বীনকে অস্বীকার করেছে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাকে জাহান্নামের সুকঠিন শাস্তি দান কর।" (আল নাসাই আল কাফিয়াহ, পৃ-৭২) মুয়াবিয়া তার সকল গভর্ণরদের প্রতি রাসূল (সা.) এর ভাই ও তার ওয়াসী বা উত্তরাধিকারী মহান আহলে বাইতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাদেরকে ভালবাসা ও মান্য করা পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক ইমানদার মুসলমানদের জন্য ফরজ তাঁর প্রতি লানত বর্ষনের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। আর যে বা যারা এর বিরোধিতা করা হলে তাকে "রাফেজী", "শিয়া" যিন্দিক (ধর্ম পরিত্যাগ কারী) আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে যথেচ্ছা শাস্তি দেওয়ার জন্য গভর্ণরদের প্রতি নির্দেশ জারী করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় উমাইয়া আমলে আহলে বাইতদের সম্মানিত সদস্য ও তাদের অনুসারীদের উপর নেমে আসে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় তথা, সকল প্রকার নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকা, রাষ্ট্রীয় চাকুরীতে অযোগ্যতা ও নির্যাতিত বা খুন হওয়া একটি রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে প্রবর্তন করা হয়। ফলে উমাইয়া সামরিক বাহিনীতে এক ব্যাপক সংখ্যক আহলে বাইত বিরোধী ও সকল প্রকার জঘণ্য কাজের হোতা, ধর্মহীন, নীতিহীন সেনা সদস্যদের সমাবেশ ঘটে। যারা আহলে বাইতের মহান সদস্য হোসাইন (আ.) কে কারবালায় হত্যা, নবী বংশের সম্মানিত মহিলাদের ওড়না ছিনিয়ে নেয়া, তাদের গহনা লুট করার জন্য কানের লতি ছিন্ন করা, মদীনায়, রাসূল (সা.)-এর রওজা মোবারককে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করা, রাসূল (সা.) সাহাবাদের সম্মান হানি ও হত্যা ও নির্যাতন, মদীনার সম্মানিত ১০০০ মহিলাকে গণধর্ষণ, পবিত্র কাবা শরীফের পর্দায় আগুন

লাগানো, কাবাগৃহের ছাদে মৃতদেহ টাঙ্গানো ইত্যাদি জঘন্যতম কাজ করতে পিছপা হয়নি। তাছাড়া আহলে বাইত বিরোধী প্রচারনা কতখানি গভীরভাবে মুসলিম সমাজে প্রোথিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় উমাইয়া খিলাফতের পতনের (৭৫০ খৃ) পর যখন সিরিয়ার কতিপয় আলেম ও মাশায়েখ আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাসের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন। খলিফা আব্বাস তাদের বললেন যে, তোমরা সর্বদাই বন্যু উমাইয়ার হিতৈষী রহিয়াছ কখনও বনি হাশীমের (আহলে বাইত) নিকট আসনি। তোমরা একথা মনে কর নাই যে, বনি হাশীম রাসূল (সা.) এর বংশ তথা আত্মীয় (আহলে বাইত)। সেই আলেম ও মাশায়েখগণ আল্লাহ্‌র কসম করে বলেছিলেন আজ পর্যন্ত আমাদের জানা ছিলনা যে, বনি হাশীম রাসূল (সা.) এর আত্মীয়। আমরা জানি যে, বন্যু উমাইয়াগণেই সকল সম্মানের মালিক। (খিলাফতের ইতিহাস, লেখক আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী, পৃ-১৪৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশন)। হযরত হাসান (আ.) সাথে মুয়াবিয়ার চুক্তি। যা হোক, নিম্নোক্ত ধারা ও শর্তগুলোর উপর ভিত্তি করেই ইমাম হাসান বিন আলী (আ.) ও মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানর মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হয়।

১। হাসান বিন আলী মুয়াবিয়ার নিকট শাসন ব্যবস্থা বা সরকার ব্যবস্থা (খিলাফত/ইমামত নয়)। যাতে 'সে আল্লাহ্‌র কুরআন, রাসূলের (সা.) এর সুন্নাহ্, পূর্ববর্তী ধার্মিক ও আমানতদার খলিফাদের ন্যায় পরিচালনা করবেন।

২। তার (মুয়াবিয়ার পরবর্তীকালে) কাউকে খলিফা মনোনয়ন দেয়ার ক্ষমতা মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের থাকবে না। মুয়াবিয়ার পর খিলাফত ও শাসন কর্তৃত্ব হাসান বিন আলী (আ.) এর উপর বর্তাবে এবং তাঁর অবর্তমানে হোসাইন বিন আলী (আ.) এর নিকট তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

৩। সিরিয়া, ইরাক তোহমা, হেযাজ বা কোন অঞ্চলের সাধারণ জনতার জান, মাল, ইজ্জত নিরাপদ থাকবে।

৪। হযরত আলী এবং তার পরিবারের সকল সদস্যদের ও তাদের অনুসারীদের জান, মাল, ইজ্জত সুরক্ষিত থাকবে, আর এ বিষয়ে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ থাকবে এবং আল্লাহ্‌র সাথে কৃত এই ওয়াদার প্রতি সম্মান বজায় রাখবে।

৫। হাসান বিন আলী (আ.) ও আহলে বাইতদের গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন প্রকার আক্রমন করতে পারবে না এবং কাউকে পৃথিবীর কোন ভূখন্ডে আতংকিত করতে পারবে না।

৬। হযরত আলী (আ.) কে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করা হবে এবং তাঁকে কোন প্রকার গালিগালাজ করা/দেয়া যাবে না।

পবিত্র কুরআনের শুরু মায়েদার ১৩ নম্বর আয়াত ও সূরা বাকাবার ২৭ নম্বর আয়াতে চুক্তির শর্ত প্রতিপালন করা ফরজ জানা সত্ত্বেও মুয়াবিয়া হাসান বিন আলী (আ.) এর সাথে তার সম্পাদিত চুক্তির একটি ধারাও প্রতিপালন করেনি।

তবে এই চুক্তি সম্পাদন করার পর হযরত হাসান (সা.) সপরিবারে মদীনায় ফিরে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই মুয়াবিয়ার ইঙ্গিতে হযরত হাসান (আ.) কে বিষপান করানোর ফলে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। (২৮ সফর, ৫০ হিজরী, ৬৭২ খৃস্টাব্দ) প্রকৃত পক্ষে মুয়াবিয়া কর্তৃক সাক্ষরিত এই চুক্তির মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত হয় যে আহলে বাইতগণই রাষ্ট্রীয় ও আধ্যাত্মিক (ধর্মীয়) ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের একমাত্র বৈধ অধিকারী বা কর্তৃপক্ষ।

হযরত ইমাম হাসান হযরত আলী (আ.) জ্ঞানেরও উত্তরাধিকারী

হযরত আলী (আ.) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওয়াসী বা উত্তরাধিকারী । তিনি রাসূল (সা.) এর আধ্যাত্মিক ও ঐশী জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। হযরত আলী তাঁর জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্য ৬ জন খলিফা নিয়োগ করেন এবং হযরত ইমাম হাসান (আ.) ছিলেন তার প্রধান খলিফা। হযরত ইমাম হাসান (আ.) যে আহলে বাইত হিসাবে নবুওতের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী তা মুয়াবিয়া সম্যক অবহিত ছিল। তাই মুয়াবিয়া হযরত হাসানকে (আ.) তিনি প্রকৃতপক্ষে খেলাফতের প্রতি লোভী বা দুনিয়াত্যাগী তা পরীক্ষা করার জন্য তাঁর সাথে চুক্তি সাক্ষরের সময় জিজ্ঞাসা করে, হে হাসান, আমার অনুমান, আপনার মন আবারও খেলাফত চাচ্ছে? উত্তরে তিনি বলেন, হে মুয়াবিয়া, নিশ্চয় খেলাফত তাঁরই অধিকার যে রাসূল (সা.) এর পন্থায় চলে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও নির্দেশ পালন করে। আর আমার প্রাণের কসম। আমরা হলাম হেদায়াতের নিশান আর তাকওয়ার আলোকবার্তিকা, কিন্তু তুমি হে মুয়াবিয়া তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা (রাসূলের) সুন্নতকে ধংস করে, বিদআতকে উজ্জীবিত করে আর আল্লাহ্‌র বান্দাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে খেলনা মনে করে। আর তুমি যার মধ্যে রয়েছ (যে পদে অবৈধভাবে হস্তগত করেছ) তা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কম সময়ই বেঁচে থাকবে। কিন্তু এর মন্দ প্রতিফল তোমার উপর অবশিষ্ট থাকবে। ইসলাম ধর্মের জঘন্য শত্রু হয়েও সে জানত ইমাম হাসান তার চেয়ে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ এবং বেহেশতের সর্দার। মুয়াবিয়া প্রশ্ন

করে : হে হাসান, এখন তাজার তাই খোরমা সম্পর্কে আমাদের বলুন। উত্তরে তিনি বলেন, হাঁ, মুয়াবিয়া, বায়ু তাকে নিষিক্ত করে এবং সূর্য তাকে ফুঁকে দেয়, আর চন্দ্র তার বর্ণ বিন্যাস করে। আর উত্তাপ তাকে পাকায় আর রাত তাকে হিমায়িত করে।
অতঃপর মুয়াবিয়া বলেন, হে আবা মুহাম্মদ, শবে কদর সম্পর্কে আমাদের বলুন ?
ইমাম বললেন, হ্যা, এসব কথা জিজ্ঞাসা কর। যে আল্লাহ্ আসমান সৃষ্টি করেছেন, সাত জমিন সৃষ্টি করেছেন, সাত দিন সৃষ্টি করেছেন, সাত থেকে, আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন সাত থেকে। আর শবে কদরকে ২৩ এর রাত থেকে ২৭ এর রাতের মধ্যে অন্বেষণ কর।

ইমাম হাসান (আ.) এর কাছে করা রোম সম্রাটের কিছু প্রশ্নের উত্তর

মুয়াবিয়া অচেনা এক লোককে পাঠাল আমীরুল মোমেনীন, হযরত আলী (আ.) কাছে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য। যা রোম সম্রাট তার কাছে জানতে চেয়েছিল। ইমামের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে তার আসল পরিচয় দিলে মওলা আলী (আ.) বলেন, আল্লাহ্, কলিজা ভক্ষক হিন্দার পুত্রকে ধ্বংস করুন। কারণ সে নিজেও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তার সঙ্গীদেরও পথভ্রষ্ট করেছে। আমারও এই উম্মুতের (মুয়াবিয়ার অনুসারী) মাঝে আল্লাহ্ বিচার করুন, তারা আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে এবং আমার উচ্চ মর্যাদাকে হেয় করেছে আর আমার সময় নষ্ট করেছে।
অতঃপর বললেন : হাসান, হুসাইন ও মুহাম্মদকে আমার কাছে আন। তারা আসলে তাদের প্রতি ইশারা করে সিরিয় লোকটিকে বললেন : হে সামদেশী ভাই। এরা দুজন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সন্তান। আর এটা (মুহাম্মদ) আমার সন্তান। এদের যার কাছ থেকে চাও তোমার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। শামের লোকটি বলল, এর (হাসানের) থেকেই জিজ্ঞাসা করি। অতঃপর এভাবে প্রশ্ন করা শুরু করল : ১। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে দূরত্ব কত? ২। আকাশ ও মাটির মধ্যে দুরত্ব কত? ৩। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব কত? ৪। চাঁদের উপর ঐ কালিমা কী ৫। কওস ও ফুথহ কী ? ৬। ছায়া পথ কি? ৭। কোন পানি পৃথিবীতে চলতে শুরু করে, ৮। যে ঝর্ণায় মুমিনদের ও মুশরিকদের আত্মা সমূহ আশ্রয় নিবে সেটা কোন টা। ঐ দশটি জিনিস কী কী যার প্রত্যেকটি অন্যটির চেয়ে কঠিন এর বা শক্তিশালী। ৯। মুআন্নাস কি?
ইমাম হাসান (আ.) বলেন : হে শামদেশী ভাই, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চার আঙ্গুলের ব্যবধান। যা তোমরা স্বচক্ষে দেখবে সেটাই সত্য। আর নিজের কান দ্বারা অনেক অসত্য শুনবে। আর আকাশ (অদৃশ্য) উর্ধ্বজগত ও পৃথিবীর মধ্যে (অত্যাচারিতের আর্তনাদ) দোয়ার এবং একবার দৃষ্টি নিক্ষেপের সমান দুরত্ব রয়েছে অর্থাৎ কোন ব্যবধানই নাই। যে কেউ এর ব্যতিক্রম বলবে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে।
আর পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সূর্যের এক দিনের অবিরাম চলার সমান দুরত্ব রয়েছে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখ যখন উদিত হয় আর তাকিয়ে দেখ যখন অস্ত যায় যে এর ব্যতিক্রম বলবে তাকে মিথ্যাবাদী গন্য করবে। আর এই যে, ছায়াপথ এটা হলো আকাশের ঐসব ফাটল, যা নূহের (আ.) তুফানের সময় বন্যার ন্যায় পানির অবতরনের স্থান ছিল।
আর কওস ও ফুযহ। তবে ফুযল বল না। কারণ, ফুযহ হলো শয়তান, কিন্তু কওস হলো আল্লাহ্র, যা ডুবে যাওয়া থেকে আশ্রয় স্বরূপ। আর চাঁদের উপর কালিমার দাগ। আসলে চাঁদেরও সূর্যের মতো আলো ছিল। আল্লাহ্ তাকে মুছে দিয়েছেন ও অন্ধকার করে দিয়েছেন আর দিনের নিদর্শনকে (সূর্য) দৃশ্যমান করেছেন। আর সর্ব প্রথম পৃথিবীর দৃশ্যমান হয় সেটা হলো "অন্ধকার প্রান্তর" আর সর্বপ্রথম যে জিনিসটি পৃথিবীর উপর গতিবান হয় (গজায়) সেটা ছিল খেজুর গাছ। আর যে ঝর্নায় মুমিনদের আত্মা আশ্রয় নিবে তার নাম "সালমা" আর যে ঝর্নায় কাফেরদের আত্ম আশ্রয় নিবে তার নাম "বারাহুত"।
আর মুআন্নাস ঐ লোককে বলা হয় যে পুরুষ না কি নারী তা বোঝা যায় না। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। যদি নারী হয় তাহলে স্তন গজাবে। আর যদি পুরুষ হয় তাহলে দাড়ি গজাবে। যদি এসব চিহ্ন পরিদৃষ্ট না হয় তাহলে তাকে বলতে হবে দেয়ালে প্রস্রাব কর। যদি তার উষ্ট্রীর ন্যায় প্রস্রাব পিছনের দিকে যায় তাহলে নারী। আর যে দশটা জিনিস একটি অন্যটির চেয়ে কঠিনতর আল্লাহ্ সবচেয়ে কঠিন যে জিনিসটি সৃষ্টি করেছেন সেটা হলো পাথর, তার চেয়ে কঠিনতর হলো লোহা, আর তার চেয়ে কঠিনতর হলো আগুন, আর আগুনের চেয়ে কঠিনতর হলো পানি, আর পানির চেয়ে কঠিনতর হলো মেঘ, আর মেঘের চেয়ে কঠিনতর হলো বায়ু। আর বায়ুর চেয়ে কঠিনতর হলো ফেরেশতা। আর ফেরেশতার চেয়ে কঠিনতর হলো মৃত্যুদূত, আর তার চেয়ে কঠিনতর হলো মৃত্যু। আর মৃত্যুর চেয়ে কঠিন তর হলো আল্লাহ্র নির্দেশ।
শামের লোকটি বললো : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এরই সন্তান যদিও আলী (আ.) মুহাম্মদের ওয়াসী। অতঃপর সে এই উত্তরটি লিখে এবং মুয়াবিয়ার জন্য নিয়ে গেল। আর মুয়াবিয়া সেটাকে ইবনুল আসফার (রোমান সম্রাট) এর কাছে পাঠিয়ে দিল। যখন তা তার হাতে পৌছল, তখন বলল : আমার বিশ্বাস, এই উত্তর মুয়াবিযার থেকে নয় বরং এর উত্তর নবুওতের খানদান ব্যতীত হতে পারে না।

ভাগ্য বনাম স্বাধীন ইচ্ছা সম্পর্কে হযরত ইমাম হাসান (আ.)

সমগ্র বিশ্বে সাধারণ মানুষ থেকে দার্শনিক সকল মহলে এই বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে এবং অদ্যাবধি তা অব্যহত হয়েছে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক লোকই নাস্তিক বা খোদাদ্রোহী হয়ে মানুষের চিন্তা ও দর্শন জগতে এক মহা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। রাসূল (সা.) এর ওফাত পরবর্তী যুগে মুসলমানদের মধ্যে একদল এ ব্যাপারে বিশেষ করে উমাইয়াদের প্রচারনায় মহা বিভ্রান্তির শিকার হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উমাইয়াগণ পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের সমস্ত জুলুম অত্যাচারের দায়-দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর বর্তানোর যুক্তি প্রদর্শন করে নিজেরা বিভ্রান্ত হয় এবং প্রচুর লোককে বিভ্রান্ত করে। এই বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রখ্যাত আল্লাহ্‌র ওলী ও ইমাম আলী (আ.) এর অন্য এক খলিফা হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানার জন্য হযরত ইমাম হাসানকে (আ.) পত্র লিখেন। পত্রে হাসান বসরী উল্লেখ করেন যে, আপনারা বনি হাশীম গোত্র, প্রবহমান নৌকা এবং উত্তাল তরঙ্গ আর মূল সড়কের আলোকোজ্জল নিশানা স্বরূপ। অথবা নূহের নৌকার ন্যায় যাতে মুমিনরা আরোহন করে এবং মুসলমানরা তার সাহায্যে রক্ষা পায়। হে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সন্তান। আমি এ চিঠিটা আপনার কাছে লিখছি, কারণ কদর (ভাগ্য) এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের মত পার্থক্য রয়েছে। আর সক্ষমতা বা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রসঙ্গে আমরা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছি না। আপনি আমাদের জানান (এ ব্যাপারে) আপনার ও আপনাদের পূর্ব পুরুষদের বিশ্বাস কী? কারণ, আপনারা আল্লাহ্‌র জ্ঞান থেকে শিখেছেন। আর আপনারা জনগণের উপর হুজ্জত আর আল্লাহ্ হলেন আপনাদের উপরে হুজ্জত (দলীল)। আর আপনারা শ্রবণকারী এবং সর্বজ্ঞানী। ইমাম হাসান (আ.) তার উত্তর দেন এরূপে : বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম, তোমার চিঠি আমার কাছে পৌছেছে। যদি তোমার এবং তোমার পূর্বে যারা বিগত হয়েছে তাদের সিদ্ধান্তহীনতা না থাকত তাহলে আমি তোমাকে এ বিষয়ে সংবাদ দিতাম না। পর সংবাদ, যে ব্যক্তি 'কদর' (ভাগ্যের অপরিবর্তনশীলতা) এর শুভ ও অশুভে বিশ্বাস করে না যে, আল্লাহ্ তা জানেন, নিশ্চিত সে কাফের। আর যে ব্যক্তি পাপ সমূহকে (নিজের) আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে এবং তারই কাজ বলে মনে করে। নিশ্চয় সে খোদাদ্রোহী ও পাপাচারী সত্যই আল্লাহ্ জোরপূর্বক অনুগত্য প্রাপ্ত হন না। আর কারো অবাধ্যতায় পরাজিত হন নি। মানুষকে তার আনুগত্য থেকে মুক্ত করে দেননি। আর তাদেরকে নিজের উপর ছেড়ে দেন নি। বরং তিনি হলেন তাদেরকে দেওয়া সব কিছুর মালিক। আর তাদেরকে ক্ষমতা তথা ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন যে তার উপর ক্ষমতাবান। বরং তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারা স্বাধীনভাবে তা গ্রহণ করে এবং তাদেরকে নিষেধ করেছেন যাতে স্বাধীনভাবে তা বর্জন করে। কাজেই যদি তার নির্দেশ অনুযায়ী চলে তাহলে এক্ষেত্রে অন্তরায় নাই।

আর যদি অবাধ্যতার পথে অগ্রসর হয় আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান এবং তাদেরকে বিরত করতে চান তাহলে তা পারেন। আর যদিও বা তা না করেন তাহলেও আল্লাহ্ জোরপূর্বক তাদের ঐ কাজে প্রবৃত্ত করেন নি এবং তাদেরকে বাধ্য করেন নি। উপরন্তু তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদেরকে দৃষ্টিবান করেছেন এবং (ভাল-মন্দের) পরিচিতি জ্ঞান দান করেছেন এবং সতর্ক করেছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন ও নিষেধ করেছেন। তাদেরকে ফেরেশতাদের ন্যায় স্বভাবত তার নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন নি। আর যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করেছেন তাতে বাধ্য করেন নি। সুস্পষ্ট হুজ্জত (প্রমাণ) আল্লাহ্‌রই। তিনি যদি চান তাহলে সকলকে সত্যে উপনীত করেন। আর সবার উপরে যে সত্য পথ অনুসরণ করে। (তথ্য সূত্র : তুহাফুল উকুলে আন আলের রাসূল (সা.) মূল : শেখ আবু মুহাম্মদ আলী হাসান ইবনে আলী ইব্রাহিম হুসাইন ইবনে শুবা আল-হাববানি (বহ), অনুবাদ আব্দুল কুদ্দুস বাদশাহ, প্রকাশ কাল, এপ্রিল, ২০১৪, আইএস বিএন :৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৬৭০০-৬)।

রাসূল (দঃ) হাদিস বর্ণনা কারী হযরত হাসান (আ.)

আবু মুআ বর্ণনা করেছেন, তিনি একদিন হাসান (আ.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, পিতামহ হিসাবে রাসূল (সা.) নিশ্চয়ই বিশেষভাবে আপনাদের জন্য অনেক কিছু বলেছেন। তার মধ্য থেকে কোন একটি কে আপনি দয়া করে আমাদেরকে শুনাবেন। হাসান (আ.) বর্ণনা করেছেন, বিতরের নামায আদায়ের সময় বিশেষ কিছু দোয়া পাঠের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন্ সেগুলো হলো : হে আল্লাহ্ আমাকে তারই মাধ্যমে পরিচালিত কর। যাকে তুমি সুপথে পরিচালিত করেছ, তারই মাধ্যমে আমার মঙ্গল কর, তুমি যার মঙ্গল করেছ, তারই মাধ্যমে আমার প্রতি পালন করেছ, আমাকে যা দান করেছ, সে গুলোকে তুমি তোমার নেয়ামত হিসাবে গন্য কর, তোমার বিধানের আলোকে যা কিছু অন্যায় তা করা হতে আমাকে রক্ষা কর, তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, তারপরে সিদ্ধান্ত দেওয়ার আর কেউ নাই। তুমি যাকে চাও, তার মর্যাদা কখনও হ্রাস পায় না, হে প্রভু তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম। হাসান (আ.) বর্ণনা করেছেন, একদা আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, আরবদের অভিভাবককে আসতে বলো। তিনি

আলীকে (ক:) কে বুঝালেন। আয়েশা (রা.) বললেন, কিন্তু হে আল্লাহ্‌র রাসূল (আ.) আপনি কি আরবের অভিভাবক নন? রাসূল (সা.) বলেন, আমি আদম (আ.) এর সন্তানদের অভিভাবক আর আলী (আ.) আরবদের অভিভাবক। আলী (আ.) কে ডেকে আনা হলো। অতঃপর তিনি আনসারগণকে উপস্থিত করতে বললেন। তাদেরকেও ডেকে আনা হলো। সবাই এলে তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : ও হে আনসারগণ, শোন, আমি কি তোমাদেরকে এমন নির্দেশ দেব, যা অনুসরণ করলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। নিশ্চয়ই হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)। রাসূল (সা.) বললেন, ইনি হচ্ছেন আলী (আ.)। আমাকে যদি ভালবাস তাহলে একেও ভালবাসবে এবং আমাকে যদি সম্মান করে, তাহলে একেও সম্মান করবে। আমি এই মুহূর্তে তোমাদিগকে যা বললাম, তা মহান প্রভু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জিববাইলে (আ.) আমাকে বলেছেন।

রাসূল (সা.) এর সাক্ষী হযরত ইমাম হাসান (আ.)

যদিও সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, প্রাপ্ত বয়স্ক কোন উন্নত বুদ্ধি জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকেই লোক সাক্ষী হিসাবে নির্বাচন করে থাকে। কিন্তু ইমাম হাসান জন্মগতভাবে ইমাম হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন বিধায় তিনি এতই মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তার নফস এমন নিষ্কলুস ছিল যে, রাসূল (সা.) তাকে শৈশবেই অনেক চুক্তি পত্রের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে মনোনীত করতেন। হযরত ওয়াকেছী তার কিতাবে লিখেছেন : পয়গম্বরে আকরাম (সা.) ছাকিফ নামে এক ব্যক্তির জন্য দায়িত্ব কাধে তুলে নেন। এ বিষয়টি খালিদ বিন সাঈদ লিখেন আর ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (আ.) সে পত্রে স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য, যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে পয়গম্বর (সা.) নজরনের খৃষ্টানদের সাথে মুবাহিলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখনও তিনি ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন, হযরত আলী (আ.) ও হযরত ফাতিমাকে (আ.) আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে সঙ্গে নেন এবং সেখানে তার উপর তাতহীরের আয়াত তাদের পবিত্রতা ও নিস্পাপতার ব্যাপারে অবতীর্ন হয়।

বিচারক হযরত ইমাম হাসান (আ.)

একদা জবাই হওয়া এক মৃত ব্যক্তি মাটিতে পড়েছিল এবং তার পাশেই একজন ব্যক্তি রক্ত মাখা একটি ছুরি হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। তুমি কি এই ব্যক্তিকে হত্যা করেছ? লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ, সে বলল, লোকজন তাকে গ্রেফতার করল। একই সময়ে অপর এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে হাজির হল এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলল। কারণ সে বলল যে, ঐ ব্যক্তিটিকে সেই হত্যা করেছে। উভয় ব্যক্তিসহ মৃতদেহটি ফয়সালার উদ্দেশ্যে আলী (আ.) সম্মুখে নিয়ে আসা হলো। যে অপরাধ তুমি কর নাই তা তুমি করেছ বলে স্বীকার করছ কেন? আলী প্রথম ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন। প্রভূ, আমি একজন কসাই, মেষ জবাই করার সময় প্রস্রাব করার জন্য আমাকে বাইরে যেতে হয়। তাড়াহুড়োর মধ্যে ছুরিটি সাথে নিয়ে অসি। সেখানে আমি খুন হওয়া লোকটিকে দেখি। তখন এ লোকগুলি আমাকে ঘিরে ফেলে। চোখের পলকে এসব ঘটনা ঘটতে থাকে। আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি। আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে কেউ আমাকে দোষী নয় বলে বিশ্বাস করবে না। তুমি কি হত্যা করেছ ? অপর ব্যক্তিকে আলী (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ আমি করেছি। লোকটি জবাব দিল। কিন্তু সবার অগোচরে আমি ঐ স্থান ত্যাগ করে নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে সক্ষম হই। অতপর যখন দেখি নিরাপরাধ এই কসাই লোকটি খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে খুন হতে যাচ্ছে তখন আমার বিবেক আমাকে বাধ্য করে সত্য প্রকাশ করতে।

হযরত আলী (আ.) হাসান (আ.) কে মামলাটি বিচারের দায়িত্ব দিলেন। ইমাম হাসান বললেন, এদের উভয়কে মুক্ত করে দাও। কসাইটা নির্দোষ আর সত্যিকারের খুনী ব্যক্তিটি নিজের দোষ স্বীকারের মাধ্যমে একজন নির্দোষ মানুষের জীবন রক্ষা করেছে। আল্লাহ্‌ বলেছেন : যে এক ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিল সে যেন সমগ্র মানব জাতির জীবন রক্ষা করিল (সূরা মায়েদা : ৩২) এবং মৃতের উত্তরাধিকারীদেরকে বায়তুল মাল থেকে রক্তের মূল্যের বিনিময়ে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মামলাটি নিস্পত্তি হলো। তাঁর পিতার শাসনামলে হাসান (আ.) কে বিচার কার্য পরিচালনা ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল যা তিনি তার জ্ঞান ও উচ্চ মানবিক কুশলতা প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পন্ন করতেন। বাইতুল মালের দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত ছিল।

মহাবীর হযরত ইমাম হাসান (আ.)

হযরত ওসমান (রা.) যখন বিদ্রাহীদের দ্বারা নিজ ঘরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তখন বিদ্রোহীরা তার গৃহে প্রবেশের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করে। তখন হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (আ.) নিজেদের জীবন বিপন্ন করে হযরত ওসমান (রা.) এর গৃহে খাদ্য-পানীয় সরবরাহ করেন। হিজরী ছত্রিশ সনে (৬৫৬ খৃ:) জুবায়ের ও তালহা (রা.) বসরায় হযরত আলীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তাকে ইতিহাসে উষ্ট্রের যুদ্ধ

বলা হয়। এই যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিহত করেন এবং বিজয়ী হন। অনুরূপভাবে হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (আ.) সিফফিনের যুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে করতে শত্রু সেনাদের বুহ্যের ভিতরে বিপদজনক অবস্থানে চলে গিয়েছিলেন। হযরত আলী (আ.) এই অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি তার অপর সন্তান মুহাম্মদ হানাফিয়াকে শত্রু সেনাদের বিতাড়িত করে ইমামদ্বয়কে নিরাপদে নিয়ে আসতে সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দিলেন। মুহাম্মদ হানাফিয়া একজন বীর যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও এই দুই ভায়ের দিকে ধাবিত হওয়া অগনিত তীর, বর্শা আর তলোয়ারের ঝাঁক দেখে হতচকিত হয়ে কিছুটা বিলম্ব করতে শুরু করলেন। কিন্তু রাসূল (সা.) এর এই দুই সন্তান আপন অবস্থানে অনড় থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলেন। যতক্ষণ না আলী (আ.) স্বয়ং সেখানে অংশ গ্রহণ করে শত্রু সেনাদের সুদৃঢ় অবস্থান ধ্বংস করে দিলেন। তাদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার পর আলী (আ.) তার সহযোগীদের বলেছিলেন এদের মৃত্যুর কারণ রাসূল (সা.) এর বংশধারা বিলুপ্ত হয়ে পড়বে এই আশংকায় আমি কখনো চাইনা যে তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হোক।

পরহেজগারী ও ইবাদত

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের প্রতি তার এক বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই গভীর অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ ওযুর সময় অনেকে তার চেহারা মোবারকে অবলোকন করতেন। যখন তিনি ওযুতে মগ্ন হতেন তখন তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। তিনি কম্পিত হতেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো : আপনি এরকম হন কেন? উত্তরে তিনি বলেন : যে বস্তু আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয় তার এরকম অবস্থায়ই যথোপযুক্ত। ষষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সাদেক (আ.) থেকে বর্ণিত যে , ইমাম হাসান (আ.) তার জমানার সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। আর যখনি তিনি মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা স্মরণ করতেন, তখনি ক্রন্দন এবং বেহাল হয়ে পড়তেন। তিনি পদব্রজে আবার কখনো নগ্ন পদে পঁচিশবার হজুব্রত পালন করেন।

তার সম্পর্কে বর্ণনাকারীরা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সব সময় মহান প্রভূ আল্ল-াহ্তালার জিকিরে মগ্ন থাকতেন। বেহেশত এবং দোজখের কথা স্মরণ হলেই এমন অস্বাভাবিক হয়ে যেতেন, মনে হত যেন কোন বিষাক্ত প্রাণীর হুল তার শরীরে বিদ্ধ হয়েছে। মৃত্যু ও শেষ বিচারের দিনের কথা স্মরণ করে তিনি অঝোর ধারায় কাদতেন । আল্লাহ্র সম্মুখে হাজির হওয়ার কথা উঠলে তিনি পাথরের মত শক্ত ও নির্বাক হয়ে পড়তেন। এ গুলো থেকে মহান প্রভুর প্রতি তার নিঃশর্ত আত্মসমর্পন ও অবর্ণনীয় ভয়ের বিষয়টিই প্রকাশ পেত।

ওজু শেষ করে মসজিদের প্রবেশের আগ মুহূর্তে তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলতেন, হে আল্লাহ্, তোমার বান্দা তোমার দুয়ারে উপস্থিত ও হে দয়াময়, এক পাপিষ্ঠ বান্দার তোমার সম্মুখে হাজির হয়েছে। অতএব, হে মহান দয়ালু স্রষ্টা, তুমি তোমার ঐশ্বর্যমন্ডিত দয়া ভান্ডারের সাহায্যে আমার পাপগুলোকে মোচন করে দাও।

যখন তিনি নামাযে দাঁড়াতেন তখন একাগ্রতা ও আত্মসমর্পণের এক অপরূপ দৃশ্য তার চেহারায় ভেসে উঠত এবং সারা শরীর কাঁপতে শুরু করত। সকালের নামায শেষে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্র ধ্যানে বা মোরাকাবায় থাকতেন, হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, একরাতে কাবা শরীফে ইবাদত করার সময় লক্ষ্য করলাম, এক ব্যক্তি কাবা শরীফের দরজার পার্শে কম্বল দিয়ে শরীর ও মুখমন্ডল ঢেকে কায়মনোবাক্যে ইবাদত করে চলেছেন। তিনি এমনভাবে কাঁদছিলেন যেন মনে হচ্ছিল তার চেয়ে বেশী গুনাহগার এই পৃথিবীতে আর কেউ নাই। সারারাত তিনি এভাবেই ইবাদত করে কাটালেন। ভোর হতেই সবার অগোচরে তিনি কাবা শরীফ ত্যাগ করলেন। আমি নিজেকে সংবরন করতে পারলাম না। তার পিছু পিছু গিয়ে তাকে শুধালাম। ভাই কে আপনি কি আপনার পরিচয়, দয়া করে আপনার চেহারাটুকু দেখান যেন তা দেখে আমি আপনাকে চিনতে পারি এবং নিজের মাগফেরাতের জন্য দোয়া ভিক্ষা চাইতে পারি। তখন তিনি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমি হাসান (আ.)। তিনি অত্যন্ত যত্ন ও মনোনিবেশ সহকারে পবিত্র কুরআন তেলওয়াত করতেন। অনুসারীদের উদ্দেশ্যে কুরআনের কোন আয়াত তেলওয়াতের পূর্বে তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলতেন, হে আল্লাহ্, আমি হাজির, ও হে প্রভু, প্রতি রাতেই তিনি সূরা কাহাফ একবার করে তেলওয়াত করতেন।

এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর সকল আনন্দ বিনোদন তিনি পরিপূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন। অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী যে আবাস মহান প্রভু তার প্রিয়জনদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেখানে ঠাঁই পাওয়াই ছিল হাসান (আ.) জীবনের ব্রত। পার্থিব কোন সুখভোগ কখনই তাকে আকৃষ্ট করতে পারে নাই। হযরত হাসান (আ.) এর আংটিতে ছোট দুটি কবিতার ছন্দ তিনি উৎকীর্ন করে রেখেছিলেন। তাতে লিখা ছিল :

"নিজেকে যতটুকু সম্ভব বিনয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখ, অবশ্যই হে মানব মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করবে।" প্রায়ই তিনি নিম্নের এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন : চিরস্থায়ী নয় এমন এক ভঙ্গুর আবাসে তোমরা পার্থিব সুখ-সম্ভেগে বিভোর হয়ে আছ, মনে রেখ, ক্ষণস্থায়ী

আবাসের এই সুখ ভোগ নিজের সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।" দীর্ঘ প্রত্যাশিত সেই চিরস্থায়ী আবাসের আকাংক্ষা হৃদয়ে পোষণ করতে ভুলে গেছে, আর ভুলে যেওনা, একদিন সকল প্রিয়জনের সম্পর্কই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং ঐ সকল প্রিয়জনদের সবার দেহই একদিন মাটিতে মিশে যাবে।"

উল্লেখ্য, ত্যাগের সঙ্গে আলিঙ্গনে আর ভোগের সঙ্গে অনাসক্তি ছিল তার জীবনের ব্রত। এ প্রসঙ্গে মুদবিক বিন জিয়াদের একটি বর্ণনা করা যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা একদিন ইবনে আব্বাসের একটি বাগানে অবস্থান করছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসান (আ.) মুদবিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, ভাই কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা যাবে ? নিশ্চয়ই, এই বলে আমি অল্প কিছু রুটি ও সবজি সামনে পেশ করলাম। তিনি এর কিছুটা খেলেন এবং বললেন খাবারটি খুব সুস্বাদু হয়েছে। সত্যি সত্যিই খাবারটি খুব মুখরোচক হয়েছিল এরপর যথেষ্ট পরিমাণ ঐ খাবারটি তার সামনে পেশ করা হলো। তিনি পাশেই ক্রীড়ারত গরীব একদল বালককে ঐ খাবারটি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং নিজে-এখান থেকে আর কিছুই খেলেন না। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বিনয়ের সাথে বলেন, সুস্বাদু হওয়ার ফলে এগুলো অপেক্ষাকৃত গরীব ও কম সুবিধাপ্রাপ্তদের প্রাপ্যই হয়ে যায়। আর তাই নির্মোহ হয়ে এটাকে পরিহার করাই ছিল আমার লক্ষ্য।

ইমাম হাসান (আ.) এর মেধা, দয়া, বিনয় ও মহানুভবতা

শিশু হাসান (আ.) ও হোসাইন (আ.) দেখতে পেলেন যে, জনৈক আরব ওজুর পদ্ধতি যথাযথ ভাবে অনুসরন করছে না। তারা তাকে বললেন শায়খ, আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের অজুর আনুষ্ঠানিকতা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করুন এবং অতঃপর বলুন কার ওজুর পদ্ধতি সঠিক। ঐ আরব ব্যক্তি খুব যত্ন সহকারে এদের ওজুর প্রত্যেকটি কর্মকন্ড পর্যবেক্ষন করলেন এবং তার নিজের ভুল গুলো বুঝতে পারলেন। তিনি শিশুদের মার্জিত আচরন ও বিচক্ষনতা দেখে আভিভূত হয়ে বললেন : হে বালকদ্বয় আপনারা উভয়েই একেবারে নির্ভুলভাবে ওজু সম্পন্ন করেছেন। আমিই ভুল পথে ছিলাম। বলবেন কি আপনারা কারা? তারা তাঁকে জানালেন যে, তারা রাসূল (সা.) এর নাতি।

একদা এক বেদুইন সাহায্যের আশায় হাসান (আ.) এর দ্বারস্থ হলো। হাসান (আ.) নির্দেশ দিলেন, আমার সংগ্রহে যত অর্থ আছে সব একে দিয়ে দাও। তখন তার কাছে দশ হাজার দিরহাম মওজুদ ছিল। তাই তাকে দেয়া হলো। বেদুইন ভিক্ষুক হতচকিত হয়ে বলল, আপনি তো আমাকে আমার চাহিদাটুকুও বলার সুযোগ দেন নাই। হাসান (আ.) জবাব দিলেন, দান খয়রাতের ব্যাপারে আমরা এমনই উদার : যেন, ঐ বিপদগ্রস্থদের চাহিদা পূরনে কোন ঘাটতি না থেকে যায় এবং সে এতটুকুও নিরাশ না হয়। আমরা যা দান করি তা নিষ্কলুষ, পবিত্র, আর যারা এই দান গ্রহণ করে তারা তা দ্বিধাহীন চিত্তে উপভোগ করতে পারে। দানের ব্যাপারে আমাদের উদারতার উচ্চতা যদি সমুদ্রের দৃষ্টি গোচর হয়, তাহলে সে তার জোয়ারের বিশালতা নিয়ে লজ্জিত হয়ে পড়বে।

একদিন তিনি মদীনার কোন একটি রাস্তায় চলছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দরবারে আল্লাহ্‌র কাছে দশ হাজার দিরহাম ভিক্ষা চেয়ে কান্নাকাটি করছে। এই দৃশ্য দেখে হাসান (আ.) অনতিবিলম্বে বাড়ীতে গিয়ে সমপরিমাণ দিরহাম নিয়ে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

একদা হাসান (আ.) রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ করেই জনৈক সিরিয়াবাসী তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাকে গালাগালি করতে শুরু করল। ঐ লোকটি তাদেরই একজন ছিল যাদের অন্তর মুয়াবিয়ার আহলে বাইত সদস্যদের প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘৃণা, বিদ্বেষের প্রচারনা ব্যাপকভাবে কার্যকর হয়েছিল। ইমাম শান্তিপূর্ণভাবে সবকিছু শুনলেন, সিরিয়াবাসীর কথা শেষ হওয়ার পর হাসান (আ.) হাসি মুখে তার দিকে তাকালেন এবং তাকে সালাম প্রদান করে বললেন, এই শহরে আপনি একজন আগন্তুক। আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারে এমন কিছু করতে পারলে সত্যিই আমি খুশী হব। আপনার যদি কোন ঘোড়া, কিংবা পরিধেয় বস্ত্র কিংবা আহারের প্রয়োজন হয় তাহলে তার সর্বোৎকৃষ্টটাই আমি আপনাকে সরবরাহ করব। আপনি যদি গরীব হয়ে থাকেন তাহলে আমি আপনাকে ধন সম্পদ দিয়ে সহায়তা করব। আমার সঙ্গে অবস্থান করুন। আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করুন। এটা আপনার জন্য আরামদায়কই হবে কেননা সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পর্যাপ্ত থাকার জায়গা আমার কাছে আছে। ঐ ব্যক্তিটি ভীষণ লজ্জিত হয়ে কাঁদতে শুরু করল। কান্না জড়িত কণ্ঠে সে ঘোষণা করল : আমি এই মর্মে সাক্ষী দিচ্ছি যে, এই পৃথিবীতে আপনিই আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। কোন পরিবারে নবুওয়তে ও বিলায়ত প্রদান করতে হবে। একমাত্র আল্লাহ্‌ই তা ভাল জানেন।

একদা হাসান (আ.) একটি হাবশী বালকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বালকটির হাতে একটি রুটি ছিল। সে তার রুটি থেকে এক টুকরো ছিড়ে নিজে খাচ্ছিল আর অপর এক টুকরা ছিড়ে তার কুকুরকে দিচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখে হাসান (আ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এমন করার কারণ কি? বালকটি বলল : একে অভুক্ত রেখে কিছু

খেতে আমার ইচ্ছা করে না। হাসান (আ.) বুঝতে পারলেন যে, এই হাবশী বালকটি বিশেষ এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তার এই অসামান্য গুণাবলী দেখে তিনি অভিভুত হয়ে গলেন তিনি তাকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে তার মালিকের কাছে পেলেন। সেখান থেকে তিনি ঐ বালককে কিনে নিলেন এবং যে বাগানে বালকটি কাজ করত সেই বাগানটি তিনি কিনে নিলেন। অতঃপর তিনি বালকটিকে ঐ বাগানটির মালিকানা দিয়ে দিলেন।

হযরত হাসান (আ.) এর কেরামত

হযরত হাসান (আ.) একবার হজের মৌসুমে পায়ে হেঁটে মদীনা থেকে মক্কা গমন করেছিলেন। পথিমধ্যে তার পাদ্বয় ফুলে গেল। তার একজন সহচর আরয করল : কোন সওয়ারীতে আরোহন করুন তাহলে ফুলা কমে যাবে। তিনি এ প্রস্তাব নাকচ করে বললেন : তুমি নিকটেই একট গৃহে পৌছে এক হাবশীকে দেখবে। তার কাছে কিছু তৈল থাকবে। তুমি তা ক্রয় করবে। সহচর বলল, আমরা কোথায়ও কোন লোক দেখেনি। যার কাছে এমন ঔষধ আছে। এখানে কোথায় পাওয়া যাবে? কিছুদূর যাওয়ার পর বর্ণিত সেই হাবশীকে দেখা গেল হযরত হাসান (আ.) বললেন, এই হাবশী সম্পর্কে তোমাকে বলেছিলাম। যাও তার কাছ থেকে তৈল কিনে আন। হাসান (আ.) এর সহচর হাবশীর কাছে তৈল চাইল। হাবশী জানতে চাইল এই তৈল কার জন্য ক্রয় করা হচ্ছে ? সে বলল, হযরত হাসান (আ.) এর জন্য। হাবশী বলল : আমাকে তার কাছে নিয়ে চল। হাবশী হাসান (আ.) নিকট এসে বলল, আমি আপনার দাস। তৈলের মূল্য নিবনা। আপনি কেবল আমার স্ত্রীর জন্য দোয়া করুন। সে প্রসব বেদনায় কাতর। দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ্ তাকে সর্বাঙ্গ সুস্থ একটি শিশু দান করেন। তিনি বললেন : নিজের গৃহে ফিরে যাও। আল্লাহ্তালা তোমাকে তেমনি একটি শিশু দান করবেন যেমনটি তুমি চাও। সে আমার অনুসারী হবে। হাবশী গৃহে ফিরে তাই দেখতে পেল যেমন তাকে বলা হয়েছিল।

একদিন হযরত হাসান (আ.) হযরত জুবায়ের (রা.) এবং কোন পুত্রের সাথে সফরে ছিলেন। তারা একটি শুষ্ক বাগানে তাবু স্থাপন করেন। হাসান (আ.) এর জন্য বাগানের এক কোনে এবং যুবায়ের পুত্রের জন্য বাগানের অন্য কোনে বিছানো হলো। যুবায়র পুত্র বললেন : চমৎকার হত যদি এই খেজুর বাগানে তাজা খেজুর থাকত। তাহলে তা মজা করে খাওয়া যেত। হযরত হাসান (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন তাজা খেজুর চাও ? ইবনে যুবায়ের হ্যাঁ বললে তিনি দোয়ার জন্য হাত উঠালেন এবং ঠোট নেড়ে কিছু পড়লেন, যা কেউ জানতে পারল না। তৎক্ষনাত একটি খেজুর গাছ সবুজ সতেজ ও ফলন্ত হয়ে গেল তাতে তাজা খেজুর উৎপন্ন হয়ে গেল। তার উট চালক বলল : আল্লাহ্র কসম, এতো জাদু। হাসান (আ.) বললেন। এটা যাদু নয়; বরং সেই দোয়ার প্রভাব যা পয়গম্বর (আ.) এর সন্তান করেছিলো। এরপর সকলে সেই অলৌকিকভাবে প্রাপ্ত খেজুর গাছ থেকে নামিয়ে আনল এবং পেট ভরে খেল। প্রকৃতপক্ষে হাসান (আ.) এর জ্ঞান গরিমা, বদান্যতা ঔদার্য আরও অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে তা সবই সঠিক আর এগুলো এত বেশী যে তা বলে শেষ করা যাবে না। (তথ্য সূত্র : শাওয়াহেদুন-নবুয়ত মূল আব্দুর রহমান জামী (রাহ) অনুবাদ মাওলানা মহিউদ্দিন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ৬ষ্ঠ সংস্করন, প্রকাশ কাল (মে-২০১৩) ISBN-৯৮৪-৮৬৩১-৫৫-০)।

হযরত হাসান (আ.) এর শাহাদত

ইতিহাস সাক্ষী মুয়াবিয়া বয়সের অযুহাত দেখিয়ে ইমাম হাসান (আ.) এর খিলাফত মানতে অস্বীকৃতি জানায়, অথচ তারপর তার কম বয়সী, দুশ্চরিত্র, পানাসক্ত পুত্রের খলিফা হওয়ার পথকে সুগম করার পথে হযরত ইমাম হাসান (আ.) এর কায়িক উপস্থিতিকে সে সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে বিবেচনা করল। কেননা সে ধারণা করেছিল যদি তার মৃত্যুর পর হাসান জীবিত থাকেন তাহলে সম্ভবত জনগণ মুয়াবিয়ার বংশের প্রতি অসন্তুষ্ট তাই তারা ইমামের দিকে ঝুকে পড়তে পারে। তাই সে কয়েকবার ইমামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। অবশেষে চক্রান্ত করে পবিত্র ইমামকে বিষ প্রয়োগে শহীদ করে। ইমাম হাসান ৬৭০ খৃস্টাব্দে শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে চির নিদ্রায় শায়িত হন। যদিও তাকে তার প্রিয় নানা জানের মাজারে দাফন করার কথা ছিল। কিন্তু উমাইয়াদের ষড়যন্ত্রে ও প্রভাবে তা কার্যকরী হতে দেওয়া হয় নাই। তাকে তার ওসীয়ত অনুসারে তার কবর নিয়ে কোন প্রকার বিরোধ না করার শর্ত মেনে নিয়ে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ্র অফুরন্ত দরুদ তার উপর বর্ষিত হোক।

চতুর্দশ অধ্যায়

হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)

হযরত আলী ও হযরত ফাতিমা (আল্লাহ্‌র দরুদ তাদের উপর বর্ষিত) দম্পতির বেলায়েত ও ওহীর গৃহ আলোকিত করে হিজরী চতুর্থ সনের তৃতীয় শাবান (৮ জানুয়ারি, ৬২৬-৬৮০ খ্রিঃ) এক মহান শিশু জন্মগ্রহণ করেন। যখন তার জন্মের সংবাদ বিশ্ব নবীর কর্ন গোচর হয় তখন তিনি বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠতম দম্পতির গৃহে আগমন করেন। তিনি তার শিশুকে আনার জন্য আসমা নামক এক পরিচারিকাকে বলেন। আসমা এই সদ্যজাত শিশুকে সাদা কাপড়ে পেচিয়ে রাসুলে খোদার (সা.) সামনে পেশ করলেন। তিনি শিশুর ডান কানে আযান আর বাম কানে ইকামত পাঠ করেন। তার সৌভাগ্যময় জন্মের প্রথম দিনে খোদায়ী ওহীর আমানতদার হযরত জিবরাইল (আ.) অবতীর্ন হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.), আল্লাহ্‌র সালাম, আপনার জন্য প্রেরিত হোক। আপনি এই নবজাত শিশুর জন্য হযরত হারুন (আ.) এর কনিষ্ঠ পুত্রের নামে শুবাইর (সাব্বির) যা আরবীতে হুসাইন বলা হয় নামকরন করুন। কেননা আলী আপনার জন্য হযরত মুসার নিকট হারুনের মর্যাদার ন্যায় পার্থক্য শুধু এটাই যে, আপনি আল্লাহ্‌র শেষ নবী। এভাবে এই মহীমাময় নাম হুসাইন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত ফাতিমার দ্বিতীয় সন্তানের জন্য নির্ধারণ করা হলো। তার জন্মের সপ্তম দিবসে হযরত ফাতিমা (আ.) আকিকা হিসাবে একটা দুম্বা ইমাম হুসাইনের জন্য কোরবানী করেন এবং তার নবজাত শিশুর মাথা মুন্ডন করেন আর সেই কথিত চুলের সম ওজনের রুপা আল্লাহ্‌র পথে দান করেন।

হযরত ইমাম হোসাইনের (আ.) বিশেষ মর্যাদা

ইমাম হোসাইনের জন্মের বিষয়টি বিশেষভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌তালা জিবরাইল (আ.) ফেরেশতাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের লক্ষ্যে রাসূল (সা.) এর নিকট প্রেরণ করেন। হযরত জিবরাইল (আ.) এক হাজার ফেরেশতাসহ পৃথিবীতে আগমন পথে একটি দ্বীপ অতিক্রম কালে তিনি কান্নার শব্দ ও এক প্রশ্নের সম্মুখীন হন। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, জীবরাইল (আ.) উত্তর দেন। আমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশে রাসূল (সা.) এর নাতি হুসাইন (আ.) এর জন্ম উপলক্ষে তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। প্রশ্নকারী বলেন, জিবরাইল আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না, আমার নাম ফুটরুস, আমি ৭০,০০০ হাজার ফেরেশতাদের পরিচালক (নেতা) ছিলাম কিন্তু আমার কাজে একটি ভুল হওয়ায় শাস্তি স্বরূপ আমার পাখা পুড়ে যায় এবং আমি এই দ্বীপে ৭০০ বছর যাবত বন্দী জীবন যাপন করছি। ফুটরুস জীবরাইল (আ.)

কে অনুরোধ করলো যে, তিনি যেন তাকে সাথে করে মদীনায় হাজির হন এবং ফুটরুসের বিষয়টি সূরাহা করার জন্য রাসূল (সা.) এর সুপারিশ করেন। রাসূল (সা.) জিবরাইল (আ.) কে নির্দেশ দেন তিনি যেন ফুটরুসকে হোসাইন (আ.) দোলনার সাথে তার শরীর ঘসতে নির্দেশ দেন। এই পবিত্র স্পর্শে ফুটরুস তার পাখা ফেরত পেলেন। তিনি আবেগ আপুত হয়ে বলেন, "আমার মত আর কে আছে" আমি এক বিশিষ্ট জন। আমি হোসাইন (আ.) কর্তৃক পাপ মুক্ত হয়েছি।

ইমাম হোসাইন (আ.) এর জন্ম সম্পর্কে আল কুরআন

ইবনে শাহ আশাহব আশোব তার মানাকিব গ্রন্থে কিতাব আল আনওয়ার এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্তালা রাসূল (সা.) কে ইমাম হোসাইনের মাতৃগর্ভে আসা ও তার জন্ম সম্পর্কে অভিনন্দন পাঠালেন। হযরত মা ফাতিমাকে জানানা হলো : কষ্ট নিয়ে তার মা তাকে বহন করেছে এবং কষ্টের ভেতরে সে তাকে প্রসব করেছে এবং তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ খাওয়ানো ছিল ত্রিশ মাস: (সূরা আহ কাফ : ১৫)

রাসূল (আ.) এর পুত্র সন্তান আল হোসাইন (আ.) সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য:

আপনার কাছে এই জ্ঞান আমার পর এ নিয়ে কেউ বিতর্ক করতে এল তাকে বলুন, এসো, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের আমাদের নারীদেরও তোমাদের নারীদের আমাদের নিজ সত্ত্বা/প্রাণ জীবন (নফস) ও তোমাদের নিজ সত্ত্বাকে অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত (অভিশাপ), (আল ইমরান : ৬১)। ইসলামের ইতিহাসে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতকে আয়াতে মোবাহিলা বলা হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, নজরানে খৃস্টান পাদ্রীগণ রাসূল (আ.) ইসলামের দাওয়াত কবুল না করে তার সঙ্গে এই বলে চ্যালেঞ্জ করল যে, রাসূল (দ:) এর পক্ষ এবং তাদের পক্ষের ব্যক্তি বর্গ আল্লাহ্র কাছে পরস্পরের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকট অভিসম্পাত প্রদান করবে। মিথ্যাবাদীর দল ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং সত্য বিজয়ী হবে। এ প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয় এবং রাসূল (সা.) এর পক্ষে কারা থাকবেন সে ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার পুত্রগণ হিসাবে হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন, নারী হিসাবে মা ফাতেমাতুজ যাহারা ও রাসূল (সা.) তার স্বীয় সত্ত্বা, প্রাণ, তথা নফস হিসাবে হযরত আলী (আ.) কে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে পৌছান। এদের চেহারা মোবারকের নূরের তাজাল্লী দেখে খৃষ্টানদের নেতা তার সাথীগণকে বলেন যে, তারা এমন ব্যক্তিত্ব যদি তারা পাহাড়কে আদেশ করেন তবে তাও সরে যাবে। আর এদের সাথে চ্যালেঞ্জে গেলে খৃস্টানজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হোসাইন (আ.) আল্লাহ্র নির্দেশের আলোকে রাসূল (সা.) এর পুত্র।

মহাপবিত্র ইমাম হোসাইন (আ.)

হে নবী পরিবার, আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের নিকট থেকে সকল অপবিত্রতা দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে পুত: পবিত্র রাখতে (সূরা আহযাব ; ৩৩)।

আলোচ্য আয়াতে নবীর "আহলে বাইত" বলে নবী পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে সকল আলেম এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেন যে, নবীর আহলে বাইত হলেন তাদের বংশধরগণ। তাই এটা তর্কাতীত যে, নবী-পরিবারের বিশেষ মর্যাদা কিয়ামত পর্যন্ত একটি স্বীকৃত ব্যাপার। তাই এই পরিবারের সদস্যগণকেই প্রকৃতপক্ষে অন্যদেরকে পরিশুদ্ধতা দান করার ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি স্রষ্টা কর্তৃক নিয়োগ করা হয়েছে। কারণ অন্যকে পরিশুদ্ধ করার ক্ষমতা নবী ও নবী-রাসূলগণের প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের জন্যই সংরক্ষিত। পবিত্র কুরআনের নবী রাসূলদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে :

অবশ্যই আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন, তিনি তাদের জন্য তাদের (সম্প্রদায়ের) থেকেই এক রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট আল্লাহ্র আয়াত সমূহ তেলওয়াত করে শুনিয়ে থাকেন। তাদের (নফস সমূহ) পরিশুদ্ধ করেন। আর তাদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা (হিকমত) শিক্ষা দেন এবং নিশ্চয় তারা এর পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল। (সূরা আল ইমরান : ১৬৪)। বর্ণিত আয়াতের মর্মানুযায়ী জানা যায় যে, নবীদের দায়িত্বের মধ্যে মানুষের নফসকে পরিশুদ্ধ করা অন্যতম। আর এই দায়িত্ব পালন করতে হলে তাকে স্বয়ং অবশ্যই চির পবিত্র হতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ্তালা নবীদের উত্তরাধিকারীকে মহাপবিত্রতা দান করেছেন।

ইমাম হোসাইনকে ভালবাসা ও মান্য করা ফরজ

আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন : "এটাই সেই বিষয়, যার সুসংবাদ আল্লাহ্ তার বান্দাদের দান করেন যারা বিশ্বাস করেও সৎকর্ম করে। হে রাসূল, আপনি বলে দিন আমি এর (ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার) জন্য তোমাদের নিকট থেকে আমার পরমাত্মীয়দের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা (মোয়াদ্দাত) গুরু দক্ষিণা হিসাবে চিরস্থায়ী

ভালবাসা ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাহিনা এবং যে ব্যক্তি উত্তম কর্ম করবে আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বৃদ্ধি করে দেব, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা শুরা : ২৩)।

তাফসীরে কাশশাফ, রুহুল বয়ান, তাফসীরে কবীর, তাফসীরে দুররে মানসুর প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি নাযিল হলে মহান নবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের ভালবাসার উপর মৃত্যুবরণ করে সে শহীদের মৃত্যুবরণ করে, সে পূর্ণাঙ্গ ইমানসহ মারা যায় তাঁকে মালেকুল মওত ও মুনকির-নাকীর বেহেশতের সুসংবাদ দান করেন। তাঁকে সেভাবে প্রেরণ করা হয় যেমন নববধু স্বামীর গৃহে যায়। এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ মহান বান্দাদের মৃত্যু দিবসকে উপলক্ষ করে তাঁদের ওরস উদযাপন করা হয়ে থাকে। আর যারা তাদের প্রতি শত্রুতায় মৃত্যুবরণ করে, কিয়ামতে তাদের সে ললাটে লেখা থাকবে "এরা আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত।" স্মরণ রেখ তারা কাফির, তারা বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না। তখন জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করলো, তাঁরা কারা যাদের ভালবাসা আল্লাহ্ আমাদের জন্য ফরয করেছেন ? জবাবে তিনি বলেন, আলী ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আল্লাহ্ এদের সেবার জন্য দরুদ প্রেরণ করুন) তিনি আরো বলেন, যারা এদের উপর জুলুম করবে এবং এদের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেবে তাদের জন্য বেহেশত হারাম হয়ে যাবে। তাফসীরে সালাবীতে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত "উত্তম কর্ম" বলতে আহলে বাইতদের প্রতি ভালবাসাকে বুঝানো হয়েছে। তাফসীরে কাশশাফ থেকে রেওয়াত টি গৃহীত হয়েছে। (তথ্যসূত্র : তাফসীরে কাশশাফ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৮)। সাধারণ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা ইমাম নয় বরং ইমাম নিয়োগ আল্লাহ্র একক ক্ষমতাভুক্ত বিষয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা ১) স্মরণ করো, যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালন কর্তা কয়েকটি বাক্য (নির্দেশ) দিয়ে পরীক্ষা করলেন, (পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর) আল্লাহ্ বলেন, আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য (ইমাম/নেতা, অনুকরণীয়/মান্যবর, বিশ্বনেতা নিয়োগ করলাম, সে বলল, আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও আল্লাহ্ বলেন হ্যাঁ (কিন্তু) আমার অঙ্গীকার (তথা নিয়োগ) জালেমদের জন্য প্রযোজ্য হবে না (সূরা : বাকারা : ১২৪)। তাদেরকে (নেতা) বানিয়ে ছিলাম, তারা আমাদের নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো (সূরা : আম্বিয়া : ৭৩)। আর আমি তাহাদের মধ্য থেকে ইমাম (নেতা) নিয়োগ করেছিলাম। যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতো যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী। ৪) (স্মরণ করেন) যেদিন আমরা প্রত্যেক জনগোষ্ঠিকে তাদের ইমাম (নেতা/ধর্মীয় ও রাজনৈতিক) সহ আহ্বান করব (সূরা বনি ইসরাইল : ৭১)। ইবনে মারদুইয়া হযরত আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ যমানার ইমাম, নিজ প্রতি পালকের কিতাব এবং নিজ নবীর সুন্নত সহ আহুত হবে (তাফসীরে দুররে মানসুর। ৪র্থ খন্ড, পৃ-১৯৪ খ্রিঃ)। এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রতি যমানায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জনগণের জন্য এক জন ইমাম বা নেতা থাকা আল্লাহ্তালার স্থায়ী বিধান। তাই আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) ছিলেন সেই সময়কার ইমাম তথা ইমামে যামানা।

কোরাআন ব্যাখ্যা আল্লাহ্তালার এখতিয়ারভুক্ত

আরবীভাষায় পান্ডিত্য বা জ্ঞান কুরআন ব্যাখ্যার জন্য চূড়ান্ত জ্ঞান নয় বরং এটির দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে; তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ব করার জন্য আপনি আপনার জিহবা তার (জিবরাইলের) সঙ্গে নাড়াবেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠের দায়িত্ব আমরাই। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি আপনি তার অনুসরণ করুন। এর বিশদ ব্যাখ্যা আমরাই। (সূরা কিয়ামাহ আয়াত ১৬) তাই রাসূল (সা.) এরপর আল্লাহ্ কর্তৃক নিযোজিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেউ এ দাযিত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নয়। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই রাসূল (সা.) বলেছেন, কুরআন ও আহলে বাইত এমনভাবে সম্পর্ক যুক্ত যে কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যহত থাকবে। অর্থাৎ শুধু আলে মুহাম্মদের ব্যক্তিবর্গ এই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি তথা কর্তৃপক্ষ।

আমরা হযরত হাসান (আ.) এর খেলাফত ও মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি আলোচনাকালে উল্লেখ করেছি যে, ঐ চুক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুয়াবিয়া শুধুমাত্র জীবিত থাকা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন তিনি যেহেতু প্রকৃত শাসক নন বরং অন্তবর্তীকালের জন্য নিয়োজিত মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতা হিসাবে বিবেচিত তাই তিনি তার উত্তরসুরী হিসাবে কাউকে নিয়োগ করার অধিকারী বা ক্ষমতা প্রাপ্ত নয় এবং তার মৃত্যুর পর হযরত হাসানের (আ.) সাথে তার সম্পাদিত চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী হযরত ইমাম হোসাইন স্বয়ংক্রিয় ভাবেই আমিরুল মোমেনীন হিসাবে বিবেচিত হবেন। অথচ মুসলমান জাতির দুর্ভ্যাগ্য যে, মুয়াবিয়া বল প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে কুরআনের বিধান লংঘন করে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে তদনীন্তন ইসলামী রাজনৈতিক শিষ্টাচারেকে বৃদ্ধাংগুলি প্রদর্শন করে তাঁর মদাপ, চরিত্রহীন, অল্প বয়সী পুত্রকে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে জাগ্রত মুসলিম জনতার যে ব্যাপক বিদ্রোহ গণরোষ বা গৃহযুদ্ধ

হওয়ার কথা তা না করে মুয়াবিয়ার শ্বেত সন্ত্রাসের ভয়ে সবাই এই মুয়াবিয়ার ধর্মহীন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধা হল। আবার এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী হযরত ইমাম হোসাইনকে ক্ষমতালোভী, বিদ্রোহী, রাজনৈতিক দিক থেকে এটি একটি অপরিপক্ক কাজ ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন এই ধারা বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যহত রয়েছে। যেখানে মুসলমানদের আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত ও রাসূল (সা.) কর্তৃক ঘোষিত ইমামের নির্দেশ উম্মাহ্র জন্য প্রতিপালন করা বাধ্যতামূলক ছিল এই দায়িত্বকে অগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে মুসলিম উম্মাহ্ এজিদের বিরুদ্ধাচরণ করা হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) এর ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসাবে অভিহিত করল। এত বড় ধর্মীয় বিপর্যয় মুসলিম জনসমাজে কিভাবে সংঘটিত হলো সে বিষয়টি বস্তু নিরপেক্ষভাবে কেহই আলোচনা করেননি। ফলে মুসলিম উম্মাহ্ এ ব্যাপারে যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই বয়ে গেছেন। এর কারণ হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক হিষ্ট্রি এন্ড কালচারের প্রফেসর ড. পারেশ ইসলাম সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান লিখেছেন: ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে মুসলমানদের অজ্ঞতা অসীম।

এই অজ্ঞতা জন্ম দিয়েছে অহমিকার, ধর্মান্ধতার ও আত্মশ্লাঘার। তাই শুধু ইতিহাস চর্চায়ই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় শাখা প্রশাখায় মুসলমানদের কর্ম তৎপরতা মধ্য যুগেই শেষ হয়ে যায়। অবশ্য তখনো যা গবেষণার নামে চর্চিত হতো তাতে আজকের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনার সন্ধান করা বৃথা। তা ছিল ঘটনাবলীর সাধারণ বিবরণমান। দৃশ্যত ঘটনার অন্তরালে যে জটিল কার্যকারণ এবং তা ভেদ করে সঠিক তথ্যে পৌঁছবার যে রীতিনীতি তা তখন অনাবিষ্কৃত ছিল।

ইসলামের ইতিহাসের উৎস হচ্ছে কুরআন হাদিস, হাদিস ও নির্ভরযোগ্য নয় যদি যা তা কুরআনের কষ্টি পাথরের বিবেচিত ও নির্বাচিত হয়। এই কাজ নিতান্ত দুরুহ, মুসলমানদের শত্রু ইহুদী ও খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ এই দুরুহ কাজ করার কিছুটা প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তথাকথিত মুসলমান পণ্ডিত ও ইতিহাসবেত্তাগণ, লু-হাও য়ার মধ্যে বালিতে মুখ গুঁজে থাকা উটের মত চোখ, কান, মন বন্ধ রেখে ইতিহাস চর্চা করে চলেছেন। আজ ইসলামের আসল ইতিহাস জানতে হলে কোন মুসলমানের লেখকের বই পড়া পণ্ডশ্রম মাত্র। আঠারো থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কুরআন ও হাদিস এবং যাবতীয় ইসলামী বিষয়ে যে বিপুল গবেষণা ইউরোপে হয়েছে তা থেকে যৎ সামান্য ধার নিয়ে আজকের মুসলমান ইতিহাসবিদগণ অপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করে সস্তা খ্যাতি লাভের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। সামান্য কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন কোন ব্যক্তির যদি কোন একটি ইউরোপীয় ভাষার জ্ঞান থাকে তবে তার কাছে আজকের মুসলমানদের রচিত ইসলামের ইতিহাসের অসারতাও বাক সর্বস্বতা সহজেই ধরা পড়বে। (তথ্য সূত্র: ইতিহাসগত বিভ্রান্তির রহস্য মুফাখ্খারুল ইসলাম অভিনন্দন।)

হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) যে পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন তার মূল কারণ এখন পর্যন্ত মুসলমান ইতিহাসবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা নিরপেক্ষভাবে বিশেষণ করতে সক্ষম হন নাই। কারণ রাসূল (সা.) যে ধর্মরাজ্য (Theocracy) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার নির্বাচন ও মনোনয়ন ছিল আল্লাহ্ কর্তৃক। আল্লাহ্তাআলা এই ধরনের ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রত্যেক নবী-রাসূলকে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে জানা যায় যে, কিছু সংখ্যক নবী-রাসূল এই কাজে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। অনেকে তা করতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু আল্লাহ্র নির্দেশের কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই নির্দেশের ধারবাহকিতায় আল্লাহ্তাআলা মুহাম্মদ (সঃ) ..... তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত আলী (আ.) হাসান (আ.) ও হুসাইন (আ.) ও তদীয় সন্তান তথা তাহলে বাইতগণকে কুরআনের চিরস্থায়ী সঙ্গী তথা কোরআনের ধারক বাহক হিসাবে আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত জননেতা হিসাবে ঘোষণা করেন। প্রকৃত পক্ষে মুহাম্মদ (সা.) ধর্মরাজনীতি হিসাবে যে নীতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন তাই ছিল প্রকৃত রাজনীতি। অর্থাৎ নীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এটি রাজ-রাজাদের নীতি নয় বরং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত মানবজাতির পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ নিয়মনীতি। যেহেতু এই আল্লাহ্ প্রবর্তিত নীতিতে তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের ব্যবস্থা নাই। তাই রাসূল (সা.) এর ওফাতের সাথে সাথে মুসলিম জনসমাজ এই নীতি প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের খেয়াল খুশি ও সুবিধা অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের ব্যবস্থা করল। আর এক শ্রেণীর মুসলিম আরবী-বিদ্বানদের ..... রচিত এই দুর্নীতিকে ইসলাম সম্মত বা সমর্থিত বলে গন্য করে ইসলামের ইতিহাসে হাজার হাজার পৃষ্ঠা ধ্বংস করেছেন। আবার মানবীয় পদ্ধতিতে তাদের নিয়োগের ঐশ্বরিক বৈধতা প্রমাণের জন্য ইসলামের ইতিহাস বিকৃতি, কুরআনের অর্থের বিকৃতি ও জাল হাদিসের যে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটানো হয়েছে তা সর্ব জনবিদিত। যাহোক, ইসলামের ইতিহাসে প্রথম তিন খলিফার আমলে বিভিন্ন ধর্মীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কি ধরনের বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে তা এ পর্যায়ে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব। স্মরণযোগ্য হযরত ওসমান (রা.) এর শাহাদত এক গণবিদ্রোহের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এহেন মহা দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে হযরত আলী (আ.) উন্মুক্ত পরিবেশে মসজিদে নববীতে গণভোটের মাধ্যমে মুসলমানদের নেতা তথা আমরুল মোমেনীন নির্বাচিত হন (৬৫৬ খৃঃ)। খেলাফত হযরত আলী (আ.) এর জন্য সূচনা থেকেই এক

কণ্টকশয্যা হয়ে দাড়াঁলো। রাজধানী মদিনা আর প্রদেশগুলোতে আগে থেকে অসন্তোষ ধুমায়িত হচ্ছিল। শাসনকর্তাদের দূর্নীতি সকল প্রকার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। কোরেশ আর বেদুইনদের ঝগড়া আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাতো ছিলই। তার উপর নতুন করে দেখা দিলো বিদ্রোহীদের তথা ওসমানের (রা.) হত্যাকারীদের শাস্তি বিধানের দাবী। বিশৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রদ্রোহে সমাজে দেখা দিল ভাঙ্গন ফলে শাসন যন্ত্র প্রায় অচল। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ থেকে বড় হয়ে উঠলো দল, উপদল, গোত্র, গোষ্ঠীগত স্বার্থ আর তা নিয়ে সংঘর্ষ লুটপাটের সুযোগ দেখে এবার বেদুইনরা এসে হানা দিল নগরে। দাস দাসীরাও জিম্মিদের কিছু অংশ ভিড়ে পড়েছিল ওদের সাথে। এদের সংখ্যা তখন প্রচুর। বহুবছর ধরে যুদ্ধ বন্দী হিসাবে অসংখ্য দাস মদীনায় বন্যা স্রোতের মত এসে জুটে ছিল-অন্যান্য শহরেও ঘটেছিল একই দশা। এদের পিছনে কোন কৌলিনা, বা আভিজাত্য ছিল না। এদেরকে গৃহভৃত্য, দ্বার রক্ষক ইত্যাদি কাজেই নিয়োগ করা হতো। এদের কেউ কেউ আবার মনিবের নামে ব্যবসা চালাতো-মুনাফার ভাগ দিতো মনিবকে। বিদ্রোহের সময় এরাও হয়ে উঠল উচ্ছৃংখল ও অবাধ্য। মদীনায় এদের প্রাধান্য ছিল বেশী। কারণ এরাই পাহারা দিত রাষ্ট্রীয় কোষাগার আর ধনী বিত্তবানদের বালাখানা, কাজেই নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে এরা ছিল খুব সচেতন। বিশেষত অস্ত্র চালানায় দক্ষ। বসরা আর অন্যত্র বিদ্রোহে এরাই অংশ নিয়েছিল। খলিফা তথা সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো দাসরা নিজ মনিবের কাছে ফিরে না গেলে তাদের বিদ্রোহীও বেআইনী জনতা হিসাবে গণ্য করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এতে পরিস্থিতির কোন উন্নতি ঘটল না। তাই আমিরুল মোমেনীন হযরত আলী (আ.) কে কয়েকটি জটিল ও কঠিন সমস্যার মোকাবেলা করতে বাধ্য করা হয়; ওসমান (রা.) এর শাসনামলে যাবতীয় বিশৃংখলা ও অশান্তির মূল কারণ ছিল শাসনকর্তাদের অন্যায় আচরণ, দুর্নীতি, গোত্রনীতি ও বাড়াবাড়ি, সুতরাং খিলাফতের চতুর্থ দিনেই হযরত আলী (আ.) উসমান (রা.) এর আমলে নিয়োজিত অধিকাংশ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পদচ্যুত করে ফরমান জারি করলেন।

হযরত ওসমান (রা.) যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন কার্যত উমাইয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুসলিম জনসমাজে ইতোমধ্যে রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত ও নবী (সা.) কর্তৃক ঘোষণাকৃত এমন কি ওসিয়তকৃত কোন উত্তাধিকারীর কনসেপ্ট (Concept) অস্বীকার করা হয় এবং নবুয়তের তথা রাষ্ট্রীয় নেতা বা শাসক। সমাজের প্রভাবশালী নেতা জনগণের নাম নিয়ে নির্বাচিত হবেন। এটাই রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে আত্মপকাশ করে ও সমাজে গৃহীত হয়। এই প্রক্রিয়াই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে নির্বাচিত ব্যক্তি পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সা.) এর হাদিসের আইন সঙ্গত ব্যাখ্যাকারী এবং এই ব্যাখ্যাই সর্বজনমান্য করার মতবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে ইসলাম ধর্মে কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা জনিত জটিলতা এক মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার যে বিভিন্ন দল, উপদল, ফেরকাবাজি, মাযহাব সৃষ্টির সূত্রপাত এখান থেকে শুরু হয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও তাদের তল্পীবাহক আলেম শ্রেণী প্রদত্ত কুরআন হাদিসের অর্থ ব্যাখ্যা অবশ্য পালনীয় অথবা রাসূল (সা.) যাদেরকে ধর্মের সংরক্ষক বলেছেন তাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা সমাজে গ্রহণযোগ্য হবে তা একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়ালো এ ধারা অদ্যাবধি অব্যহত হয়েছে।

উল্লেখ্য, গাদীরে খুমের বক্তৃতাসহ বিভিন্ন স্থানে রাসূল (সা.), হযরত আলী (আ.) কে তার বৈধ উত্তাধিকারী হিসাবে ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অধিকারী হিসাবে ঘোষণা করেন। অথচ রাসূল (সা.) ওফাতের পরে আলী (আ.) এবং ফাতিমা (আ.) কর্তৃক প্রদত্ত কুরআনের ব্যাখ্যা বিভিন্ন ধর্মীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিধি বিধান রাষ্ট্রীয়নীতিতে গ্রহণ করা হয় নাই। বরং কুরআনের ব্যাখ্যাজনিত জটিলতার কথা উল্লেখ করে মা ফাতিমা (আ.) ও হযরত আলী (আ.) কে তাদের পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। যেহেতু আহলে বাইতগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন না তাই আজ পর্যন্ত মুসলিম জনগোষ্ঠী বিবেচনা করে যে, আহলে বাইতগণই কুরআন ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা দেননি বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরাই কুরআন হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যাকারী। উল্লেখ্য উমর ইবনে আব্দুল আজিজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে অতীতের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ভুল ছিল মর্মে ঘোষণা করে আহল বাইতদের জীবন্ত উত্তরাধিকারীদের সেই সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন। আবার পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য প্রথম তিন খলিফার আমলে গৃহীত বিভিন্ন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক কার্যক্রম কুরআন ও হাদিস পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে তা প্রকৃত ও সঠিক হিসাবে ধর্মীয় অনুশাসনের মর্যাদা পেত এবং তা অবশ্য পালনীয় হিসাবে গণ্য হত। আর ধর্মীয়ভাবে প্রকৃত বা সঠিক ব্যাখ্যা সর্বসাধারণের অগোচারেই থেকে যেত। অথবা ক্ষেত্র বিশেষে প্রথম তিন খলিফা কর্তৃক জারিকৃত সকল কর্মকাণ্ডই সঠিক এবং এর বিপরীত যে কোন ব্যাখ্যাই ভুল বা অগ্রহণযোগ্য। সমাজে এই বিষয়টি এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, হযরত আলী (আ.) এর ওফাতের পর মুয়াবিয়া ক্ষমতাসীন হয় পূর্ববর্তী তিন খলিফাকেই তাঁর ধর্ম ও রাজনৈতিক মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং

হযরত (আ.) কে তার শত্রু তথা ইসলামের দুশমন এবং আলী (আ.) এর ভক্তরা ধর্মদ্রোহী, আল্লাহ্‌দ্রোহী, রাসূলদ্রোহী ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত হলো এবং এই নীতি উমাইয়া বংশ ও আব্বাসীয় বংশধরগণ এটাকেই প্রকৃত ইসলাম হিসাবে চালু করলেন। এহেন পরিস্থিতিতে মুয়াবিয়া ইন্তিকাল করলে তার সাথে সম্পাদিত হযরত হাসান (আ.) এর সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) পদ্ধতিগতভাবে আমীরুল মুমেনিন হলেও কার্যত তা রাষ্ট্রীয়ভাবে অগ্রহণযোগ্য ও হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) কে রাষ্ট্রদ্রোহী তথা ধর্মদ্রোহী বিবেচনা করে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত উমাইয়া খিলাফত গ্রহণ করে।

হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) এর আন্দোলন

"হে জনগণ! আল্লাহ্ যা দ্বারা স্বীয় বন্ধুদের উপদেশ দেন তা থেকে উপদেশ গ্রহণ কর। যেমন ইহুদী পণ্ডিতদের সম্পর্কে তার নিন্দা বাণী থেকে। ইরশাদ হচ্ছে: কেন রাব্বানী আলেম ও পণ্ডিতবৃন্দ তাদেরকে অন্যায় কথা থেকে বিরত রাখেনি (সূরা মায়েদা : ৬৫)। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে: অভিসম্পতপ্রাপ্ত হয়েছে বনি ইসরাইলের যারা অবিশ্বাসী হয়েছে কতই না মন্দ যা তারা করে (মায়েদা : ৭৮-৭৯)। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে এ কারণে জালিম বলে ভৎর্সনা করেছেন যে,তারা তাদের মধ্যে যারা জালিম ছিল তাদের নোংরা ও জঘন্য কাজ প্রত্যক্ষ করত। কিন্তু তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করত না-তাদের হাতে যা ছিল তার লোভে এবং কোনঠাসা হয়ে পড়ার ভয়ে। অথচ মহান আল্লাহ্ বলেন: মানুষকে ভয় করনা। ভয় কর আমাকে (সূরা মায়েদা : ৪)। আরো বলেন, মুমিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু এবং তারা সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে (তওবা: ৭১)। হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) বলেন, আল্লাহ্ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকে তাঁর একটি ফরজ কাজ হিসাবে করার সূত্রপাত করেছেন। কারণ তিনি জানতেন যদি এই ফরযটি পালন করা হয় তাহলে সহজ-কঠিন সব ফরযই করা হবে। আর এটা এজন্য যে, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ হলো অন্যায়ভাবে হৃত অধিকার প্রত্যার্পণ। জালিমের বিরোধিতা, বাইতুল মাল ও গণিমত বণ্টন, যাকাতের জায়গা থেকে যাকাত গ্রহণ এবং যথার্থ খাতে তা ব্যয় করা সহ ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো। অতঃপর তোমরা, হে শক্তিমান সম্প্রদায়। যারা জ্ঞানে বিখ্যাত এবং ভাল কর্ম ও মঙ্গলকামিতায় স্বনামধন্য ও প্রসিদ্ধ আর আল্লাহ্‌র মাধ্যমে মানুষের অন্তরে এতটা মর্যাদার অধিকারী হয়েছে যে,মর্যাদাবান ব্যক্তি ও তোমাদের মূল্যায়ন করে আর দুর্বল ব্যক্তি তোমাদের শ্রদ্ধা করে চলে। আর যারা তোমাদের সমতুল্য এবং যাদের উপর কোন নেয়ামতের অধিকারী নও। তারা তোমাদেরকে নিজেদের উপরে প্রাধান্য দেয়। যখন কামনাকারী তাদের মনষকামনায় পৌঁছতে ব্যর্থ হয় তখন তোমাদেরকে সে সব পাওয়ার মাধ্যমে শান সহকারে আর বুজুর্গদের সম্মান সহকারে রাস্তায় পথ চল। এসবই কি এ জন্য নয় যে, জনগণ তোমাদের প্রতি আশা রাখে যে, তোমরা আল্লাহ্‌রই আইন প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন করবে? আর যদি তার অধিকাংশ-অধিকার থেকে পিছু হটে যাও তাহলে ইমামগণের অধিকারে অবজ্ঞা করলে। আর দুর্বলদের অধিকার এড়িয়ে গেলে, অথচ তোমাদের ধারণায় যা স্বীয় অধিকার বলে গণ্য করো। তা ঠিকই প্রাপ্ত হয়েছে। এ অবস্থায় যে তোমরা এ পথে কোন অর্থও খরচ করনি, নিজ জীবন ও সেই আল্লাহ্‌র জন্য বিপদাপন্ন করনি যিনি ঐ জীবনের স্রষ্টা। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কোন স্বজনের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওনি। তোমরা আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর বেহেশতের আকাংখা পোষণ কর, তদ্রুপ তাঁর রাসূলগণের পাশে থাকা ও তাঁর আযাব থেকে নিরাপদে থাকার আশা রাখ। হে ঐ ব্যক্তিবর্গ : যারা আল্লাহ্‌র থেকে এরুপ আশা কর, তোমাদের ব্যাপারে আমার আশংকা হয় যে, ঐশী কোন প্রতিশোধ তোমাদের উপর নেমে আসবে। কারণ তোমরা আল্লাহ্‌র সম্মানের ছায়ায় এমন এক মর্যাদায় পৌঁছেছো যেখানে অন্যদের উপরে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি ইমানদার বান্দা সংখ্যায় অনেক কিন্তু জনগণ তাদেরকে শ্রদ্ধা করে না। আর তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে বাহ্যিক সম্পৃক্ততার কারণে জনগণের মাঝে সম্মানের পাত্র। এখন তোমরা স্বচক্ষে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সমূহ ভঙ্গ হতে দেখেও ভয় করছ না। অথচ নিজেদের পিতাদের একটি অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে তোমরা ভীত হয়ে পড়ছ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অঙ্গীকার ভঙ্গ হওয়াকে তুচ্ছ মনে করছ। সকল জনপদে অন্ধ, বোবা আর অচলরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে এবং তাদের উপর দয়া করা হয় না এ ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের পদ অনুযায়ী ও দায়িত্ব মোতাবেক কাজ করছ না। আর যে ঐ কাজ করে তাকেও সাহায্য করছ না। আর যাদের সাথে আঁতাত ও আপোষ করে নিজেদেরকে ঝামেলা মুক্ত রাখছ। এসবই হলো সেই জিনিস যেগুলোকে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করার জন্য আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ করেছেন। আর তোমরা তার থেকে উদাসীন। তোমাদের উপর দুর্দশা অন্যদের চেয়ে বড়, কারণ। তোমরা তোমরা পণ্ডিত ও বিদ্বানদের মহান জ্ঞান-মর্যাদাকে রক্ষার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়েছে। হায়, যদি তোমাদের চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগাতে। এটা ঐজন্য যে, নির্দেশাবলি ও বিধি বিধানের বাস্তবায়ন আল্লাহ্‌র জ্ঞানে পণ্ডিত ও বিদ্বানের উপর ন্যাস্ত যারা হালাল ও হারামের উপরে আমিন বা বিশ্বস্ত রক্ষক এবং শাসন কর্তৃত্ব তাদের

হাতেই থাকতে হবে। সুতরাং তোমরা হলে তারাই যাদের থেকে এই পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর যে কারণে তা তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে সেটা হলো তোমরা সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছ এবং যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রাসূল (সা.) এর নীতিপন্থা সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছ। তোমরা যদি নিপীড়নে ধৈর্য্য ধারণ কর এবং আল্লাহ্‌র রাহে সহনশীল হও তাহলে আল্লাহ্‌র শাসন কর্তৃত্ব তোমাদের কাছে ফিরে আসবে এবং তোমাদের পক্ষ থেকে বাস্তবায়ন হবে এবং তোমরাই জনগণের বিষয়াদির সমাধান স্থলে পরিণত হবে কিন্তু তোমরা নিজেরাই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছ এবং খোদায়ী কর্তৃত্ব তাদের হাতে সোপর্দ করছে যাতে তারা সংশয় প্রণোদিত কাজ করে এবং স্বীয় প্রবৃত্তি ও কামনার বশীভূত হয়ে চলে। তোমাদের মৃত্যু ভয় এবং দুনিয়ার জীবন-যা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই তাদেরকে এই পদে আসীন করেছে। এরূপ মানসিকতা ও জীবন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমেই তোমরা অক্ষমদেরকে তাদের অধীন করেছ। ফলে অক্ষমদের একদল তাদের অনুদাস ও আজ্ঞাবহ হয়েছে আরেক দল এক লোকমা খাবারের অন্বেষণে নিরুপায় হয়ে পড়েছে। আর এ সকল শাসক নিজেকে প্রবৃত্তি প্রসূত (অবিবেচক) মত দ্বারা রাষ্ট্রকে ওলট-পালট করে দেয় এবং পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন ও কুজনদের অনুসরণের মাধ্যমে প্রবৃত্তি পূজারীর লাঞ্ছনাকে নিজেদের উপরে ডেকে আনে। আর প্রত্যেক জনপদে মিম্বারের উপরে তাদের মুখপাত্র হিসেবে একজন বাকপটু খতিব রেখেছে এবং গোটা দেশ তাদের পদতলে এবং তাদের হাত সর্বত্র প্রসারিত। আর জনগণ তাদের নিয়ন্তণে। তাদের উপর যাই চাপিয়ে দিক তা থেকে আত্মরক্ষা করতে অপারগ। কিছু আছে জোর জবরকারী ও শত্রুতাকারী এবং অক্ষমদের উপরে কঠিন আক্রমণকারী। আর কিছু আছে শাসনকারী। তারা আল্লাহ্‌ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে না। অদ্ভুত! আর কেনইবা অবাক হব না, যখন পৃথিবী এমন এক ব্যক্তির হস্তগত যে ঠগবাজ ও জালিম, আর যাকাত আদায়ের দায়িত্ব এমন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত যে আত্মসাৎকারী এবং মুমিনদের শাসনের ভার এমন একজনের হাতে রয়েছে যে তাদের প্রতি দয়া করেনা। তাই আল্লাহ্‌ যা নিয়ে আমাদের বিরোধ সে বিষয়ে বিচার করুন। নিশ্চয় তিনি স্বীয় নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করবেন।

হে আল্লাহ্‌! তুমি জান যে, আমাদের থেকে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে তা শাসন কর্তৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নয় এবং দুনিয়ার পণ্যের লোভে নয়। তবে এ জন্য যে, তোমার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত দেখব এবং তোমার রাজ্যে সংস্কার করব আর তোমার নিপীড়িত বান্দাদের চিন্তা মুক্ত করব এবং তোমার ওয়াজিব ও সুন্নত এবং বিধি বিধান পালন করব। তোমাদের (আহলে বাইতদের প্রতি ইনসাফ করা)। যালিমদের শক্তি তোমাদের উপরে রয়েছে। তারা তোমাদের নবীর নূরকে নিভিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। আর আল্লাহ্‌ আমাদের জন্য যথেষ্ট। তার উপরে ভরসা করি এবং তার দরবারে প্রত্যাবর্তন করব। শেষ পরিণতি সব তারই অভিমুখে।

ইমাম হোসাইন (আ.) কে প্রশ্ন করা হয় যে, জিহাদ সুন্নাত কাজ নাকি ফরয? তিনি উত্তরে বলেন: জিহাদ চার প্রকার দুটি ফরয। আর একটি জিহাদ হলো এমন সুন্নাত, যা ফরয ছাড়া বাস্তবায়িত হয় না। আরেকটি হলো নিরেট সুন্নাত জিহাদ। কিন্তু দুটি ফরয জিহাদের একটি হলো মানুষের নফসের সাথে জিহাদ-আল্লাহ্‌ অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে। আর এটা হলো বৃহত্তম জিহাদ। আর তোমাদের সীমান্তবর্তী কাফেরদের সাথে যে জিহাদ ফরয।

আর যে জিহাদটি সুন্নাত কাজ এবং ফরযের মাধ্যমে ছাড়া সম্পন্ন হয় না সেটি হলো শত্রুর সাথে জিহাদ ও সকল উম্মতের উপর তা ওয়াজিব। আর যদি জিহাদকে বর্জন করে তাহলে তাদের উপর আযাব নেমে আসবে এবং সে আযাব সম্পূর্ণ উম্মতকে ঘিরে ধরবে। আর তা ইমামের জন্য সুন্নাত। আর এর পরিনাম হলো ইমাম উম্মতের সাথে শত্রুর নিকটে জিহাদটি নিরেট সুন্নাত সেটা হলো কোন সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কোন মুসলমান যে সংগ্রাম করে এবং তা বাস্তবায়ন ও উজ্জীবিত করার জন্য যে লড়াই করে আর ঐ কারণে কাজ ও চেষ্টা করার অন্যতম কাজ। কারণ এটা হলো সুন্নতকে বাঁচিয়ে রাখা। আর রাসূল্লাহ বলেছেন: যে ব্যক্তি উত্তম কোন রীতি বা প্রথা চালু করবে সে তার পুরষ্কার লাভ করবে। তদ্রুপ কিয়ামত পর্যন্ত যারাই তদনুযায়ী আমল করবে তাদের সওয়াবে অংশীদার হবে। তবে এতে আমলকারীদের সওয়াব থেকে কিছুই কম করা হবে না।

রোমান সম্রাটের প্রশ্নাবলীর উত্তরে ইমাম হুসাইন (আ.)

ইমাম হুসাইন (আ.) এর নিকট রোমান সম্রাটের কাছে দূত ছায়া পথ সম্পর্কে আর আল্লাহ্‌র এমন সাতটি সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করে যেগুলো মায়ের গর্ভ হতে নয়। ইমাম হুসাইন (আ.) স্মিত হাসেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় : হাসলেন কেন? তিনি বললেন তুমি এমন কিছু বিষয়ের প্রশ্ন করেছ যা পরম জ্ঞানের (ঐশী জ্ঞান) দৃষ্টিতে অকূল দরিয়ার মাঝে খড়কুটোর সম।

ছায়াপথ হলো আল্লাহ্‌র ধনুক। আর যে সকল সৃষ্টি মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেনি তা হলো- হযরত আদম (আ.), হযরত হাওয়া (আ.) ঐ কাক (হাবিল কাবিলের ঘটনায় যা

নাযিল হয়েছিল), ইব্রাহিম (আ.) এর দুম্বা যা ইসমাইল (আ.) এর পরিবর্তে কোরবানি করা হয়। আল্লাহ্‌র নবী সালেহ (আ.) এর জন্য প্রেরিত উষ্ট্রী। মুসা (আ.) এর লাঠি। আর হযরত ঈসা (আ.) অলৌকিক ক্ষমতাবলে যে পাখি সৃষ্টি করে জীবন দেন। অতঃপর সে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের রুজি সম্পর্কে প্রশ্ন করে। ইমাম হুসাইন (আ.) উত্তর দেন, বান্দাদের রুজি চতুর্থ আসমানে এবং আল্লাহ্ পরিমাণ মতো সেখান থেকে অবতীর্ণ ও সংকীর্ণ ও প্রসারিত (বৃদ্ধি) করেন। অতঃপর প্রশ্ন করে যে, মুমিনদের আত্মাসমূহ কোথায় একত্র হয়? তিনি বলেন, জুম আর রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাসের পাথরের নিচে আর তা আল্লাহ্‌র আরশের নিম্নতম স্থান যেখান থেকে তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তার ওপর পথ অতিক্রম করা হয়। এবং যেখান থেকে আসমান সমুন্নত হয়েছে। আর কাফেরদের আত্মাসমূহ এই দুনিয়াতে একত্র করা হবে হাযরামাউতে যা ইয়েমেন নগরীর পশ্চাতে অবস্থিত। অতঃপর আল্লাহ্ পশ্চিম থেকে এক আগুন আর পূর্ব থেকে এক আগুন উত্থিত করবেন। যাদের মাঝে দুটি বাতাস থাকবে যা সকল মানুষকে বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি পাথরের কাছে একত্রে করবে এবং ঐ পাথরের ডান পার্শ্বে তাদেরকে আটক করা হবে আর বেহেশত পরহেযগারদের জন্য আত্মপ্রকাশ করবে। আর ঐ দোযখে রয়েছে ঐ পাথরের বাম পার্শ্বে ঐ মাটির গভীরে। আর তার মধ্যে রয়েছে ফালাক ও সিজ্জিন। সকল মানুষ পাথরের নিকট থেকে বিক্ষিপ্ত হবে। যারা বেহেশত প্রাপ্ত সে পাথরের নিকট থেকে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যে দোযখের উপযুক্ত সে পাথরের নিকট থেকে সেদিকে যাবে।

ইমাম হিসেবে জাতির উদ্দেশ্যে ইমাম হুসাইন (আ.) এর দিক নির্দেশনা

"আমি তোমাদের আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ দান করছি। আর তার (শাস্তির) দিনসমূহ থেকে সতর্ক করছি। আল্লাহ্‌র প্রতীক ও নিদর্শনসমূহকে তোমাদের জন্য সমুন্নত করছি। এমনভাবে যে, যেন যা ভীতিকর এবং তা তার ভয়ানক আগমন, অচেনা পদার্পন এবং তিক্তকর স্বাদ সহ তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে আর তোমাদের ও তোমাদের আমলের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমরা সুস্থ শরীরে তোমাদের আয়ুষ্কালের মধ্যেই আমলে ধাবিত হও যেন অকস্মাৎ মৃত্যু দেখা দিবে আর তোমাদেরকে মাটির ওপর থেকে মাটির মধ্যে টেনে নিবে এবং মাটির টিলা থেকে গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করবে এবং সঙ্গী সাথী ও প্রশান্তি থেকে ভয় ও নিঃসঙ্গতায় নিয়ে যাবে এবং খোলা আকাশ ও আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাবে। আর প্রশস্ত জায়গা থেকে সংকীর্ণতার মধ্যে ঠেলে দিবে যেখানে আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে যাওয়া হয় না, অসুস্থকে ও দেখতে যাওয়া হয় না আর না কোন ফরিয়াদে সাড়া দেওয়া হয়। আল্লাহ্ আমাদের এই দিনের ভয় থেকে সাহায্য করুন আর আমাদের ও তোমাদের তার শাস্তি থেকে নাজাত দিন এবং আমাদের ও তোমাদের জন্য তার সমুচিত সওয়াব আবশ্যক করুন। আল্লাহ্‌র বান্দারা, যদি এই দুনিয়াই তোমাদের জীবনের শেষ হতো ও চূড়ান্ত আবাস, তাহলে উচিত ছিল মানুষ এমন কাজ করবে যা দুনিয়া থেকে তার দুঃখ কষ্টকে সরিয়ে নেয় ও দুনিয়ার বিপত্তি থেকে মুক্তি দেয়। আর কেনই বা এমনটা হবে না যা যখন মানুষ এই দুনিয়ার পরে তার কৃতকর্মের দায়ে বাধা। তাকে হিসাব-নিকাশের মুখোমুখি করা হবে, কোন সাহায্যকারী নেই যে তাকে বাঁচাবে আর কোন পৃষ্ঠপোষক নাই যে তাকে রক্ষা করবে। এই দিনে ইমান এনে কারো কোন লাভ হবে না। যদি না দুনিয়ায় ইমান এনে

থাকে কিংবা ইমান থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করে থাকে। বলুন, তোমরা অপেক্ষা কর, আমরা তোমাদের সাথেই অপেক্ষমান। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার উপদেশ দিচ্ছি। কারণ যে ব্যক্তি তাকওয়াবান হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জামিনদার হন, তার খারাপ থেকে ভালো অবস্থায় নিয়ে যাবেন এবং যে পথ দিয়ে সে ধারনাও করেনি সেখান থেকে তার রুজির ব্যবস্থা করবেন। আর এমন না হয় যে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যে, আল্লাহ্‌র অন্যান্য বান্দার পাপে উৎকণ্ঠিত থাকবে, অথচ নিজের পাপ থেকে নির্ভাবনায় থাকবে। কারণ আল্লাহ্ তাঁর বেহেশতের ব্যাপারে ধোঁকার শিকার হবেন না। আর তার নিকটে আছে সেটা আনুগত্য ব্যতীত অর্জন করা যায় না।

হয়রত হুসাইন (আ.) এর কেরামত

আহলে বাইতের মহান সদস্য ও উজ্জ্বল নক্ষত্র । তাঁর কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ উপাধি সৈয়দ ও শহীদ তিনি এমন শুভ্র ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন যে, অন্ধকারে বসলে তাঁর কপাল, গন্ড থেকে আলো বের হয়ে চারপাশ আলোকিত করে দিত। তিনি বক্ষ থেকে পদ যুগল পর্যন্ত রাসূল পর্যন্ত রাসূল (আ.) এর এবং বক্ষ থেকে মাথা পর্যন্ত ইমাম হাসান (আ.) এর সম আকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন।

হুযুর পাক (সা.) বলেন; হুসাইন আমা হতে এবং আমি হুসাইন থেকে। যে হুসাইনের সাথে বন্ধুত্ব করে তুমিও তার বন্ধু হও। কেননা হুসাইন আমার বংশ ধারার উজ্জ্বল বাতি। হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা.) রেওয়ায়েত করেন। যখন ইবনে যিয়াদ (কুফার ইয়াজিদ নিয়োজিত গভর্ণর) আদেশ দেয় যে, হুসাইনের শির বর্শায় বিদ্ধ করে কুফা শহরের অলিতে-গলিতে প্রদর্শন করা হোক। তখন আমি আমার গৃহের জানালায়

দণ্ডায়মান ছিলাম। যখন তাঁর পবিত্র শির আমার কাছ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, তখন আমি তার মধ্য থেকে এই আওয়াজ শুনতে পেলাম: "আপনি কি ধারনা করেন যে, গুহা ও পর্বতের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল" (সুরা কাহাফ:৮) । এই আওয়াজের প্রচন্ডতায় আমার লোমকূপ শিউরে উঠে। আমি চিৎকার করে বললাম: আল্লাহ্‌র কসম. এই শির তো রাসূলাহ (সা.) এর দৌহিত্রের ।এর ভিতর থেকে এমন আওয়াজ ভেসে আসা বিস্ময়কর বটে। মুয়াম্বার ও যুহরী (রহঃ) একদিন আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের (উমাইয়া খলিফা) মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। ওলীদ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করল: আপনাদের মধ্যে কে বলতে পারেন যে হযরত হুসাইন (আ.) এর শাহাদতের দিন বাইতুল মুকাদ্দসের পাথর কি অবস্থায় ছিল? ইমাম জুহুরি বললেন ; আমি সংবাদ পেয়েছি যে সে দিন যে পাথরই উঠানো হতো, নিচে তাজা রক্ত পাওয়া যেত। অন্য একজন থেকে বর্ণিত আছে হুসাইন (আ.) শহীদ হলে আসমান থেকে রক্ত বর্ষিত হতে থাকে এবং আমাদের সবকিছু রক্তাপ্লুত হয়ে যায়। আকাশ ও কয়েকদিন পর্যন্ত রক্ত রঞ্জিত দৃষ্টিগোচর হয়।

জনৈক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলেন : আমি তার গোত্র থেকে আগত জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম : তুমি হুসাইন (আ.) এর জন্য জ্বিনদের বিলাপ করতে শুনেছ কি? সে বলল : আমি জ্বিনদেরকে এই বলে বিলাপ করতে শুনেছি : রাসূলাহ (সঃ) তার কপালে চুমু খেয়েছেন। তাঁর কপালে উজ্জল ও দীপ্তিময়। তার বাপদাদা উত্তম ও শ্রেষ্ঠতম পরিবারের সদস্য। হযরত হুসাইন (আ.) এর শাহাদতের সময় আহলে বাইতদের দুশমন ইয়াযিদ নিয়োজিত গর্ভনর ও উমাইয়া ব্যক্তিবর্গ এ সংবাদ পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে সে রাতে মদিনার সর্বত্র নিম্নোক্ত কবিতা শ্রুত হয়। কিন্তু আবৃত্তিকারী কে তার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।" হুসাইন এর হত্যাকারী। তোমাদেরকে কঠিন অবমাননাকর আজাবের দুঃসংবাদ। আসমানে যত সৃষ্টি আছে পয়গম্বর হোক কিম্বা ফেরেশতা সকলে তোমাদেরকে বদ দোয়া দিচ্ছেন। তোমাদের ওপর লানত হোক ইঞ্জিলধারী ঈসা (আ.) ও সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ.) এর বাচনিক। রোমীয় গাজিগণের মধ্য থেকে একজন বর্ণনা করেন, আমি এক গির্জায় নিম্নোক্ত কবিতা লিখিত দেখেছি :

যে উম্মত, হুসাইন (আ.) কে হত্যা করেছে সে কি কিয়ামতের দিন তার নানার সাফায়াত আশা করে ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এই কবিতা কে লিখেছে? জওয়াবে গির্জার লোকেরা এই ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করে। জনৈক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলেন: মুখতার কারবালার যুদ্ধে হুসাইন (আ.) এর হত্যাকারীদের বেছে বেছে হত্যা করেন। এই প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে যখন ওবায়দুলাহ ইবনে যিয়াদ ও তাঁর সঙ্গীদের শির কুফার মসজিদ প্রাঙ্গনে আনা হয় তাদেরকে বাহবায় রাখা হয়। আমি ও সেখানে গেলাম। আমি মানুষের মুখ থেকে "এসে গেছে" "এসে গেছে" ধ্বনি শুনতে উপস্থিত ছিলাম। অবশেষে একটি সাপ এল এবং নিহতদের শিরের মাঝখানে বসে গেল। এরপর সাপটি ওবায়দুলাহ ইবনে যিয়াদের নাকে ঢুকে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে বের হয়ে এসে চলে গেল। সাপটি সকলের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল লোকেরা আবার "এসে গেছে" "এসে গেছে" বলে চিৎকার আরম্ভ করল। দ্বিতীয়বার সেই সাপ আবার "এসে গেল" এবং পৃষ্ঠে যেরূপ করেছিল তা আরম্ভ করল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদিন রাসূল (সা.) এর কাছে হযরত জিবরাঈল (আ.) ছিলেন। এ সময় হুসাইন (আ.) রাসূল (সা.) এর কাছে চলে আসেন। জিবরাইল (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন এ কে? হুযুর (সা.) বললেন: সে আমার সন্তান। এ কথা বলে তিনি হুসাইনকে কোলে বসিয়ে নিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন: তাকে শহীদ করা হবে। রাসূল (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তাকে কে শহীদ করবে? জিবরাঈল (আ.) বললেন: আপনার উম্মত। আপনি বললে সেই জায়গাও বলে দেই, যেখানে তাকে শহীদ করা হবে। এরপর জিবরাঈল (আ.) কারবালার দিকে ঈশারা করলেন এবং কিছু লাল মাটি ধরে তাকে দেখালেন। তিনি বললেন: এ মাটি হুসাইনের শাহাদত ভূমির মাটি। হযরত উম্মে সালমাহ (রা.) বলেন, একরাতে রাসূল (সা.) গৃহের বাইরে চলে গেলেন। তিনি দীর্ঘ সময় পরে ফিরে এলেন। আমি তাঁর চুল বিক্ষিপ্ত ও ধুলিধুসারিত দেখলাম। আমি আরয করলাম: ইযা রাসূলালাহ! আমি আজ আপনাকে এ কি অবস্থায় দেখছি। তিনি বললেন: কুদরতের কর্মীরা আজ আমাকে ইরাকে অবস্থিত এক জায়গায় নিয়ে গেল। সে জায়গাকে কারবালা বলা হয়। সেটাই হুসাইনের শাহাদত ভূমি। সেখানে আমি আমার আওলাদকে প্রত্যক্ষ করেছি এবং তার রক্ত থেকে মাটি তুলে এনেছি, যা এখন আমার হাতে আছে। তুমি হেফাজতে রাখ। আমি মাটি হাতে নিয়ে দেখলাম সেটি লাল মাটি ছিল। এরপর আমি সেই রক্ত রঞ্জিত মাটি বোতলে রেখেছিলাম এবং বোতলের মুখ ভাল করে বেঁধে দিলাম। যখন হযরত হুসাইন (আ.) ইরাক সফর শুরু করেন, তখন আমি প্রত্যহ এই বোতলটি বাইরে এনে দেখতাম। তাতে মাটি পূর্বাবস্থায়ই ছিল। কিন্তু যখন আমি আশুরার দিন এই মাটি দেখলাম, তখন তাতে রক্ত তাজা হয়ে গিয়েছিল। এতে আমি বুঝে নিলাম যে, পাষন্ডরা হযরত হুসাইন (আ.) কে শহীদ করে দিয়েছে। আমি খুব কাঁদলাম। কিন্তু শত্রুদের তাৎক্ষণিক হাসি-তামাশার ভয়ে কান্নাকাটি প্রকাশ করলাম না। এরপর যখন তাঁর শাহাদতের খবর এল

তখন শাহাদতের তারিখ সেটাই ছিল। হযরত হুসাইন (রা.) এর শাহাদত ৬১ই হিজরীতে আশুরার দিনে হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৭ বৎসর।

কুফাবাসীদের প্রতি ইমাম হোসাইন (আ.) এর পত্র

কুফাবাসীগন প্রথমে ইমাম হোসাইন (আ.) এর নিকট তাকে আমিরুল মুমেনীন হিসাবে মান্য করার ও তাঁর আনুগর্ত্য স্বীকার করার জন্য তাকে কুফায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায় পরবর্তীতে তারা তাদের এই অবস্থান পরিবর্তন করে ওবায়দুলাহ ইবনে যিয়াদের আনুগত্য স্বীকার করে কারবালা যুদ্ধে ইমাম হোসাইন (আ.) এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এই বিষয়টি সম্যক অবহিত হয়ে তিনি কুফাবাসীদের নিকট যে পত্র লিখেন তা নিম্নরূপ :

পর সংবাদ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হও হে কুফাবাসী দল। এই সময়ে যখন তোমরা আমাদের সাহায্য চেয়েছ এবং আমরা দ্রুত আমাদের সাহায্য এনেছি। অথচ তোমরা ইসলামের শাসনের যে তলোয়ার আমাদের অধিকার ছিল সেটাই আমাদের উপরে হেনেছ এবং আমাদের জীবনের উপরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছ যা আমরা নিজের ও তোমাদের শত্রুদের উপরে প্রজ্জ্বলিত করেছিলাম। আর তোমরা তোমাদের নিজেদের বন্ধুদের ক্ষতি সাধনে হাতে হাত মিলিয়েছে ও একট্টা হয়েছে এবং নিজের শত্রুদের সাহায্যকারী হয়েছে তারা তোমাদের মাঝে কোন ন্যায়নীতির প্রসার ঘটানো ছাড়াই অথবা তারা তোমাদের কোন প্রত্যাশা পূরণ করা ছাড়াই। আর আমাদের থেকে কোন কোন বেদআত্ সংঘটিত হওয়া ছাড়াই কিংবা কোন ভ্রান্ত মতামত হওয়া ছাড়াই। তাই ধিক তোমাদের উপর। তোমরা আমাদের পরিত্যাগ করেছ অথচ কোন তলোয়ারই উঠানো হয় নি এবং চিত্তসমূহ নিরুদ্বিগ্নই আছে আর আমাদের মতামত পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু তোমরা পঙ্গপালের ন্যায় তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছ এবং পতঙ্গের ন্যায় মোমবাতির উপর লাফিয়ে পড়েছ। তাই ধ্বংস ও নিঃস্ব থেকে উম্মতের মধ্যে এসব অবাধ্য- এসব আহযাবের বিতাড়িতরা ও কুরআনকে দূরে নিক্ষেপকারীরা এবং এসব শয়তানের চেহারা। যারা সত্য বাণীকে অন্যরুপে প্রতিভাত করে এবং ইসলামে সুন্নতের প্রদীপকে নির্বাপিত করে এবং জারজদেরকে স্বীয় বংশের অন্তর্ভুক্ত করে । (মুয়াবিয়া তার পিতার জারজ সন্তান যিয়াদকে তার পিতার বৈধ সন্তান হিসাবে ধর্মীয় সিদ্ধান্তকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে তাকে বৈধতা দান করে তাকে ভাইয়ের মর্যাদা দিয়ে সকল প্রকার সুযোগ-সবিধা দানের ব্যবস্থা করে)। এরা দ্বীনকে উপহাস করে এবং কোআনকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে। আল্লাহ্র কসম। এই কাপুরুষতা এবং লাঞ্চনা তোমাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। তোমাদের মূল ও কান্ড এর উপরেই জন্মেছ আর তোমাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। তোমাদের মূল ও কান্ড এর উপরেই জন্মেছে আর তোমাদের মেরুদন্ড এর উপরেই দন্ডায়মান। তোমরা হলে নিজ তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচর্যাকারী মালিকদের জন্য কণ্ঠকে আকীনকারী নিকৃষ্টতম ফল, আর তোমাদের লুণ্ঠনকারীদের জন্য সুস্বাদু লোকমা স্বরুপ। তাই আল্লাহ্র অভিসম্পাত হোক ঐসব অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর উপর যারা দৃঢ় অঙ্গীকার করার পরে, তা ভঙ্গ করে অথচ তারা ইতিপূর্বে নিজেদের উপর আল্লাহ্কে তত্ত্বাবধায়ক ও সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করেছিল। জেনে রাখ এই জারজের পুত্র জারজ (ইবনে যিয়াদ) আমাদেরকে দুই পথের মাঝে নিক্ষেপ করেছে। ধর্ম আর লাঞ্ছনাও গোলামির মধ্যে। কিন্তু অইমান আমাদের সাজে না। আল্লাহ্ তাঁর রাসূল, মুমিনগণ এবং পবিত্র সেই কোলসমূহ যা আমাদের প্রতিপালন করেছে আর আত্মসম্মানের অধিকারী উন্নত শির ব্যক্তিরা এটাকে মেনে নেয় না। আমরা বীর পুরুষ সুলভ জীবন বাজি রাখাকে এসব নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অভিশপ্তদের আনুগত্য করার উপরে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আমি এই জন্য কয়েক স্বজন -পরিজন নিয়েই অগ্রসর হব ও প্রতিবাদ করব যদিও শত্রু কঠিন এবং অগণিত। আর বন্ধুরা হাত গুটিয়ে নিয়েছে। জেনে রেখ অচিরেই যুদ্ধ বেঁধে যাবে, যুদ্ধ শুরু হতে কেবল তাদের (শত্রুদের) ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার সময়টুকু বাকি রয়েছে আর তারপরেই খণ্ডিত মস্তকসমূহকে ঝুলানো হবে। এটা হলো একটি উপদেশ যা আমার পিতা আমার উদ্দেশ্যে করেছিলেন। কাজেই তোমরা সকল প্রচেষ্টাকে একত্র এবং আমার বিরুদ্ধে বাস্তবায়ন কর এবং আমাকে অবসর দিওনা। আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখি যিনি আমার প্রতিপালকও তোমাদের প্রতিপালক। আর এমন কোন প্রাণী নেই যার লাগাম (পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ) ও প্রাণ তাঁর হাতে নয়। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সঠিক পথের (সত্যকে সাহায্যে নীতি) উপরে (অবিচল) রয়েছেন। (হুদ ৫৬)।

হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)এর শাহাদত

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্মার এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন হযরত ইমাম হোসাইনের যুদ্ধ সম্পর্কে তার বর্ণণা: আমি বর্শা দ্বারা ইমামকে আক্রমন করিয়াছিলাম এবং একেবারে তাহার কাছে পৌঁছিয়া ছিলাম। তিনি সব দিক দিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যেদিকে ফিরতেন সেদিকেই শক্ত সৈন্যদেকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া যাইতেন। দেহে জামা, মাথায় পাগড়ি বাঁধা অবস্থায় তিনি লড়ছিলেন। খোদার নামে বলেছি এরূপ ভগ্ন হৃদয় ব্যক্তি যার পরিবারে সকলেই একে পর এক চোখের সামনে শত্রুর হাতে নিহত

হয়েছে; সেই মানুষের মধ্যে এরূপ বীরত্ব, সাহস, দৃঢ়চিত্ততা এবং স্থিরতা আমি জীবনে আর কখনও দেখিনি।

তিনি ডানে-বামে যে দিকে ফিরতেন সেই দিকেই শত্রু দল ব্যঘ্র তাড়িত ভীরু মেঘপালের ন্যায় উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করত। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই অবস্থা চলল। তখন ওমর ইবনে সাদ আসরের নামায কাজা হয়ে যাবে (নামাযের মধ্যে যাদের সালাত ও সালাম পাঠ করা হয় তাদের হত্যা করার জন্য) তাই সহসাই যুদ্ধ শেষ করার নির্দেশ দেয়। এ লক্ষ্যে আক্রমন জোরদার করার নির্দেশ দিল। তাই সবাই একযোগে ইমাম পাককে (আ.) আক্রমন করল। কোন তীর ঘোড়ার পায়ে লেগেছিল কোনটা তার নিজ শরীর মোবারকে লাগছিল। এভাবে যখন তীরের আঘাতে তা নিজের পবিত্র শরীর ঝাঝড়া হয়ে ফিনাকি দিয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। তখন ইমাম হোসাইন (আ.) বার বার মুখে হাত দিয়ে বলেছেন, "বদবখত" তোমরা তোমাদের নবী (সা.) এর আহলে বাইতকে হত্যা করলে। মহান ইমাম ঘোড়া থেকে পতিত হলেন। যাকে নবী নিজের কাঁধে রাখতেন ঘোড়া থেকে পতিত হওয়ায় সৃষ্টির নিকৃষ্ট প্রাণী সীমার হাওলা বিন ইয়াজিদ হোসাইনের বুকের উপর বসল। তাকে দেখে হুসাইন (আ.) বললেন, আমার নানাজান (সা.) ঠিকই বলেছেন এক হিংস্র কুকুর আমার আহলে বাইতের উপর মুখ দিচ্ছে। ইমাম পাক সিজদায় মাথা রাখলেন, তাসবীহ সুবহানা রাব্বিয়াল আলা পাঠ করলেন ও বললেন, মওলা যদি (হুসাইন) এর কুরবানী তোমার দরবারে গৃহীত হয় তাহলে এর সওযাব নানাজান (আ.) এর উম্মতের উপর বকশিস করে দাও। (ইন্না লিল্লাহে---রাজেউন)। ইমাম পাকের পবিত্র মস্তক মোবারক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে তাঁর ঘোড়া "জুলজানা" স্বীয় কপালকে তাঁর পবিত্র রক্তে রঞ্জিত করে এবং দৌঁড়াতে থাকে। তখন সীমার বলতে থাকে ঘোড়াটিকে ধরো। যতজন ঘোড়াটিকে ধরতে এগিয়ে এলো সে সবাইকে আক্রমন করলো। এভাবে সতের জন খোদার দুশমন খতম হয়ে গেল। তারপর ঘোড়া দৌঁড়ে ইমাম পরিবারের তাবুর কাছে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী বলেছেন, শহীদ হওয়ার পর হযরত ইমাম পাকের পবিত্র দেহে ৩৩টি বর্শার আঘাত, ৩৪টি তরবারি ও অসংখ্য তীরের আঘাত দেখা যায়। ওমর বিন সাদের প্রতি নির্দেশ ছিল ইমামের লাশ মোবারক যেন অশ্বখুরে দলিত মথিত করা হয়। এবার সেই কাজের পালা ওমর বিন সাদ্ বলল, অশ্বখুরে দলিত করার জন্য কাহারা প্রস্তুত আছ? ওমনি দশজন ঘোড় সওয়ার প্রস্তুত হলো এবং ইমামের পবিত্র দেহ মোবারকের উপর দিয়া দশজন সিপাহী ঘোড়া ছুটাইয়া চলে গেল। কারবালার মহা রন শেষ হলো। কারবালার ঘটনা দুঃখদায়ক ও বেদনাদায়ক ও লোমহর্ষক। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের জঘন্যতম কোন ঘটনা ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এটি এমন একটি বেদনাদায়ক ঘটনা যার চেয়ে লজ্জাজনক আর কোন ঘটনা ইসলামে ঘটে নি। আল্লাহ্‌র অভিশাপ পড়ুক সেই সব লোকের উপর যাদের হাত ছিল সেই ঘটনায় অর্থাৎ যারা হুকৃম চালিয়েছে এবং যারা এই ধরণের চূড়ান্ত ধর্মদ্রোহিতার কাজ সম্পাদনে কোন না কোন ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। হিন্দের শাহানশাহ হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তী (রাহঃ) বলেছেন, হোসাইন ছিলেন বাদশা, (আমীরুল মোমেনীন)। তিনি ছিলেন বাদশাহদের বাদশাহ। তিনি ছিলেন স্বয়ং ইসলাম ধর্ম। তিনিই ছিলেন ধর্ম ইসলামে সহায়তাকারী। তিনি শাহাদত বরণ করেছেন কিন্তু মিথ্যার কাছে আত্মসমর্পণ (ইয়াজীদের হাতে বাইয়াত করেন নি)। প্রকৃত পক্ষে হযরত ইমাম হুসাইনের শাহাদতের মাধ্যমে দ্বীন ইসলমেরই মৃত্যু সংঘটিত হয়েছিল, আর আহলে বাইতের মহান ওলী হযরত গাউসুল আযম আব্দুল কাদের জিলানী মহীউদ্দিন নাম ধারণ করে এই দ্বীনকে পুর্ণজীবন দান করেছেন।

কারবালায় হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) এর মাজার নির্মাণ ও ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

"বিহারুল আনওয়ার" এ খাবায়েজ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মোহাম্মদ আল্-বাকির (আ.) বলেছেন যে, "একদিন ইমাম আলী তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে কারবালা থেকে এক বা দুই মাইল দূরে গেলেন। এরপর তিনি আরও এগিয়ে গেলেন এবং মাক দাফান নামে এক জায়গায় পৌচ্ছুলেন এবং সেখানে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এরপর বললেন, দুশ নবী ও নবীদের সন্তানদের এখানে শহীদ করা হয়েছে এবং এটি থামার জায়গা। বিরাট প্রশান্তি লাভকারী শহীদদের শহীদ হওয়ার জায়গা। যা প্রাচীন লোকেরা অর্জন করতে পারেনি এবং তাদের পরে যারা আসবে তারাও তাতে পৌছাতে পারবে না।" বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে যখন ইমাম হুসাইন (আ.) সে জায়গায় পৌছুলেন তিনি জায়গাটির নাম জিজ্ঞাসা করলেন। লোকজন উত্তরে বলল তা কারবালা। ইমাম বললেন," হে আলাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই " কারব " (দুঃখ) এবং বালা (মুসিবত) থেকে।" এরপর তিনি বললেন: এখানে দুঃখ ও মুসিবত বাস করে। তাই এখানে থামো এবং এটি আমাদের থামার জায়গা। এখানে আমাদের রক্ত ঝরানো হবে এবং এখানে আমাদের কবর দেয়া হবে। আমার নানা আল্লাহ্‌র রাসূল আমাকে এ বিষয়ে আমাকে বলেছেন। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, কারবালা

শব্দগুচ্ছ আরবি কার-বাবেল শব্দ থেকে সৃষ্টি। যা প্রাচীন ব্যবিলনের কয়েকটি গ্রাম নাই নাওয়া , অলি-গদিবিয়া কারবেল্লা। আল নাও যাইস এবং আল হীর। এই আল হীরেই বর্তমান আল হেয়ার নামে পরিচিত। সেখানে ইমাম হুসাইন (আ.) এর মাজার শরীফ অবস্থিত। ইমাম হুসাইন (আ.) এর শাহাদতের পর তাঁর পরিবারের সদস্যদের বন্দি করা হয় এবং কুফা থেকে দামেস্কের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন বনি আসাদ গোত্রের লোকেরা সর্ব প্রথম তাঁর দেহ মোবারক কবরস্থ করে এবং এর উপর তাঁবুর আচ্ছাদন প্রদান করে। এই গোত্রের একজন নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তি এই রওজা শরীফে সর্ব প্রথম মোমবাতি জ্বালায় এবং তাঁর মাথার দিকে একটি গাছ রোপণ করে। (অক্টোবর, ৬৮০)। মুখতাব ইবনে আবু উবাই যাদাহ সাকাফি (যিনি কারবালায় ইমাম পাকের খুনীদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী) । সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং কবরের উপরে একটি গম্বুজ নির্মাণ করে। সেখানে একটি সবুজ পতাকা টাঙ্গিয়ে দেন। মসজিদের জন্য দুটি প্রবেশ দ্বার নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া তিনি রওজা পাকের আশে-পাশে কিছু জন বসতি স্থাপন করেন (৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ)। আব্বসীয় খলিফা আল সাফ্ফার শাসনকালে রওজা শরীফের উপর আরও একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয় এবং মসজিদের আর দুইটি প্রবেশ দ্বার নির্মাণ করা হয় (৭৪৯খৃ:)। ৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে আব্বসীয় শাসক আল মনসুর কর্তৃক রওজা শরীফের ছাদসহ গম্বুজসমূহ ধ্বংস করা হয়। খলিফা আল মাহদীর আমলে ধ্বংসকৃত ছাদ পুনঃ নির্মাণ করা হয় (৭৭৪)। ৭৮৭ সালে খলিফা হারুন আর রশীদের আমলে মাজার শরীফটি ধ্বংস করা হয় এবং পূর্বোল্লিখিত গাছটি কেটে ফেলা হয় এবং মাজারের সকল নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করা হয়। যাতে জিয়ারতকারীগণকে মাজার জিয়ারতে নিরুৎসাহিত করা হয়। আল মামুনের (৮১৩-৮৩৩) শাসন কালে রওজা শরীফ পুনঃ নির্মাণ করা হয়। ৮৫০ সালে খলিফা আল মুতাওক্কিল কর্তৃক মাজার শরীফ ধ্বংস করা হয় এবং মুনতাসীরের লাঙ্গল দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয় এবং জিয়ারত কারীদের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল..... নির্দেশে মাজার শরীফ পুনঃ নির্মাণ করা হয় এবং মাজারের ছাদে লোহার পিলার দেওয়া হয়। ৮৮৬ সালে পুনরায় এটি ধ্বংস করা হয়। ৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ওলীদ পরিষদ কর্তৃক রওজা শরীফটি পুনঃ নির্মাণ করা হয় এবং এর সঙ্গে দুটি মিনার যুক্ত করা হয়। ৯৭৭ সালে বুয়াইদ আমির আদহুদ আদ দওলার নির্দেশে রওজার অভ্যন্তরে কাঠের তৈরি খিলান নির্মাণ করা হয়। মাজারের চারদিকের পরিবেশ দৃষ্টি নন্দন করা হয়। তিনি কারবালাকে একটি শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইমরান বিন শাহীন মাজারের পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ১০১৬ সালে মাজারটি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে উজির হামান ইবনে ফাদী এর কাঠামো পুনঃনির্মাণ করেন। ১২১২ খ্রিস্টাব্দে নাসির দ্বীন আল্লাহ্ মাজারটির অভ্যন্তর ভাগ সংস্কার করেন। ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দে মাজারের কাঠামো, গম্বুজ ও দেওয়াল সুলতান ওয়ায়েস ইবনে হাসান জলিওয়ারীর নির্দেশে পুনঃনির্মাণ করা হয়। ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আহমদ ইবনে ওয়ায়েস কর্তৃক মাজারের দুটি মিনার সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয় এবং মাজারের পরিধি সম্প্রসারিত করা হয়। ১৫১৪ সালে ইরানে সাকাভি বংশীয় প্রথম ইসমাইল মূল মাজারের অভ্যন্তরে ভাগ কাচ দিয়ে মুড়ে দেন। ১৬২২ সালে আব্বাস শাহ সাকাভি পিতল দিয়ে মাজারের অভ্যন্তর ভাগ সংস্কার করেন এবং গম্বুজ কাশী, টাইলস দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে ওসমানী শাসক মুরাদ মাজারের চুনকাম করার ব্যবস্থা করেন। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে নাদির শাহ আকদার মাজার শরীফকে সুসজ্জিত করেন এবং মাজারের কোষাগারে মূল্যবান রত্ন উপহার দেন। ১৭৯৬ সালে আগা মোহাম্মদ শাহ কমর মাজারের গম্বুজ ও মিনার খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮০১ সালে ওহাবীরা মাজার শরীফ ধ্বংস করে এবং গম্বুজের সোনা লুট করে। ১৮১৭ সালে ওহাবীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মাজারটির অভ্যন্তর ভাগ ফাতিহ আলী শাহ কাজর রুপার ..... দিয়ে পুনঃনির্মাণ করেন এবং গম্বুজ পুনরায় সোনা দিয়ে মোড়ার ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৯ সালে ড: সৈয়দ তাহের সাইফুদ্দিন দাউদী (বুহরা সম্প্রদায়) মাজারের অভ্যন্তরভাবে রূপার পর্দা যার সঙ্গে সোনা সংযুক্ত ছিল উপহার দেন। এই সোনার সেটে ৫০০ টি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল যার প্রতিটির ওজন ছিল ১২ গ্রাম। ১৯৪১ সালে তিনি মাজারের সকল মিনার খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১৯৯১ সালে স্থানীয় বিদ্রোহী দমনের নামে সাদ্দামের সেনাবাহিনী এই মাজারের ব্যপক ক্ষতি সাধন করে, পরিপূর্ণ নির্মাণ কাজ ১৯৯৪ সালে শেষ হয়। ২০০৪-২০১০ সাল পযর্ন্ত বিভিন্ন সময়ে এ পবিত্র মাজারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বোমা হামলা করা হয় এবং প্রতিবারই বেশ কিছু সংখ্যক লোক মৃত্যু বরণ করে। এই মাজারের নির্মাণ ও ধ্বংসের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, মাজারের সম্মান বিষয়ক যত বিধি নিষেধ ফকীহরা আরোপ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তা মূলত আহলে বাইতদের দুশমনদের স্বার্থ সংশিষ্ট। অর্থাৎ আহলে বাইতদের দুশমনরা চায় না যে এই সব মাজারে কোন লোক জিয়ারতে যাক। তাই তাদের পক্ষ থেকে ফতোয়া দেওয়া হয়। মাজার জিয়ারত জায়েজ নাই, এটি শিরক ইত্যাদি। পক্ষান্তরে আহলে বাইতদের অনুসারীগণ এসব ফতোয়া যে ধর্মীয় বিষয় নয় বরং এসব ফতোয়া মূলত অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাই এগুলো মান্য করার বিষয়টি অবান্তর ও ধর্মীয়ভাবে

অপ্রাসসঙ্গিক। হযরত ইমাম হুসাইনের রওজায় বর্তমানে একাধিক প্রবেশ পথ রয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত প্রবেশ পথটিকে আল কিবলা অথবা দাহবাব বলা হয়। প্রবেশ পথের ডান পাশে হযরত ইবনে মাজাহিরের কবর অবিস্থত। তিনি বাল্য অবস্থা থেকে ইমাম পাকের সুহৃদ ছিলেন। ইমাম পাকের মাজারের দুই পার্শে তার দুই শাহজাদা হযরত আলী আকবর ও ৬ মাসের আলী আকবরের মাজার রয়েছে। তাছাড়া সপ্তম ইমাম হযরত মুসা কাযিমের মহান পুত্র ইবরাহীম, যিনি কারবালার শিক্ষা জনগণের মধ্যে প্রচার করেছেন তার মাজার শরীফ এখানে অবস্থিত মসজিদের মধ্যে রয়েছে। (তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট ও গাদীরে ঘুম থেকে দামেস্ক সংকলন সম্পাদনা ডাঃ এ.এন.এম মোমিন প্রথম প্রকাশ ২০১৫)।

হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) তার মস্তক মোবারকের কবর মিসরের কায়রো শহরে অবস্থিত। ঐতিহ্যহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে কারবালার যুদ্ধের পর ইমাম পাকের পবিত্র মস্তক এবং কারবালার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। দামেস্কের জামে মসজিদের কোন গোপন দেওয়ালে প্রোথিত করে। পরবর্তীতে উমাইয়া শাসক সুলায়মান ইবন আব্দুল (৭০৫-৭১৫) মালিকের নির্দেশে এ পবিত্র মস্তক রাষ্ট্রীয়ভাবে বাজেয়াপ্ত ও রাষ্ট্রীয় হেফাজতে থাকে। এই পরিস্থিতি ২২০ বৎসর কাল যাবত বলবত থাকে। এবং ইয়াজিদ মসজিদ এই মস্তক মোবারকের কারণে একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আব্বসীয়রা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তারা তাহলে বাইতের নামে প্রতারণা করে ক্ষমতায় আরোহণ করলেও উমাইয়াদের চেয়েও আহলে বাইতদের অধিকতর বড় শত্রু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আব্বাসীয় খলিফা আল মুকতাদীর (৯০৮-৯২৯) খৃঃ) ইমাম হোসাইন (আ.) এর শির মোবারকের প্রতি জনগণের এত ভক্তি দেখে সে হিংসায় জ্বলতে থাকে এবং বিভিন্নভাবে এই জিয়ারত কাজে বাধা প্রদান করতে থাকে কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই মুকতাদির এই পবিত্র মস্তক অশিকালান গাজা অঞ্চল থেকে ১০ কি.মি ইসরাইলের তেলআভিব থেকে ৫৮ কি.মি দূরে প্রেরণ করে এবং তা গোপনে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে এই পবিত্র মস্তক উদ্ধার সম্পর্কে আরবী ভাষায় যে তথ্য পাওয়া যায় সৈয়দ হাসান বিন আসাদ বর্ণনা করেন যে, যখন হোসাইন (আ.) মাথা মোবারক ছোট বাক্স থেকে বের করা হলো তখন তাজা রক্ত দেখা যাচ্ছিল এবং স্থানটি মুশকের সুগন্ধে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল।

তার বাংলা তরজমাঃ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটে তার অন্যতম একটি হলো হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) এর পবিত্র মস্তক উদ্ধার। এটি জুলুমবাজ শাসক কর্তৃক গোপনীয়ভাবে আশকালান এ রক্ষিত ছিল। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি ইচ্ছা করলেন যে এটি জাহির বা প্রকাশিত হোক এবং আল্লাহ্‌র বন্ধুরা তা দেখেন। যেহেতু হুসাইন (আ.) এর প্রকৃত ভক্ত ও অনুরক্তদের পবিত্র অন্তর বেলায়েত ও দ্বীন ধর্মে গভীরতায় বিশ্বাসী। তাই তিনি এই সুযোগ সৃষ্টি করেন। আব্বাসীয় খলিফা আল মুনতাসির বিল্লাহ্‌র (১২২৬-১২) শাসনামলে এটি উদ্ধার করা হয়। যে জায়গায় এটি লুকায়িত ছিল মুনতাসির সেখানে একটি বিশেষ ধরনের মিম্বর নির্মাণের ব্যবস্থা করে। ফাতেমীয় সুলতান আল জাফর (১১৪৯-১১৫৪) শত্রু পক্ষের অসম্মান ও অন্যান্য জটিলতা পরিহার করার লক্ষ্যে এ পবিত্র মস্তক আশকালান থেকে বর্তমান কায়রোর (কাহেরা) স্থানান্তর এর নির্দেশ দেন। সেই মোতাবেক আশকালান শহরের নগর পাল আল আমর সাইফ আল মামলাকা তামিম ও এই পবিত্র মাথা মোবারকের রক্ষক কাজী মোহাম্মদ আবীন মিসকিন যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে এই মস্তক মোবারক ৮২ জমাদিউস সানি, ৫৪৮ হি: ৩১শে আগস্ট, ১১৫৩-খ্রিস্টাব্দ কায়রোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আল মার কিরিজি আহম্মদ কালাকাসান্দি এবং ইবনে মুয়াজ্জির উল্লেখ করেছেন যে, হুসাইন (আ.) এর মস্তক মোবারক মঙ্গলবার, জমাদিউল সানি, ২রা সেপ্টেম্বর ১১৫৩ খ্রিস্টাব্দে কায়রো পৌছে। অতঃপর এটি বাব-মাকালফ আত আল রাসউল যা আল হুসাইন মসজিদে অবস্থিত। ফাতেমীয়দের রাজত্বের সোনালী সময়ের আশুরার দিনে মিশরীয় জনগণ এখানে উট, ছাগল, দুম্বা, গরু আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করত। এবং হুসাইন (আ.) এর হত্যকারীদের অভিসম্পাত করত। সালাউদ্দিন আইয়ুবীর শাসনামলে (১১৯৩ খ্রিঃ মৃত্যু) এইগুলি বেদআত হিসাবে গণ্য করে তা বন্ধ করা হয়। এই পবিত্র মস্তকের সংরক্ষকের নিকট থেকে গুপ্তধনের আশায় সালাউদ্দিন আয়ুবী তাকে জঘন্যভাবে নির্যাতন করে। কিন্তু তিনি সেই নির্যাতন সহ্য করতে সমর্থ হন এবং হুসাইন আঃ মস্তক বহনকারী বাক্স মাথায় করে বহন করেছিলো বলে অলৌকিক ভাবে রক্ষা পান। মিশরে বিশ্বের বিভিন্নস্থান থেকে আগত (৬৫৮-৭১৫ খ্রিঃ) বহু হুসাইন ভক্ত ঐ পবিত্র মাজার জিয়ারত করে থাকেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন

আলী ইবনে হোসাইন যিনি জয়নাল আবেদীন বা খোদা ভীরুদের অংলকার অথবা সাজ্জাদ অর্থাৎ সেজদাকারী। তিনি চতুর্থ ইমাম। ৩৮ হিজরীর ১৫ই জমাদিউল আওয়াল মোতাবেক ৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) আর মাতার নাম শাহারা বানু, যিনি পারস্য সম্রাট ইয়াজদগেরদের তৃতীয় কন্যা। প্রসঙ্গতে বলা যায় যে, ইরানের শাহ ইয়াজদগেরদ মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধে নিহত হলে তাঁর তিন কন্যা মুসলিমদের রাজধানী মদিনায় বন্দি হিসাবে আগমন করেন। তাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পূর্ব মসলিশে শুরায় হযরত আলী প্রস্তাব করেন যে, এই তিন কন্যা মুসলিম সম্ভ্রান্ত ৩টি পরিবারে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিবাহ দেওয়া হোক। সেই মোতাবেক সবচেয়ে বড় বোন ওমর পুত্র আব্দুল্লাহ বিন ওমরকে, মেজবোন আবুবকর পুত্র মুহম্মদ এবং তৃতীয় তথা কনিষ্ঠ কন্যা হযরত আলীর পুত্র হোসাইনকে পছন্দ করেন। হযরত আলী এই তিন দম্পতিকে মোবারক বাদ দিয়া বলিলেন, আমার বিশ্বাস আরব-আজমের দুইটি কুলীন রক্ত ধারা এই মহামিলনের ফলে আল্লাহ্পাক তোমাদিগকে দুনিয়ার সেরা প্রতিভাবান সন্তান দান করবেন। হযরত আলী (আ.) এর ভবিদ্বানীর প্রত্যক্ষ ফসল হলেন, হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন (আ.)। হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীনের জন্মের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য তাকে "ইবনে আল খাইরাতান" উপাধিতে ভূষিত করা হয় যার অর্থ তিনি কোরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং পারসীক বা ইরানীয়দের বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন

হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) ও তার স্ত্রী শাহারা বানু হযরত আলীকে (কঃ) ধারণাতীত সম্মান করতেন। তাই তাদের সন্তানের নাম রাখেন আলী। যেহেতু তাদের অপর এক পুত্রের নামও ছিল আলী তাই আলীর নামের সাথে "আজগর" অর্থাৎ ছোট শব্দ যোগ করে এই মহান শিশুর নাম রাখা হলো আলী আজগর। পরবর্তীতে তাঁর নামের সাথে জয়নুল আবেদীন বা সাধক কূলের ভূষণ তাঁর নামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে জনসমাজে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশু কালেই তিনি মাতৃহারা হন। তিনি অন্য মা দ্বারা প্রতিপালিত হন। বেশ বয়স হওয়ার পরও আলী আজগর জানতেন না যে, এই মা মহিলা তাঁর গর্ভধারনী মা নন। কথাবার্তা বলার বয়স হতেই পারিবারিক পরিবেশে ইমাম সাহেবের লেখাপড়ার হাতে খড়ি শুরু হয়। পরিবারের অন্যান্য শিশুর

সাথে তিনিও মসজিদে নবীর পাঠশালায় যাতায়াত শুরু করেন এবং অতি অল্প বয়সেই কুরআন শরীফ হেফজ করেন। তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ছিল মসজিদে নববী। সারা মুসলিম জাহানের প্রাতঃস্বরণীয় মনীষীগণ এখানে সমবেত হতেন। বিজ্ঞ সাহাবীগণ মসজিদে বসিয়া কুরআন-হাদিস,তাফসীর, ফেকাহ,ক্বেরাত প্রভৃতি দ্বিনি এলেমের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা দান করতেন। এলমে তাফসীরের উস্তাদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও হাদীসের উস্তাদগণ এই শিক্ষাকেন্দ্রের বিভিন্ন শাখা পরিচালনা করতেন। শিশু-কিশোরগণ অনেক সময় দলবেধে হুজুর (আ.) এর পূন্যবতী স্ত্রীদের খেদমতে হাযির হতেন। তাদের জবানী বিভিন্ন ঘটনা শ্রবণ করে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতেন। কেমন ছিল তাঁর পবিত্র চেহারা মোবারক, তাঁর আদব অভ্যাস, তিনি দিন-রাত্রি কিভাবে অতিবাহিত করতেন, তিনি কী কী পছন্দ করতেন এই সমস্ত বর্ণনা শ্রবণ পূর্বক শিশু-কিশোরগণ তাদের জীবন সেই আদলে গঠন করার জন্যে কঠোর সাধনা করতেন। এই সমস্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে অতি অল্প বয়সেই বালক আলী আজগর সকলের সপ্রশংস স্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অসাধারণ মেধা ও সুতীক্ষ্ম ধীশক্তির গুণে আট-নয় বৎসর বয়সে তিনি বড় বড় জ্ঞানী-গুণীগণের মজলিসে সমাদর পাইতে লাগিলেন। বড় বড় জ্ঞানীগণ ও সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিষয়ে পর্যন্ত শিশু আলী আজগরের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে মুগ্ধ হতেন। আলী আজগর সর্বোপরি তাঁর মহান পিতা ও তার মহান চাচার তত্ত্বাবধানে আস্তে আস্তে বড় হন। তিনি বড় হয়ে দেখতে পান যে, মুসলিম উম্মাহ্ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার। মুসলিম উম্মাহ্ বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত হয়ে মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে আহলে বাইতদের অধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘণ করছে। হাসান ও হুসাইন (আ.) এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ব্যাপারে সদা সচেষ্ট রয়েছেন। এহেন পরিস্থিতিতে তাঁর মহান চাচা হযরত ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে শাহাদত করানো হয়। তাঁর মহান পিতা সীমাহীন ধৈর্য্য ধরেন। কারণ মুয়াবিয়ার সাথে চুক্তি ধারা অনুযায়ী তার করণীয় কিছু ছিলনা। শুধু তিনি অপেক্ষা করছিলেন সেই দিনের যে দিন মুয়াবিয়ার অপঃশাসন থেকে মুসলিম উম্মাহ মুক্তি পাবে। আর সন্ধি চুক্তি অনুযায়ী তিনি রাজনৈতিকভাবে ইমাম ঘোষিত হবেন। অথচ মুয়াবিয়া তার মৃত্যুর পূর্বেই তার ফাসেক, জালেম মদ্যপ পুত্র ইয়াজিদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার সকল ব্যবস্থা করে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে (৬৮০ খ্রিঃ)। ইয়াজিদ ক্ষমতারোহণ করে সর্বপ্রথম ইমাম হোসাইন (আ.) কেই তাঁর আনুগত্য প্রকাশ অর্থাৎ বায়াত (Oath of Allegiance) এর জন্য চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করে। কিন্তু তিনিই তো বৈধ আমিরুল মোমিনীন তাছাড়া রাসূল (সা.) কর্তৃক আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঘোষিত ইমাম। তিনি কেমন করে এই ধরনের ব্যক্তির নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে পারেন। তাই তিনি মদিনা থেকে মক্কায় গমন করেন। ইমাম হোসাইন (আ.) জানতে পারেন তাকে হত্যা করার জন্য ইয়াজিদ গুপ্ত ঘাতক নিয়োগ করেছে। পাছে মক্কার পবিত্রতা তাঁর রক্তে বিনষ্ট হয়। তাই তিনি মক্কা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ইতোমধ্যে কুফা থেকে তাঁর কাছে হাজার হাজার পত্র আসতে থাকে। সব চিঠির বিষয়বস্তু এক আপনি অবিলম্বে কুফায় এসে আমিরুল মুমেনীনের দায়িত্বভার গ্রহণ করুন। তিনি কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে ইয়াজিদের সৈন্যরা তাকে বাধা প্রদান করে এবং কারবালার ময়দানে খাদ্য ও পানি থেকে বঞ্চিত করে এক শ্বেত সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি বাধ্য হয়ে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির প্রচেষ্টায় আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। সৌভাগ্যবশত পিতা হোসাইনের সাথে আলী আজগর উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অসুস্থ ছিলেন তাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম ছিলেন না, ফলে প্রাণে বেঁচে ছিলেন। তাঁর অন্যান্য পুরুষ আত্মীয় এমন কি ছয়মাসের ভ্রাতা পর্যন্ত শত্রুপক্ষের তীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শাহাদত বরণ করেন।

বন্দি ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.)

নিসন্দেহে ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) এর ইয়াজীদের সেনাদের হাতে পরিবার সহ বন্দি হওয়া তাঁর পিতার অভ্যুত্থানকে ফলাফলে পৌছানোর জন্য বিশেষ দাবিদার। কেননা যদি তারা বন্দি দশায় পরিপূর্ণভাবে সহনশীলতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, মহত্ব ও বীরত্বের সাথে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে মানুষের মাঝে ফুটিয়ে না তুলতেন এবং মানুষ অতি নিকট থেকে তাঁদেরকে না দেখত তাহলে কোন অবস্থাতেই ইমাম হোসাইন (আ.) এর মহান শাহাদতের বিষয়টি এরকম ভাবে সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করতো না। অথবা বণি উমাইয়াদের কুশাসন বিশেষ করে ইয়াজিদের অপকর্ম জনসমক্ষে প্রচার হওয়ার সুযোগ পেত না। ইমাম জয়নুল আবেদীন সর্বসমক্ষে নিজেদের বিজয়ী ও সৌভাগ্যবান ও ইয়াজিদকে পরাজিত ও হতভাগ্য ও ধর্মদ্রোহী হিসাবে বর্ণনা করতেন এবং তা প্রকৃত পক্ষে মুসলিম উম্মাহ তা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। এ ধারা অদ্যাবধি বলবত রয়েছে। কুফায় যখন তাঁর ফুফু জয়নাব ও ভগিনী ও কণিষ্ঠ ফাতেমার ভাষণ শুনে মানুষ মর্মাহত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তখন তিনি সবাইকে চুপ থাকতে বলে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের ভুয়সী প্রশংসা ও গুণাগুণ করে এবং নবী (সা.) এর প্রতি দরুদ পাঠ করে বলেন: হে

মানব সকল, আমি আলী, হুসাইন বিন আলী বিন আবু তালিবের সন্তান। আমি তার সন্তান যার সবকিছু লুণ্ঠন করা হয়েছে। যাঁর পরিবারের সবাইকে বন্দি করে এখানে আনা হয়েছে। আমি তাঁর সন্তান, যে ফোরাতের কিনারায় মর্মান্তিক ও নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। হে লোক সকল! তোমরা কেয়ামতের ময়দানে কিভাবে নবী (সা.) এর সামনে দাঁড়াবে। যখন তিনি তোমাদেরকে বলবেন, আমার পরিবারবর্গকে এমনভাবে খতম করা হয়েছে আর আমার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখনি সুতরাং তোমরা আমার উম্মত নও। ইমাম জয়নুল আবেদীনের এই আবেগপূর্ণ, জোরালো ও গভীর তাৎপর্য পূর্ণ বক্তব্য কুফার জনগণের অন্তরকে আন্দোলিত করে তুলল। চারিদিক থেকে চিৎকার ধ্বনি তুলে সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিল এবং একজন আরেক জনকে তিরস্কার করে বলল আমরা এতই দুর্ভাগা যে, আমরা যে ধ্বংস হয়ে গেছি তা নিজেরাও জানি না। "এভাবেই তিনি ঘুমন্ত ও বিভ্রান্ত মুসলিম উম্মাহ্কে আন্দোলিত ও প্রাণবন্ত করে তুললেন। আর কারবালার প্রকৃত তাৎপর্য ও মহত্ত্বকে তুলে ধরলেন। মুসলিম উম্মাহ্ যে মহাভুলের মধ্যে নিপতিত তা চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ইমাম জয়নুল আবেদীনকে যখন তাঁর পরিবারের সাথে কুফার গর্ভনর ইবনে যিয়াদের সামনে আনা হলো সে ইমামের পরিচয় জানতে চাইলে তাকে বলা হয় তিনি হুসাইনের পুত্র আলী। ইবনে যিয়াদ বলল, আল্লাহ্ কি তাকে খুন করে নি? (উমাইয়া নেতারা তাদের সকল জঘন্য কাজকে আল্লাহ্র কাজ বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত, নাউজু বিল্লাহ)। ইমাম সাজ্জাদ বলেন, আমার অন্য এক ভাইয়ের নামও আলী ছিল তোমার লোকেরা তাকে হত্যা করেছে। ইবনে যিয়াদ বলে, না, আল্লাহ্ তাকে হত্যা করেছে। ইমাম সাজ্জাদ বলেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন মৃত্যুর সময় আত্মাগুলোকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ইবনে যিয়াদ তার কথায় প্রতিবাদ করা একেবারেই অপছন্দ করতো তাই ইমামকে চ্যালেঞ্জ করে বলল, "কিভাবে তুই এখনো আমার সাথে দাঁড়িয়ে আমার সাথে তর্ক করার সাহস করিস। তাই সে ইমাম সাজ্জাদকে হত্যার নির্দেশ দেয়। হযরত জয়নব (সা.) প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন: তুই আমাদের কোন পুরুষকে জীবিত রাখনি। যদি আলী বিন হুসাইনকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাক তাহলে আমাকেও তার সাথে হত্যা কর। ইমাম সাজ্জাদ, হযরত জয়নব (আ.) কে বললেন আপনি ওর সাথে কথা বলবেন না, আমি ওর সাথে কথা বলছি। ইমাম পাক ইবনে যিয়াদের দিকে ফিরে বললেন, ওহে যিয়াদের ছেলে। আমাকে হত্যা করার ভয় দেখাচ্ছ? তোমার জানা নেই যে, কতল হওয়া আমাদের প্রথা ও শাহাদত বরণ করা আমাদের মর্যাদা।

ইয়াজীদের দরবারে বন্দী ইমাম সাজ্জাদ (আ.)

ইয়াজীদের দরবারে জয়নাল আবেদীন থেকে শুরু করে হযরত জয়নব পর্যন্ত সকল বন্দিকে এমনকি শিশুদেরকে পর্যন্ত একই দড়িতে বেঁধেছিল। তারা তাদের এক লাইনে হাটতে বাধ্য করল এবং কেউ হোচট খেয়ে পড়ে গেলে তাকে চাবুক দিয়ে সজোরে আঘাত করত। এই লজ্জাজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বন্দিদের জালিম ইয়াজীদের সামনে হাজির করা হয়েছিল। ইমাম জয়নুল আবেদীন ইয়াজীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, রাসূল (সা.) আমাদের এমনাবস্থায় দেখে খুশী হবেন কি? রাসূল (সা.) এর অনুভূতি আমাদের এমন অবস্থায় দেখলে কেমন হবে? ইমামের এই কথা জালিম ইয়াজীদসহ সবাইকে অবাক করে দিল। বন্দি আহলে বাইতের দিকে তাকিয়ে ইয়াজীদ প্রতারনা করে বলল, ইবনে মারজানার (ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ) প্রতি শোক। যদি তোমাদের সঙ্গে তার কোন বাধঁন (আত্মীয়তা) থাকত তবে সে কখনো এমন করতে পারতো না। প্রসঙ্গতে উল্লেখ্য যে, ওবায়দুল্লাহর পিতা যিয়াদ। সে ছিল, আবু সুফিযানের অবৈধ পুত্র। তার পিতৃ পরিচয়ের কারণে সে খুব অসম্মানিত বোধ করত। তাছাড়া তার জীবনের প্রথম পর্যায়ে সে ছিল হযরত আলী (আ.) এর অনুসারী। মুয়াবিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সে সকল প্রকার শরীয়তী বিধান লংঘন করে যিয়াদকে তার বৈধ ভাই হিসাবে ঘোষণা করে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় সুবিধা প্রদান করে। ওবায়দুল্লাহর মা মারজানা ছিল একজন কুখ্যাত পতিতা। সেই সুবাদে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ প্রকৃত পক্ষে একজন জারজ সন্তান ও ইয়াজীদের অবৈধ চাচাত ভাই। তাই ইয়াজীদের এ কথাগুলো ছিল মূলত মিথ্যা, প্রতারনামূলক ও লোক দেখানো। ইয়াজীদ, ইমাম জয়নুল আবেদীনের দিকে ফিরে বলল, তো আলী ইবনে হুসাইন যেহেতু তোমার পিতা আমার বংশের সঙ্গে তার সৌহার্দ্যের ব্যাপারে মনোযোগী ছিল না। আমার অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং আমার ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা করেছিল। তাই আল্লাহ্ তোমার পিতার সঙ্গে এমনটি করেছেন। (অর্থাৎ ইয়াজীদের সমস্ত জঘন্যতম কুকর্মের দায়দায়িত্ব আল্লাহ্র (নাউজুবিলাহ্)। ইমাম জয়নুল আবেদীন ইয়াজীদের এই মিথ্যাচার পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রতিহত করে বলেন: "জমিনে বরং তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন কোন মুসিবত আপতিত হয় না। যা সংঘাটত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ। যাতে তোমরা আফসোস না করো তার উপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ্ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না; (সুরা হাদীদ:২২-২৩)। এই জবাব

ইয়াজীদকে রাগান্বিত করে দিলে সে কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রতি-উত্তরের চেষ্টা করে বলে: "মানুষের উপর যত বালা মুসিবত আপতিত হয় তা সে তার দুই হাতে অর্জন করে।" কুরআনের সুগভীর জ্ঞানের উৎস ইমাম বলেন, এই আয়াতটি তাদের সম্পর্কিত যারা অন্যের উপর জুলুম করে। যারা মজলুম তাদের সম্পর্কিত নয়। ইয়াজীদের পূর্ব পুরুষরা ইমাম হুসাইনের পিতা, পিতৃব্যদের সঙ্গে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে নাস্তানাবুদ হওয়ার তিক্ত স্মৃতি তার জানা ছিল। তাই যখন রাসূল (সা.) এর আইলে বাইতকে দৃশ্যত পরাজিত করল এবং ইমাম হুসাইনের পবিত্র মাথা তার সামনে পেশ করা হলো, তখন সে দারুন উচ্ছ্বাসিত ছিল সে তখন স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করল :

আজ যদি আমার বদরের পূর্ব পুরুষরা দেখতেন যাদের খাজরাজরা (মদীনাবাসী) কন্টক যন্ত্রনা দিয়েছিল। তবে তারা উচ্ছ্বাসিত হতেন। আর বলতেন, তোমার হাত কখনো অবশ না হোক; আমরা যেন তাদের নেতাদের হত্যা করেছি সত্য এটা বদরের বদলা যদিও আসমান থেকে না এসেছে কোন সংবাদ আর না নাজিল হয়েছে ওহি। আমি খন্দক অস্বীকার করতাম। যদি আহমদের সন্তানদের থেকে এর প্রতিশোধ না নিতাম। ইয়াজীদের নিজস্ব মতামত তথা ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বলিত কবিতার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে সে ধর্মদ্রোহী বা কাফির ছিল।

ইয়াজীদ এর সামনে সিরিয়ার জামে মসজিদে ইমাম জয়নুল আবেদীনের ঐতিহাসিক ভাষণ

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজীদের আদেশ ছিল ইমাম হোসাইনের পরিবারকে এবং ইমাম জয়নুল আবেদীনকে একটি কক্ষে আটকে রাখতো যেখানে তারা নিজেদেরকে গরম ও ঠান্ডার করনে সে সময় পর্যন্ত যখন তাদের চেহারার মাংস ফেটে গিয়েছিল। শুক্রবার, ইয়াজীদ একজন দরবারী বক্তাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে মিম্ববরে উঠে ইমাম আলী (আ.) ও ইমাম হোসাইন (আ.) কে গালিগালাজ করতে লাগল এবং মুয়াবিয়া ও ইয়াজীদের প্রশংসা করতে লাগল। হযরত জয়নাল আবেদীন উচ্চ কণ্ঠে বললেন, "হে তুমি যে ওয়াজ করছ, আর সৃষ্টিকর্তার ক্রোধ ডেকে আনছ। আর তোমার স্থান হলো জাহান্নাম। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, আলী (আ.) এর গালি-গালাজ করা সরকারীভাবে মুয়াবিয়া আমল থেকে চালু করা হয়েছিল যা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের আমলে বন্ধ ছিল এবং তৎপরবর্তী সময়ে পুনরায় চালু করা হয়। যা হোক, এরপর ইমাম জয়নুল আবেদীন ইয়াজীদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, তুমি কি আমাকে অনুমতি দিচ্ছ কিছু বলার জন্য, যা আল্লাহ্‌র জন্য সন্তুষ্টির এবং যারা উপস্থিত আছে তাদের জন্য সওয়াব বা পুরস্কার। ইয়াজিদ ইমামের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। উপস্থিত জনতা ইয়াজিদকে চাপ দিল যাতে সে ইমামকে কিছু বলার অনুমতি প্রদান করে। ইয়াজিদ বলল, যদি আমি তাকে অনুমতি দিই মিম্বরে উঠার জন্য সে তা থেকে নামবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাকেও আবু সুফিয়ানের বংশকে অপমাণিত করে। জনতা বলল, কিভাবে এ অসুস্থ যুবক তা করবে। ইয়াজিদ বলল, "সে এমন এক পরিবার থেকে এসেছে যারা দুধের সঙ্গে প্রজ্ঞা পান করেছে। জনতা ইয়াজীদকে চাপ দিতে থাকল যতক্ষণ না সে তাতে রাজী হলো। ইমাম মিম্বরে উঠলেন তিনি আল্ল-াহ্‌র হামদ ও তাসবীহ করলেন এবং বক্তৃতা দিলেন যা চোখগুলো কাঁদালো এবং হৃদয়গুলোকে কাঁপিয়ে দিল। এরপর তিনি বললেন, হে জনতা আমাদেরকে (আহলে বাইতদেরকে) ছয়টি গুণাবলী ও সাতটি মর্যাদা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে-১. জ্ঞান, ২. সহনশীলতা, ৩. উদারতা, ৪. বাগ্মীতা, ৫. সাহস, ৬. ইমানদারদের অন্তরে আমাদের জন্য ভালবাসা, যা আমাদের মাঝে উপস্থিত, আর আমাদের মর্যাদা গুলো হলো- ... যে রাসূল সাঃ দায়িত্বে আছেন, তিনি আমাদের মাঝ থেকে ... সত্যবাদী, ইমাম আলী আমাদের মাঝ থেকে ... যিনি উড়েন (হযরত জাফর তাইয়ারা) তিনি আমাদের মাঝ থেকে...আল্লাহ্‌র সিংহ এবং তার রাসূলও আমাদের মাঝ থেকে, আর উম্মতের দুই সিবত আমাদের মাঝ থেকে। যারা আমাকে জানে তারা আমাকে জানেই, যারা আমাকে চেনে না আমি তাদের জন্য আমার বংশধারা ও পূর্ব পুরুষদের পরিচয় প্রকাশ করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আমাকে চিনতে পারে। হে জনতা, আমি মক্কা ও মিনার সন্তান, আমি যমযম ও সাফার সন্তান, আমি তার সন্তান, যিনি কালো পাথর হজরে আসওয়াদ তুলেছিলেন তার কম্বলের প্রান্ত ধরে। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান যিনি সুন্দর করে পাজামা ও আলখাল্লা পরতেন, আমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান যিনি কাবা-তাওয়াফ করেছেন, সাঈ করেছেন। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান যিনি হজ করেছেন এবং তলিবয়া উচ্চারন করেছেন, আমি তার সন্তান, যাকে রাতের বেলা মসজিদে আকসাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি তার সন্তান, যাকে সিদরাতুল মুনতাহাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি তার সন্তান যে, "এরপর নিকটবর্তী হলো এবং স্থির ঝুলে রইল সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে (সূরা ইসরা) আমি তার সন্তান যে ছিল "দুই ধনুক পরিমাণ পরস্পর মুখোমুখি অথবা তার চেয়েও কাছে" (সূরা নজম) । আমি তার সন্তান, যাকে সর্বশক্তিমান ওহী দান করেছিলেন, যা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আমি হোসাইনের সন্তান, যাকে কারবালায় হত্যা করা হয়েছে, আমি আলীর সন্তান, যিনি মুর্তযা

(অনুমোদনপ্রাপ্ত), আমি মোহাম্মদ সঃ এর সন্তান যাকে বাছাই করা হয়েছিল। আমি ফাতেমাতুয যাহারার সন্তান। আমি সিদতারাতুল, মুনতাহার সন্তান, আমি শাজারাতুন মুবারাকাহ্ বরকতময় গাছ এর সন্তান, আমি তার সন্তান যার শোকে রাতের অন্ধকারে জিনরা বিলাপ করে ছিল, আমি তার সন্তান যার জন্য পাখিরা বিলাপ করেছিল।" বক্তৃতার এ পর্যায়ে পৌছল জনতা কাঁদতে কাঁদতে ও বিলাপ করতে শুরু করল এবং ইয়াজিদের আংশকা এতে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যেতে পারে। সে মোয়াযযিনকে ডেকে বলল নামাযের ঘোষণা দাও। মুয়ায়যিন উঠল এবং বলল আল্লাহু আকবর। ইমাম বললেন আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম এবং সর্বোত্তম সবচেয়ে সম্মানিত এবং সবচেয়ে দয়ালু তার চেয়ে যা আমি ভয় করি এবং যা আমি এড়িয়ে যাই। এরপর সে বলল, "আশহাহু আন-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ," ইমাম বললেন, নিশ্চয়ই আমিও সাক্ষী দিচ্ছি আপনাদের সঙ্গে যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহা নাই এবং তিনি ছাড়া কোন মালিক নেই। আর আমি প্রত্যেক অস্বীকারকারীদের প্রত্যাখ্যান করি। যখন সে বলল, আমি সাক্ষী দিচ্ছি মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল। ইমাম নিজের মাথা থেকে পাগড়ী নামিয়ে নিলেন এবং মুযাযযিনের দিকে ফিরে বললেন, আমি এই মুহাম্মদ (সা.) এর নামে অনুরোধ করছি এক মুহূর্ত নীরব থাকার জন্য। এরপর তিনি ইয়াজিদের দিকে ফিরে বলেন, হে ইয়াজীদ এ সম্মানিত ও মর্যাদা পূর্ণ রাসূল কি আমার প্রপিতামহ নাকি তোমার? যদি তুমি বল যে, তোমার প্রপিতামহ তাহলে গোটা পৃথিবী জানে যে তুমি মিথ্যা বলছ। আর যদি বল যে, তিনি আমার প্রপিতামহ, তাহলে কেন তুমি আমার পিতাকে জুলুমের মাধ্যমে হত্যা করেছ এবং তার মালপত্র লুট করেছো এবং তার নারী-স্বজনদের বন্দি করেছে। এরপর বলেন, আল্লাহ্র শপথ, এ পৃথিবীর উপরে আমি ছাড়া কেউ নেই যার প্রপিতামহ হলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কেন এ লোকগুলো আমার পিতাকে জুলুমের মাধ্যমে হত্যা করেছে এবং আমাদেরকে রোমানদের মত বন্দি করেছে? এরপর বললেন, হে ইয়াজীদ, তুমি এটা করে আবার বলছ যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল এবং তুমি কিবলার দিকে মুখ ফিরাও। অভিশাপ তোমার উপর ঐ দিন যে দিন আমার প্রপিতামহ এবং পিতা তোমার উপর ক্রোধান্বিত হবেন। এ কথা শুনে ইয়াজীদ মুযাযযিনকে নামাযেরই ইকামত দিতে বলল। লোকজনের ভেতর গুঞ্জন উঠল এবং তাদের ভেতরে একটি তোলপাড় শুরু হলো। তারপর একটি দল তার সঙ্গে নামায পড়লো এবং অন্যরা পড়ল না এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে গেল। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম জয়নুল আবেদীনকে ইয়াজীদের কাছে আনা হলে ইমাম সাজ্জাদ বলেন : আমাদের জন্য সম্পদের লোভ এবং লালসা তোমার হৃদয়ে রেখো না। যেন তুমি আমাদের পুরস্কৃত করো এবং যেন আমরা তোমাকে সম্মান করি এবং যেন তুমি আমাদের উপর অত্যাচার করো আমরা তোমার প্রতি অত্যাচারকে দুরে সরিয়ে দেই। আল্লাহ্ সাক্ষী যে, আমরা তোমাকে পছন্দ করি না, না, আমরা ঘৃনা করি যে, তুমি আমাদের পছন্দ করো না। ইয়াজীদ বলল, হে বৎস, তুমি সত্য বলেছ বরং তোমার বাবা ও দাদা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চেয়েছিল। সব প্রশংসা আল্লাহ্র যে, তিনি তাদেরকে হত্যা করেছেন। এবং তাদের রক্ত ঝরিয়েছেন। ইমাম উত্তর দিলেন নবুয়ত বেলায়েত ও ইমামত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তথা খিলাফত সব সময়ই আমার পিতাদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তোমার ইয়াজিদের জন্মের বহু আগে থেকে। গাদেরী খুমের রাসূল সাঃ প্রদত্ত বক্তৃতার বাস্তবায়ন। ইয়াজিদও বিষয়টি জানত। এ কারনেই ইমাম সাজ্জাদের এই বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয় নাই। পরবর্তীতে ইমাম সাজ্জাদকে সপরিবারে মদীনায় প্রেরণ করা হয়।

সমকালীন জালেম খলিফাদের সাথে ইমাম (আ.)

ইমাম জয়নুল আবেদীনের ইমামত কালে জালেম ও অত্যাচারী শাসকদের শাসন চলছিল। তারা হলো ইয়াজীদ (৭৮০-৭৮৩)। মারওয়ান বিন হাকাম ওসমান (রা.) এর কুখ্যাত মন্ত্রী (৬৮৩-৬৮৫) আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান (৬৮৫-৭০৫), ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালেক (৭০৫-৭১৫)। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে হিংস্র অতাচারী, ধর্মহীন ও জুলুমবাজ শাসক বলতে এদেরকেই বুঝায়। ইয়াজীদের শাসন কার্যক্রম সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ইয়াজীদের সেনাধ্যক্ষ মদিনা অভিযানের নৃশংসতার পর ইমাম জয়নাল আবেদীনকে গ্রেপ্তার করে। ইমাম সাহেবকে সেনাপতি মাশরাফ বিন উকবা রুক্ষ কণ্ঠে তাহাকে এজীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহন করার নির্দেশ দিল। ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, এজীদ আমার নিকট হইতে কিসের আনুগত্য করাইতে চায়। কোন কথার উপর আমাকে তুমি শপথ করাইতে চাও। ইমামের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুর্ধষ সেনাপতি মাসরাফের কণ্ঠনালী শুকাইয়া গেল। কি যেন এক অপার্থিব ভীতি তাহার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে আমতা আমতা করিয়া বলিল না তেমন কিছু নয়। আপনি শুধু নিশ্চয়তা দিন যে, এজীদের একজন বিশ্বস্ত জ্ঞাতি ভাই হিসাবে সর্বাবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করবেন। " এই টুকু বলিয়া সেনাপতি ইমাম সাহেবকে সম্মানের সঙ্গে বসাইল। বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে নির্দেশ করুন। আমি তা পূর্ণ করতে পারলে আনন্দিত হইব। ইমাম সাহেব বলিলেন, আমার একটি মাত্র আকাঙ্খা, এই মুহূর্ত হইতে তুমি তরবারি কোষ বদ্ধ কর।

মদিনাবাসীদের উপর আর নির্যাতন চালাইওনা।" ইমাম সাহেবের এই নির্দেশ পেয়ে সে তার সেনাবাহিনীকে সংযত করল ফলে ইয়াজীদ বাহিনীর ভয়াবহ নির্যাতনের থেকে মদিনাবাসী রক্ষা পেল। খলিফা আব্দুল মালেক, ইমাম সাহেবের প্রবল ব্যক্তিত্বে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে কিভাবে কাবু করা যায় সেই চেষ্টায় থাকতো এক হজের সময় আব্দুল মালেক দেখতে পেল যে, ইমাম সাহেব গভীর অভিনিবেশ সহকারে আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করছেন। আব্দুল মালেক ইচ্ছা করে ইমাম সাহেবের সামনে আসলেন কিন্তু ইমাম আল্লাহ্‌র ধ্যানে এত মগ্ন ছিলেন যে তার দিকে কোন খেয়ালই করলেন না। ইমাম সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়ে আব্দুল মালেক যারপর নাই গোস্বা হলেন। আব্দুল মালেক, ইমাম সাহেবকে তার রাজদরবারে তলব করল। আব্দুল মালেক ইমাম সাহেবকে বলল, জয়নুল আবেদীন, আলী ইবনে হোসাইন। আপনার পিতাকে তো আমি হত্যা করি নাই। তারপরও আপনি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন বলে মনে হয়। আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন না কেন। ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, আমার পিতার হত্যাকারীরা আমাদের দুনিয়ার জীবন বরবাদ করেছে। আমার মহান পিতা মজলুম অবস্থায় শাহাদত বরণ করায় উহাদের আখেরাত বরবাদ হয়েছে। আপনি যদি অকারন আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আপনার আখেরাত ধ্বংস করতে চান তবে সানন্দ চিত্তে তা করতে পারেন। আমার পক্ষ থেকে আপনাকে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। ইমাম সাহেবের এই বক্তব্য শুনে আব্দুল মালেক অপ্রস্তুত হয়ে বলল, না তা নয়। আপনার উচিত আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা। আর আপনার যদি কোন প্রয়োজন থাকে তাও আমাকে বলতে পারেন। ইমাম সাহেব বললেন, এটা আল্লাহ্‌র ঘর এখানে সবকিছু আল্লাহ্‌র নিকটই পেশ করা উচিত। আব্দুল মালেক ক্রুদ্ধ হলেন, তবে বাড়াবাড়ি কিছু করলেন না। আব্দুল মালেক পুত্র হেশামকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করিয়া মুসলিম জাহানের সম্মুখে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে হজে পাঠাইয়া দিলেন। হেশাম অভুতপূর্ব জাকজমকের সাথে বিরাট লত্তি-লস্করসহ মক্কায় উপস্থিত হলেন। সমগ্র মক্কা নগরে যুবরাজের আগমন উপলক্ষে সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু আল্লাহ্‌র ঘরে আসার পর কোন হম্বি-তম্বীতে কোন কাজ হলো না। অর্থাৎ কাবা শরীফ তাওয়াফ করার সময়ে হজরে আসওয়াদ চুম্বনে এই রাজকীয় বাহাদুরী কোন কাজে আসল না এবং হেশাম হজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে সক্ষম হলো না। এমন সময় দেখা গেল মুখে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারনরত এক দল সাধক পরিবেষ্টিত হয়ে ইমাম জয়নুল আবেদীন তাওয়াফ করতে আসিতেছেন। প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যেও লোকজন স্বতস্ফুর্ত ভাবে একদিকে সরে গিয়ে ইমাম সাহেবকে পথ করে দিচ্ছে। ইমাম সাহেব হজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে লোকজন সরে গিয়ে ইমাম সাহেবকে পবিত্র হজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সুযোগ করে দিল। যুবরাজের নিরাপত্তা কর্মীরা এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল আর হেশাম রাগে-দুঃখে-লজ্জায় ফেটে পড়তে লাগল। জনৈক ব্যক্তি হেশামকে জিজ্ঞাসা করলো কে এই ব্যক্তি। হেশাম, ইমাম সাহেবকে চিনলেও নিজের গুরুত্ব কমে যাবে বিবেচনায় বলল আমি তাকে চিনি না। সেই সময় বিখ্যাত আরবী কবি আব্দুল ফারাছ ফেরাজদাক উপস্থিত ছিলেন। ইমামের প্রতি হেশামের এই তাচ্ছিল্য ভরা উক্তি শুনে আহলে বাইতের মান মর্যাদা বর্ণনা করে এক অসাধারণ কবিতা লেখেন। যা আরবী সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

কবিতাটির বাংলা তরজমা নিম্নে পত্রস্থ করা হলো : আব্দুল ফারছি ফেরাজ

"হে প্রশ্নকারী যে দয়ালু ও মহান ব্যক্তি সম্বন্ধে আমার কাছে জানতে চেয়েছো তার পরিষ্কার উত্তর আমার কাছে আছে যদি কেউ তার সন্ধান করে।"

তিনি এমন কেউ যে মক্কার মাটি তার পায়ের শব্দের সাথে পরিচিত এবং পবিত্র কাবা ও তার আশে পাশের ভূমিগুলিও তার সাথে পরিচিত।

তিনি আল্লাহ্‌র সব থেকে উত্তম বান্দার সন্তান। পরহেজগার, পাপমুক্ত, পাক-পবিত্র, সুপরিচিত ও বিখ্যাত।

তিনি (আহমদ) এর সন্তান, যাকে আল্লাহ্ নবী হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। যার উপর আল্লাহ্ সকল সময় দরুদ পাঠায়।

যদি এই কাবা ঘর জানতো যে কে তাকে চুম্বন করতে এসেছে তাহলে অস্থির হয়ে মাটিতে পড়ে যেত তার পায়ের ধুলায় চুম্বন দেওয়ার জন্য।

এই মহানের নাম আলী এবং দ্বীনের নবী তার পিতা যার হেদায়েতের নুরের ছটায় উম্মত পরিচালিত হয়ে থাকে।

তিনি এমন কেউ যার চাচা জাফর তাইয়ার ও হামযা যারা শহীদের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে যে কিনা তার ভালবাসার প্রতি কসম দেয়।

তিনি নারী সর্দার হযরত ফাতিমা ও দ্বীনের নবী (সা.) এর স্থলাভিষিক্তের সন্তান। যার তলোয়ার ছিল কাফের ও মুশরেকদের জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা।

যখনই কুরাইশ বংশের কেউ তাকে দেখে সমস্ত স্বীকারোক্তি দেয় যে অলৌকিক ক্ষমতা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কাছে হার মেনেছে (এবং কখনও তার থেকে উন্নত কাউকে চিন্তা করা যায় না)।

তিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গৌরবের সাথে সম্পৃক্ত সে স্থানে আরব ও অনারবের যে কারো পৌছানো অসম্ভব।

ওহে হিশাম। তোমার এই কাজে, যে ভান করছো তুমি তাকে চেন না এবং জিজ্ঞাসা করছ সে কে? তাতে তার কোন লোকসান হবে না। কেননা তুমি যদিও তাকে অস্বীকার কর তথাপিও আরব অনারবের সবাই তাকে চেনে।

(হায়া) লজ্জা থেকে তার চোখকে সরিয়ে রাখে এবং তাঁর শান-শওকতের কারণে চোখগুলি তা থেকে সরে থাকে। কেউ তার সাথে কথা বলতে পারে না যদি তিনি অনুমতি না দেন।

তার কপালের নুরের ছটায় অন্ধকারের পর্দা ছিড়ে যায়। যেমন ভাবে সূর্যের আলো অন্ধকার গুলোকে সরিয়ে দেয়।

এমন তার বদান্যতা যে, কখনও তিনি কলেমা ছাড়া অন্য কোথায়ও না " শব্দটি ব্যবহার করেন নি। যদি এটা আল্লাহ্‌র এক ও অদ্বিতীয় তার সাক্ষ্য দেওয়ার স্থানে না হতো তাহলে সেখানেও না " শব্দটি না বলে (হ্যাঁ) শব্দটি বলতেন।

তাঁর ভিত্তি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। তাঁর পবিত্র গর্ভে জন্ম নেওয়া। পবিত্র লালন পালন বা পরিচর্যা বা প্রশিক্ষণ, উত্তম স্বভাব-চরিত্র এসব কিছুই তাঁর উন্নত মানের।

অধিক মূল্যের বোঝা সেই সব সম্প্রদায়কেই বহন করতে হয়েছে যারা তাদের উপর অত্যাচার ও শক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে।

যদি কিছু বলে, তবে তা এমনই যে সবাই মেনে নেয়। আর তার বক্তব্য তাকে আরও মহিমান্বিত করে তোলে।

যদি তাকে না চিনে থাকো তাহলে জেনে নাও তিনি ফাতিমার সন্তান, যার পিতামহের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র নবীগণের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

আল্লাহ্ তাকে প্রাচীন যুগ থেকেই মহান ও সম্মানিত করেছেন। আর আল্লাহ্‌র ঐশ্বরিক স্মৃতি ফলকে তার ব্যাপারে এরূপই লেখা আছে।

তিনি এমন কেউ যার বংশধরের শ্রেষ্ঠত্ব বা জ্ঞান ও মর্যাদার কাছে অন্যান্য আত্মীয়গণের বংশ মর্যাদা ক্ষুদ্র সমতুল্য। আর তাঁর বংশধরের (নবী) উম্মত, অন্যান্য নবীর উম্মতের থেকেও (শ্রেষ্ঠ)।

তাঁর ক্ষমাশীল দৃষ্টি সমস্ত সৃষ্টিকে আয়ত্ব করেছে এবং বিভ্রান্তি, ক্ষুধার্থতা, অন্ধকারাচ্ছন্নতা তার থেকে দূরীভূত হয়ে গেছে।

তার দুটি হাত যেন রহমত স্বরূপ। যার সুফল সবার কাছে পৌঁছায়। যারা অনুমোদনপ্রাপ্ত হয় অভাব তাদের উপর ফিরে আসে না।

তিনি এতই কোমল হৃদয়ের যার ভিতর কোন প্রকার রূঢ়তা ও হঠকারিতার স্থান নেই। দুটি বৈশিষ্ট্য তাকে অলংকৃত করেছে যা হচ্ছে ধৈর্য্য ও মহানুভবতা।

কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করে না এবং সব সময় তাঁর উপস্থিতি বরকতময়। তার বাড়ির বৈঠকখানা সুপ্রশস্ত (তার বাড়ির দরজা সবার জন্য খোলা)।

তিনি এমনই বংশের যাদের সাথে বন্ধুত্বই ধর্ম এবং তাদের সাথে শত্রুতা ধর্মহীনতা স্বরূপ আর তাদের সংস্পর্শে থাকার অর্থই হচ্ছে মুক্তি ও আখেরাতে পরিত্রাণ পাওয়া।

প্রতিটি ফিতনা ও অমঙ্গলই তার ভালবাসায় ধুলিসাৎ হয়ে যায়। আর ক্ষমাশীলতা ও দয়াদ্রিতা তার দিকে বর্ধিত হয়।

প্রতিটি বক্তব্যের শুরুতে এবং শেষে আল্লাহ্‌র নামে তবে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়। যদি পরহেজগারদের বারণ করা হয় তবে তারা পরহেজগারদের পরিচালক বা পথ প্রদর্শক এবং যদি প্রশ্ন করা হয় যে, পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম মানুষ কারা? এই প্রশ্নের উত্তরে তারাই পরিচয়প্রাপ্ত হবেন। তিনি ক্ষমা করার পর অন্য কোন ক্ষমাকারীকে হিসাবের মধ্যে গণনা করা হবে না এবং কোন জ্ঞাতি যতই মহানুভবতা ও মহত্বের অধিকারী হোক না কেন তার পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না।

তাদের উপস্থিতি এতই বরকতময় যা কিনা খরার সময় বৃষ্টি আসার মত। আর যখন যুদ্ধের ডামাডোল বেজে উঠে তখন তারা সিংহের ন্যায় হয়ে যায়।

যখনই তার কাছ থেকে খারাপ, (নিন্দা ভর্ৎসনা, তিরস্কার) বিষয় পাওয়া যায় না। উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকার এবং তার হাত দিয়ে বৃষ্টির ন্যায় অব্যাহতভাবে অনুদান আসতে থাকে।

না থাকলেও তাঁর হাত দিয়ে অনুদান আসা বন্ধ হয় না, তার জন্য থাকা বা না থাকা উভয়ই সমান।

এমন কোন গোত্র নাই যারা তাঁর বংশধরদের থেকে অথবা তার থেকে অনুগ্রহ পায়নি। যারা আল্লাহ্‌কে চিনিছে তারা তাকেও চিনেছে। মানুষ তাদের ধর্মকেও পথ নির্দেশনাকে তার গৃহ থেকে অর্জন করেছে।

কুরাইশ বংশের মধ্যে শুধুমাত্র তাঁর বাড়িতেই সমস্যা দূরীভূত হওয়ার জন্য সাহায্য নিতে আসতো এবং সুষ্ঠু বিচারের জন্যও মানুষ তার কাছে আসতো।

তার পূর্ব পুরুষ নবী (সা.) ও আমিরুল মুমেনীন আলী (আ.); যিনি নবী (সা.) এর পরে উম্মতের ইমাম ও পরিচালক।

বদর, ওহুদ, খন্দক, মক্কা বিজয়, এ সকল যুদ্ধই তার প্রমান যা সবারই জানা।

খায়বার, হুনাইন তাঁর জন্য সাক্ষ্য দেয় এবং (বনি করিযেহ) সে দিনগুলিতে তার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআন ও হাদিস/ মোতাবেক আহলে বাইতের যে মর্যাদা

সেই মহাসমুদ্রের এক বিন্দু পানিই মাত্রাফাবাযদাক অতি বিপদ হাতে করে বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ্ তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দান করুন।

হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীনের কেরামত

ইমাম যুহরী বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে হুসেনকে খুবই মর্মন্তদ অবস্থায় দেখেছি। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আদেশে তার পদযুগলে বন্ধন, হাতে শিকল ও ঘাড়ে বেড়ি পরানো হয় এবং তাঁর জন্য প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। আমি তাকে সালাম করার জন্য অনুমতি চাইলাম। তিনি তখন এক তাবুতে ছিলেন, আমি তাকে এ অবস্থায় দেখে কেঁদে ফেললাম এবং বললাম। কত ভাল হত যদি আপনার জায়গায় আমাকে বেড়ি পরানো হত এবং আপনি মুক্ত থাকতেন। তিনি বললেন, 'যুহরী, তুমি মনে কর আমি এ সব বন্ধন ও বেড়ির কারণে কষ্টে আছি। আমি ইচ্ছা করলে এগুলো তাৎক্ষণিকভাবে খসে পড়তে পারে। কিন্তু এ ধরণের দৃষ্টান্ত থাকা উচিত, যাতে তোমরা আল্লাহ্র শাস্তিকে স্মরণে রাখ এবং হাশরের পরিস্থিতি তোমাদের জন্য সহজ হয়। এরপর তিনি আপন হাতে শিকল খুলে ফেললেন এবং পদযুগল ও বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিলেন। অতঃপর বললেন: হে যুহরী আমি এগুলোসহ এই অবস্থায় দু মন্জিলের বেশি যাব না। চারদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন তিনি ফিরলেন না তখন তাঁর প্রহরীরা মদীনায় ফিরে গেল। মদীনায় তাকে তালাশ করে পাওয়া গেল না। কোন কোন প্রহরী কর্ণনা করে যে, আমরা এক জায়গায় অবস্থান করে তাঁকে কড়া প্রহরা দিচ্ছিলাম। সকাল বেলায় তাঁর উটের গদিতে আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না। ইমাম যুহরী বলেন: এরপর আমি আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে জয়নাল আবেদীন সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি যা জানতাম তাই বললাম: আব্দুল মালেক বলেন: যখন আমার কাছে তার নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর আসে তার কিছু পরেই তিনি আমার কাছে চলে আসেন এবং বলেন: আমার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা কিসের? আমি বললাম: একটু বসুন। আমি মোটেই থামব না। এরপর তিনি বাইরে চলে গেলেন। আল্লাহ্র কসম, তার ব্যক্তিত্বের প্রতাপে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

তাঁর নাম জয়নুল আবেদীন হওয়ার কারণ এই যে, এক রাতে তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে মশগুল ছিলেন। এমন সময় শয়তান সাপের আকৃতিতে প্রকাশ পায় যাতে এই ভয়াবহ আকৃতি দেখে তিনি এবাদতে বিরত থাকেন। কিন্তু আলীই বিন হুসায়েন (আ.) সাপের দিকে ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত করলেন না। অবশেষে সাপ তার বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ভীষন রুপে দংশন করল। ফলে তিনি খুব ব্যথা অনুভব করলেন? এরপরও তিনি নামায ছাড়লেন না। আল্লাহ্তালা তাঁর কাছে ফুটিয়ে তুলেন যে, এটা সাপ নয়, শয়তান। সেটিকে তিরস্কার করলেন এবং প্রহার করলেন। অতঃপর বললেন : হে দুরাচারী শয়তান, দূর হয়ে যা, সাপ দূরে যেতেই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে ব্যাথা খতম হয়ে যায়। ইতোমধ্যে তিনি একটি আওয়াজ শুনলেন : কিন্তু আওয়াজকারীকে দেখতে পেলেন না। আওয়াজকারী বলছিল : আপনি জয়নুল আবেদীন, আপনি জয়নুল আবেদীন, আপনি জয়নুল আবেদীন। (জয়নুল আবেদীন এর অর্থ হল ইবাদতকারীদের মাথার মুকুট)।

২.হযরত খিযিরের (আ.) সাথে বাক্যালাপ

জনৈক রাবী বর্ণনা করেন : একদিন আমি হযরত আলী ইবনে হুসাইন (আ.) এর গৃহে গেলাম। আমার মন চাইল না যে, তাঁকে আওয়াজ দেই। সে মতে বাইরেই বসে রইলাম। অবশেষে তিনি বাইরে এলেন এবং আমি সালাম দিলে তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং একটি প্রাচীরের কাছে এসে বললেন : এই প্রাচীরটি দেখেছ? আমি একদিন এই প্রাচীরে হেলান দিয়ে বিষন্ন মনে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ একজন সুশ্রী ও স্বচ্ছল ব্যক্তি আমার দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। তার পোশাক অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও উৎকৃষ্ট ছিল। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলছিল : হে আলী ইবনে হুসাইন, তোমাকে বিষন্ন দেখাচ্ছে কেন? যদি দুনিয়ার কারণে বিষন্ন হয়ে থাক, তবে দুনিয়া একটি রুযী, যা প্রত্যেক সাধু ও অসাধু ব্যক্তি খায়। আমি বললাম : আমার দুঃখ ও বেদনা দুনিয়ার কারণে নয়। কেননা দুনিয়ার ব্যাপার তেমনি যেমন আপনি বর্ণনা করেছেন। এরপর এই সজ্জন ব্যক্তি বললেন : যদি তোমার দুঃখ ও বেদনা আখেরাতের কারণে হয়। তবে সেটা এক সত্যিকারের প্রতিশ্রুতি, যাতে একজন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ ফয়সালা করবেন। আমি বললাম : আমার দুঃখ একারণেও নয়। আখেরাত তো তেমনি হবে, যেমন আপনি বললেন। এরপর আগন্তুক বলল : হে আলী! তাহলে তোমার বিষন্নতা কি কারণে? আমি বললাম : আমি ইবনে যুবায়েরের উপরে ফেতনার কারণে শংকিত আছি। সে বলল : হে আলী ! তুমি এমন কোন ব্যক্তি দেখেছ কি, যে আল্লাহ্র কাছে চেয়েছে, আর আল্লাহ্ তাকে দেন নি? আমি বললাম: না ! সে বলল : তুমি কি এমন ব্যক্তিও দেখেছ যে, আল্লাহ্কে ভয় করেছে আর আল্লাহ্ তার কাজের জন্য সন্তুষ্ট হন নি? আমি বললাম : না ! এরপর লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। পরে জানা গেল যে, তিনি ছিলেন হযরত খিযির (আ.) যিনি হযরত আলী ইবনে হুসাইন (আ.) এর কাছে সৃষ্টি রহস্য বর্ণনা করেছিলেন।

৩. ইমাম জয়নুল আবেদীন ও খলিফা আব্দুল মালেক

আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান, বনী আব্দুল মুত্তালিবের হত্যাকান্ড থেকে বিরত থাকার জন্য শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে গোপনীয় ভাবে লিখিত নির্দেশ দান করে। হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন বিষয়টি অবহিত হয়ে আব্দুল মালেককে লিখলেন যে, আপনি অমুক দিন অমুক বিষয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে এই মর্মে পত্র লিখেছেন। রাসূল্লাহ (সা.) আমাকে এই বিষয়ে অবগত করেছেন, যে কারণে তিনি আপনার রাজত্বকে স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা দান করেছেন। হযরত জয়নুল আবেদীন পত্রের সেই বাক্যাবলী উদ্ধৃত করে একটি চিঠি গোলামকে দিলেন এবং আপন উষ্ট্রিতে সওয়ার করিয়ে আব্দুল মালেকের কাছে প্রেরণ করলেন। খলিফা আব্দুল মালেক যখন পত্রের তারিখ নিজের পত্রের তারিখ অনুরূপ পেল, তখন সে বিশ্বাস করল যে, হযরত জয়নুল আবেদীন (আ.) হকের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। সে খুশি হয়ে সেই উষ্ট্রীর পিঠে যতটুকু সে বহন করতে পারে সেই পরিমাণ দেরহাম ও দীনার পাঠিয়ে দিল।

৪. ইমাম জয়নুল আবেদীনের দোয়া কবুল

মিহাল ইবনে আমর বলেন : হজের দিনগুলোতে আমি হযরত জয়নুল আবেদীনের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি আমাকে খুযায়মা ইবনে কাহাল আমাদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি আরয করলাম সে কুফায় আছে। তিনি তার জন্য এই ভাষায় দোয়া করলেন : হে আল্লাহ্ তাকে লোহার তাপ দিয়ে জ্বালিয়ে দাও। হে আল্লাহ্ তাকে অগ্নির তাপে জ্বালিয়ে দাও। আমি কুফায় ফিরে এসে জানতে পারলাম যে, মুখতার ইবনে আবু ওবায়দ (যে কারবালা শহীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে সংশিষ্ট সবাইকে হত্যা করে।) বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আমি তার সাথে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করলাম এবং তার সাথে সাক্ষাতের জন্য ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলাম। যখন তার কাছে গেলাম, তখন সেও ঘোড়ায় সওয়ার হচ্ছিল। আমি তার সঙ্গে এক জায়গায় গেলাম। সেখানে সে এক ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ খুযায়মাকে উপস্থিত করা হল। মুখতার, বলল আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্ আমাকে তোমার উপর ক্ষমতাশালী করেছেন। অতঃপর আগুন জ্বালতে বলল, খুযায়মাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। সে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বললাম : সুবহানাল্লাহ। মুখতার আমাকে সুবহানাল্লাহ বলার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি হযরত জয়নুল আবেদীনের দোয়ার কথা বললাম। সে আমাকে কসম দিয়ে তার সত্যতা জানতে চাইলে আমি বললাম আমি নিজে শুনেছি। মুখতার ঘোড়া থেকে নেমে দুরাকাআত নামায আদায় করল। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ সেজদায় পড়ে রইল।

৫.জয়নুল আবেদীন এবং ইমাম নির্বাচনের বিবরণ

আমীরুল মুমেনীন (আ.) এর শাহাদতের পর মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (রা.) জয়নুল আবেদীনের কাছে এলেন এবং বললেন : আমি তোমার চাচা এবং বয়সেও বড়। অতএব, আমিই ইমামতের অধিক হকদার। তুমি রাসূলাহ (সা.) এর হাতিয়ার আমাকে সমর্পন কর। হযরত জয়নুল আবেদীন বললেন : হে চাচা, আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং যে বিষয়ের আপনি যোগ্য নন, তা দাবী করবেন না। পুনরায় মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া জোরে শোরে দাবী করলে তিনি বললেন : হে চাচা ! চলুন বিচারকের কাছে যাই। সে আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবে। মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বললেন : কে সেই বিচারক। তিন বললেন : বিচারক হচ্ছে হজ্রে আসওয়াদ (মক্কার কৃষ্ণ পাথর)। উভয়েই সেখানে পৌঁছুলেন। হযরত জয়নুল আবেদীন বললেন : চাচা কথা বলুন। তিনি কথা বললে কোন উত্তর এলো না। এরপর হযরত জয়নুল আবেদীন দোয়ার জন্য হাত তুললেন এবং আল্লাহ্তালাকে গুণবাচক নাম ধরে ডাকলেন, ফলে হজ্রে আসওয়াদ কথা বলতে লাগল। এরপর তিনি আপন মুখমন্ডল হজরে আসওয়াদের দিকে ফিরিয়ে বললেন : তোমাকে পরওয়ার দেগারের কসম, যিনি বান্দার ওয়াদা তোমার উপর রেখেছেন। আমাদেরকে বল হুসাইন (আ.) এর পর ইমামতের হক কার? হজরে আসওয়াদ কেঁপে উঠল এবং স্থানচ্যুত হওয়ার উপক্রম হল। কিন্তু পরক্ষনেই বিশুদ্ধ ও অলংকারপূর্ণ ভাষায় বলল : হে মোহাম্মদ হানাফিয়া এটা স্বীকৃত যে, হুসাইন (আ.) এর পর আলী ইবনে হুসাইনই (আ.) ইমামতের হকদার।

সমাজ সংস্কারক ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.)

রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর থেকে আহলে বাইতকে ক্ষমতাচ্যুত করার ধারাবাহিকতায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় জালেম রুপী রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, দাসপ্রথা, ধনীলোকতোষন এবং রাজতন্ত্রের তাবেদার আলেম শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এ কারণে ধর্ম ইসলামের তথা মুসলমানদের সমাজে ব্যাপক অনাচার, অবিচার, জুলুম, শোষন ইত্যাদি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার পর্যায়ে পর্যবসিত হয়। জয়নুল আবেদীন এ পরিস্থিতির জীবন্ত প্রতিবাদ হিসাবে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত বাদীকে বিবাহ করলেন। উমাইয়া অভিজাত শ্রেণীর লোকদের ভুয়া কৌলিন্য বোধের মধ্যে

ইমাম সাহেবের এই পদক্ষেপ নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করল। নির্যাতিত দাস শ্রেণী এবং মুক্তি প্রাপ্ত মওয়ালিগণ ইমাম সাহেবের এই বিবাহকে তাহাদের সামাজিক মর্যাদার বাস্তব স্বীকৃতি বলে উল্লাসিত হয়। খলিফা আব্দুল মালেক এই খবরে দারুন প্রতিক্রিয়া দেখাল কারণ এটি উমাইয়া সৃষ্ট দাস প্রথা ও অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি শেলাঘাত স্বরুপ। ইমাম আব্দুল মালেক শ্লেষাত্মক ভাষায় ইমাম সাহেবকে লিখিল, "জানতে পারলাম আপনি নাকি সম্প্রতি একটি বাঁদীকে বিবাহ করিয়াছেন। আপনার খান্দান কুরাইশ কুলে কি এমন কোন মেয়ে ছিল না যাকে বিবাহ করিয়া আপনি আপনার ভবিষ্যৎ সন্তানদিগকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারতেন না? আপনি নিজের মর্যাদার প্রতি তো খেয়াল করলেন না, ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে ও মর্যাদাহীন করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।" ইমাম সাহেব এই পত্রের উত্তরে খলিফাকে লিখলেন, সালাম বাদ আপনার পত্র পাইলাম। একজন মুক্তিপ্রাপ্তা বাঁদীকে বিবাহ করায় আপনি আমাকে দোষারোপ করিয়াছেন এবং আপনার ধারনা অনুযায়ী অভিজাত কুরাইশ খান্দানের কোন মেয়েকে বিবাহ করিয়া আমার ভবিষ্যৎ বংশধরকে সম্মানিত করার প্রয়োজন ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্মরণ রাখবেন, রাসূলে মকবুল (সা.) এর চাইতে বেশী ইজ্জত এই দুনিয়ার বুকে আর কাহারো হইতে পারে না। পরবর্তী কালের মানুষ একমাত্র তাঁহার দেখানো পথে চলিয়াই প্রকৃত ইজ্জত লাভ করতে পারে। বাদীটি আমারই মালিকানাধীনে ছিল। তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করার উদ্দেশ্যেই আমি বিবাহ করিয়াছি। আল্লাহ্‌র দ্বীন মোতাবেক এই কাজ কোন মুমিনের পক্ষে বিন্দুমাত্র ইজ্জত হানিকর হইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। আল্লাহ্‌তা'লা বংশগত কৌলিন্যের অহমিকা খতম করিয়া দিয়া এই রুপ ধারণাকে ভ্রান্ত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র পথে কোন আমল করার অভিযোগে কোন মুসলমানকে দোষারোপ করা উচিত নয়। যারা জাহেলিয়াত যুগের পুরাতন এবং আল্লাহ্‌ ও রাসূল কর্তৃক বাতিল ঘোষিত ধ্যান-ধারণা পুনরায় জীবিত করতে চায়। তারাই ধিক্কার পাওয়ার যোগ্য।" যেহেতু ধর্ম-রাষ্ট্র ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন ধরনের অধিকার লংঘন করা হচ্ছিল এবং সমাজে পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সা.) এর হাদিস অনুযায়ী কার কি অধিকার সে সর্ম্পকে আম জনতার কোন ধারনাই ছিলনা। এই পরিস্থিতে তিনি জনগণের কার কি অধিকার সে সর্ম্পকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে জন সমক্ষে প্রচার করেন। এ পত্রের ভূমিকা :

জেনে রেখ, তোমার উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হোক। তোমার উপরে আল্লাহ্‌র রয়েছে কিছু অধিকার। যেগুলি তোমাকে আবেষ্টন করে রেখেছে তুমি চলমান বা স্থির যে অবস্থায় থাক না কেন, আর তোমার যে অঙ্গকেই সঞ্চালিত কর আর যে উপকরণই ব্যবহার কর না কেন। কিছু অধিকার রয়েছে যেগুলো অপর অধিকারগুলোর তুলনায় বড়। তোমার উপর সবচেয়ে বড় যে অধিকারটি মহা মহিম আল্লাহ্‌ নিজের পক্ষ থেকে আবশ্যক করেছে তা হলো তাঁর (আল্লাহ্‌র) অধিকার যা সকল অধিকারের ভিত্তি এবং তা থেকেই সব অধিকার উৎপত্তি লাভ করে। অতঃপর তোমার জন্য তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সকল অঙ্গপ্রতঙ্গের জন্য তোমার উপর অধিকার আবশ্যক করেছেন। তোমার চোখের জন্য তোমার উপর অধিকার রয়েছে। তোমার উপরে তোমার কানের অধিকার রয়েছে। তোমার উপর তোমার জিহবার অধিকার রয়েছে। তোমার হাতের অধিকার রয়েছে। তোমার পায়ের অধিকার রয়েছে। তোমার পেটের অধিকার রয়েছে। তোমার লজ্জাস্থানের অধিকার রয়েছে। এ গুলো তোমার সাতটি অঙ্গ যে গুলো দ্বারা তুমি কাজ করে থাক। অতঃপর আল্লাহ্‌ তোমার প্রত্যেক কাজের জন্য তোমার উপর অধিকার নির্ধারণ করেছেন। তোমার উপর তোমার নামাযের অধিকার রয়েছে। তোমার রোযার অধিকার রয়েছে। তোমার যাকাতের অধিকার রয়েছে। তোমার কোরবানির অধিকার রয়েছে। তোমার কাজকর্মের তোমার উপর অধিকার রয়েছে। অতঃপর অধিকারের বৃত্ত তোমার থেকে অন্যদের কাছে পৌঁছায় যারা তোমার উপর অবশ্য পালনীয় অধিকার রাখে। এসব অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে আবশ্যকীয় হলো তোমার নেতাদের অধিকার। অতঃপর তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের অধিকার, তারপর তোমার স্বজনদের অধিকার, এগুলো হলো কতিপয় অধিকার এবং এগুলো থেকে আরো কিছু অধিকার বিচ্ছুরিত হয়। তোমার নেতাদের যে অধিকার রয়েছে তোমার উপর সেগুলো তিন ধরনের। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আবশ্যকীয় হলো তোমার উপর (বৈধ) শাসকের অধিকার, তোমার কাজকর্মের নির্দেশনার ভার তারই হাত ন্যাস্ত। অতঃপর শিক্ষকের অধিকার এরপর তোমার মুনিবের (নিয়োগকর্তার) অধিকার। প্রত্যেক পরিচালনাকারী এবং পৃষ্ঠপোষকই হলো নেতা। অধীনস্তদের অধিকার হলো তিন ধরনের। তার মধ্যে সবচেয়ে আবশ্যক হলো তোমার অধীনস্তদের অধিকার। তারপর শিষ্য ও ছাত্রের অধিকার। কারণ মুর্খ হলো জ্ঞানীর অধীন। আর যে সকল অধীনস্তের ক্ষমতা তোমার হাতে যেমন স্ত্রী-ক্রীতদাস (ইত্যাদি)। আর আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার অনেক এবং যার সাথে আত্মীয়তার নৈকট্য যত অধিক তার অধিকার তত অগ্রগন্য। আর তোমার উপর অবশ্য পালনীয় অধিকার সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অধিকার হলো তোমার মায়ের। অতঃপর তোমার পিতার, তারপর তোমার সন্তানদের অধিকার। তারপর তোমার ভাইয়ের। এরপরে ধারাবাহিকভাবে তোমার নিকটবর্তী স্বজনদের

অধিকার। অতঃপর তাদের অধিকার যারা তোমার প্রতি সদাচার করেছে। অতঃপর তোমার মুআজ্জিনের অধিকার। তারপর নামাযের পেশ ইমামের অধিকার। তারপর তোমার সহচরদের অধিকার। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর অধিকার। তারপর তোমার শরীরের অধিকার। তারপর তোমার সম্পর্কের অধিকার। তোমার কাছে দেনাদারের অধিকার। তারপর তোমার কাছে পাওনাদারের অধিকার। তারপর তোমার সঙ্গী ও বন্ধুর অধিকার। তারপর তোমার কাছে দাবিদারের (বিবাদী)। তারপর তোমার সাথে পরামর্শকারীর। তারপর তুমি যার সাথে পরামর্শ কর তার অধিকার। তারপর যে তোমার উপদেশ চায় তার অধিকার। তারপর তোমার চেয়ে বড়দের অধিকার। তারপর তোমার চেয়ে ছোটদের অধিকার। তারপর যে তোমার কাছে সাহায্য চায় তার অধিকার। তারপর তুমি যার কাছে সাহায্য চাও তার অধিকার। তারপর সেই ব্যক্তির অধিকার যে কোন কথা বা কাজের মাধ্যমে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে কিংবা কোন কথা বা কাজের মাধ্যমে তোমার বিরুদ্ধে আনন্দ প্রকাশ করেছে। ইচ্ছাকৃতই হোক বা অনিচ্ছাকৃত। অতঃপর তোমার স্বধর্মীর অধিকার। তারপর ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিমদের অধিকার। সে সব অধিকার যে গুলো বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কারণ সূত্রে যেমন যুদ্ধ-সন্ধি-চুক্তি ব্যবসায়, লেনদেন ইত্যাদি জন্মে। ধন্য সেই ব্যক্তি যার প্রতি আল্লাহ্ সহায় হন যাতে তার উপর নির্ধারনকৃত অধিকারসমূহ পালন করতে পারে এবং তাকে সফলতা দান করেন এবং রক্ষা করেন।

ইমাম জয়নুল আবেদীনের শাহাদত

খলিফা আব্দুল মালিকের মৃত্যুর পর ৮৬ হিজরীতে তার পুত্র ওয়ালিদ ক্ষমতাসীন হয়। সেও ছিল অধিকতর অত্যাচারী ও লজ্জাহীন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি তার ব্যাপারে লিখেছেন : ওয়ালিদ ছিল অধিকতর জালেম। ওয়ালিদ তার প্রথম ভাষনে বলে : যারাই আমার অবাধ্যতা করবে তাদেরকে হত্যা করব। আর যে, কেউ মৃত্যুর ভয়ে নীরবতা অবলম্বন করবে তাকেও ভবিষ্যতে হত্যা করব। ওয়ালিদ ও অন্যান্য জালেম শাসকদের মতই সে সময় ইমামের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তায় ভীত সন্ত্রস্ত ছিল এবং ইমামের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ক্ষমতার কারণে হীনমন্যতায় ভুগত। আর ভীত থাকতো যদি মানুষ ইমামের পাশে এসে দল বাধে তাহলে সেটি হবে তার ক্ষমতা ও খেলাফতের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর এ কারণেই ইমামের উপস্থিতিটা সে সহ্য করতে রাজী ছিল না। অবশেষে সে চক্রান্ত করে ইমামকে ৯৪ হিজরীতে বিষ পান করিয়ে শহীদ করে। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না লিল্লাহে রাজেউন।

ইমাম বাকের (আ.)

হযরত ইমাম "বাকের" (৫৭ হিজরীর ৩রা সফর, শুক্রবার মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন)। ইমাম হযরত বাকের (আ.)। হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (আ.)। নবী পরিবারের শীর্ষ ব্যক্তি পঞ্চম ইমাম। তাঁর পারিবারিক নাম আবু জাফর এবং উপাধি "বাকের"। তাঁকে "বাকের" বলার কারণ এই যে, তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগাধ বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন এবং জ্ঞান শাস্ত্রের সার গর্ভ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করতেন। তার পবিত্র মাতার নাম ছিল ফাতিমা। যিনি হযরত হাসান ইবনে আলী (আ.) এর (কন্যা ছিলেন)

রাসূল (সা.) এ দৃষ্টিতে ইমাম বাকের (আ.)

প্রখ্যাত সাহাবী জাবির বিন আব্দুলাহ আনসারী (রা.) বলেন : রাসূল (সা.) বলেছেন, ইমাম বাকের (আ.) (৬৭৯-৭৩৬) ওহে জাবির তুমি আমার সন্তান (মুহাম্মদ বিন, আলী বিন, হুসাইন বিন, আলী বিন আবু তালেব) যার নাম তৌরাত কিতাবে "বাকের" বলে সম্বোধন করা হয়েছে তাকে দেখা পর্যন্ত জীবিত থাকবে। যখন তোমার সাথে তার দেখা হবে তাকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। নবী (সা.) ওফাতের পর তাঁর ভবিদ্বানী অনুযায়ী জাবির (রা) দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। একদিন ইমাম জয়নুল আবেদীনের (আ.) বাড়িতে এসে শিশু অবস্থায় ইমাম বাকের (আ.) তার কাছে আসতে বলে এবং সে আবার শিশু "বাকের"কে ফিরে যেতে বলে। ইমাম ফিরে গেলেন। জাবির ইমামের দেহ ও পথ চলা পর্যবেক্ষণ করে বলেন : আল্লাহ্র কাবা ঘরের কসম, অবিকল নবী (সা.)।

অতঃপর জাবির ইমাম জয়নুল আবেদীনকে জিজ্ঞাসা করল। এই শিশু কে? ইমাম জয়নুল আবেদীন বলেন সে (মুহাম্মদ বাকের) আমার সন্তান এবং আমার পরে তোমাদের ইমাম। জাবির উঠে দাঁড়ালেন এবং ইমাম বাকের (আ.) এর পায়ে চুম্বন দিয়ে বলল : হে রাসূল (সা.) এর সন্তান। আপনার জন্য আমার জীবন উৎস্বর্গীত হোক। আপনার পিতা নবী (সা.) এর সালাম ও দরুদ গ্রহণ করুন। কেননা তিনি আপনাকে সালাম দিয়েছেন। ইমাম বাকের (আ.)-এর চক্ষু মোবারক পানিতে ভরে গেল। তিনি বললেন : সালাম ও দরুদ আমার পিতা নবী (সা.) এর উপর যতদিন এই আকাশ মন্ডলী ও জমিন অবশিষ্ট থাকবে। আর তোমার উপরে ও সালাম ও দরুদ হে জাবির যেহেতু তুমি তার সালামকে আমার কাছে পৌছে দিয়েছো।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

উমাইয়া শাসক ও ইমাম বাকের (আ.)

ইমাম বাকের (আ.) এর ইমামত কাল ছিল জালেম বাদশাহ হিশাম বিন আব্দুল মালেক এর সমকালীন। হিশাম ও অন্যান্য উমাইয়া শাসকরা ভাল করেই জানত যে, যদিও অন্যায় অত্যাচার ও বলপূর্বক তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে। তথাপিও এই ক্ষমতা দিয়ে মানুষের অন্তর থেকে নবী (সা.) এর পরিবারের প্রতি তাদের ভালবাসাকে ছিনিয়ে নেয়া যাবে না। মহান ইমামদের শান, মান, মর্যাদা, সর্বোপরি অলৌকিক শক্তি এত অধিক ছিল যে কারণে সব সময় তাদের শত্রু অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলদারেরা ভীত সন্ত্রস্ত্র থাকত। হিশাম এক বছর হজ্জ করতে যায়। ইমাম বাকের ও ইমাম জাফর সাদিক (আ.) ও ঐ বছর হজে গিয়েছিলেন, সে বারে ইমাম সাদিক হজের ময়দানে খোতবা দেন যা ছিল এরুপ, "আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপা যে মুহাম্মদকে (সা.) সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন। আর তার ওছিলায় আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নির্বাচিত ব্যক্তি। আর দুনিয়াতে তাঁর প্রতিনিধি। মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তারাই যারা আমাদেরকে অনুসরণ করবে এবং দুর্ভাগা তারাই যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করবে।" ইমাম সাদিক (আ.) হজ থেকে ফেরার অনেকদিন পর বললেন : আমার বক্তব্যকে হিশামের কাছে পৌঁছানো হয়েছিল। কিন্তু সে কোন প্রতিবাদ না করেই দামেস্কে ফিরে যায়। আমরাও মদিনায় ফিরে আসি। এসে জানতে পারলাম হিশাম তার, মদিনার গর্ভনরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছে যে আমরা হজ থেকে ফিরে এলেই আমাদেরকে (ইমাম বাকের ও সাদিক (আ.) কে যেন দামেস্কে পাঠায়। আমরা দামেস্কে গেলাম। হিশাম তিন দিন পর্যন্ত আমাদের কোন পাত্তাই দিল না। চর্তুথ দিনে তার, দরবারে গেলাম। হিশাম সিংহাসনে বসে ছিল এবং দরবারের লোকেরা তার সম্মুখে তীরন্দাযীতে (Archery) ব্যস্ত ছিল। হিশাম আমার বাবাকে তার নাম ধরে ডেকে বলল : এসো, তোমার এলাকার বয়জেষ্ঠ্যদের সাথে তীরন্দাযী কর। আমার বাবা : আমার বয়স হয়েছে তীরন্দাযী করার বয়সও চলে গেছে আমাকে একাজ থেকে বিরত রাখ। হিশাম অনেক চাপাচাপি করল এবং এক প্রকার তাকে বাধ্য করল এই কাজ করার জন্য। সে বনি উমাইয়া বংশের এক বৃদ্ধকে তার তীর ধনুকটি বাবাকে দিতে বলল। বাবা ধনুকটি নিয়ে তাঁতে তীর লাগিয়ে লক্ষ্য বস্তুর দিকে ছুড়লো। প্রথম তীরটি ঠিক লক্ষ্য বস্তুর মাঝখানে গিয়ে বিদ্ধ হল। দ্বিতীয়টি প্রথমটির পশ্চাৎ ভাগে গিয়ে বিধলো এবং প্রথম তীরটিকে বিভক্ত করে ফেলল। তৃতীয়টি দ্বিতীয়টির, চর্তুথটি তৃতীয়টির, পঞ্চমটি চর্তুথটির, এভাবে নবমটি অষ্টমটির পশ্চাৎ ভাগে বিঁধলো। উপস্থিত সবাই চিৎকার ধ্বনি দিয়ে উঠল। হিশাম হতভম্ব হয়ে চিৎকার দিয়ে বলল : সাবাস আবু

জাফর। তুমি আরব অনারবদের মধ্যে তীরন্দাযীতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তুমি কেমন করে ভাবলে যে তোমার তীরন্দাযীর বয়স শেষ হয়ে গেছে? একথা গুলো বলছিল ঠিক তখনই মনে মনে বাবাকে হত্যার পরিকল্পনা করল। মাথা নিচের দিকে দিয়ে চিন্তায় মগ্ন ছিল। আর আমরা তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমরা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তার এ কর্মের কারণে বাবা ভীষন রেগে গেলেন। তিনি অতিরিক্ত রেগে যাওয়াতে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু তার রাগান্বিত ভাবটি চেহারায় ফুটে উঠেছিল। হিশাম তার রাগান্বিত হওয়াটা বুঝতে পেরে আমাদেরকে তার সিংহাসনের দিকে যাওয়ার ইশারা করল। আমরা তার দিকে অগ্রসর হতেই সে নিজে উঠে দাঁড়িয়ে বাবাকে তার ডান পাশে অবস্থিত সিংহাসনে ও আমাকে বাবার ডান পাশে রাখা আরেকটি সিংহাসনে বসালো। তারপর সে আমার বাবার সাথে কথা বলতে শুরু করল। কুরাইশ বংশের গর্ব যে তোমার মত লোক তাদের মধ্যে আছে। সাবাস তোমাকে। এমন তীরন্দাযী কোথা খেকে এবং কত সময় ধরে শিখেছো ? বাবা বললেন : তুমি তো জান যে, মদিনাবাসীদের তীরন্দাযীতে বিশেষ দক্ষতা আছে। আর আমি যুবক বয়সের কিছু সময়কে এটা শেখার কাজে লাগিয়েছিলাম। পরে আর এটার চর্চা করিনি। যা এতদিন পরে তুমি করতে বললে। হিশাম : যে দিন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকে এমন তীরন্দাযী আর কখনও কোথায়ও দেখি নি। আমি মনে করি না যে, এই পৃথিবীতে আর কেউ তোমার মত তীরন্দাযী করতে পারে ? তোমার ছেলে জাফর ও কি তোমার মত তীরন্দাযী করতে পারে ? বাবা বললেন : আমরা পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতাকে উত্তরাধিকারীদের সূত্রে পেয়েছি। যে পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতাকে আল্লাহ্ তার নবীকে (সা.) দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ তার পবিত্র কুরআনে বলেছেন : আজ তোমাদের দ্বীনকে আমি সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে তোমাদের ঐশ্বরিক দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করলাম (সুরা মাযেদা : ৩)। আর যারা এধরনের কাজে পারদর্শী তাদের থেকে পৃথিবী কখনও দূরে থাকে না। এই বাক্যগুলি শোনার সাথে সাথে হিশামের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। অতিরিক্ত বয়সের কারণে তার চেহারা লাল হয়ে গেল। কিছু সময়ের জন্য মাথা নিচু করে থাকার পরে পুনরায় মাথা তুলে বলল : তবে কি তোমরা (বনী হাশেম) ও আমরা (বনী উমাইয়া) সম্মানিত বা অভিজাত বংশের (আবাদ মানাফ) নই। যা সর্ম্পকের দিক দিয়ে আমরা একে অপরে সম মান ? ইমাম হা : কিন্তু আল্লাহ্ আমাদেরকে বিশেষত্ব দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেন নি। জিজ্ঞেস করল : তাহলে কি আল্লাহ্ স্বীয় নবীকে (সা.) আবদে মানাফ এর বংশে সমস্ত মানুষের (সাদা, কালো, লাল) উদ্দেশ্যে পাঠায় নি? তুমি কিভাবে এই জ্ঞানকে উত্তরাধীকারত্মের সূত্রে পেয়েছো যা কিনা নবী (সা.) এরপর আর কোন নবী আসেনি আর তোমরা তো নবী নও ? ইমাম : আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে তার নবীকে বলেছেন, "হে আমার নবী। তোমার জিহবাকে কিছু বলার জন্য নাড়িও না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার উপর অহী নাজিল হয়। (সুরা কিয়ামাহ : ১৬)। এই আয়াত অনুযায়ী নবী (সা.) এর কথা অনুরুপ ওহী বৈ অন্য কিছুই নয়। (সুরা আল হাক্কাহ-১২)। যা আমাদেরকে বিশেষত্ব দিয়েছে যা অন্যদেরকে দেয়া হয় নি। আর একারণেই তার ভাই আলী (আ.) এর সাথে গুপ্ত বিষয়াদি বলতেন। যা অন্য কাউকে তা কখনও বলতেন না। আল্লাহ্ এ ব্যাপারে বলেছেন : আর অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কান তা ধারণ করবে। আল্লাহ্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আলী (আ.) কে বললেন : ঐ গুলি (গুপ্ত বিষয়গুলি) তোমার কাছে বলার জন্য আল্লাহ্র কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম। আর সে কারণেই আলী বিন অবি তালিব (আ.) কুফায় বলেছিলেন : আল্লাহ্র নবী আমাকে এক হাজারটি অধ্যায় সম্পন্ন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যার প্রতিটি অধ্যায় থেকে আবার হাজারটি অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে ...। যেমনভাবে আল্লাহ্ পাক নবী (সা.) কে বিশেষ পরিপূর্ণতা দিয়েছেন তদ্রুপ নবী (সা.) আলীকে (সা.) দিয়েছেন এবং এমন কিছু শিখিয়েছেন যা অন্যরা শিখেনি। আর আমাদের জ্ঞান ঐ উৎস বা সূত্র থেকে এসেছে এবং শুধুমাত্র আমরাই উত্তরাধিকারী হিসাবে পেয়েছি না অন্যরা। হিশাম : আলী ইলমে গায়েবের দাবীদার ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ এখন পর্যন্ত কাউকে ইলমে গায়েবের অধিকারীত্ব দেন নি। বা (ইমাম বাকের): আল্লাহ্পাক তার নবী (সা.) এর উপর আসমানী কিতাব পাঠিয়েছেন যার ভিতর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত কিছুর বর্ণনা করেছেন। কেননা পবিত্র কুরআনে আছে তোমার কাছে এমন কিতাব (কুরআন) পাঠিয়েছি যা সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা রাখে (সূরা নহল: ৮৬)। অন্য আর এক জায়গায় এসেছে: সমস্ত কিছুকে কিতাবে কুরআন) পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছি সূরা ইয়াসীন ১২) এবং অন্য আরেক জায়গায় এসেছে যে, এমন কিছু নাই যা এই কিতাবে আনা হয়নি। সূরা আনআম : ৩৮)। আর কুরআনের সমস্ত গোপন বিষয়গুলি আলীকে (আ.) শিখানোর জন্য আল্লাহ্তালা নবীকে (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন। নবী (সা.) উম্মতের প্রতি বলেছেন: আলী তোমাদের সবার থেকে বিচার কাজে পারদর্শী। হিশাম নীরব ছিল। আর আমরা তার দরবার থেকে বের হয়ে এলাম। দোলায়েলে লাইমামহ, তারাবি, পৃ. ১০৪-১০৬)।

আলী (আ.) বিরোধীরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ বিরোধী ও রাসূল বিরোধী

হযরত আলী (আ.) এর আব্দুলাহ বিন নাফে নামে এক শত্রু ছিল। সে বলতঃ যদি এই পৃথিবীর কেউ আমাকে বুঝাতে পারে যে, খারেজীদেরকে হত্যা করে আলী (আ.) ধর্মত সঠিক কাজ করেছে তাহলে আমি তার পক্ষে যাব। যদিও সে পৃথিবীর পূর্বে ও পশ্চিমে অবস্থান করে। কেউ তাকে বলল! তুমি কি মনে কর যে আলী (আ.) এর সন্তানরাও এটাকে প্রমাণ করতে পারবে না সে তার সন্তানদের মধ্যে কি কেউ এমন মনীষী আছে যে, আমাকে বুঝাতে পারে? প্রশ্নকারী: তোমার মুর্খতার এটাই একটা বড় পরিচয়। এটা কি করে সম্ভব যে, আলী (আ.) এর অভিজাত বংশে কোন মনীষী থাকবে না। নাফে: এখন তার বংশের মনীষী কে? প্রশ্নকারী নাফের কাছে ইমাম বাকের (আ.) এর পরিচয় তুলে ধরল। নাফে তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মদীনায় এসে ইমামের সাথে দেখা করার জন্য অনুমতি চাইলে ইমাম তার মালামাল গুলিকে উটের পিঠ থেকে নীচে নামানোর জন্য একভৃত্যকে নির্দেশ দিলেন। আর তাকে পরের দিন ইমামের কাছে উপস্থিত হতে বললেন। পরের দিন সকালে আব্দুলাহ তার সাহাবীদের নিয়ে ইমামের বৈঠকখানায় আসল। এদিকে ইমাম তার সন্তানদের মুহাজির ও আনসার উত্তরসূরীদেরকেও ঐ বৈঠকে উপস্থিত হতে নির্দেশ দিলেন। যখন সবাই সেখানে উপস্থিত হলো ইমামের গায়ে তখন লাল বর্ণের একটি পোশাক ছিল। যা কিনা তাকে দেখতে আকর্ষণীয় ও সুদর্শন করেছিল ইমাম বললেন: সকল প্রশংসাও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্পাকের, যিনি স্থান, কাল, পাত্র,কখন কোথায় ও কিভাবে সৃষ্টি করেছেন। প্রশংসা সেই আল্লাহ্তালার যার না ঘুম আছে না ঘুমের ভাব। আর যা কিছু এই আসমান ও জমিনে আছে তিনি এসব কিছুর মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এই যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য (মাবুদ) নাই এবং মুহাম্মদ অনেকের মধ্য হতে বাছাইকৃত তার বান্দা ও রাসূল। ধন্যবাদ, আল্লাহ্কে যিনি তাকে নবুওয়াত দান করে আমাদের সম্মানিত করেছেন। আর আলীকে (আ.) তাঁর নবী (সা.) এর খলিফা নিযুক্ত করে আমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন। হে মুহাজির ও আনসারদের সন্তানেরা। তোমাদের মধ্য থেকে যে যতটুকু আলী বিন আবু তালিবের ফযিলত সম্বন্ধে জান বল। উপস্থিতদের মধ্য থেকে একজন আলী (আ.) ফযিলত বর্ণনা করতে করতে খাইবারের হাদীসে পৌঁছে বলল: নবী (সা.) খাইবারের ইহুদীদের সাথে যুদ্ধের সময় বলেছিলেন: আগামীকাল ইসলামের পতাকা এমন একজনের হাতে দিব, যে আল্লাহ্ ও তার নবীকে ভালবাসে এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর নবীও তাকে ভালবাসে। যুদ্ধে পারদর্শী, যে কখনও যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেনা এবং আগামীকাল যুদ্ধ থেকে খালি হাতে ফিরে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাঁর হাতে ইহুদীদের পরাজয় ঘটান। পরের দিন ইসলামের পতাকাটিকে আমীরুল মোমেনীন আলী (আ.) এর হাতে দিলেন। তিনি যুদ্ধে বিস্ময় সৃষ্টি করে ইহুদীদেরকে পরাজিত ও পলায়নে বাধ্য করলেন। আর তাদের বৃহৎ দুর্গের দরজাকে খুলে ফেললেন। ইমাম বাকের (আ.) আব্দুল্লাহ বিন নাফেকে বলেন, এই হাদীসের ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? নাফে: হাদিসটি সত্য কিন্তু আলী পরে কাফের হয়ে গিয়েছিল এবং খারেজীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। ইমাম: তোমার থেকে যেন তোমার মাকে কাঁদতে হয়। আল্লাহ্ যখন আলীকে ভালবাসতেন তখন কি তিনি জানতেন, না জানতেন না যে সে (আলী) খারেজীদেরকে হত্যা করবে? যদি বলো আল্লাহ্ জানতেন না, কাফের হয়ে যাবে। নাফে: আল্লাহ্ জানতেন। ইমাম: আল্লাহ্ কি তাঁকে কি তাঁর নির্দেশ মেনে চলার জন্য ভালবাসত না কি তাঁর নির্দেশ অমান্য করার কারণে? নাফে: যেহেতু সে (আলী) আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে চলত সে কারণেই আল্লাহ্ তাকে ভালবাসতেন। অর্থাৎ যদি সে ভবিষ্যতে পাপী হয়ে যেত তাই আল্লাহ্ জানতেন এবং কখনও ভালবাসতেন না। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, খাজেরীদেরকে হত্যা করা আল্লাহ্র আনুগত্য তথা নির্দেশ পালন করার সামিল। ইমাম: তুমি চলে যাও পরাজিত হয়েছো। কারণ এ ব্যাপারে তোমার কাছে কোন জবাব নাই। আব্দুল্লাহ্ উঠে যাওয়ার সময় এই আয়াতটি তেলোয়াত করল যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের কাছ থেকে ছুবেহ সাদেকের সাদা রেখা কালো রেখা হতে পৃথক হয়ে যায় (সূরা বাকারা : ১৮৭) এ বিষয়টিতে রাতের অন্ধকার ঠেলে দিনের আলোর মত পরিস্কার হয়ে যাওয়ার দিকে ইশারা করে বলল: আল্লাহ্ ভাল জানেন যে তার রেসালতের দায়িত্ব কোন পরিবারে দিবেন। (সূরা আন আম: ১২৪)

এই ফায়সালা থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, যারা হযরত আলী (আ.) এর বিরুদ্ধে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তারা অবশ্যই আল্লাহ্র নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। তাই এখানে ইজতেহাদী ভুল হওয়ার কোন অবকাশ নাই। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন।

অর্থনীতিবিদ হযরত ইমাম বাকের (আ.)

বাদশাহ আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে মিশরের খৃস্টানগণ রোমীয় টেকনোলজী ব্যবহার করে কাগজ তৈরি করত। আর তাতে খৃস্টানদের ধর্মীয় চিহ্ন ক্রস (+) ব্যবহার করত। আব্দুল মালেক এই ধরণের কাগজ দেখে তার উপর সংযোজনকৃত চিহ্নটির ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মিশরের গভর্নরকে নির্দেশ দিল। যখন আব্দুল মালিককে এই প্রতীকের তাৎপর্য ও মর্মার্থ জানানো হলো এবং সে এসব কাগজ

ধংস করে তৌহিদের শ্লোগান সম্বলিত কাগজ তৈরী করতে নির্দেশ দিল। তৌহিদের উক্তি সম্বলিত কাগজের ব্যবহার বেশ প্রচার পেল। সেই কাগজ রোমের বিভিন্ন শহরেও পৌঁছায়। বিষয়টি রোমের বাদশার গোচরীভূত হলে, সে আব্দুল মালেকের কাছে একটি চিঠি পাঠাল যে: কাগজ শিল্প সর্বদা খৃস্টানদের প্রতীক সম্বলিত ছিল। তা পাল্টানোর সিদ্ধান্ত যদি তোমার হয়ে থাকে, তাহলে আগের খলিফারা ভুল করেছে। আর তারা যদি ঠিক করে থাকে, তাহলে তুমি ভুল করেছো। আব্দুল মালেক তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং রোমের বাদশাহ মালেকের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তৃতীয়বারের মত এক ভয়াবহ সতর্কতামূলক পত্র প্রেরণ করে: দুইবার আমার পাঠানো উপহার গ্রহণ করলে না। আমার ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করলে না। তৃতীয়বারের মত কয়েকগুণ বেশী করে উপঢৌকন পাঠালাম। ঈসার কসম, যদি খৃস্টান প্রতীক সম্বলিত কাগজের ব্যবহার আগের পর্যায়ে ফিরিয়ে না আন তাহলো নবী মুহাম্মদের নামের সাথে অইমানসূচক বাক্য সম্বলিত স্বর্ণ ও রোপ্য মুদ্রা তৈরী করার নির্দেশ দিব। আর তুমি ভাল করেই জান যে, রোমানরা মুদ্রা তৈরীতে বিশেষ পারদর্শী। যখন তোমরা তোমাদের নবীর নামে অইমানসূচক বাক্য সম্বলিত মুদ্রাগুলি দেখবে তখন লজ্জায় তোমাদের কপাল ঘামে ভিজে যাবে। সুতরাং এটাই ভাল যে, উপঢৌকনগুলি গ্রহণ করে আমাদের ইচ্ছাটিকে পূরণ কর। যেন আমাদের অতীতের বন্ধুত্ব আগের মতই থাকে।

রোমের বাদশাহ্‌র (সীজার) এই চিঠি পেয়ে বাদশাহ্ আব্দুল মালেক দিশেহারা হয়ে গেল। তার মন্ত্রী ও উপদেষ্টারা কোন উপায় না দেখতে পেয়ে তাকে পরামর্শ দিল নবী পরিবারের ইমাম বাকের (আ.) এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে সক্ষম। সেই মোতাবেক ইমাম বাকেরকে (আ.) মদীনা থেকে দামেস্ক আনা হলো। ইমাম বাকেরকে আব্দুল মালিক সৃষ্ট পরিস্থিতির পূর্বাপর ব্যাখ্যা দিলে ইমাম বললেন: এখন সমস্ত শিল্পকর্মীদেরকে এক জায়গায় একত্রিত কর তারা যেন মুদ্রা তৈরীর কাজে লাগতে পারে। মুদ্রার এক পিঠে সূরা তৌহিদ ও অন্য পিঠে নবী (সা.) এর নাম লেখ। আর এভাবেই আমরা রোমানদের ধাতব মুদ্রা থেকে অমুখাপেক্ষী হব। মুদ্রার ওজন সম্পর্কে তিনি নির্দেশ দেন যে, দশ দেরহাম করে তিন ধরণের মুদ্রা তৈরী করবে যার প্রতিটির ওজন হবে সাত মিসকাল। তিনি বলেন, প্রথম ধরণটি প্রতি এক দেরহাম, এক মেসকাল এবং দশ দেরহাম দশমিকার দ্বিতীয় ধরণটি প্রতি দশ দেরহাম ছয় মিসকাল এবং তৃতীয় ধরণটি প্রতি দশ দেরহাম পাঁচ মিসকাল হবে। আর এভাবে ঐ তিন ধরণের মুদ্রা হতে ত্রিশ দিরহামে একুশ মিশকাল হতো। এটা রোমান মুদ্রার সমমান ছিল। মুসলিমরা বাধ্য ছিল যে রোমানদের ত্রিশ দেরহাম বা একুশ মেসকাল হতো তা ফেরত দিয়ে নতুন ত্রিশ দেরহাম নেওয়ার জন্য। তিনি আরও বলেন যে শহর থেকে মুদ্রা তৈরী করা হবে সে শহরের নাম, তারিখ বছর যেন তাতে উল্লেখ করা হয়। আব্দুল মালেক ইমামের নির্দেশের বাস্তবায়ন করল এবং প্রতিটি ইসলামী প্রদেশগুলোতে সংবাদ পাঠাল যে সব ধরণের বেচাকেনা যেন নতুন মুদ্রা ব্যবহার করা হয়। এখনও যাদের কাছে আগের মুদ্রা আছে তা ফেরত দিয়ে তাদেরকে ইসলামী মুদ্রা গ্রহণ করার জন্য জানাল। বিষয়টি রোমান বাদশহকেও জানানো হলো। রোমান বাদশাহ তার দেয়া হুমকি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলো। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, হযরত আলী (আ.) এর জমানায় তার নির্দেশে ইসলামী মুদ্রার প্রচলন করা হয়।

হযরত ইমাম বাকের (আ.) এর কেরামত

১. হযরত আবু বসীর দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি বলেন : একদিন আমি হযরত বাকের (আ.) কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি রাসূল (সা.) এর দ্বীনের রক্ষক ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম : তিনি তো সকল পয়গম্বরের ওয়ারিশ। তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিনি তাদের শিক্ষার ওয়ারিশ। আমি বললাম : আপনি ওয়ারিশ সূত্রে সেই শিক্ষা পেয়েছেন কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম : আপনি মৃতকে জীবিত করার শক্তি রাখেন কি ? জন্মান্ধকে চক্ষুদান করতে পারেন ? কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ সবল করতে পারেন ? এছাড়া এটাও বলুন যে, মানুষ তাদের গৃহে কি খায় আর কি সঞ্চিত রাখে ? হযরত বাকের বললেন : হ্যাঁ। আমি অল্লাহ্‌র হুকুম বলতে পারি। তারপর বললেন : আমার সম্মুখে এসে বসে যাও। আমি বসে গেলাম। তিনি আপন পবিত্র হাত আমার মুখমন্ডলে বুলালেন। আমার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে গেল। আমি পাহাড়, পর্বত, প্রান্তর, আকাশ পৃথিবীর বিস্তৃতি স্বচক্ষে দেখলাম। অতঃপর তিনি পুনরায় আপন হাত আমার মুখমন্ডলে বুলালেন। এতে আমি পূর্বাবস্থায় ফিরে এলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : এই অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে কোনটি তুমি পছন্দ কর ? এক : এই যে, তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসুক এবং তোমার ভালমন্দের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পিত হোক। দুই : এই যে, তোমার চক্ষুদ্বয় তেমনি অন্ধ থাকুক এবং তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ কর। আমি বললাম : আমি তো অন্ধ থাকা এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়াই পছন্দ করি।

২. জনৈক রাবী বর্ণনা করেন: আমরা বাকের (রা.) এর সঙ্গে হেশাম ইবনে আব্দুল মালেকের গৃহের কাছ দিয়ে গমন করছিল। তখন সে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন

করছিল। হযরত ইমাম বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, এই গৃহ ধ্বংস ও উজাড় হয়ে যাবে এবং মানুষ এর মাটি পর্যন্ত উপড়ে নিয়ে যাবে। যে সব পাথর দিয়ে এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, সেগুলো ধ্বংস স্তুপে পরিনত হবে। রাবী বলেন : একথা শুনে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। কেননা হেশামের মত প্রতাপশালী ব্যক্তির গৃহ ধ্বংস ও বরবাদ করার সাধ্য কার? কিন্তু হেশামের মৃত্যুর পরেই তার পুত্র ওলীদ ইবনে হেশামের আদেশে এই গৃহ ভূমিমাৎ করা হয়। গৃহের ভিত এত দূর খনন করা হয় যে, ভিত্তির পাথর দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। আমি স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখেছি।

এই রাবীই বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত বাকেরের সঙ্গে ছিলাম। তার ভাই যায়েদ ইবনে আলী আমাদের কাছে আগমন করলেন। হযরত বাকের বললেন: আল্লাহ্‌র কসম, সে কুফায় বিদ্রোহ করবে। কুফার লোকেরা তাকে হত্যা করবে এবং তার শির অলিতে গলিতে ঘুরিয়ে এখানে (মদীনায়) নিয়ে আসবে। এরপর বর্শার মাথায় ঝুলাবে। তার এসব কথাবার্তায় আমরা বিস্মিত হলাম। কেননা মদীনায় কখন ও কাউকে বর্শায় ঝুলানো হয় নি। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তার শির মদীনায় আনা হয় তখন তার সাথে শুলীও আনা হয়।

৩. কয়স ইবনে মাতার বলেন: আমি ইমাম বাকেরের (আ.) কাছে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইলাম। লোকেরা বলল তড়িঘড়ি করবেন না। কেননা, তার কাছে আপনাদেরই ভাই বন্ধু রয়েছে। ইতোমধ্যে ১২ ব্যক্তি আট সাঁট পোশাক এবং হাত পায়ে দস্তানা ও মোজা পরিহিত অবস্থায় বের হয়ে গেল। তারা আস্‌সালাম আলাইকুম বলে চলে গেল। এরপর আমি হযরত বাকেরের (আ.) কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম; এরা কারা ছিল। যারা এই মাত্র আপনার কাছ থেকে বের হয়ে গেল? আমি তাদেরকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেন: এরা তোমাদের ভাই জিন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি তাদেরকে দেখেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমরা যেমন হালাল-হারাম সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা কর। তেমনি তারাও এসে জিজ্ঞাসা করে।

৪. অন্য এক রাবী বলেন; আমরা ইমাম বাকেরের সঙ্গে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী উপত্যকায় সফররত ছিলাম। তখন তিনি খচ্চরের পিঠে সওয়ার ছিলেন। আর আমি একটি গাধার উপর সওয়ার ছিলাম। হঠাৎ আমি দেখিলাম এক ব্যক্তি পাহাড় থেকে নেমে তার কাছে এলো। সে তার খচ্চরের জিনের নীচে হাত রেখে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হযরত বাকেরের সাথে কথাবার্তা বলল। তিনি শুনতে থাকলেন। লোকটির সাথে একটি বন্য বাঘ ছিল। সেটিও এগিয়ে এসে হযরত বাকেরের সাথে কথা বলল। অবশেষে তিনি বাঘকে বললেন, এখন চলে যাও। তুমি যেভাবে চেয়েছিলে, আমি তা করে দিয়েছি। বাঘটি চলে গেল। তারপর হযরত বাকের আমাকে বললেন: তুমি জান বাঘ কি বলছিল? আমি বললাম আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূল ও রসূলের সন্তান বেশী জানেন। তিনি বললেন: সে বলছিল যে তার জোড়া এ সময়ে প্রসব বেদনায় ভুগছে। আপনি দোয়া করুন। যাতে আল্লাহ্‌ তাকে খালাস করেন এবং আমার বংশের কেউ যেন আপনার কোন ভক্তের উপর হামলা করার কুমতি না হয় সে মতে আমি দোয়া করেছি।

শাহাদাত

মহান ইমাম বাকের উল-উলুম ৫৭ বৎসর বয়সে ১১৪ হিজর (৭৩২ খ্রিস্টাব্দ) যিলহজ মাসের ৭ তারিখে জুলুমবাজ শাসক আব্দুল মালেকের নির্দেশে ইব্রাহীম ইবনে ওয়ালীদের মাধ্যমে বিষ প্রয়োগে শহীদ করা হয়। ওফাতের সন্ধ্যায় ইমাম সাদিককে (আ.) বলেন: আমি আজ রাতে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেব। এখনই আমি দেখতে পেলাম আমার বাবা আমার কাছে শরবত নিয়ে আসলেন। আর আমি তা পান করলাম। তিনি আমাকে অমর জীবনে যাওয়ার ও আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছানোর সুসংবাদ দিলেন। পরদিন আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সীমাহীন জ্ঞানের এই পবিত্র দেহটিকে "বাক" নামক কবর স্থানে ইমাম মুজতবা ও ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এর সমধিস্থানের পাশে দাফন করা হয়। তার উপর আল্লাহ্‌র সালাম হোক।

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) (৭০৫-৭৭০ খ্রিস্টাব্দ)

আহলে বাইতের ত্বরিকার ইমামের বাল্য নাম ডাকনাম ও পদবী যথাক্রমে জাফর, আবু আব্দুলাহ, ও সাদিক। তার মহান পিতা হযরত ইমাম বাকের (অঃ) মাতা ফারাহ বিনতে কাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর (রা.) সম্পর্কে বলেন, সে মোহাম্মদ আমার সন্তান যদিও সে আবু বকরের পুত্র। মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে হযরত আলী (আ.) এর একান্ত অনুসারী হওয়ার কারণে মুয়াবিয়া তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে। হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) ই একমাত্র ইমাম যিনি একই সাথে হযরত আলী (আ.) ও আবু বকর (রা.) এর সন্তান। ইমাম সাদিক (আ.) তাঁর মাতার সম্পর্কে বলেন: আমার মা এমন মহিলা ছিলেন যিনি পরহেযগার। ইমানদার ও সৎ কর্মশীল। ইমাম ৬৫ বছর দুনিয়াতে জীবন যাপন করেন। ৮৩ হিজরী (৭০২ খৃস্টাব্দ) মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।

ইমাম ৬৫ বছর দুনিয়াতে জীবন যাপন করেন এবং ১১৪ হিজরী থেকে ১৪৮ হিজরী পর্যন্ত মোট ৩৪ বছর তিনি ইমামতের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ইমামতের সমকালীন শাসকরা হল: বনি উমাইয়া থেকে হিশাম বিন আব্দুল মালেক ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ বিন আবদুল মালেক, ইয়াজিদ বিন ওয়ালীদ, ইব্রাহীম বিন ওয়ালিদ ওমর ওয়াল হিমার এবং বনি আব্বাস থেকে সাফ্ফাহ ও মানসুর দাওয়ানেকী)।

জালেম শাহী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইমামের নীরব বিপ্লব

উমাইয়া শাসকদের এক শতাব্দীর কাছাকাছি সময় ইসলামী ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় হিসাবে বিবেচিত। ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহ তাদের কাছে তামাশার বিষয় ছিল। তারা মানুষকে কোন প্রকার মূল্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সমস্ত মুসলমান বিশেষ করে আহলে বাইতের সদস্যরা ও তাদের অনুসারীবৃন্দ বনি উমাইয়াদের রাজত্বকালে অত্যধিক কষ্টে ও অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠায় থাকতেন। বনি উমাইয়ারা সম্পূর্ণরূপে ধর্মহীন ও খোদাদ্রোহী ছিল। ইসলামের সূচনা থেকেই তারা ইসলামী ধর্মাদর্শ ও নবী (সা.) এর সাথে শত্রুতা শুরু করেছিল যা কোন অবস্থাতেই সংশোধনীয় ছিল না। পরবর্তীতে বিভিন্ন ঘটনা, বদর বা ওহুদের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরে নবী (সা.) ও হযরত আলী (আ.) এর ব্যাপারে তাদের অন্তরে কঠিনভাবে শত্রুতা পোষণ করতে থাকল। যখনই তাদের হাতে সময় ও সুযোগ আসতো তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চেষ্টা চালাতো আর ইসলামকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে নবী (সা.) ও আর ইসলামকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে নবী (সা.) ও তার পরিবারকে যারা প্রকৃত পক্ষে ইসলামের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হিসাবে ভূমিকা পালন করতেন তাদেরকে ধ্বংস ও উৎখাত করার লক্ষ্যে কোন প্রকার চতুরতা, কূটনীতি, অত্যাচার করতে বাদ রাখেনি। কারবালার বিষাদময় ঘটনার পর ইমামগণের নীরব বিপ্লব, তথা উন্নত দিক নির্দেশনা ও শিক্ষা বনি উমাইয়াদের শাসন কাজের উপর প্রচণ্ড ঘৃণা, ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে যাইদ (আ.) এর শাহাদতের পর তাঁর মৃতদেহের সাথে উমাইয়া শাসকদের অমানবিক ও জঘন্যতম আচরণে উমাইয়াদের ধর্মহীনতা, অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মানুষদেরকে ধর্মের পথে ফিরে আসার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অবশেষে ৭৫০ খৃস্টাব্দে তাদের লজ্জাকর ক্ষমতার অবসান ঘটে এবং বনি আব্বাস সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অবৈধভাবে খেলাফতের ক্ষমতা গ্রহণ করে ইমাম সাদেক (আ.) ও অন্যান্য মহান ইমামগণের ন্যায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত প্রধানত যখন উমাইয়া শাসকদের জঘন্য কাজ কারবার সম্পর্কে প্রকাশ্যে ও গোপন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যস্ত ছিলেন। আর যখন তার উপর থেকে বনি উমাইয়াদের নজরদরি ও তৎপরতা কম থাকত তখনই তিনি সঠিক ও প্রকৃত ইসলাম ধর্মের উন্নত চিন্তার আলোচনা করতেন এবং উত্তম সাথী-সঙ্গীদের মধ্যে দ্বীনের সঠিক রাস্তাকে পরিচয় করাতেন এবং মানুষের মাঝে তুলে ধরতেন। ঐ অন্ধকারাময় সময়ে ইমাম বাকের ও ইমাম সাদিকের খেদমত হচ্ছে, ইসলামকে জীবন্ত রাখা ও এর প্রচার ও হেফাজতের লক্ষ্যে জ্ঞানের আন্দোলন করা। আলেম, বিশিষ্ট ফকীহ্ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি তৈরি করা। এই সব ব্যক্তিবর্গ যেন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দ্বীন, ধর্ম, কুরআন, হাদিসকে অপব্যাখ্যা, অপপ্রচার, মিথ্যাচার, ভুলভ্রান্তি ও কমবেশী ছাড়াই যথাযথভাবে প্রচার করতে পারে ও দ্বীনের আদেশ নির্দেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আর বিশ্বাস বা আক্বীদাগত বিষয়াদির বিভ্রান্তিকে বন্ধ বা রোধ করতে পারে এবং ইসলামের সঠিক রাস্তাকে পরিচয় করাতে পারে। এই সংগ্রাম অন্যন্য সকল প্রকার সংগ্রামের থেকে কঠিন ছিল ঐ তিন মহান ব্যক্তির বরকতে এই কাজ অন্যান্য উপাদানের থেকে এমন এক বিশেষ উপাদানে রূপ নিয়েছিল যা দেখা যায় প্রায় একশত বছরের বনি উমাইয়াদের অন্ধকারময় ও ইসলাম বিরোধী শাসনামলও দ্বীনের আসল ভিত্তি প্রস্তরকে ধ্বংস করতে পারেনি। যদিও বনি উমাইয়ারা অনেক চেষ্টা করেছিল ইসলামী উম্মাহ্কে জাহেলিয়াতের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য আর বাহ্যিকভাবে তারা তাদের উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু এই সব মহান ইমামগণের প্রচেষ্টায় বিশেষ করে উত্তম শিক্ষা-দীক্ষায় ছাত্র তৈরী ও তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ ও সমাজের মানুষের মাঝে প্রকৃত ইসলামের (উমাইয়াদের তৈরী ইসলাম নয়) পরিচিতি তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাদের সূক্ষ্মদর্শিতার কারণেই উমাইয়ারা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর রাস্তায় বড় ধরণের বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং শত্রুরা তাদের আসল উদ্দেশ্য ইসলামকে ধ্বংস করার ব্যাপারে ব্যর্থ হয়।

অবশেষে উমাইয়াদের জঘন্য ও কলুষিত রাজনীতির অবসান ঘটলে বনি আব্বাসীয়রা তাদের জায়গা দখল করে। বনি আব্বাসীয়রা হচ্ছে আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিবের বংশধর। সে ছিল নবী (সা.) এর চাচা। আগেই বলা হয়েছে তারা শুরুতে কারবালার শহীদের রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য ও উমাইয়াদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নিমিত্তে মানুষদেরকে তাদের পাশে একত্রিত করেছিল এবং বিশেষ করে ইরানীদের আলী (আ.) এর উপর ভক্তি শ্রদ্ধা থাকার কারণে তাদের কাছ থেকে সুবিধা অর্জন করতে চেয়েছিল। তারা বলেছিল যে, উমাইয়াদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে আমরা (আব্বাসীয়রা) এমন কারোর হাতে তা হস্তান্তর করবো যে তার উপযুক্ততা

রাখে। ফলে আব্বাসীয়রা তাদের পাশে আহলে বাইতদের বিপুল সংখ্যক অনুসারীদের সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হয় এবং বনি উমাইয়াদের ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে সক্ষম হয়। বনি আব্বাসীয়রা আল্লাহ্‌র কাছে ও জনগণের কাছে করা তাদের ওয়াদা লংঘন করে সেই সময়কার ইমাম জাফর সাদেকেকে বাদ দিয়ে আব্বাসীয়রা নিজেরাই ক্ষমতা দখল করে এবং আহলে বাইতদেরকেই তাদের ঘোষিত শত্রু হিসাবে গণ্য করে।

বনি আব্বাসীয়রা ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে চলেও বাহ্যিকভাবে ভান করতো যে, তারা ইসলামী আদর্শ মেনেই চলেছে। আর এভাবে তারা নিজেদেরকে নবী (সা.) এর সত্যিকার উত্তরসূরী ও ইসলামের খেলাফতের উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচয় দিতো। আর যেহেতু তারা নিজেরা অন্যদের থেকে খুব ভাল করেই জানত যে তারা এ মর্যাদার অধিকারী নয়। তাই তারা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ইমাম জাফর সাদেক নবী বংশ ও তাদের অনুসারীদের চাপের মধ্যে রাখে। আর মুনাফিকের মত সর্বব্যাপী বাহ্যিকভাবে নিজেকে নায়েবে রাসূল ওসিয়ে রাসূল হিসাবে পরিচয় দেয়। মানসুর আরাফাতের দিনে তার এক খোতবাতে বলে: হে লোক সকল। এককভাবে আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই জমিনের বুকে তোমাদের বাদশাহ ও তার করুণায় তোমাদের প্রতিটি বিষয়কে তত্ত্বাবধান করব। আমি আল্লাহ্‌র হিসাব রক্ষক এবং তাঁর কোষাগারের দায়িত্ব আমার হাতে। তার পছন্দমত কার্য সম্পাদন ও তাঁর ইচ্ছামত বিলি বণ্টন করব। তার অনুমতিতেই দান করব। আল্লাহ্‌তালা আমাকে তাঁর কোষাগারের তালা হিসাবে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। যখনই চান তখনই আমাকে উন্মুক্ত করেন যেন তোমাদেরকে দান করতে পারেন।

ঐ খোতবাতে খোরাসানের জনগণের উদ্দেশ্যে বলে: হে খোরাসানের লোক সকল। আল্লাহ্‌ আমাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও উত্তরাধিকার সূত্রে নবী (সা.) এর খেলাফতকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন আর আল্লাহ্‌ তার নূরকে দৃশ্যমান ও তাঁর পছন্দকারীদেরকে ভালবাসা দান ও অত্যাচারিদেরকে ধ্বংস করেছেন। মানছুর জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করে নিজেকে পবিত্র ব্যক্তি হিসাবে পরিচয় দিতে এবং তার আর আসল চেহারাটাকে যা বনি উমাইদের সাথে কোন রূপ পার্থক্য ছিল না, অর্থাৎ অপবিত্রতার, ধর্মহীনতা, মিথ্যাচার, কুরআনও হাদিসের অপব্যাখা ও মুনাফেকীতে ভরা ছিল তা এভাবে ঢেকে রাখতে চেয়েছিল । আর এভাবেই সে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) এর বাহ্যিক সম্মতি আদায় করার চিন্তা করলো, আর তা যদি হুমকি ধমকি ও ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমেও হয়। আর এটা যদি আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে মানুষের সামনে নিজের উপযুক্ততাকে তুলে ধরতে পারে। কিন্তু ইমাম জাফর সাদিক (আ.) তাকে কোন মতেই সমর্থন দিলেন না বরং নিজের তথা প্রকৃত ইসলাম ও মনছুরের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত ইসলামের স্বরূপ জনসমক্ষে তুলে ধরাই তার জীবনের মিশন হিসাবে গ্রহণ করলেন, পক্ষান্তরে মনসুর তার নিজস্ব চিন্তাধারা অনুযায়ী একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও ভাড়াটে আলেমদের (দিয়ে বিভিন্ন ফকিহ্‌) ধর্মমত মাযহাব তথা আহলে সুন্নত জামাত প্রভৃতি চিন্তাশীল শ্রেণী বা মতধারা সৃষ্টি করলো এবং এসব চিন্তানায়কদের পদ পদবী বস্তুবাদী লোভ, ঘুষ ও ক্ষেত্র বিশেষে বল প্রয়োগের মাধ্যমে তার নিজস্ব ব্যাখ্যা সম্বলিত কুরআন ও হাদিসের আলোকে ধর্মবিশ্বাস চালু করল যা বর্তমানে দ্বীন ইসলামী চিন্তাধারার একমাত্র বৈধ মূল ধারা হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো। আর সরকারী অনুমোদন ব্যতীত অন্যান্য সকল ধর্মীয় চিন্তাধারা, ধর্মত্যাগী, অগ্নি উপাসক, শিয়া ধর্মমত, রাফেজী ইত্যাদি অভিধায় গন্য করে এসবের প্রবক্তা ও অনুসারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হলো। এই ধারা অদ্যাবধি সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবেলার ব্যাপারে তাঁর অনুসারীরা তাঁর মতামত চাইলে তিনি ফিকাহ্‌ শাস্ত্র বিশারদদের বিষয়ে বলেন; ফিকাহ শাস্ত্রবিদরা নবী (সা.) আমিন (Custodian) স্বরূপ। যদি দেখ যে, তারা খলিফাদের পক্ষে আছে অর্থাৎ অত্যাচারীদের শক্তি বৃদ্ধিকারী ও সাহায্যকারী হয়েছে তাহলে তাদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে ও তাদের উপর কোন প্রকার বিশ্বাস রাখবে না।

মনসুর ইমামকে দেয়া তার চিঠিতে লিখে: কেন অন্যান্যদের মত তুমি আমার কাছে আসনা? ইমাম সে চিঠির জবাবে লিখেন: দুনিয়ার কাছে আমাদের চাওয়া পাওয়ার কিছু নাই যে, তার জন্য তোমার কাছে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবো। আর তোমার নিজেরও আখেরাত ও আধ্যাত্মিকতার কিছু নেই যার কারণে তোমার প্রতি আশান্বিত হবে বা তুমি এমন কোন নেয়ামতের মধ্যেও নও যে তার কারণে আসবো তোমাকে অভিনন্দন জানাতে বা তুমি নিজে বালা মুসিবতে পতিত হয়েছ এমনকি ভাবছো তাই দেখে আসবো তোমাকে সান্ত্বনা জানাতে তার কোনটাই না সুতরাং; কেন আসব তোমার কাছে? মনছুর লিখলো: এসো, এসে আমাদেরকে উপদেশ দাও। ইমাম লিখলেন "যে দুনিয়া পছন্দ করে সে তোমাকে উপদেশ দিবে না, আর যে আখেরাতকে পছন্দ করে সে তোমার কাছে আসবে না।

একদিন ইমাম জাফর সাদিক (আ.) মনছুরের দরবারে উপস্থিত ছিল। সেই সময় একটি (মাছি মনছুরকে জালাতন করছিল, যত বারই মুখ সরাচ্ছিল মাছিটি দূরে না

গিয়ে তার মুখে বসছিল। সে রাগান্তিত হয়ে ইমামকে প্রশ্ন করল, আল্লাহ্ কেন মাছিকে সৃষ্টি করেছেন? ইমাম সংশয়হীনভাবে জবাব দিলেন এ জন্য যে, প্রতিহিংসা পরায়ন অত্যাচারীদিগকে এই প্রক্রিয়ায় অপদস্থ ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন। এই কথা শোনার পর মনছুরের গলায় যেন কথা আটকে গেল। সে আর কোন কথা বলতে পারল না। চুপ করে বসে রইলো।

খলিফা মানসুরের নিয়োজিত মদীনার গভর্নরের সম্মুখে ইমাম সাদিক (আ)

আব্দুলাহ বিন সোলাইয়ামন তামিমি বলেন: যখন আব্দুলাহ্ বিন হাসান বিন হাসান (আ.) এর সন্তান মুহাম্মদ ও ইব্রাহীমকে আব্বাসীয় খলিফার নির্দেশে শহীদ করা হল, আব্বাসীয় খলিফা মানসুর সাইরাহ বিন গাফফাল নামে তার মতাদর্শের অনুসারী মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করল। সাইবাহ মদীনায় এলো এবং জুমার দিনে মদীনার মসজিদে মিম্বারে উঠে খোতবায় বলল: বস্তুত আলী বিন আবি তালিবই (আ.) মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টিকারী এবং ইমানদারদের সাথে যুদ্ধ করেছে। আর খেলাফতকে নিজের জন্য চেয়েছিল ও চেষ্টা করেছিল যে, প্রকৃত খেলাফতের অধিকারীদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করতে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছে। এখন তাঁর সন্তানরাও মতবিরোধ সৃষ্টি করার ও ক্ষমতা পাওয়ার চেষ্টায় আছে। যারা এর যোগ্যতা রাখে না। আর এ কারণেই বিভিন্ন জায়গায় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে তারা নিজেদের রক্ত ঝরায়। তার বক্তব্য জনগণের কাছে খুবই জঘন্য ও অগ্রণযোগ্য বিবোচিত ছিল কিন্তু আব্বাসীয় পুলিশের অত্যাচারের ভয়ে কেহ টুঁ শব্দটি করতে সাহসী হতো না। যা হোক, এ সময় পশমী পোশাক পরিহিত একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল: আমরা আল্লাহ্কে মেনে চলি ও মুহাম্মদকে সর্বশেষ নবী ও সমস্ত নবীদের সর্দার হিসাবে এবং অন্যান্য নবীদের উপর দরূদ পাঠ করি। কিন্তু তোমার বক্তব্যে ভাল কথা যেগুলো বলেছি তা আমাদের প্রাপ্য। আর খারাপ কথা যা বলেছো তুমিও মনছুর তার উপযুক্ত। তারপর উপস্থিত জনগণের দিকে বলল: তোমাদেরকে কী বলব যে, কে বা কারা ক্বিয়ামতের দিনে দুরবস্থায় থাকবে? সে এমন কেউ যে তার আখেরাতকে দুনিয়া পাওয়ার জন্য বিক্রি করে দেয়। আর পাপাচারী গভর্নর হচ্ছে তেমন ব্যক্তি। কারণ সে (গভর্নর) তার আখেরাতকে মানসুরের কাছে বিক্রি করেছে। উপস্থিত সবাই শান্ত হলো এবং গভর্নর কিছু না বলেই মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। ঐ সময় কাউকে জিজ্ঞাসা করলাম এই লোককে যে গভর্নকে এ রকমভাবে তিরস্কার করে কথা বলল? সে বলল: তিনি ছিলেন ইমাম জাফর বিন মুহাম্মদ সাদিক (আ.)।

রাসূল (সা.) এর বংশধর, হযরত আলী (আ.) এর সন্তান হিসাবে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) ছিলেন রাসূল (সা.) এর জ্ঞানের প্রতিনিধিত্বকারী মহান ব্যক্তিত্ব। এ কারণে তিনি ছিলেন আমাদের আধুনিক পরিভাষায় একই সাথে কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যাকারী মহান ধর্মীয় ইমাম, জাফরী আইন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। লেখক, দার্শনিক, চিকিৎসক, রসায়নবিদ, পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিদ, অংক শাস্ত্রবিদ, শরীতত্তবিদ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাঁর ছাত্রদের মধ্যে জাবির ইবন হায়ান (সবর) প্রখ্যাত রাসায়নবিদ যার লেখা ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং পান্ডুলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়াম, জার্মানীতে এখনও মজুদ আছে। ইমাম আবু হানিফা, মালিক ইবন আনাস দুই মাযহাবের ইমাম মুতাযিলাদের ইমাম ওয়াসিল ইবনে আতাও তার শিষ্য ছিলেন। মোট কথা জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা-প্রশাখা ছিল না যাতে তার পারদর্শিতা ছিলনা। পৃথিবীর সকল ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শিতা থাকায় হিন্দু ও খৃস্টান ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ ও তাঁর জ্ঞান থেকে উপকৃত হয়েছেন।

ইমাম সাদিক (অ) এর এই মহাজ্ঞান তিনি বিশ্ব দরবারে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উমাইয়া খেলাফতের শেষের দিকে ও আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম দিকে তিনি নিজের দ্বীনের ও জ্ঞানের আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেন। যা ছিল মদীনার আলেমদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এক বিশাল জ্ঞান আহরণ ক্ষেত্র। যেখান থেকে হাজার হাজার লোক তাদের পছন্দমত জ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গনে ও শাখায় তার কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করে। জ্ঞানের ব্যাপারে ইসলামী দেশগুলোতে তাঁর সুপরিচিতি এত অধিক পরিমাণে ছিল যা প্রতিটি লোকের মুখে মুখে। এ কারণে ইসলামী দেশগুলোর দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ মদীনায় তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত তাঁর অন্তহীন জ্ঞানের মহা সাগর থেকে সবাই লাভবান হতো। এমন কি প্রচুর পরিমাণে অমুসলিম গবেষকও জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তার কাছে আসতো ইসলামের বিভিন্ন মাযহাব ও বিভিন্ন আক্বিদা বা বিশ্বাসের লোকেরা তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে জবাব দেওয়া ইসলামী ইতিহাসের পাতায় সর্বপ্রথম নজীরবিহীন অতীব আকর্ষণীয় ঘটনা এটা সুস্পষ্ট যে, ইমামের দেয়া বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবগুলি স্থান, কাল, পাত্র ভেদে বা প্রশ্নকারীর ধারনা অনুযায়ী ছিল। আর তাই কিছু উত্তর আবার প্রশ্নকারীর দুরদর্শিতা ও চিন্তার ক্ষেত্রে ধারণা পাওয়ার জন্য। অবশ্য বেশির ভাগ প্রশ্নের জবাব জ্ঞান ও দর্শন ও ধর্ম ভিত্তিক ছিল। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, তার এই শিক্ষার প্রসারের কারণে রাজকীয় নীতিহীন ফকীহর বিপরীতে একদল প্রকৃত ন্যায়বান, সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী জ্ঞানী,

ফকীহ, চিন্তাবিদ দাঁড়িয়ে গেলেন যাদেরকে সকল জুলুমশাহী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা এক একটি ডিনামাইট, বম্ব বা বিপ্লব বিদ্রোহের প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্যে প্রধান ছিল প্রকৃত সুফি সম্প্রদায়। তারাই প্রকৃতপক্ষে পারস্য) ভারত, আফ্রিকা, মিশর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক ধর্ম ভিত্তিক আন্দোলনে সফলতা অর্জন করেন যে ধারা অদ্যাবধি বিদ্যমান। এই মহান ইমামের লেখনীসমূহ বা প্রশ্নের উত্তরসমূহ একত্র করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে ইমামের ধর্ম বিশ্বাসের সামান্য অংশ আমরা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করব।

আহলে বাইতদের প্রতি ভালবাসার শ্রেণী বিভাগ ও ইমামত মান্য করার গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম সাদিক (আ.)

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) এর নিকট এক ব্যক্তি এল। তিনি তাকে বললেন: লোকটি কাদের থেকে? উত্তরে সে বলল: আপনাদের মহব্বতকারীদের এবং অনুসরণকারীদের একজন। ইমাম (আ.) বললেন: আল্লাহ্ কোন বান্দাকে ভালবাসেন না যতক্ষণ না তাকে নিজের পক্ষে গ্রহণ করেন। আর তাকে নিজের পক্ষে গ্রহণ করে নেন না যতক্ষণ না তার জন্য বেহেশ্ত ওয়াজিব করেন। অতঃপর তাকে বললেন: তুমি আমাদের কোন মহব্বতকারী লোকটি চুপ হয়ে গেল এবং সাদির (তাঁর ইমামের সাহাবী) তাকে বললেন: হে রাসূলের পুত্র। আপনাদের মহব্বতকারীরা কয় শ্রেণীর? তিনি বললেন: তিন শ্রেণীর! এক শ্রেণী রয়েছে যারা আমাদেরকে প্রকাশ্যে ভালবাসে কিন্তু পেছনে ভালবাসে না। আরেক শ্রেণী আছে যারা আমাদের গোপনে ভালবাসে কিন্তু তবে প্রকাশ্যে আমাদের ভালবাসে না। আরেক শ্রেণী রয়েছে যারা প্রকাশ্যে ও গোপনে দুভাবেই আমাদের ভালবাসে। এরা হলো উৎকৃষ্ট শ্রেণী। তারা স্বচ্ছ সুপেয় পানি পান করেছে এবং কিতাবে (কুরআনের) তাবিল (ব্যাখা) এর জ্ঞান তারা জেনেছে, জেনেছে সম্বোধনের ভাষাও কারণসমূহের কারণ। তাই তারাই উৎকৃষ্ট শ্রেণী। অভাব ও দুর্দশা এবং বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ ঘোড়ার চেয়েও দ্রুততর তাদের দিকে ধাবমান।

কষ্ট ও অস্বচ্ছলতা তাদেরকে ঘিরে ধরে। তারা অস্থিতিশীল অবস্থা ও পরীক্ষার মধ্যে পড়ে। তাদের কেউ আহত ও কেউ নিহত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এরাই হলো তারা যাদের ওসীলায় আল্লাহ্ অসুস্থকে সুস্থতা দান করেন এবং নিঃস্বকে সামর্থ্যবান করে দেন। আর তাদের দ্বারাই তোমরা সাহায্য লাভ করে থাক এবং বৃষ্টিপ্রাপ্ত হও এবং রুজি ভক্ষণ করে থাক। তারা সংখ্যায় একেবারে কম এবং আল্লাহ্র নিকটে উচ্চতর মর্যাদার ও স্থানের অধিকারী। আর দ্বিতীয় শ্রেণীটি হলো নিম্নতর। তারা প্রকাশ্যে আমাদের ভালবাসে আর বাদশাহদের কায়দায় চলে। তাদের জিহ্বাসমূহ আমাদের সাথে আর তাদের তলোয়ারসমূহ আমাদের বিরুদ্ধে। আর যেন তৃতীয় শ্রেণীটি হলো মধ্যম, যারা অন্তর থেকে আমাদের ভালবাসে তবে প্রকাশ্যে আমাদের বন্ধুত্বকে প্রকাশ করে না। আমার প্রাণের কসম। যদি তারা প্রকৃতই আমাদের অন্তর দিয়ে ভালবাসত। এমনকি যদি তা প্রকাশও না করত তাহলে তারা দিনের বেলায় রোজা পালনকারী ও রাত জেগে ইবাদতকারী হতো। আর ইবাদতের চিহ্ন তাদের চেহারায় দেখতে পেতো। তারা শান্তিপ্রিয় ও আনুগত্যশীল হতো। লোকটি বলল: আমি আপনাদের গোপন ও প্রকাশ্য বন্ধু। ইমাম সাদিক (আ.) বললেন: আমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বন্ধুদের কিছু চিহ্ন রয়েছে যা দ্বারা তাদেরকে চেনা যায়। লোকটি বলল: সে চিহ্নগুলো কী? তিনি বললেন: সেগুলো হলো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যথা: প্রথমত সে একত্ববাদকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছে এবং তাওহীদকে ভাল মতো শিখতে পেরেছে। অতঃপর তাঁর সত্ত্বা ও তাঁর গুণের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করেছেন অতঃপর ইমান, তার হাকীকত, শর্তাদি এবং ব্যাখ্যা জেনেছে। সাদির বলল: হে রাসূলের পুত্র! আমি আপনাদের থেকে ইমানকে এই পুণ বিশেষণে বর্ণনা করতে শুনিনি। ঈমাম সাদিক (আ.) বলেন: হ্যাঁ হে সাদির, প্রশ্নকারীর প্রশ্ন করার অধিকার (নাই যে, ইমান কী যতক্ষণ না জানতে পারে যে, ইমান কার প্রতি। সাদির বলল: হে রাসূলের পুত্র! যা বললেন তার একটু ব্যাখ্যা দিন। ইমাম সাদিক (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ্কে তার মনে ধারনা ও কল্পনা ছাড়া চিনতে পেরেছে, সে হলো মুশরিক। আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ্কে অর্থ বিনা নামে চেনে। সে নিজেই নিজের কথার অসারতাকে স্বীকার করল। কেননা নিছক নাম হলো সৃষ্টিগত অর্থাৎ সৃষ্ট বিষয়।

আর যে ব্যক্তি মনে করে নাম ও অর্থকে এক সাথে উপাসনা করে, সে আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করল আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে অর্থকে উপলব্ধি দ্বারা না, বরং গুণ ও বিশেষণ দ্বারা উপাসনা করে সে অদৃশ্যের প্রতি নির্ভর করেছে। আর যে ব্যক্তি মনে করে, যে গুণ ও গুণান্বিত উভয়েরই উপাসনা করে, সে একত্ববাদকে বিনষ্ট করেছে। কারণ গুণ হলো গুণান্বিত থেকে ভিন্ন। আর যে ব্যক্তি মনে করে যে গুণান্বিতকে গুণের সাথে সংযুক্ত করেছে, সে বড়কে ছোট করেছে এবং আল্লাহ্কে যথাযথ মর্যাদা দেয় নি। তাকে বলা হলো। তাহলে একত্ববাদের পথ কিরুপ? উত্তরে তিনি বলেন: অনুসন্ধানের পথ খোলা রয়েছে এবং উপায় বের করার পথ তৈরি রয়েছে। নিশ্চয় যে জিনিস প্রকাশ্যে রয়েছে প্রথমে সেটাই চেনা হয় এবং তারপর তার গুণকে আর অদৃশ্যের গুণ

চেনাটা তার স্বীয় সত্তার চেয়ে অগ্রগামী। তাকে বলা হলো: কিভাবে প্রকাশ্যে জিনিসের চেনাটা তার গুণের চেয়ে অগ্রবর্তী? তিনি বললেন: তুমি তাকে চেন এবং তাকে জান আর নিজকেও তার দ্বারা চেন। নিজকে নিজের মাধ্যমে এবং নিজের থেকে চিন বরং তাঁর মাধ্যমে চিন।

তুমি জান যে, তোমায় কিছু রয়েছে তা তাঁরই থেকে এবং তাঁরই মাধ্যমে। যেমনভাবে ইউসুফের ভায়েরা বলল সত্যিই কি তুমি ইউসুফ? ইউসুফ বলল: আমি ইউসুফ আর এ হলো আমার ভাই "(সূরা ইউসুফ : ৯০)। তারা স্বয়ং তাকে দিয়েই তাকে চিনতে পারল অন্যকে দিয়ে তাকে চিনেনি। আর নিজেদের ধারনা ও কল্পনা থেকে তাঁকে ভাবতে পারেনি। দেখ না যে আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের কাজ নয় বৃক্ষাদি জন্মানো। (সূরা নমল : ৬০)। ইমাম বলেন, (এর বাতেনী অর্থ) তোমাদের অধিকার নাই নিজের থেকে কোন ইমাম নিযুক্ত করবে এবং তাকে তোমাদের ইচ্ছাও মনের খাহেসের বসে সত্য ইমাম বলে আখ্যায়িত করবে। অতঃপর ইমাম সাদিক (আ.) বললেন তিন ব্যক্তি রয়েছে যাদের সাথে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। যে ব্যক্তি কোন বৃক্ষ জন্মাবে যা আল্লাহ্ জন্মান নি অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ইমাম নিযুক্ত করে যাকে আল্লাহ্ নিযুক্ত করেন নি। কিংবা কোন ইমামকে অস্বীকার করবে যাকে আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন? আর যে মনে করবে এ দু'জনের নিজের থেকে ইমাম নিযুক্তকারী ও সত্য ইমামকে অস্বীকারকারী ইসলাম কোন অংশ আছে? যখন আল্লাহ্ বলেছেন-আর তোমার প্রতিপালক যা চান সৃষ্টি করেন স্বয়ং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। কিন্তু তাদের কোন এখতেয়ার (মনোনয়নের অধিকার) নেই।" (সূরা কাসাস : ৬৮)।

সুফিবাদের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে ঈমাম সাদিক (আ.)

প্রখ্যাত সুফি সাধক সুফিয়ান সাওরী ইমাম সাদিকের (আ.) নিকট উপস্থিত হলেন এবং ইমামের গায়ে সাদা পরিচ্ছদ দেখতে পেলেন যেন ডিমের সাদা অংশের উপরস্থ ক্ষীনকায় আবরন তিনি। ইমাম (আ.) কে বললেন: নিশ্চয় এটা আপনাদের পোশাক নয় তখন ইমাম উত্তরে বলরেন: আমার কথা শুনে নাও এবং তা মনের মধ্যে গেঁথে ফেল যা তোমাকে বলি। তা হলো সুন্নত ও সত্যের উপরে মৃত্যুবরণ কর এবং বেদআত ও অসত্য বিশ্বাসসহ মৃত্যুবরণ না কর, তাহলে সেটা তোমার জন্য মঙ্গলকর। আমি তোমাকে খবর দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দুরবস্থা ও সংকটের সময়ে ছিলেন। আর যখন দুনিয়া অনুকুল হল তখন এসব নেয়ামত ব্যবহার করার যোগ্যতর হলেন সৎকর্মপরায়নরা, কুকর্মকারীরা নয় এবং মুমিনরা, মুনাফিকরা নয় এবং আর মুসলমানরা কাফেররা নয়। হে সাওরী। অস্বীকার করছ কেন? আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয় আমি এই অবস্থায় যা তুমি দেখছ। যেদিন থেকে আমি বুদ্ধিসম্পন্ন হয়েছি সেদিন থেকে কোন সকাল বা সন্ধ্যা অতিবাহিত হয়নি এমনভাবে যে, আমার সম্পদে কোন অধিকার নির্ধারিত থাকবে যা আল্লাহ্ আমাকে যথাযোগ্য প্রাপকের কাছে পরিশোধ করতে নির্দেশ প্রদান করে থাকবেন আর আমি তা পরিশোধ না করব।

বর্ণনাকারী বলেন: তখন এমন একদল পরহেজগারিতা প্রদর্শনকারী (এক শ্রেণীর সুফি) লোক তাঁর নিকটে আসলো যারা সবাইকে তাদের নিজেদের মতো হওয়ার আহ্বান জানাত এবং তাদের পন্থায় পরিচ্ছিন্নতা ও আনন্দ ফুর্তি এবং আল্লাহ্র নেয়ামত ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকত। তারা বলল: আসলে আমাদের এ বন্ধু আপনার কথা থেকে মনে কষ্ট পেয়েছে তার জিহ্বা আটকে গেছে এবং তার দৃষ্টিতে কোন প্রমাণই চোখে পড়ে নি। ইমাম তাদের চেয়ে বললেন: তোমরা তোমাদের যুক্তি প্রমানসমূহ আনয়ন কর তোমাদের প্রমাণ অন্যকিছুর চেয়ে যা অনুসরণ ও আমলের জন্য অধিকতর উপর্যুক্ত। তারা বলল: মহান আলাহ্ নবী (সা.) এর একদল সঙ্গীর কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফল (সূরা হাশর: ৯)।

অন্যত্র বলেন: খাবারে তাদের আসক্তি সত্ত্বেও মিসকিন ও ইয়াতীম এবং বন্দিকে তারা আহার দান করে (সূরা দাহর : ৮)। আমরা এ দুটি আয়াত দ্বারাই যথেষ্ট মনে করছি। বৈঠকে উপস্থিতদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাদেরকে বলল: আমরা তোমাদেরকে দেখিনি তো উত্তম খাবার পরিহার কর। অথচ লোকদেরকে নির্দেশ দিয়ে থাক তা পরিহার করতে যাতে তারা নিজেদের সম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নেয় আর তোমরা তা ব্যবহার কর।

ইমাম সাদিক (আ.) বললেন: যাতে কোন লাভ নেই তা বর্জন কর এবং তোমরা সবাই আমাকে বল দেখি, কুরআনের নাসেখ (বিধান রহিতকারী) ও মানসুখ (রহিত) এবং মুহকাম (স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন) ও মুতাশাবাহকে (রূপক বা একাধিক অর্থবাহী আয়াত) কি তোমরা জান? কেন না যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়েছে সে এখান থেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর উম্মতের মধ্যে সে ধ্বংস হয়েছে সে এই পথেই হয়েছে।

ইমামের উত্তরে তারা বলল: কিছু কিছু জানি, সবগুলো জানি না। ইমাম বললেন এই অজ্ঞতায় তোমরা আক্রান্ত হয়েছো। রাসূল (সা.) এর হাদিস সমূহের বেলায়ও একই কথা। আর এই যে উল্লেখ করা হলো। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে এমন একদল লোক সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন যাঁদেরকে তাদের নিজেদের সম্পদ অন্যদেরকে দান করার জন্য প্রশংসা করেছেন। সেদিন এই কাজ তাদের জন্য মোবাহ এবং জায়েয ছিল। তাঁদের জন্য নিষেধ ছিল না এবং তাদের সওয়াব আল্লাহ্র নিকট রয়েছে। কিন্তু মহাপবিত্র আল্লাহ্ তারা যা করেছেন তার বিপরীতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র এ নির্দেশ তাদের কাজকে নাসখ (রহিত) করেছে। মহান আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে এবং তাদের মঙ্গল কামনার্থে তাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন যাতে তাদের নিজের ও পরিজনদের ক্ষতির কারণ না হয়। যাদের অক্ষম। শিশু সন্তান এবং অচলবৃদ্ধও বয়োবৃদ্ধা পরিজন রয়েছে। যারা ক্ষুধায় ধৈর্য্যধারণ করতে সক্ষম নয়। আর আমার যদি একখানা রুটি থাকে এবং আর কোন রুটি না থাকে এমতাবস্থায় উক্ত রুটিখানা সাদাকা প্রদান করি তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ক্ষুধায় মারা যাবে। আর এ কারণে রাসূল (সা.) বলেন : যে লোকের কিছু খোরমা কিংবা পাঁচটি রুটি কিংবা কিছু দিনার বা দিরহাম রয়েছে এবং সেটা উত্তম কাজে ব্যয় করতে চায় তার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট হলো নিজের পিতামাতার জন্য ব্যয় করা। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজের জন্য এবং নিজের পরিবারের জন্য ব্যয় করা। আর তৃতীয় পর্যায়ে তার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এবং তার মুমিন ভাইদের জন্য ব্যয় করা। আর চতুর্থ পর্যায়ে তার দুঃস্থ প্রতিবেশীদের জন্য এবং পঞ্চম পর্যায়ে অল্লাহ্র পথে ও জিহাদের জন্য খরচ করা যার প্রতিদান সবচেয়ে কম।

রাসূল (সা.) এর একজন আনসার যে মৃত্যুর সময় নিজের পাঁচ অথবা ছয়জন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছিল এবং এছাড়া তার আর কিছুই ছিল না এবং শিশু সন্তানদের রেখে গিয়েছিল, তার সম্পর্কে বলেন: যদি তার এ কাজ আমাকে অবগত করতে তাহলে আমি তাকে মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করতে দিতাম না। সে কয়েকটি শিশু সন্তান রেখে গেছে যাতে তারা জনগণের কাছে ভিক্ষা করে বেড়ায়। অতঃপর বলেন: আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুলাহ্ (সা.) বলেন: খরচ আরম্ভ কর যে তোমার ভরন পোষণাধীন তার থেকে ক্রমধারা তোমার নিকটবর্তী হতে নিকটবর্তীর জন্য। এছাড়াও তোমাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য কুরআন হলো যথেষ্ট যাতে মহিমান্বিত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ আবশ্যিকরূপে তা নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে: তারা যখন দান করে তখন অপচয় করেনা আবার কৃপণতা করেনা এবং এ দুয়ের মাঝে প্রতিষ্ঠিত থাকে। (সূরা ফুরকান-৬৭)। তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, মহান আল্লাহ্ ভর্ৎসনা করেছেন সেই কাজের যার প্রতি তোমরা আহ্বান করে থাক এবং অপচয়কারীদের। আর আল্লাহ্র কিতাবের কয়েকটি আয়াতে তিনি বলেন: নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আনআম: ১৪১ ও সূরা আরাফ: ৩১)। সুতরাং তিনি তাদের অপচয়ে নিষেধ করেছেন তাদের এবং তাদেরকে কৃপনতা করতে নিষেধ করেছেন। তবে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এ দুয়ের মাঝে থাকার জন্য।

তার কাছে যা আছে সবটুকুই যেন দান করে না দেয় যে, তারপর আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে তাকে রুজি প্রদানের জন্য আর তার প্রার্থনা গ্রহণ করা হবে না সেই হাদীসের কারণে যা নবী থেকে এসেছে: আমার উম্মতের মধ্যে কয়েকটি দলের দোয়া গ্রহণ করা হবে না: যে লোক তার বাবা মায়ের উপরে অভিশাপ দেয়, যে ব্যক্তি তার সেই পাওনাদারের অভিশাপ দেয় যার পাওনা টাকা সে না দেওয়ার নিয়তে বা বিলাসিতার পথে খরচ করে ফেলেছে। অথচ কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করেনি; যে লোক স্বীয় স্ত্রীর প্রতি অভিশাপ দেয়, অথচ আল্লাহ্ তাকে তালাক দেওয়ার এখতিয়ার তাকে দিয়েছেন, যে লোক নিজ গৃহে বসে থাকে এবং বলে: হে প্রতিপালক! আমাকে রুজি দান কর। তবে রুজির সন্ধানে বের হয় না। তখন মহামহিম আল্লাহ্ তাকে বলেন: আমি কি তোমার জন্য রুজি অন্বেষণের এবং সুস্থ শরীরে ভ্রমণের বের হওয়ার পথ খুলে দেই নি? রুজি অন্বেষণের নির্দেশ পালনের ব্যর্থতার কারণ দেখিয়ে তোমাকে তোমার ও আমার মাঝে অজুহাত আনতে হবে যাতে তোমার পরিজনদের স্কন্ধে বোঝা না হও তবেই আমি যদি চাই তাহলে তোমাকে রুজি দান করব। আর যদি চাই তাহলে তোমার রুজি সংকীর্ণ করে দেব। আর এ শর্তেই তুমি আমার নিকট ক্ষমার পাত্র। আর যে লোককে আল্লাহ্ অনেক সম্পদ দেন এবং সে সবটাই দান করে দেয় এবং খরচ করে। অতঃপর আল্লাহ্র দরবারের অভিমুখী হয়ে প্রার্থনা করে: হে প্রতিপালক। আমাকে রুজি দান কর। তখন আল্লাহ্ বলবেন: আমি কি তোমাকে অনেক রুজি দিই নি। কেন সে ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেনি যেমনটি তোমাকে বলেছি। আর কেন অপচয় করেছ। অথচ তা তোমাকে নিষেধ করেছি। আর সর্বশেষ যে ব্যক্তির দোয়া গৃহীত হয়না সে হলো ঐ লোক যে আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের জন্য দোয়া করে।

অতঃপর আল্লাহ্ তার প্রিয় নবী (সা.) কে শিখিয়ে দিয়েছেন। কিভাবে দান করতে হয়। আর এটা এ জন্য যে, তাঁর কাছে এক পোটলা স্বর্ণ ছিল এবং তিনি চাননি রাত্রে তা তার নিকটে থাকুক। তিনি তার সবটুকু সাদাকা প্রদান করেন। সকালে তার কাছে কিছুই ছিল না। এ সময়ে একজন ভিক্ষুক তাঁর কাছে এল। কিন্তু তাকে দেওয়ার মতো

কিছুই ছিল না। তখন ভিক্ষুক তাকে ভর্ৎসনা করে। এতে তিনি দুঃখিত হলেন যে, কিছু নেই যা তাকে দিতে পারেন। তিনি ছিলেন দয়াশীল ও আন্তরিক। আল্লাহ্ স্বীয় নবীকে এ ক্ষেত্রে সঠিকপন্থা শিক্ষা দিলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বললেন: কৃপনতাবশত তোমার হাতকে গলায় বেঁধে রেখনা আবার দানের জন্য একেবারে খুলেও দিও না। তাহলে নিঃস্ব হয়ে পড়বে এবং তিরস্কৃত হবে। (সূরা বনি ইসরাইল : ২১), তিনি বলেন, কখনও কখনও লোকেরা তোমার কাছে সাহায্য চায় কিন্তু তারা তোমার না দেওয়ার অজুহাতকে মেনে নেয় না। এ কারণে তুমি যদি তোমার সবকিছু অন্যদের দান কর তাহলে তুমি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী-কুরআন যেগুলোকে সত্যায়ন করে। আর কুরআনকে সকল মুমিন সত্য ও সঠিক বলে জানে।

আবু বকরকে তাঁর মৃত্যুর সময়ে যখন বলা হলো। অসিয়ত করুন। তখন বললেন: আমার এক পঞ্চমাংশ সম্পদে অসিয়ত করব আর এক পঞ্চমাংশ সম্পদও অনেক। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ এক পঞ্চমাংশে সন্তুষ্ট হয়েছেন। অতঃপর তিনি এক পশ্চমাংশ অসিয়ত করলেন। অথচ মহান আল্লাহ্ এক তৃতীয়ংশ পর্যন্ত মৃত্যুর সময় তার ক্ষমতায় প্রদান করেছিলেন। আর যদি জানতেন যে, এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করা তার জন্য উত্তম ছিল তাহলে সেভাবেই অসিয়ত করতেন। অতঃপর রাসূল (সা.) এর পরে যাঁদের মর্যাদা ও সংযমশীলতা তোমরা জান তা হলেন সালমান এবং আবুযর। সালমান (রা.) যখন বায়তুল মাল হতে তার প্রাপ্য গ্রহণ করতেন তখন পরবর্তী এক বছরের প্রয়োজনের সমান গ্রহণ করতেন। তাকে বলা হলো: হে আবা আবদিলাহ। আপনি এত পরহেযগার হয়েও এরূপ করেন। অথচ আজ কিংবা কাল মারা যেতে পারেন? তার উত্তর ছিল এটা যে, কেন তোমরা যতটা আমার মৃত্যুর জন্য চিন্তিত, ততটা আমার বেঁচে থাকার প্রতি আশা রাখ না? হে অজ্ঞদল। তোমরা জাননা যে যখন মানুষের জীবিকার সংস্থান থাকে না তখন তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। আর যখন জীবিকার সংস্থান থাকে তখন শান্ত হয়ে যায়। আর আবু যারের ছিল কয়েকটি উস্ট্রি এবং কয়েকটি দুম্বা তিনি সেগুলোর দুধ দোহন করতেন। আর যখন তাঁর পরিবার গোশ্ত ভক্ষণের আগ্রহ প্রকাশ করত কিংবা বাড়িতে অতিথি আসত তখন তা থেকে জবেহ করতেন। আর যদি দেখতেন সে ভূমিতে সেগুলো চরত সেখানকার বাসিন্দাদের প্রচন্ড প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে একটা উট কিংবা দুম্বা তাদের জন্য জবাই করতেন। সেই পরিমাণ যাতে গোশতের দিক থেকে তাদেরকে তুষ্ট করতে পারেন। সেই গোশত তাদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন এবং তাদের একজনের অংশের পরিমাণ গোশত নিজের জন্য রাখতেন। তাদের চেয়ে বেশী নিতেন না। কে আছে এদের চেয়ে পরহেযগার হবে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের সম্পর্কে বলেছেন। অবশ্য তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, কিছুই আর থাকবেনা। তোমরা (সুফিরা) নির্দেশ দিয়ে থাক যেন নিজের সমুদয় পণ্য ও দ্রব্যাদি দান করে দেয়। আর অন্যদেরকে নিজের উপরে এবং নিজের পরিবার পরিজনদের উপরে অগ্রগন্য করে। হে লোক সকল! জেনে রেখ। আমি শুনেছি আমার পিতা তাঁর পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) একদিন বলেন: আমি মুমিন ব্যক্তির থেকে আশ্চার্যন্বিত হওয়ার মতো আর কিছুতেই আশ্চান্বিত হইনি। যদি তার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে কাঁচি দিয়ে তার শরীরকে টুকরো টুকরো করে তাহলে সেটা তার জন্য মঙ্গল। আবার যদি পূর্বে থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৃথিবীর সবকিছুর মালিক হয় তাহলে সেটাও তার জন্য মঙ্গলকর।

জানিনা, যা কিছু আজ আমি তোমাদের বললাম তা তোমাদের উপর প্রভাব ফেলেছে নাকি তোমাদের জন্য আরো বলব। তোমরা কি জান না যে, মহামহিম আল্লাহ্ শুরুতে একজন মুমিনের উপর ধার্য করেন যে, দশজন মুশরিকের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তাদের সামনে থেকে পলায়ন করবে না। আর যে কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত সে দোজখে যেত। অতঃপর তাদের উপর অনুগ্রহবশত তাদের নিজের অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং কর্তব্য এটা স্থির হয় যে, একজন মুসলমান দুজন মুশরিকের সাথে যুদ্ধ করবে। আর এটা ছিল সেই অনুকম্পা যা মহামহিম আল্লাহ্ মুমিনদের প্রদান করেন এবং দুজন দশজনের বরাবরের হুকুম রহিত করেন। আমাকে আরো বল দেখি, যখন বিচারক তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাউকে তার স্ত্রীর ভরণ পোষণ দান করার নির্দেশ দেন তখন যদি সে বলে: যেহেতু আমি সন্ন্যাসী ও দুনিয়ায় বিমুখ এবং আমার কোন উপার্জন নেই, সেহেতু আমার পক্ষে স্ত্রীর ভরণ পোষণের অর্থ দেওয়া সম্ভব নয়।

এ ক্ষেত্রে বিচারক যদি তার এ অজুহাত মেনে না নেন, তবে কি বিচারক ঐ ব্যক্তির উপর জুলুম করেছেন? যদি তোমরা বল যে, তিনি তার উপর জুলুম করেছেন, তবে তুমি ইসলামের অনুসারী অর্থাৎ মুসলিম নারীদের প্রতি জুলুম করলে। আর যদি বল ন্যায় ও সঠিক কাজ করেছেন তাহলে তোমরা নিজেদেরকেই অভিযুক্ত করলে। আর অপর যে বিষয়টি চিন্তা করা উচিত তাহলো এই যে, কিভাবে তোমরা ঐ ব্যক্তির অসিয়তও প্রত্যাখ্যান কর যে তার মৃত্যুর সময় স্বীয় সম্পদের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী নিঃস্ব লোকদের জন্য সদাকা প্রদান করে? তবে আমাকে বল দেখি, যদি তোমরা যেমনটা চাও সকল মানুষ দুনিয়াত্যাগী হয় এবং অন্যের পণ্য দ্রব্যের প্রতি কোন প্রয়োজনই অনুভব যা করে। তাহলে উট, দুম্বা গরু এবং অন্যান্য, যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য,

খোরমা, কিসমিশসহ যা কিছুর যাকাত রয়েছে সেগুলোর ওয়াজিব যাকাতের সাদাকা এবং কসম ও মানতের কাফযারা সমূহ কাকে প্রদান করা হবে? বাস্তব অবস্থা যদি সেরূপই হয় যেমনটা তোমরা বলে থাক তবে কারোরই উচিত নয় দুনিয়ার কোন পণ্য জমা করা। এমন কি যদি তার সেটার প্রতি অতীব প্রয়োজনও থাকে; বরং তার জন্য উপযুক্ত হলো যা কিছুই তার হাতে আসবে সত্বর তা প্রদান করা। কতই না মন্দ এ বিশ্বাস যার প্রতি তোমরা ঝুঁকেছ আর লোকজনকে সেদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছ। আল্লাহ্ কি তার এবং তাঁর নবীর সেই সুন্নতের প্রতি অজ্ঞতার বশে যে সুন্নতকে নাযিলকৃত কি তার সমর্থন করে থাকে। অথবা তোমরা মুর্খতাবশত সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান কর আর কুরআনের অপরিচিত বিষয়াদিতে মনোনিবেশ করে নাসেখ-মানসুখ এবং মুহকাম ও মুতাশাবিহসহ এর ব্যাখ্যাকে তোমরা বর্জন করেছ।

আমাকে বল দেখি সুলায়মান ইবনে দাউদ (আ.) সম্পর্কে যিনি আল্লাহ্র নিকট থেকে এমন রাজ্য সম্পর্কে প্রার্থনা করেন যা তার পরে আর কারো জন্য সমীচীন নয়। মহামহিম আল্লাহ্ তাঁকে তা দান করেন। আর তিনি ন্যায় বলতেন এবং ন্যয়ত করতেন। অথচ আমরা কোথায়ও দেখিনি যে, আল্লাহ্ এ কারণে তাকে ভর্ৎসনা করেছেন, আর না কোন মুমিন কেও। আর দাউদ (আ.) তার পূর্বে শক্তিশালী রাজত্বের অধিকারী ছিলেন। আর তারপর নবী ইউসুফ (আ.) যিনি মিশরের বাদশাহ্কে বলেন: আমাকে এ দেশের কোষাগারের দায়িত্ব দান করুন। কারণ আমি রক্ষক ও জ্ঞানী। (সূরা ইউসুফ : ৫৫) তাঁর অবস্থা এ পর্যায়ে উপনীত হলো যে, তিনি মিশর ও তার চার পাশের অঞ্চলসহ ইয়েমেন পর্যন্ত ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব হাতে নেন এবং এতদঅঞ্চলের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করার জন্য তার নিকট থেকেই খাদ্য নিত। আর তিনি ন্যায় বলতেন এবং ন্যায়ত কাজ করতেন। অথচ কাউকে দেখিনি এজন্য তাঁকে দোষারোপ করবে। এরপর যুলকারনাইন ছিলেন একজন বান্দা। যিনি আল্লাহ্কে ভালবাসতেন আর আল্লাহ্ও তাকে ভালবাসতেন এবং তাঁর জন্য উপকরণ যোগাড় করে দিলেন ও পৃথিবীর প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য তাঁর অধীন করলেন। আর তিনিও ন্যায় বলেছেন এবং ন্যায়তঃ কাজ করেছেন। তারপর কাউকে দেখিনি এ জন্য তাকে দোষারোপ করবে।

অতএব, আল্লাহ্র শিষ্টাচারে দীক্ষিত হও হে জনগোষ্ঠী। যা তিনি মুমিনদের দিয়েছেন। আর ঐ আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধেই ক্ষান্ত থাক এবং যা কিছু তোমাদের জন্য ভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে এবং তোমরা জান না, তা নিজেদের থেকে ঝেড়ে ফেল। আর জ্ঞানকে জ্ঞানীর কাছে সোপর্দ কর যাতে প্রতিদান লাভ কর এবং ক্ষমার পাত্র হও মহামহিম আল্লাহ্র নিকটে। আর কুরআনের নাসেখ-মানসুখ এবং মুহকাম ও মুতাশারিহ এর জ্ঞান অন্বেষণের চেষ্টায় থাক এবং আল্লাহ্ কৃত হালাল ও হারামকে অনুধাবন ও চিহ্নিত কর। কেননা এটা তোমাদের আল্লাহ্র নিকটতর করবে এবং অজ্ঞতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। অজ্ঞতাকে তার অধিকারীর কাছে সোপর্দ কর। কারণ অজ্ঞতার অধিকারীরা অনেক। আর জ্ঞানের অধিকারীরা কম। যদিও মহান আল্লাহ্ বলেছেন: প্রত্যেক জ্ঞানের অধিকারীর উপরে রয়েছে আরো অধিক জ্ঞানী।

ইমাম জাফর সাদিকের (আ.) কেরামত

হযরত যায়েদ (আ.)কে শহীদ করে শুলীতে চড়ানো হয় তখন শাসনকর্তা আব্বাস কালবী এ মর্মে দুলাইন কবিতা আবৃত্তি করল। আমরা যায়েদকে খর্জুর বৃক্ষের কান্ডে ফাঁসি দিয়েছি। আমি কখনও সৎপথপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শুলীতে চড়তে দেখিনি। তোমরা মুর্খতাবশত আলীকে উসমানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। অথচ ওসমান আলী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ছিল।" বিষয়টি জাফর সাদিক (আ.) এর কর্ণ গোচর হলে তিনি বিচারের জন্য আল্লাহ্র দরবারে হাত তুলে বললেন; আল্লাহ্ তোমার বান্দা বাস্তবে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর তোমার কোন কুফর চাপিয়ে দাও। কথিত আছে আব্বাস কলবীকে বনী উমাইয়া কুফা পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সে পথিমধ্যে বাঘের করলে প্রাণ হারায়। এ সংবাদ হযরত জাফর সাদেক পেয়ে সেজদায় নত হয়ে যান এবং বলেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্। যিনি আমাদের ওয়াদা পূরণ করেছেন।

জনৈক বর্ণনাকারী বলেন: একদিন আমি অনেক মানুষের সাথে হযরত জাফর সাদিকের (আ.) খেদমতে হাজির ছিলাম। তিনি বললেন: আল্লাহ্পাক ইব্রাহীম (আ.) কে আদেশ করলেন। চারটি পাখি ধর। অতঃপর এগুলোকে নিজের দিকে ডাক। তখন এসব পাখি কি একই প্রজাতির ছিল না বিভিন্ন প্রজাতির? তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে তেমনি করে দেখাব। আমরা বললাম হ্যাঁ দেখান। তিনি বললেন: হে ময়ুর এদিকে এস। তৎক্ষণাৎ একটি ময়ুর এসে হাজির হল। অতঃপর বললেন: হে কাক এদিকে এস। অমনি একটি কাক এসে গেল। তিনি বললেন: হে বাজ এদিকে এস। অমনি একটি বাজ এসে গেল। তিনি বললেন হে কবুতর এদিকে এস, তৎক্ষনাৎ কবুতর এসে গেল। পাখি চতুষ্টয় এসে গেলে তিনি বললেন: এদেরকে যবেহ করে খণ্ড বিখণ্ড কর এবং একটির গোশত অন্যটির মধ্যে মিশ্রিত করে দাও কিন্তু প্রত্যেকটির শির সমতলে রাখবে। এরপর জাফর সাদেক (আ.) ময়ুরের শির ধরে বললেন: হে ময়ুর। এ কথা বলার সাথে সাথে আমরা দেখলাম যে তার অস্থি, পাখা এবং মাংস শিরের সাথে সংযুক্ত

হয়ে গেছে এবং সে একটি আস্ত ময়ুরে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে অপর তিন পাখির বেলায়ও তিনি তাই করলেন এবং তারাও জীবিত হয়ে গেল।

জালেম খলিফা মানসুর আব্বাসী তার এক কর্মকর্তাকে আদেশ দিলো: জাফর ইবনে মোহাম্মদকে (আ.) আমার দরবারে হাজির কর। সে মতে তাকে হাজির করা হলে মানসুর বলল: আপনি অনর্থ ও গোলযোগ সৃষ্টি করে মুসলমানদের মধ্যে রক্তের খেলা দেখতে চান? এ পথ থেকে বিরত হন। অন্যথায় আমি শপথ করে বলছি, আপনি বিষাদগ্রস্ত হবেন। হযরত জাফর বললেন: আমি মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত ঘটানোর ইচ্ছাও করিনি এবং এ ব্যাপারে কথিতও কিছু করিনি। তোমার কাছে এ ধরণের কোন তথ্য পৌঁছে থাকলে তা কেবল কোন নির্জলা মিথ্যাবাদীর মাধ্যমেই পৌঁছেছে। খলিফা ইমাম (আ.) কে তাঁর সিংহাসনের উপর নিজের কাছে বসালেন। অতঃপর বললেন: আপনার কথাবার্তা অমুক ব্যক্তি আমাকে বলেছিল। খলিফা সেই ব্যক্তিকে হাযির হওয়ার আদেশ দিলেন। সে হাযির হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি এসব কথাবার্তা জাফর সাদেকের (আ.) মুখ থেকে শুনেছো। সে বলল হ্যাঁ। খলিফা বললেন তুমি এ ব্যাপারে কসম খেতে পার? সে বলল হ্যাঁ অতঃপর লোকটি এই বলে কসম করল: আল্লাহ্‌র কসম যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। হযরত জাফর সাদেক বললেন, হে খলিফা আমি তাকে কসম দিচ্ছি। হ্যাঁ আপনি তাকে কসম দিন। ইমাম (আ.) লোকটিকে বললেন: বল, যেভাবে ইমাম বলেছিলেন, লোকটি কসম খেতে ইতস্তত করতে লাগল। অবশেষে কসম খেল এবং কসম খাওয়ার সাথে সাথে উপস্থিত লোকদের সামনে ছটফট করতে করতে মরে গেল।

খলিফা মনছুর জল্লাদকে ডেকে আদেশ দিল: যখনই জাফর ইবনে মোহাম্মদ আগমন করবে, আমি আমার হাত মাথার উপর রাখব অমনি তুমি তাকে হত্যা করবে। এরপর হযরত জাফরকে ডাকা হলো। আমি তার সাথে চললাম। আমি দেখতে পেলাম যে, তিনি বিড়বিড় করে কিছু পাঠ করলেন আমি তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে মনছুরের প্রাসাদে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে। তিনি প্রাসাদ থেকে এমনভাবে বের হলেন, যেমন কোন নৌকা সমুদ্রের প্রচন্ড তরঙ্গমালার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে। তাঁর আকার আকৃতি অদ্ভুত ছিল-কম্পমান দেহ, উলঙ্গ শির ও নগ্ন পা। এমতাবস্থায় খলিফা হযরত জাফর সাদেককে অভ্যর্থনা করার জন্য এলেন। অতঃপর তার বাহু ধরে নিজের সাথে গদিতে বসিয়ে বললেন, হে ইবনে রাসূলুলাহ্! আপনি কিরূপে আগমন করলেন? হযরত জাফর (আ.) বললেন: তুমি ডেকেছ আর আমি এসে গেছি। এরপর ইমাম বাইরে চলে গেলেন। মনছুর তখনই নিদ্রাকালীন পর্যন্ত পান পাত্র তলব করলেন এবং দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত নিদ্রিত রইল। নিদ্রা থেকে উঠার পর সে আমাকে ডেকে বললো: আমি জাফর সাদেককে ডাকার সময় এক বিশাল অজগর দেখতে পেলাম। তার মুখের এক অংশ মাটিতে এবং অপর অংশ আমার প্রাসাদের উপরে ছিল। সে আমাকে বিক্ষুব্ধ ও স্পষ্ট ভাষায় বলছিল: আমাকে আল্লাহ্‌তালা প্রেরণ করেছেন। যদি হযরত জাফর সাদেককে (আ.) কোনরূপ আঘাত করা হয় তবে তোকে তোর প্রাসাদসহ গিলে ফেলব। এতে আমার অবস্থা বিগড়ে গেল। যা তুমি দেখেছ। আমি বললাম: এটা যাদুটোনা নয়। এটা সেই এসমে আযম তথা কুরআনের বৈশিষ্ট্য, যা রাসূলে করিম (সা.) এর উপর নাযিল হয়েছিল। সে মতে তিনি যা চাইতেন। তাই হত।

একদিন খলিফা মনসুর তার এক রক্ষীকে আদেশ করলো: আমার কাছে পৌঁছার পূর্বেই হযরত জাফরকে হত্যা করে দিবে। সে দিনই হযরত জাফর আগমন করলেন এবং মনসুরের কাছে গিয়ে বসলেন। মনসুর রক্ষীকে ডাকলেন। রক্ষী এসে হযরত জাফরকে সেখানে বিরাজমান দেখতে পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। হযরত জাফর যখন ফিরে গেলেন। তখন খলিফার রক্ষীকে বললেন: আমি তোমাকে কি বলেছিলাম? রক্ষী বলল: আল্লাহ্‌র কসম, আমি জাফরকে আপনার কাছে আসতেও দেখিনি এবং যেতেও দেখিনি। কেবল আপনার কাছে উপবিষ্ট দেখেছি।

শাহাদত

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফা হিশাম, সাফফাহ এবং মনসুর কর্তৃক একাধিকবার বন্দী হয়েছিলেন। প্রতি হিংসাপরায়ন খলিফা মনসুর দাওয়ানকী, বনি আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, অত্যাচারী ও জালেম শাসক ছিল। সে সর্বদা ইমামকে তার লোকজনদের দিয়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে তার আশেপাশে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছিল। ইমাম কাযেম (আ.) বলেছেন: একবার মনসুর আমার বাবাকে (ইমাম জাফর সাদিক) হত্যা করার উদ্দেশ্যে ডেকে ছিল। হত্যা করার সরঞ্জাম (তলোয়ার) তৈরি করেছিল, আর রাবি নামে একজন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিল যে, জাফর বিন মুহাম্মদ দরবারে ঢোকার পর তার সাথে কথা বলতে বলতে যখন আমি হাত তালি দিব তখন তার দেহ থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলবে। ইমাম দরবারে ঢুকলেন। মনসুরের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়তেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে শুভ আগমন জনিয়ে বলল, তোমাকে এখানে ডেকে আনার কারণ হচ্ছে তোমার ঋণ পরিশোধ করবো তাই...। তারপর তার

শারীরিক অবস্থা এবং আত্মীয় স্বজনদের কুশলাদি জানতে চাইল। রাবির দিকে তাকিয়ে বলল: তিনদিন পর জাফর বিন মোহাম্মদকে তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেবে। সমাজের রন্ধে রন্ধে এবং ইসলামী ভূখন্ডগুলোতে ইমামের সুখ্যাতি ও মর্যাদা মনসুর সহ্য করতে পারছিল না। অবশেষে ১৪৭, (৭৬৭ খৃ.) হিজরীর সওয়াল মাসে তাকে বিষ প্রয়োগ করে। তিনি ঐ মাসের পাঁচ তারিখে ৬৫ বৎসর বয়সে শাহাদাতের অমিয় সাকী পান করে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তার পবিত্র দেহটিকে মদীনার জান্নাতুল বাকীতে তার পিতার পাশে সমাধিস্থ করা হয়। তার মৃত্যুতে কাতর হয়ে একজন কবি কি চমৎকার কবিতাই না রচনা করো।" তুমি কি জান কোন মহামানবের লাশকে নিয়ে যাচ্ছ মাটি দিতে? হায় আফসোস, বিশালাকার পর্বত তার সর্বোচ্চ সীমার শীর্ষবিন্দু থেকে নিম্নে পদার্পণ করেছিলেন কবরে দাফন হতে। ভোরে এবং মাজারে সবাই মাটি ফেলবে : এটই বাঞ্ছনীয় যে, তার হারানোর ব্যথায় নিজের মাথাকেও মাটি ফেলব। "হ্যাঁ সত্যিই আলে মুহাম্মদের উত্তরসুরী ইমাম সাদিকের শাহাদতে মানুষ ও ইসলাম তাদের মহামূল্যবান বস্তুকে হারায়। যদি তিনি রেসালত বা ইমামতের বংশের না হতেন (যেহেতু তার আগে পরে আরও ইমাম আছেন) তাহলে অবশ্যই বলতাম: কাল ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ পৃথিবী এমন ধরণের মহামানব তৈরীতে অপারগ: তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্‌তা সৎ লোক ও মুমিনদের উপর দরূদ।"

সপ্তদশ অধ্যায়

ইমাম হযরত মুসা আল কাজিম (আ.)

মুসা-ইবন-জাফর আল কাযিম, তিনি আবুল হাসান, আবু আব্দুলাহ্ আবু ইবরাহিম এবং আল কাযিম নামে অভিহিত করা হয়। কাযিম শব্দের অর্থ হলো যিনি যে কোন পরিস্থিতিতে তার রাগ বা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করেন। তার পিতা ছিলেন হযরত জাফর আল সাদিক তার মাতা ছিলেন বর্তমান স্পেনের আন্দালুসিয়া প্রদেশের অধিবাসী হামজা বানু বেগম। মুসা কাযিম আব্বাসিয়া খলিফা যখন ক্ষমতারোহন করেন (৭৫০) খৃস্টাব্দ) তখন তাঁর বয়স ছিল চার বৎসর সেই হিসাবে তিনি ৭৪৬ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার জীবিতকালে খলিফা আল মানসুর, আল হাদী, আল মাহদী ও হারুন অর রশীদ এর রাজত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে শাসকবর্গ কর্তৃক জেল ও জুলুমের শিকার হয়েছেন।

আব্বাসীয়া খেলাফত ও ইমাম মুসা কাযেম (আ.)

ইমাম মুসা কাযিমের (আ.) চার বছর বয়সের সময় স্বেচ্ছাচারী উমাইয়া শাসনের মূলোৎপাটন করা হয়েছিল। উমাইয়া শাসকদের উগ্র আরবীয়করণ নীতি, অন্যায় অত্যাচার, লুণ্ঠন প্রক্রিয়া ইসলাম বিরোধী শাসন ব্যবস্থা, জনগণ বিশেষ করে ইরানীরা যারা প্রকৃত ইসলামী ও ন্যায় ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার পুনপ্রতিষ্ঠা আশা করত অর্থাৎ হযরত আলী (আ.) এর স্বল্পকালীন খেলাফত আমলের শাসন ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি আশা করত ও তারা উমায়ইয়া দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। এই পরিস্থিতিতে তদানীন্তন রাজনীতিবিদগণ জনমানসের এ প্রবণতাকে বিশেষ করে ইরানীদের আলী (আ.) এর আহল (বংশধর) ও তাদের আলী (আ.) প্রবর্তিত শাসন ব্যাবস্থার প্রতি আকর্ষণকে পুঁজি করেছিল। এই রাজনীতিবিদগণ যার অধিকার তার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার নামে, আবু মুসলিম খোরাসানীর সহযোগিতায় উমাইয়াদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করলো। কিন্তু এই রাজনীতিবিদগণ আলী বংশীয় ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিক (আ.)কে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক পদ্ধতিতে অবৈধভাবে আবুল আব্বাস সাফাহ (রক্ত পিপাসু)কে খেলাফতের ময়দানে এবং প্রকৃতপক্ষে রাজ সিংহাসনে বসালো। এভাবেই ১২৩ হিজরীতে (৭৫০ খৃস্টাব্দে) রাজতন্ত্রের এক নব ধারার পত্তন ঘটল, তবে তা খেলাফত ও নবী (সা.) এর উত্তরসুরীর পোশাকে ধর্মহীনতা, অত্যাচার ও কপটতার দিক থেকে উমাইয়াদের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না। বরং এগুলোর দিক থেকে তারা উমাইয়াদেরকেও হার মানিয়েছিল। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, উমাইয়াদের কুশাসন খুব বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে নি। আর আব্বাসীয়রা ৬৫৫ হিজরী (১২৫৮ খৃস্টাব্দে) পর্যন্ত একইভাবে বাগদাদ থেকে (সাফফাহ্, মনসুর দাওয়ানিকী, হাদী মাহদী ও হারুনের) খেলাফতের নামে রাজত্ব করেছিল। যা হোক হযরত মুসা কাযেম তার জীবদ্দশায় তাদের সকল অত্যাচার, নির্যাতন, মানহানি ও বল প্রয়োগের ঘটনাপঞ্জীসহ অতিবাহিত করেছিলেন।

আবুল আব্বাস সাফফাহ ১৩৬ হিজরীতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে তার ভাই মনসুর তার স্থলাভিষিক্ত হল। সে বাগদাদ নগরী গড়িল এবং তার এককালীন সহযোগী আবু মুসলিমকে জঘন্যভাবে হত্যা করল। তার এই প্রতারণামূলক কাজ সমাজে বাগধারা অর্থাৎ মনসুরের মত প্রতারণার মাধ্যমে "আপন জনের হত্যা করা" পরিণত হয়েছিল। মানসুর ক্ষমতাসীন হয়ে আলী (আ.) এর সন্তানগণকে হত্যা, কারারুদ্ধ, নির্যাতন ও তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্রাপ্ত বা লুট করা একটি রাষ্ট্রীয় নীতিতে পর্যবসিত হয়ে পড়েছিল। সে আলী (আ.) বংশের সকল মহান ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল এদের মধ্যে শীর্ষে ছিলেন ইমাম জাফর সাদিক (আ.)।

মানসুরের মৃত্যুর পর সিংহাসনের দায়িত্ব তার পুত্র মাহদী (৭৭৫-৭৮৫ খৃ.) উপর ন্যস্ত হল। মাহদীর রাজ্য শাসনের রাজনীতি ছিল প্রবঞ্চনা ও প্রতারণামূলক। সে নবী বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কার্যকলাপ কঠোর নজরদারীতে রাখত এব তদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের স্টীম রোলার চালু করেছিল। তাছাড়া যে সকল কবি বা লেখকগণ আলী (আ.) এর বংশকে দুর্নাম করতো তাদেরকে অগণিত পুরস্কার দিত। যেমন একবার বাশার ইবনে বারদকে সত্তর হাজার দেরহাম দিয়েছিল এবং মারওয়ান ইবনে আবি হাফসকে এক লক্ষ দিরহাম দিয়েছিল। মুসলমানদের বাইতুল মালের টাকা তার আরাম আয়েশ, মদপান ও নারীর পিছনে উদার হস্তে খরচ করত্ সে তার পুত্র হারুনের বিবাহে পঞ্চাশ মিলিয়ন দেরহাম খরচ করেছিল। হারুন ছিল চরম হিংসুক, হিংস্র, কৃপণ, লোভী ও বিশ্বাসভঙ্গকারী। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুঃখের কথা হলো ধর্মীয় দিক থেকে দীর্ঘস্থায়ী শাসন করার সুবাদে তারা রাসূল (সা.) এর নীতি ইসলাম ধর্মকে কুরআনের ও হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং একাধিক অপব্যাখ্যার সুযোগ সৃষ্টি করে বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টি ও আন্ত মাযহাব বিভাজন ও সংঘর্ষে ছিয়াহ্সিত্তা অর্থাৎ শুধুমাত্র ছয়টি হাদিসকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে হাদীসের অন্যন্য সূত্রকে অর্থাৎ আহলে বাইতদের উৎস থেকে প্রাপ্ত কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা ও হাদিস অস্বীকৃতির ধারা তৈরী করে। শিয়া সুন্নীদের ধর্মীয় বিরোধীতা সৃষ্টি, পোষণ ও (ফিকাহ) প্রচার, ইসলামী আইন বিজ্ঞানে হযরত আলী ও মহান ইমামদের মতামত, কুরআন হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যার অস্বীকৃতি ও অগ্রণযোগ্যতা এবং তার বিপরীতে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট

সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও এজমা (সম্মিলিত ও সিদ্ধান্ত) ও কিয়াস (সাদৃশ্য ভিত্তিক) সিদ্ধান্ত ইসলাম ধর্মের ব্যাপক বিকৃতির মাধ্যমে এক নতুন ধর্মমত চালু করে এবং রাষ্ট্রীয় বল প্রয়োগের মাধ্যমে এই তৈরীকৃত ধর্মকেই প্রকৃত ধর্ম হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে বর্বোরচিত পদ্ধতিতে ইসলামী শাসন চালু করে এরই ধারাবাহিকতায় জালেম ও জুলুম শাহী, রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, জুলুমবাজ আমীর, ওমরাহ্, দাসপ্রথা, হেরেমপ্রথা, পুঁজিবাদী শ্রেণী বিন্যাস, আশরাফ, আতরাফ প্রজাপীড়ন, বাক স্বাধীনতা হরণ, মদীনা সনদের রাষ্ট্রীয় অস্বীকৃতি ইত্যাদি জঘন্য ধরনের কার্যক্রম ইসলামী লেবাস লাগিয়ে সমাজ জীবনে প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কারণে এসব ধর্ম-রাজনৈতিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কুরআনের প্রকৃত বিধি বিধান কার্যকর করাই সম্ভব হচ্ছে না। তাই পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন আপাত মধুর চিত্তার্ষক মতবাদ, চিন্তাধারা, দর্শন, অর্থাৎ সকল প্রকার ইসম (ism) ও ক্রেসী (Cracy) সহজেই মুসলিম সমাজে প্রবেশ করছে এবং এর বিপরীতে যে পবিত্র কুরআনে উন্নতর বাস্তব সম্মত নীতি ও বিধান রয়েছে তা মুসলিম জনগণ জানতেই পারছেনা বা বিশ্বাস করতে পারেছনা। কার্যত রাজনীতি ও খলিফাদের কার্য কলাপ ফিকাহ শাস্ত্রের বাইরে রাখা হলো। এই সব মহান ইমামগণ ধর্মের নামে যেন এই ধরনের বিকৃতি না হয় তা প্রতিরোধকল্পে তাঁরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় চালিয়েছেন কিন্তু রাজশক্তি তাদের এ ক্ষেত্রে সর্বাত্মক বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিসহ তাদেরকে গুপ্ত ও প্রকাশ্য হত্যার নীতি গ্রহণ করেছে। এ কারণে হারুন অর্থাৎ আব্বাসীয় দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আলী (আ.) এর উত্তরাধিকারীদের দৃঢ় অবস্থানের কারণে শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতি খুবই ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট ছিল। ফলে যে কোন ভাবেই হোক তাদেরকে শাস্তি ও ক্লেশ দেওয়ার ব্যাপারে সমাজে তাদের মর্যাদাহানির ব্যাপারে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। আর এ জন্য তারা আত্মবিকৃতকারী দরকারী কীর্তনকারীদের অগণিত অর্থ প্রদান করত। আলী (আ.) এর পরিবারবর্গের দুর্নাম করার জন্য মানসুর নামাবীর নাম উল্লেখ করা যায়। এই ব্যক্তির কবিতায় আলী (আ.) পরিবারবর্গকে নিন্দা করেছে বলে হারুন তাকে বাইতুল মালের নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয় যাতে সে তার ইচ্ছামত অর্থ নিতে পারে। বাগদাদের সকল আলী বংশীয় মদীনায়দেরকে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল যাতে এবং তাদের অগণিত সংখ্যককে হত্যা ও বিষ প্রয়োগ নিধন করা হয়েছিল। এমনকি হযরত ইমাম হোসাইনের (আ.) কবর জিয়ারতের জন্য মানুষের যাওয়া আসাটা হারুন সহ্য করত না। তাই হারুন সেই পবিত্র মাজার এবং এর সংলগ্ন গৃহ ও আবাসনসমূহ ধংস করে। পবিত্র কবরের পাশে যে কুল গাছ ছিল তা কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়। এই ধরণের ধর্মদ্রোহী শাসকদের সম্পর্কে তার ধর্মীয় মতামত জানতে হলে আমরা এই ঘটনাটি উল্লেখ করতে পারি ইমাম মুসা কাযিম (আ.) সাফওয়ান ইবনে মেহবনকে বলেছিলেন: তুমি সবদিক থেকেই উত্তম। শুধুমাত্র এ দিকটি ব্যতীত যে, তুমি তোমার উটগুলো হারুনকে ভাড়া দিয়ে থাক সাফওয়ান বলল হজের জন্য ৬টি উট ভাড়া দিয়ে থাকি কিন্তু আমি স্বয়ং উটের সাথে যাই না। তিনি বললেন: আর এজন্যই তুমি অন্তরে কামনা করনা যে, হারুন কমপক্ষে মক্কা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত জীবিত থাকুক, যাতে তোমার উটগুলো নিরাপদে ফিরে আসে এবং তোমার ভাড়ার মূল্য পরিশোধ করতে পারে। জবাবে সে বলল: জী হ্যাঁ ইমাম বললেন: যদি কেউ অত্যাচারীদের উপস্থিত থাকা কামনা করে তবে সে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হয়।

ইমাম মুসা কাযেমের বন্দী জীবন

হযরত মুসাকে প্রথমবার মাহদী ইবনে মনসুরের নির্দেশে বাগদাদে এনে আটক করা হয়। একদিন মাহদী হযরত আলী (আ.) কে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি বলছিলেন: তোমরা শাসক হয়ে পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টি করতে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে চাও কি? মাহদীর উজীর রবী বলেন: রাত্রি কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। মাহদী আমাকে ডাকলেন: আমি গিয়ে শুনি তিনি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত সুললিত কণ্ঠে পাঠ করছিলেন। অতঃপর আমাকে বললেন: এখনই গিয়ে মুসা ইবনে জাফর (আ.) কে নিয়ে এসো। আমি আদেশ পালন করলাম এবং তাঁকে নিয়ে এলাম। মাহদী তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন এবং নিজের কাছে বসিয়ে স্বপ্ন শোনালেন। তারপর বললেন : আপনি কি আমার এবং আমার সন্তানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকতে পারেন না? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, এটা আমার ইচ্ছা নয় এবং আমার জন্য শোভনীয় নয়। মাহদী বললেন সম্পূর্ন ঠিক। এরপর খলিফা রবীকে বললেন : তাঁকে দশ হাজার দিনার দিয়ে দাও এবং মদিনায় যাওয়ার জন্য সফরের সরঞ্জাম সরবরাহ কর। রবী বললেন : আমি রাতারাতি সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করলাম এবং তাকে "আলবিদা" বলার জন্য সঙ্গে গেলাম। অতঃপর তিনি নিরাপদে সুস্থ অবস্থায় মদিনায় পৌঁছে গেলেন। ইমাম বসরার গর্ভনর ঈসা ইবনে জাফরের কারাগারে এক বছর বন্দী ছিলেন। ইমামের উত্তম চরিত্র মাধুর্য ঈসার উপর এমন প্রভাব ফেলেছিল যে, সে হাসানের নিকট লিখেছিল : তাঁকে (ইমামকে) আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও নতুবা আমি তাঁকে মুক্ত করে দিব। হারুনের নির্দেশে এই মহান ইমামকে পরবর্তীতে বাগদাদে ফাযিল ইবনে রাবির নিকট কারারুদ্ধ রাখা হয়। কিছুদিন পর ফাযিল ইবনে ইয়াহিয়ার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

একের পর এক, এক স্থান থেকে অন্য স্থান স্থানান্তরের কারণ ছিল এটাই যে, খলিফা বিভিন্ন কারা প্রহরীদের প্রস্তাব দিয়েছিল ইমামকে যেন তারা বা তাদের কেউ হত্যা করে। তবে কেউ এই প্রস্তাবে রাজী হয় না। অবশেষে সানাদি ইবনে শাহাক ইমাম (আ.) কে বিষ প্রয়োগ করেছিল। তার শাহাদতের পূর্বে একদল বিখ্যাত ব্যক্তি বর্গকে হাজির করেছিল যাতে তারা সাক্ষী দেয় যে, ইমাম (আ.) এর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু ইমামের অসাধারণ মেধা, উপস্থিত বুদ্ধি ও গভীর জ্ঞান তাদের এ চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়। কারণ যখন ঐ সাক্ষীরা ইমামের দিকে তাকিয়েছিল, তিনি বিষের প্রচন্ডতা ও বিপন্ন অবস্থা সত্ত্বেও তাদেরকে বললেন : আমাকে ৯টি বিষযুক্ত খোরমা দিয়ে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। আগামীকাল আমার শরীর সবুজ হয়ে যাবে। তারপর দিন আমি ইহ ধাম ত্যাগ করব। আর এভাবেই তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সত্য প্রকাশ করেছিলেন।

খলিফা হারুনের সাথে ইমাম মুসা কাযিম (আ.) এর ইমামগণ রাসূলের সন্তান বিষয়ক বিতর্ক

আব্বাসীয় খলিফাগণ নিজেদেরকে হাশেমী বা কোরাইশ বংশের সন্তান হিসেবে দাবী করে জনগনের উপর যে, অত্যাচার নির্যাতন করত তার যৌক্তিকতা হিসাবে। তারা রাসূলের বংশধর হিসাবে জনগণের নিকট থেকে অবৈধ সুযোগ নিত। যদিও রাসূল (আ.) তাঁর বংশের সকল লোককে ঢালাওভাবে মান্য করতে বলেন নাই। বরং শুধুমাত্র তাঁর বংশধারা অর্থাৎ ফাতিমা ও আলী (আ.) এর বংশধারায় আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত ইমামকেই মান্য বা আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। একারণে সাধারণ জনগণ নবীর বংশধর হিসাবে আলী (আ.) এর সন্তানগণের চারিত্রিক মাধুর্য জ্ঞান, দয়া, ও অসাধারণ মানবিক যোগ্যতা দেখে তাঁদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হতো। তাই এই মহান ব্যক্তিদের বিপুল ধর্মীয় ভালবাসা মিশ্রিত সীমাহীন আনুগত্য অবৈধ ক্ষমতাসীনরা কখনও পছন্দ করেনি বা মেনে নিতে পারে নি। খলিফা হারুন উর রশীদ এ বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য ইমাম মুসা কাযিম (আ.) কে কুরআন ভিত্তিক দলিল দিয়ে প্রমাণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেন। মুসা কাযিম (আ.) ও হারুনের সাথে এ বিষয়ে ডায়ালগ পত্রস্থ করা হলো:

হারুন: আমি আপনার কাছে আব্বাস ও আলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, কেন আলী রাসূল (সা.)এর উত্তরাধিকারে অগ্রগণ্য ছিলেন, অথচ আব্বাস ছিলেন নবী (সা.) এর চাচা ও পিতার ভাই। ইমাম মুসা (আ.) বললেন: আমাকে মাফ করুন। হারুন বলল: আল্লাহ্র কসম। আপনাকে মাফ করব না। বলতেই হবে। ইমাম বললেন: যদি মাফ না করেন, তাহালে আমাকে নিরাপত্তা দিন। হারুন বলল: আপনাকে নিরাপত্তা দেয়া হলো। মুসা কাযিম (আ.) বললেন: নিশ্চয়ই নবী এমন কাউকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। যে হিজরতে সক্ষম ছিল কিন্তু হিজরত করেননি। আপনার পিতা আব্বাস ইমান আনেন তবে হিজরত করেন নি। আর আলী (আ.) ইমান আনেন ও হিজরত করেন। আল্লাহ্ বলেন: যারা ইমান এনেছে ও হিজরত করেনি। আপনার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না হিজরত করে (সূরা আনফল: ৭২)।

(মুসা কাযিম এর কথা শুনে) হারুনের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল এবং অন্য রূপ ধারণ করল। হারুনকে বলল: আপনারা কেন নিজেকে আলীর সন্তান বলেন না। রাসূল (সা.) এর সন্তান বলে আখ্যায়িত করেন। অথচ তিনি তো আপনার নানা ইমাম (আ.) বলেন: আল্লাহ্ ঈসা (আ.) কে তার খলিফা, বন্ধু ইবরাহীম (আ.) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন হযরত ঈসা (আ.) এর কুমারী মাতার মরিয়মের মাধ্যমে যাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি। এরশাদ হচ্ছে: আর ইবরাহীমের বংশ থেকে হলো দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা এবং হারুন। আর এভাবে আমরা সৎ কর্মশীলদের পুরস্কার দান করি। আর জাকারিয়া। ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াস। তারাও ইবরাহীমের বংশ থেকে) এবং তারা সকলেই সৎ কর্মশীলদেরও অন্তর্ভুক্ত (সূরা আনআম: ৮৪-৮৫)। সুতরাং, তাঁকে তার মায়ের দিক দিয়ে স্বীয় বন্ধু ইবরাহীম (আ.) এর একজন সন্তান গণ্য করেছেন। যেমনভাবে দাউদ, সুলায়মান, মুসা ও হারুনকে তাদের পিতা ও মাতা উভয় দিকে থেকে তার (ইবরাহীম সন্তান বলে গণ্য করেছেন। আর ঈসার এ মর্যাদা কেবল তার মায়ের কারণে। একথা মারইয়াম (আ.) এর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। নিশ্চয় তোমাকে নির্বাচিত করেছেন এবং পূত পবিত্র করেছেন এবং জগতসমূহের মসীহর নারী কুলের উপর মনোনীত করেছেন (সূরা আলে ইমরান : ৪২)। কোন পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়া মসীহর জন্মদানের মাধ্যমে এ রূপ করেছেন। তদ্রূপ আল্লাহ্ ফাতেমা (আ.) কে নির্বাচিত করেছেন এবং তাঁকে পূত পবিত্র করেছেন এবং জগতসমূহের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন হাসান ও হোসাইনের মাধ্যমে যাঁরা বেহেশতে যুবকদের সর্দার। এ পর্যায়ে হারুন বিমর্ষ হয়ে পড়লেন এবং যা কিছু শুনেছেন তাতে তার মন খারাপ হয়ে গেল। হারুন বলল: আপনি কোত্থেকে বলছেন যে, মানুষ যদি 'খুমস' (যাকাতের ন্যায় আল্লাহ্ নির্দেশিত আহলে বাইতদের জন্য সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ প্রদেয় ট্যাক্স, সূত্র সূরা আনফল : ৪১), তার প্রাপকের কাছে না পৌঁছে দেয় সে তা মাতা ও পিতার দিক থেকে নিকৃষ্ট বংশের হয়। ইমাম এ ব্যাপারে তার মতামত প্রদান করেন

নি। হারুন বলল: ইসলামের মধ্যে যিন্দিকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে আর সেই যিন্দিকদের থেকে আমাদের কাছে অনেক খবর পৌঁছে এবং আমাদের তারা বিভিন্ন তথ্য দেয়। তারা নিজেদেরকে আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত মনে করে। আপনাদের আহলে বাইতের (নবী পরিবার) দৃষ্টিতে যিন্দিক কারা? ঈমাম (আ.) বললেন: যিন্দিক সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তারাই যারা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা ও যুদ্ধ করে। আল্লাহ্ বলেন: আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ইমান আনয়নকারীদের মধ্যে এমন কোন দলকে পাবেনা যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে তীব্র বিরোধিতা করে যদিও তারা তাদের পিতৃ পুরুষ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ এবং স্বজনদের অন্তভুর্ক্ত হয়। সূরা মুজাদালা: ২২)। এরাই হলো সেই নাস্তিক দল যারা তাদের দ্বীনকে একত্ববাদ থেকে নাস্তিকতায় পরিবর্তন করেছ। হারুন বলল: আমাকে বলুন যে, প্রথম কোন ব্যক্তি নাস্তিক ও যিন্দিক হয়েছিল?

ইমাম বললেন: প্রথম যে ব্যক্তি নাস্তিক ও জিন্দিক হয়েছিল সে ছিল আসমানে ইবলিশ, যে অহংকার করে এবং আল্লাহ্র নির্বাচিত ও রাজ (যার কাছে তিনি তার ভেদ ও রহস্য অবগত করেছেন আদম) এবং আদম (আ.) এর উপর গর্ব করে, আর সে অভিশপ্ত বলে: আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে কাদা দিয়ে। (সূরা আরাফ) অতঃপর তার প্রতিপালকের নির্দেশ লংঘন করে এবং নাস্তিক হয়। আর নাস্তিকতা তার বংশে কেয়ামত পর্যন্ত উত্তরাধিকার পায়। হারুন বললেন: ইবলিশের কি বংশ রয়েছে? ইমাম বললেন: হ্যাঁ, কেন আল্লাহ্র বাণী কি শোননি: কেবল ইবলিস ছাড়া, সে ছিল জিনদের থেকে এবং তার প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল (ও সেখান থেকে বিতাড়িত হল) তবুও কি তোমরা তাকে ও তার বংশকে আমার পরিবর্তে নিজেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু। কতই না মন্দ জালিমদের বিনিময়। আমি তাদেরকে আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টির সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করিনি (সূরা কাহফ: ৫০-৫১)। কারণ, তারা আদম (আ.) এর বংশকে ছলনাময় ভাষা ও মিথ্যা দ্বারা পথভ্রষ্ট করে আর (বাহ্যিকভাবে) মুখে বলে: আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যেমনভাবে আল্লাহ্ স্বীয় বাণীতে তাদের বর্ণনা তুলে ধরেছেন: এবং যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর কে আকাশসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। তৎক্ষণাৎ বলবে: আল্লাহ্ বলুন প্রশংসা আল্লাহ্রই; বরং তাদের অধিকাংশ জানে না (সূরা লোকমান:২৫)। অর্থাৎ তারা একাজটি বলে নিছক শিখিয়ে দেওয়া বুলি হিসাবে এবং অভ্যাস বশে এবং কেবল জিহ্বায় আর সে তাতে বিশ্বাস রাখে না যতই সাক্ষ্য প্রদান করুক, নিশ্চয় সে সন্দেহগ্রস্ত, হিংসুক এবং শত্রু। আর এ কারণেই আরবরা বলে: যে ব্যক্তি কোন জিনিস জানে না তার শত্রু হয় আর যাকে নাগালে পায়না তার ত্রুটি অন্বেষণ করে এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কারণ সে হয় মূর্খ ও অজ্ঞ। (তথ্য সূত্র তুহাফুল উকুল আল আলের রাসূল (আ.) পৃ: ৩৫৬-৩৫৯)।

হযরত মুসা কাযিমের কেরামত

বিখ্যাত সুফি সাধক হযরত শকিক বলখী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; হজের সফরকালে আমি কাদেসিয়া এলাকায় গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে আমি একজন সুশ্রী ও দীর্ঘদেহী যুবককে দেখলাম। যার পরনে ছিল শাল, কাঁধে পাগড়ির প্রান্ত এবং পদ যুগলে জুতা। সে অনেক ভিড়ের মধ্য থেকে বের হয়ে একাকীই এক জায়গায় বসে গেল। আমি ভাবলাম। এই যুবক সুফি শ্রেণীভুক্ত মনে হয়। সম্ভবত সে এ সফরে মুসলমানদের উপর বোঝা হয়ে যেতে চায়। কাজেই তাকে এ থেকে বিরত রাখার জন্য শাসন করা উচিত। আমি তার কাছে যেতেই সে বলল: হে শকিক, অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কতক ধারণা সরাসরি পাপ। একথা বলে সে চলে গেল। আমি মনে মনে বললাম, আশ্চর্যের কথা। সে আমার নামও মনের কথা বলে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে সে কোন সাধু ব্যক্তি। আমার উচিত তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আমি যতই দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাকে ধরতে পারলাম না। দ্বিতীয় মন্জিলে পৌঁছে আমি তাকে নামাযরত দেখলাম। তার শরিরে ছিল কম্পন এবং চোখে অশ্রুর ধারা। আমি পুনরায় তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার ইচ্ছা করলাম। কয়েক মিনিট পর আমি তার দিকে চাইলাম তখন তিনি পাঠ করছিলেন; যে তওবা করে ইমান দূরস্ত করে, সৎ কর্ম করে। অতঃপর সরল পথে থাকে, আমি তার জন্য ক্ষমাকারী। একথা বলার পর তিনি আমাকে ছেড়ে গেলেন। আমি মনে করলাম, এই যুবক আবদাল গণের একজন হবে, যিনি দ্বিতীয় বার আমার মনের কথা বলে দিলেন। অন্য এক স্থানে পৌছে আমি তাঁকে এক কূপের পার্শ্বে দন্ডায়মান দেখলাম। তাঁর হাতে ছিল একটি চামড়ার বালতি। যা দ্বারা তিনি কূপ থেকে পানি তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু বালতিটি তার হাত থেকে খসে কূপে পড়ে গেল। তিনি আকাশের দিকে মুখ করে অস্পষ্ট ভাষায় একটি দোয়া পাঠ করলেন। আল্লাহ্র কসম, আমি পানিকে উপরে উঠে আসতে দেখলাম। যুবক হাত বাড়িয়ে পানির উপর থেকে বালতি তুলে নিলেন। অতঃপর ওযু করত চার রাকআত নামায আদায় করলেন। এরপর বালুকার একটি দিকে চলে গেলেন। তিনি সামান্য বালুকা হাতে নিয়ে বালতিতে ফেলে দিলেন এবং পানির সাথে মিশিয়ে পান করে নিলেন। এটা দেখে আমি তার কাছে গিয়ে আস্সালামু আলাইকুম বললাম। আমি

বললাম, আহার করান। আল্লাহ্ আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। যুবক বললেন, হে শকীক। আল্লাহ্তালার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন নেয়ামত সমূহ আমি সর্বদাই পাই। তাই তুমি আল্লাহ্ সর্ম্পকে সুধারণা রাখ। এরপর তিনি আমাকে সেই বালতি দিলেন, এতে ছাতু ও চিনি ছিল। আমি পান করলাম। আল্লাহ্র কসম, এর চেয়ে মিষ্টি ও সুস্বাদু পানীয় আমি কখনও পান করিনি। আমি তৃপ্ত ও সিক্ত হয়ে গেলাম। এমনকি কয়েক দিন পর্যন্ত আমার পানাহারের প্রয়োজন ছিল না। এরপর আমি যুবককে আর দেখলাম না। মক্কা পৌছার পর একদিন আমি তাঁকে তাহাজ্জুদরত অবস্থায় দেখলাম তিনি অত্যাধিক বিনম্রতা সহকারে নামায আদায় করছিলেন। তখন চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। সারারাত এ রকম ধারা অব্যহত রইল। ভোর হলে ফজরের নামায শেষে তিনি তওয়াফে লেগে গেলেন। তওয়াফ শেষে বাইরে চলে গেলেন। আমিও তাঁর পিছনে রওনা হলাম। আমি দেখলাম, এখন তার কাছে একাধিক গোলাম ও খাদেম ছিল। লোকজন তাকে ঘিরে রেখেছিল এবং বলছিল : আস্সালামুআলাইকুম ইবনে রাসূলল্লাহ। আমি জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, ইনি হচ্ছেন হযরত মুসা ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবিতালেব (রা.)। আমি স্বতস্ফুর্তভাবে বলে উঠলাম : এই সাইয়িদের কাছ থেকে এ ধরনের অত্যাশ্চর্য বিষয়াদি প্রকাশ পাওয়া কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়।

খলিফা হারুনুর রশীদ, আলী ইবনে ইয়াফসীনকে অত্যন্ত মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট পোশাক পরিচ্ছদ দান করেন। এগুলোর মধ্যে একটি গুদড়ি (দরবেশদের অত্যন্ত দামী পোশাক) ছিল। আলী ইবনে ইয়াফসীন হযরত মুসা কাযিম (আ.) এর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর খেদমতে পোশাক পরিচ্ছদ পাঠিয়ে দিলেন। হযরত মুসা গুদড়ী ব্যতীত সবকিছু কবুল করলেন এবং ইয়াফসীনকে বলে পাঠালেন যে, এ গুদড়ীটি যেন ভালভাবে সংরক্ষণ করা হয় কারণ পরবর্তীতে এর প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে আলী ইবনে ইয়াফসীনের এক গোলাম খলিফার কাছে নালিশ জানাল যে, "তার মনিব মুসা কাযিমের অন্ধ ভক্ত এবং খলিফা তাকে যে গুদড়ী তাকে দান করেছেন সে তাও ইমাম মুসাকে উপহার দিয়েছে"। একথা শুনে হারুন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। সেই মুর্হূতেই একজন কর্মচারী পাঠিয়ে আলী ইবনে ইয়াফসীনকে তলব করলেন। তিনি দরবারে উপস্থিত হলে খলিফা বললেন : সেই গুদড়ী কোথায় যা আমি তোমাকে পাঠিয়ে ছিলাম? হুযুর সেটি তো আমার কাছেই আছে। খলিফা বললেন : সেটি হাজির কর। আলী নির্দেশ মত এক গোলাম একটি মোহর করা পাত্র নিয়ে রাজ দরবারে হাজির হলো। খলিফা পাত্রের মোহর ভাঙ্গার আদেশ দিলেন। পাত্রের ঢাকনা উঠাতেই খলিফা সে গুদড়ী দেখতে পেলেন। গুদড়ীটি মূল্যবান আতর গোলাপ মাখা অবস্থায় পাত্রে রক্ষিত ছিল। এটা দেখে খলিফার ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনি বললেন : গুদড়ী যেখানে ছিল সেখানেই পৌছে দাও। তোমরা আনন্দিত ও উৎফুল্ল থাক। ভবিষ্যতে আমি কখনও তোমার সম্পর্কে কারও কথায় কর্ণপাত করব না।

প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত বিশরে হাফী প্রথম জীবনে অত্যন্ত উচ্ছৃংঙ্খল ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। একারণে তার বাড়িতে গভীর রাত পর্যন্ত মদপান, খানা, সংগীত, নাচ ইত্যাদি চলত। কোন এক রাতে হযরত মুসা কাযিম (আ.) বিশরে হাফীর বাড়ির রাস্তা দিয়ে কোথায়ও যাচ্ছিলেন। এই সময়ে বিশরে হাফীর একজন বাঁদী ময়লা ফেলার জন্য রাস্তায় আসে এমন সময় মুসা কাযিমের (আ.) সাথে সেই বাঁদীর সাক্ষাৎ হয়। হযরত মুসা কাযিম বাদীকে জিজ্ঞাসা করেন এই বাড়ির মালিক স্বাধীন ব্যক্তি না দাস। বাঁদী উত্তর দেয় তিনি একজন মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি। হযরত মুসা কাযিম বলেন: যেহেতু সে স্বাধীন তাই সে তাঁর প্রভু (আল্লাহ্) কে ভয় করে না। বাঁদী বাড়িতে ফিরলে বিশরে হাফী তার এত দেরী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বাঁদী হযরত মুসা কাযিমের (আ.) সাথে তার কথোপথনের বিষয়টি তাকে অবহিত করে। এ কথা শুনে হযরত বিশরে হাফীর অন্তরে এক ভাবের উদয় হয়। তিনি বলতে থাকেন আমি স্বাধীন তাই আল্লাহ্কে ভয় পাই না। সেদিন থেকেই তার জীবনের এক অলৌকিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত সুফি সাধকে পরিণত হন। তিনি সব সময় খালি পায়ে থাকতেন। লোকে বলত আপনি খালি পায়ে থাকেন কেন। তিনি বলেন, খালি পায়ে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ আমাকে হেদায়েত করেছেন তাই এই অবস্থায় থাকাই আমি পছন্দ করি। বিশর আস হাফী অর্থ নগ্ন পদে থাকেন যিনি।

জনৈক রাবী বর্ণনা করেন; আমি মদীনা মুনওয়ারায় একটি গৃহ ভাড়া করে খাদেম হিসাবে বসবাসরত ছিলাম। বেশীর ভাগ সময় আমি হযরত মুসা কাযেমের (আ.) খেদমতে থাকতাম: একদিন মুষলধারে বৃষ্টি হলে আমি তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে সালাম জানাতেই তিনি বললেন: তুমি এক্ষুণি তোমার গৃহে ফিরে যাও। কেননা, তোমার গৃহে ছাদ তোমার মাল আসবারের উপর ভেঙ্গে পড়েছে। আমি বাড়ী ফিরে এসে কয়েকজন শ্রমিক ভাড়া করলাম। তারা আমার আসবাবপত্র নিচ থেকে বের করল। একটি পেয়ালা ছাড়া আমার কোন জিনিস হারালাম না। পেয়ালাটি দিয়ে আমি ওযু করতাম। এই পেয়ালা হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ অবগত হয়ে হযরত মুসা কাযেম (আ.) কিছুক্ষণ মোরাকাবা করলেন। অতঃপর বললেন। যাও। গৃহের মালিকদের বাদীকে জিজ্ঞাসা কর যে পেয়ালাটি সে তুলে নিয়েছে কিনা। তুলে নিয়ে থাকলে যেন

ফেরত দিয়ে দেয়। সে পেয়ালাটি তোমাকে ফিরিয়ে দেবে। আমি ফিরে পিয়ে বাঁদীকে বললাম: আমি অমুক জায়গায় পেয়ালাটি ভুলে গিয়েছিলাম। (তুমি এসেছিলে এবং কুড়িয়ে নিয়েছিলে। এখন আমাকে সেটি ফিরিয়ে দাও যাতে আমি ওযু করতে পারি। বাঁদী তৎক্ষনাৎ চলে গেল এবং পিয়ালা এনে হাজির করল।

এই রাবীই বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত মুসা কাযিমকে বসরায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি মাদায়েনের নিকটে তাঁর নৌকায় সওয়ার হলাম। আমাদের পশ্চাতেও একটি নৌকা ছিল। তাতে এক মহিলা ছিল, সে তার স্বামীর সাথে বাসর রাত্রি যাপন করছিল। হঠাৎ নৌকা থেকে শোরগোল শুনা গেল। হযরত মুসা কাযিম (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন। এটা কিসের শোরগোল? আমি বললাম। নৌকায় গৃহবধু যাচ্ছে। একঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর আবার হৈ চৈ শুনা গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কিসের শব্দ লোকেরা স্মরণ করল: নৌকায় উপবিষ্ট নববধু নদী থেকে কিছু পানি নিতে চাইলে তার স্বর্ণের কংকন পানিতে পড়ে গেছে। এ কারণে সে কান্নাকাটি করছে। তিনি বললেন, নৌকার প্রতি নযর রেখো এবং মাঝিদেরকে বলে দাও যেন নৌকা হেফাযতে রাখে। অতঃপর নৌকাটি তীরে ভিড়লে তিনি বিড়বিড় করে কিছু পড়তে লাগলেন। অতঃপর মঝিকে বললেন, পানিতে নাম এবং কংকন তুলে নাও। আমরা দেখলাম কংকন পানির উপর ভাসছে। সে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটি ধরে ফেলল।

হযরত মুসা কাযিম (আ.) এর শাহাদাত

খলিফা হারুন ইমাম কাযিমকে (সা.) হত্যার উদ্দেশ্যে মদীনা গমন করে মহানবী (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বলে হে রাসূলুলাহ্। আপনার সন্তান মুসা ইবনে জাফরের (আ.) ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করেছি, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি আন্তরিকভাবে তাকে বন্দী করতে চাই না কিন্তু আমি এ ভয়ে ভীত যে, আপনার উম্মতের মধ্যে যুদ্ধ ও বিরোধ সৃষ্টি হবে আর এ জন্য এ কর্ম করেছি। সে তৎক্ষণাত ইমাম (আ.) কে বন্দী ও বসরায় নিয়ে কারাবদ্ধ করার আদেশ ছিল। তখন ইমাম (আ.) সেখানে নবীর মাযারের পাশে নামাযে মশগুল ছিলেন। ইমাম (আ.) বারি কারাগারে ছিলেন। হারুন কখনও কারাগারের ছাদে আসত এবং অভ্যন্তরে উঁকি দিয়ে দেখত। যতবারই তাকতো। প্রত্যেকবারই দেখত একগুচ্ছ জামা কাপড় কারাগারের এককোণে পড়ে আছে এবং সেখান থেকে স্থানান্তরিত হচ্ছেনা। হারুন একবার জিজ্ঞেস করেছিল ঐ পোশাকগুলি কার? রাবি বলল পোশাক নয়। তিনি মুসা ইবনে জাফর (আ.), তিনি অধিকাংশ সময় প্রভুর ইবাদতের মধ্যে কাটান ও সিজদাবনত হয়ে মাটিতে চুম্বন করেন। একবার হারুন এক যুবতী দাসীকে ইমামের কাছে পাঠিয়েছিল যাতে ইমামের বিরুদ্ধে নতুন কোন অভিযোগ করা যায়। ইমাম আপত্তি উত্থাপন করলে হারুন তা নাকচ করে এবং ঐ দাসীকে কারাগারে থাকতে বাধ্য করে। ইমাম ও দাসীর ব্যাপারে হারুনের গুপ্ত চরেরা সংবাদ দিল যে ঐ দাসী অধিকাংশ সময়ই সেজদাবনত অবস্থায় থাকে। হারুন বলল: আল্লাহ্‌র শপথ মুসা ইবনে জাফর (আ.) ঐ কন্যাকে যাদু করেছে অতঃপর খলিফা হারুনের নির্দেশে ১৮৩ হিজরী (৮০৫ খৃস্টাব্দে) এই মহান ইমামকে বিষ প্রয়োগ শহীদ করা হয়। যেখানে তাকে দাফন করা হয় স্থানটি অচিরেই একটি ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থানে পরিণত হয় এবং যার নামকরণ করা হয় কাযিমিয়া। অর্থাৎ ইমাম হযরত মুসা কাযেমের (আ.) এর শহর।

ইমাম হযরত আলী রেযা (৭৮৬-৮১৭ খ্রিস্টাব্দ)

ইমাম আলী রেযা ১৮৪ হিজরী মোতাবেক ৭৬৫ খৃস্টাব্দে হযরত মুসা কাযেমের শহর মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক নাম আবুল হাসান। তাঁর পিতা হযরত মুসা কাযেম (আ.) বর্ণনা করেন। আমি আমার কুনিয়াত তাকে দিয়েছি। তার উপাধি রেযা। তার মাতার নাম ছিল নাজমা। তিনি একজন পূণ্যশীলা উচ্চবংশীয়, ধর্মপরায়না ও বিদুষী রমনী ছিলেন। আল্লাহ্‌তালা তাঁর নাম আর রেযা রাখেন। কেননা, তিনি আকাশে আল্লাহ্‌র রেযা (সন্তুষ্টি) এবং পৃথিবীতে তাঁর রাসূলে মকবুলের রেযা ছিলেন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ইমাম গণের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে তিনি আপন মিত্রদের ন্যায় শত্রুদের প্রতি ও সন্তুষ্ট থাকতেন।

খলিফা মামুন (৮১৩-৮৩৩) কর্তৃক ইমাম আলী রেযাকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী নিয়োগ

খলিফা মামুন তার ভাই আমিনকে হত্যা করার পর হুকুমতের মসনদে আরোহণ করার পর এক নাজুক পরিস্থিতির শিকার হয়। কারণ তার অবস্থান বিশেষ করে বাগদাদে যা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেখানে এবং আব্বাসীয়দের মধ্যে যারা আমিনের পক্ষে ছিল ও মামুনের খলিফা হওয়াকে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করত এবং তা তাদের নিকট অস্থিতিশীল হিসাবে বিবেচিত হতো। কারণ হযরত আলী (আ.) এর অনুসারীদের আন্দোলন মামুনের হুকুমতের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ছিল। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রশমিত করার জন্য মামুন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাস সর্ম্পকিত বিষয়ে তার পূর্ববতীদের বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় মতবাদ বাদ দিয়ে সঠিক

ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে প্রযাসী হয়। তার মধ্যে রয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হিসাবে হযরত আলী (আ.) এর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। মুয়াবিয়ার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করা আইনগতভাবে বৈধ ঘোষণা। হযরত ফাতেমাতুয যাহরার সম্পত্তি হিসাবে খ্যাত "বাগে ফিদাক " যা রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তা তার মূল মালিককে ফেরত প্রদান। এরই ধারাবাহিকতায় খলিফা মামুন দৃশ্যত তাঁর পূর্ববর্তী শাসকদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভুল সংশোধনের লক্ষ্যে ইমাম রেযাকে (আ.) তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছিল। ইমাম রেযা মার্ভে প্রবেশের পর খলিফা মামুন ইমাম (আ.) এর কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করে যে, সে খেলাফত থেকে পদত্যাগ করে তা ইমাম রেযাকে প্রদান করতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে ইমামের মতামত সর্ম্পকে জানতে চায়। ইমাম মামুনের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এ প্রেক্ষিতে মামুন ইমামের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করে যে, যেহেতু ইমাম মামুনের প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি তাই ইমামকে অবশ্যই তার দ্বিতীয় প্রস্তাব অর্থাৎ ওয়ালী এ আহাদ (Crown prince or khalifa Designated) পদগ্রহণ করতে হবে মর্মে জানায়। ইমাম রেযা এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। তখন খলিফা মামুন ইমামকে নিজের কাছে ডেকে পাঠাল এবং তাঁর সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করল। মামুন বলল : আমার মত হল খেলাফত এবং মুসলমানদের শাসনকার্য আপনার হাতে অর্পণ করব। ইমাম তা গ্রহণ করলেন না। মামুন ওয়ালী আহাদ এর প্রস্তাবটি পুনর্ব্যক্ত করল। পুনরায় ইমাম তা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করলেন। মামুন বলল: ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) নিজের পর খিলাফতের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ গঠন করেছিলেন। আর ঐ ছয় সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন আপনারই পিতামহ আলী ইবনে আবি তালেব (আ.)। ওমর (রা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন ঐ ছয়জনের মধ্যে যে বিরোধিতা করবে তাকে শিরোচ্ছেদ করা হবে। তাই এখন আমি (মামুন) যা কামনা করেছি তা গ্রহণ করা ব্যতীত আপনার কোন পথ নাই। কারণ, আমার এ ছাড়া অন্য কোন উপায় বা পথ নাই। অর্থাৎ এ প্রস্তাবের মাধ্যমে ইমামকে হত্যার হুমকি দেয়া হলো। ইমাম রাজনৈতিক চাপের মুখে ওয়ালী আহাদীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং বললেন: বেলায়েত গ্রহণ করব এ শর্তে যে, কোন প্রকার হুকুমকারী, আদেশ নিষেধকারী। মুফতী, কাজী হব না এবং কাউকে পদচ্যুত করব না। কাউকে নিয়োগ দিব না। কোন কিছুর পরিবর্তন করব না। মামুন ইমামের সকল শর্ত মেনে নিল। প্রসঙ্গত আব্বাসীদের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আমীর আলী 'দি স্পিরিট অব ইসলাম' পুস্তকে লিখেছেন: ইসলামের আধ্যাত্ম ও পার্থিব কর্তৃত্বের বনী আব্বাসীয়দের অধিকার। বাইয়াত বা নামমাত্র নির্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত হল সাফফাহ (৭৪৯-৭৫৪) সিংহাসীনারোহনের সময় থেকেই আব্বাসীয় খলিফাগণ তাঁদের জীবদ্দশায় তাদের অভিপ্রেত উত্তরাধিকারীদের প্রতি রাজ্যের প্রধানদের আনুগত্য লাভের ব্যাপারে স্বাধীনতা অবলম্বন করতেন। আর নির্বাচন-নীতির ক্ষেত্রে নজীর ও প্রাচীন দৃষ্টান্ত থেকে বৈধতা ও পবিত্রতা মুদ্রিত করা অপরিহার্য। হয়েছিল....আব্বাসীয় রাজ বংশের অধিকারের সমর্থনে হাদীসের অনুসন্ধানে ইরাক ও হিজাজের প্রত্যেক জায়গা তছনছ করা হলো। আইনের বিশেষজ্ঞদেরকে পরিষ্কার ভাষায় গোড়া মতবাদের মূলনীতিসমূহ প্রণয়ন করতে হয়েছিল। আর ধীরে ধীরে আব্বাসীয় স্বার্থের সংকীর্ণ ভিত্তির উপর সুন্নী মযহাবের বৃহৎ সৌধ গড়ে উঠেছিল। যে সকল পণ্ডিত ও আইনজ্ঞ সুন্নী মযহাবের জন্ম ও বিবর্তনে সাহায্য করেছিলেন তাদের সাফল্য এসেছিল বহুলাংশে। ঐতিহাসিক আমীর আলী আরো লিখেছেন: মামুন ও তার দুজন অব্যবহিত উত্তরাধিকারীর সংস্কৃতি সম্পন্ন শাসনকালে মানবিক বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুশীলনে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের ধারণা প্রভাবিত করেছিল। তখন সুন্নী মযহাবের বিকাশে ছেদ পড়েছিল। এই সময় ছাড়া সমগ্র আব্বাসীয় খেলাফত (৭৫০-১২৫৮) সুন্নী মযহাবের মতবাদসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র এক সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। খলিফা ছিলেন ইমাম-পার্থিব প্রধান ও আধ্যাত্মিক প্রধান। আইন ও ধর্মের বিশেষজ্ঞ দল ছিলেন তার ভৃত্য। তিনি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতেন এবং তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রিত করতেন। এ কারণে সুন্নী মযহাব বিভক্ত হয়েছিল তা ক্রমশ অন্তর্হিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানেও এ চারটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং বহু মত ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরস্পর পৃথক। (ইমাম জাফর তুমির দাবিস্তানে উদ্ধৃত) মতানুযায়ী সুন্নীরা মূলত বিভক্ত ছিল। (তথ্য সূত্র: দি স্পিরিট অব ইসলাম পৃ-৪১৭-৪২০)।

হযরত ইমাম রেযার হাতে আব্বাসীয়দের বাইয়াত গ্রহণ

ইমাম (আ.) কর্তৃক বর্ণিত রূপে বেলায়েতী আহাদী পদ গ্রহণ করার পর খলিফা মামুন জনগণকে এ সম্পর্কে অবহিত করার ও রাজনৈতিকভাবে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মামুন এক অভিষেক ও আনুষ্ঠানিক বাইয়াতের আয়োজন করে। বৃহস্পতিবার মামুন তার সভাসদদের জন্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল ইমাম রেযা (আ.) ওয়ালী আহাদ সম্পর্কে মামুনের মতামত মানুষের নিকট তুলে ধরল এবং মামুনের এ আদেশ পৌঁছাল যে সকলকে সবুজ পোশাক (পূর্বে আব্বাসীয়দের কালো পোশাক ছিল) পরিধান করতে হবে এবং পরবর্তী বৃহস্পতিবারে ইমামের হাতে বাইয়াত করার জন্য উপাস্থিত হতে

হবে। নির্ধারিত দিবসে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ যেমন: সভাসদ সেনাপ্রধান, বিচারক ও অন্যান্যরা সকলেই সবুজ পোশাক পরিধান করে উপস্থিত হল। খলিফা মামুন বসল এবং ইমামের জন্যও বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা করা হলো। ইমাম (আ.) ও সবুজ পোশাক পরিধান করলেন ও মাথায় পাগড়ী পরলেন এবং তরবারি সাথে নিয়ে বসলেন। খলিফা মামুন আদেশ দিল যে তার পুত্র আব্বাস ইবনে মামুনই হবে ইমামের কাছে প্রথম বাইয়াতকারী। ইমাম তার হস্ত উচু করলেন এমনভাবে যে হাতের পশ্চাদদিক নিজদিকে এবং হাতের তালু বাইয়াতকারীর দিকে অবস্থান করছিল।

খলিফা মামুন বলল: বাইয়াতের জন্য আপনার হাত প্রসারিত করুন। ইমাম বললেন: আল্লাহ্ রাসূল (সা.) এ রূপেই বাইয়াত করতেন এবং তাঁর হস্ত একই রূপে হস্তসমূহের উপর ছিল ইমামের ভক্তরা কবিগন ইমামের মর্যাদা সম্পর্কে ও মামুনের কর্মের প্রশংসা করে বক্তব্য পেশ ও কবিতা আবৃত্তি করেছিল। অতঃপর মামুন বলল: আপনি খোতবা পড়ুন এবং বক্তব্য প্রদান করুন। ইমাম আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বললেন: মহানবী (সা.) এর দিক থেকে আপনাদের উপর আমার কিছু অধিকার আছে। আবার আমার উপরও আপনাদের কিছু অধিকার আছে মহানবীর (সা.) দিক থেকেও। অতএব, যখন আপনারা আমার অধিকার রক্ষা করলেন, আমারও আপনাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য। অতঃপর ঐ সভায় তিনি আর কিছু বললেন না, খলিফা মামুন ইমাম রেযার (আ.) এর নাম দেরহামের উপর মোহরাংকিত করার নির্দেশ দেয়। মুদ্রায় অংকিত হলো লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ আলী ওয়ালী আল্লাহ্।

ইমাম রেযা ও আব্বাসীয় খলিফা মামুনের ঈদের নামায

কোন এক ঈদের নামাযে ইমামতি করার জন্য খলিফা মামুন ইমাম (আ.) কে অনুরোধ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তাঁর সাথে যে সব শর্তে তিনি এ পদ গ্রহণ করেছে তার সাথে এ প্রস্তাব অসংগতিপূর্ণ। মামুন বলল: আমার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যাতে নিশ্চিত হতে পারে এবং আপনার সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারে। ইমাম বললেন, এ ক্ষেত্রে আমি আল্লাহ্র রাসূল (সা.) ও আমিরুল মোমেনীন আলী (আ.) মত খোলা আকাশের নীচে নামায আদায় করব। (রাজা-বাদশাহ্গণ এ সুন্নত পূর্বেই বাতিল গণ্য করে)। খলিফা মামুন তা গ্রহণ করল এবং বলল: আপনি যেভাবে ইচ্ছা বাইরে যেতে পারেন। মামুন আদেশ দিল যাতে সেনাপতিবর্গ, সভাসদগণ ও সাধারণ জনগণ ঈদের দিবসে প্রভাতে ইমামের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ঈদের প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে পথ প্রান্তর ভক্ত মানুষের পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং এমনকি নারী ও শিশু পর্যন্ত উপস্থিত হয় এবং ইমামের বাইরে আসার অপেক্ষায় থাকে। সেনাপতিগণ, সেনাবাহিনীসহ বাইরে আরোহিত অবস্থায় ইমামের গৃহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সূর্যোদয় হলো, ইমাম গোসল শরিফ শেষ করার পর পোশাক পরিধান করলেন। তুলার তৈরী শুভ পাগড়ী মাথায় পরলেন। পাগড়ীর একপ্রান্ত স্কন্ধের উপর ও অপর প্রান্ত পিঠ থেকে এনে স্কন্ধের উপর রাখলেন। সুগন্ধি মাখলেন এবং লাঠি হাতে নিয়ে এবং সঙ্গীদের বললেন: আমি যা করি তোমরা তাই করবে। অতঃপর নাঙ্গা পায়ে এবং পাজামা পায়ের গোড়ালী থেকে কিছুটা উপরে পরিধান করত যাত্রা শুরু করলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর মাথা আকাশের দিকে তুলে তাকবীর বললেন তাঁর সাহাবীরাও তাকবীরের জবাবে তাকবীর বলল: ইমাম একটি প্রান্তরে পৌঁছলেন এবং দাঁড়ালেন। সেনা ও সেনাপতিরা ইমামকে এরূপ করতে দেখলে তারাও বাহন থেকে অবতরণ করল এবং পাদুকা খুলে খালি পায়ে মাটির উপর দাঁড়িয়ে ছিল। ইমাম উক্ত প্রান্তরে তকবীর বললেন এবং জনতাও তার সাথে তাকবীর বলল। এত সুন্দর আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যেন আসমান জমিন তার সাথে তকবীর ধ্বনি করছে। মার্ভের সর্বত্র আনন্দাশ্রু কান্নার ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছিল। এই পরিস্থিতি দেখে তার মন্ত্রী ফাযল ইবনে সাহল খলিফা মামুনকে সংবাদ দিল: হে আমীর। ইমাম রেযা (আ.) যদি এভাবে নামাযের স্থানে যান তবে ফেতনা ও বিদ্রোহ সৃষ্টি হবে এবং আমরা সকলেই আমাদের প্রাণের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত্র, তাঁকে ফিরে আসার সংবাদ দিন। মামুন ইমামকে সংবাদ দিল: আমরা আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। আপনার কষ্ট হোক তা আমরা চাইনা। আপনি লোকজনসহ ফিরে আসুন। ইতিপূর্বে যে নামায পড়াতো সেই নামায পড়াবে। ইমাম তার পাদুকা নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। ইমাম (আ.) পাদুকা পরে বাহনে আরোহন করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। মামুনের এই নির্দেশে জনগণ বুঝতে পারল যে, খলিফা মামুন ইমামের ব্যাপারে যা কিছু করে তা কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এর মধ্যে প্রকৃত ধর্ম অনুভূতির বা বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নাই।

বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ইমাম আলী রেযার (আ.) উন্মুক্ত আলোচনা

আব্বাসীয় আমলে মুক্তবুদ্ধির যে চর্চার কথা প্রশংসা ভরে উচ্চারিত হয়ে থাকে তার সূত্রপাত করেন হযরত ইমাম আলী রেযা (আ.)। প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ লিখেছেন, মামুন পথভ্রষ্ট ব্যক্তি সকল ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কালামশাস্ত্রবিদদেরকে (ধর্ম বিশেষজ্ঞ) নিমন্ত্রণ করেছিল এবং তার প্রত্যাশা ছিল তারা ইমামকে পরাভূত করবে। আর এটা

ইমামের প্রতি মামুনের হিংসা ও পরশ্রীকাতরতাপ্রসূত যা সে তার কলুষিত হৃদয়ে লালন করছিল। কিন্তু ইমাম রেযা (আ.) এমন কারো সাথে বিতর্কে উপনীত হননি যে, অবশেষে ইমামের মর্যাদাকে স্বীকার করেনি ও মহান ইমামের যুক্তির কাছে পরাভূত হয়নি। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, খলিফা মামুন তার মন্ত্রী ফাযল ইবনে সাহলকে নির্দেশ দিল যাতে সে বিভিন্ন মাযহাব ও সম্প্রদায়ের প্রধানদেরকে নিমন্ত্রণ করে। যেমন ক্যাথোলিক ধর্ম যাজক, ইহুদী আলেমদের প্রধান আল জালুত। সাবেয়ীদের প্রধান যারায়ুষ্ট (অগ্নি উপাসক) ধর্মের প্রধান ও অনুসারীরা, রোমীয় তার্কিক ও কালাম শাস্ত্রবিদ জাছলিক: মসীহদের বিশপদের প্রধান, সাবেয়ীন; ফেরেশতা বা নক্ষত্র পূজারী অথবা যারা নবুয়তে ও শরীয়তে বিশ্বাসী নয়, হারযাব: হারযাবদের আরবীকৃত এবং অগ্নি কুন্ডলীর খাদেম, অগ্নিপূজকদের কাজী, যারা আকাইদশাস্ত্রে দক্ষ, তাদের সবাইকে এক উন্মুক্ত আলোচনা সভায় আহ্বান করল। খলিফা মামুন ইমামের বিশিষ্ট সহকারী ইয়াসিরের মাধ্যমে ইমাম রেযাকে অনুরোধ করেছিল যে, যদি তিনি রাজী থাকেন তবে বিভিন্ন মাযহাবের প্রধানগণের সাথে আলোচনায় বসতে পারেন। ইমাম জবাব দিলেন আগামীকাল আসব। ইমাম ফিরে গেলে ইমাম তার এক সহকারীকে বলেন, তুমি হলে ইরাকের অধিবাসী এবং ইরাকীরা খুব সচেতন। খলিফা মামুন যে মুশরিক ও বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদেরকে নিমন্ত্রণ করেছে। সে ব্যাপারে তুমি কী বুঝতে পারছো? সহকারী বলল: যে চায় আপনাকে পরীক্ষা করতে এবং আপনার জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে জানতে। ইমাম বললেন, তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে, তারা আমার যুক্তিকে অসার প্রতিপন্ন করবে? সহকারী বলল: আল্লাহ্‌র শপথ, কখনই আমি এ ব্যাপারে সন্ত্রস্ত্র নই। বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ্ আপনাকে তাদের উপর জয়যুক্ত করবেন। ইমাম বললেন: তুমি কি জানতে চাও মামুন কখন অনুতপ্ত হবে? বলল: জী হ্যাঁ। ইমাম বললেন: যখন তৌরাতের অনুসারীদের সাথে তাদের তৌরাত থেকে, ইঞ্জিলের অনুসারীদের সাথে তাদের ইঞ্জিল থেকে, যবুরের অনুসারীদের সাথে তাদের যবুর থেকে, সাবেয়ীনদের সাথে তাদের হিব্রু ভাষায়, যরায়ুষ্ট্র পুরোহিতদের সাথে তাদের ফার্সী ভাষায়, রুমীয়দের সাথে তাদের ভাষায় এবং প্রত্যেকের ভাষায় তাদেরকে যুক্তি প্রদর্শন করব, যখন প্রত্যেক দলকে পরাভূত করব এবং তাদের যুক্তিকে অসাড় প্রমাণ করব এবং তারা স্বীয় বিশ্বাস ও রীতি থেকে বিরত হয়ে আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে। মামুন নিজেই জানে যে, সে যে মসনদের উপর অধিষ্ঠিত হয়ে আছে তার অধিকারী সে নয়। আর এ সময় মামুন অনুতপ্ত হবে। তারপর ইমাম বললেন: পরবর্তী প্রভাতে তাদের সভায় উপস্থিত হলেন। ইহুদীদের প্রধান আলেম জালুত বলল: আমরা তোমার নিকট থেকে তৌরাত, ইঞ্জিল, দাউদের যাবুর, সহুফে ইব্রাহীম ও মুসা ব্যতীত কোন কিছুর উদ্ধৃতি গ্রহণ করব না। ইমাম (আ.) তার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। মহানবী (সা.) এর নবুওতের প্রমাণের জন্য ইমাম রেযা (আ.) তাদের সাথে তৌরাত, ইঞ্জিল ও যাবুর থেকে বিস্তারিত দলিল উপস্থাপন করেছিলেন। তারা ইমামকে তা সত্যায়িত করল। অতঃপর অন্যদের সাথেও কথা বললেন। যখন সকলে নিশ্চুপ হয়ে গেল। তখন ইমাম বললেন; ওহে লোক সকল। যদি তোমাদের মধ্যে কারো বিরোধিতা থেকে থাকে, কিংবা প্রশ্ন থেকে থাকে, তবে নিসংকোচে প্রশ্ন করতে পার। ইমরানী সাবা যে বিতর্কেও কালাম শাস্ত্রে অতুলনীয় ছিল, সে বলল, হে মহাজ্ঞানী। যদি আপনি প্রশ্ন করার জন্য আহ্বান না জানাতেন, তবে প্রশ্ন করতাম না, কারণ আমি কুফা, বসরা, শাম ও আলযেরিয়া গিয়েছিলাম এবং ঐ শহরসমূহের কালাম শাস্ত্রবিদদের সাথে কথা বলেছিলাম। কিন্তু এমন কাউকে পাইনি যে আল্লাহ্‌র একত্বকে আমার জন্য প্রমাণ করতে পেরেছিল। ইমাম (আ.) বিস্তারিত দলিল উপস্থাপনের মাধ্যমে একক প্রভুর অস্তিত্বের প্রমাণ তার জন্য বর্ণনা করলেন। ইমরান তুষ্ট হল এবং বলল: হে আমার নেতা, আমি অনুধাবন করতে পেরেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মহান আল্লাহ্, আপনি যেরূপে বর্ণণা করেছেন সেরূপই আছেন; আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র বান্দা যাকে তিনি মানব সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্য সঠিক দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। অতঃপর সে কেবলামুখী হল এবং সেজদাবনত হল ও ইসলাম গ্রহণ করল।

ইমাম রেযা (আ.) এর কেরামত

আবু ইসমাইল সিন্ধী বলেন: আমি যখন হযরত আলী রেযা (আ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, তখন আরবী ভাষার আলিফ, বা ও জানতাম না, আমি সিন্ধী ভাষায় তাঁকে সালাম করি এবং তিনি সেই ভাষায়ই জওয়াব দেন। এরপর আমি আমার ভাষায় কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। তিনি একই ভাষায় সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। আমি ফিরে আসার সময় আরজ করলাম: আমি আরবী বলতে পারিনা। আপনি দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্‌তালা আমাকে এ ভাষা এলহাম করেন। তিনি নিজের পবিত্র হাতে আমার ঠোঁটের উপর বুলালেন। আমি তখন আরবীতে কথা বলতে শুরু করলাম।

বর্ণণাকারী বলেন, আমি একদিন হযরত ইমাম রেযা (আ.) এর সাথে এক বাগানে আলাপ করছিলাম। হঠাৎ একটি পাখি এসে মাটিতে পড়ে গেল এবং অস্থির অবস্থায় চিঁচিঁ করতে লাগল। ইমাম বললেন: তুমি জান সে কি বলছে? আমি বললাম: না। তিনি বললেন; সে বলছে। এই ঘরে একটি সাপ প্রবেশ করেছে। সাপটি তার বাচ্চাগুলোকে

খেয়ে ফেলতে চায়। তিনি আমাকে বললেন: উঠ, এই ঘরে গিয়ে সাপটি মেরে ফেল। আমি গিয়ে সেটি মেরে ফেললাম।

বর্ণিত আছে যে; জনৈক ব্যক্তি অতি উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র দিয়ে এহরামের চাদর তৈরি করে। এহরাম বাঁধার সময় তার মনে হলো রেশমী কাপড়ের এহরাম হালাল না হারাম। বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হল। শেষ পর্যন্ত রেশমী কাপড় বর্জন করে সে অন্য কাপড় পরিধান করল। মক্কা পৌছার পর সে হযরত আলী রেযা (আ.) এর খেদমতে একটি পত্রসহ সেই কাপড়ও পাঠিয়ে দিল। কিন্তু রেশমী বস্ত্রের এহরাম জায়েজ কিনা। একথা পত্রে লিখতে ভুলে গেল। অথচ এ উদ্দেশ্যেই পত্রটি লেখা হয়েছিল। অবশেষে দূত পত্রের জবাব নিয়ে ফিরে এলো। পত্রের শেষ ভাগে তিনি লিখেছিলেন : যদি কেউ রেশমী বস্ত্রে এহরাম বাঁধে তবে তাতে কোন দোষ হবে না।

জনৈক রাবী বর্ণনা করেন : বাইয়ান ইবন ছলাত আমাকে বলল : আমি হযরত আলী রেযার (আ.) এর সাথে এই আশায় সাক্ষাৎ করতে চাই যে, তিনি আমাকে নিজের কোন কাপড় পরাবেন এবং কয়েকটি দিরহামও দান করবেন। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমার জন্য সাক্ষাতের অনুমতি হাসিল করুন। এরপর আমি যখন হযরত আলী রেযার দরবারে হাজির হলাম। তখন কোন কিছু বলার আগেই তিনি আমাকে বললেন : রাইয়ান ইবনে দলত এখানে হাজির হতে চায়, যাতে আমি তাকে কাপড় পরিধান করাই এবং আমার নামে জারীকৃত দিরহাম থেকে কয়েকটি দিরহাম দেই। রাইয়ানকে এখানে নিয়ে এস। রাইয়ান ভিতরে গেলে তিনি তাকে দুটি কাপড় এবং ত্রিশটি দেরহাম দান করলেন।

জনৈক কুফাবাসী বর্ণনা করেন, আমি যখন খোরাসানের উদ্দেশ্যে কুফা থেকে রওয়ানা হই। তখন আমার কন্যা আমাকে উৎকৃষ্ট কাপড় দিয়ে বলল : আব্বাজান, এটি বিক্রয় করে আমার জন্য ফিরোজা পাথর কিনে আনবেন। আমি মার্ভে পৌছালে হযরত আলী রেযার (আ.) ভক্তদের একজন এসে আমাকে বলল : আমাদের একজন সঙ্গী মারা গেছে। তার কাফনের জন্য এই কাপড় আমাদের কাছে বিক্রয় করুন। আমি বললাম : আমার কাছে কোন কাপড় নেই। একথা শুনে সে চলে গেল। কিন্তু পুনরায় এসে বলতে লাগল : আমাদের প্রভু আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনার কাছে একটি কাপড় আছে। যা আপনার কন্যা বিক্রয় করে ফিরোজা কিনে নেয়ার জন্য আপনাকে দিয়েছে। আমি এর মূল্য নিয়ে এসেছি। আমি কাপড় তাকে দিয়ে দিলাম এবং মনে মনে বললাম : হযরত আলী রেযা (আ.) কে কয়েকটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করব। দেখি তিনি কি জওয়াব দেন। সে মতে আমি কয়েকটি মাসআলা একটি কাগজে লিখে অতি প্রত্যুষে তাঁর বাস ভবনে পৌছে গেলাম। সেখানে অনেক জনসমাগম ছিল। এই ভিড় ঠেলে তাঁর সাথে দেখা করা সহজ ছিল না। আমি বিস্ময়বিষ্ট হয়ে দাড়িয়েছিলাম। এমন সময় তাঁর এক গোলাম বাইরে এল এবং আমার নাম নিয়ে একটি লিখিত কাগজ আমাকে দিয়ে বলল : এ গুলো তোমার প্রশ্নের জওয়াব। আমি দেখলাম যে তাতে হুবহু আমার প্রশ্নগুলোরই জওয়াব লিখিত ছিল।

শাহাদত

মামুন অবশেষে ইমামকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। কারণ সে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, ইমাম (আ.) কে কোন ভাবেই নিজের হাতের পুতুল বানানো সম্ভব নয়। অপর দিকে জনগণের নিকট ইমামের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ইমামকে ব্যক্তিত্ব হীন করতে মামুন তার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও ইমামের সম্মান ও ব্যক্তিত্ব দিনের পর দিন চূড়ান্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে থাকল। মামুন জানত যে, যতই সময় গড়াবে ইমামের সত্যতা তত বেশি প্রকাশ পাবে এবং আর মামুনের কপটতা তত বেশি প্রকাশিত ও স্পষ্টতর হবে। অন্যদিকে আব্বাসীয় ও তাদের অন্ধভক্ত অনুসারীগণ ইমামকে ওলী আহাদ নিযুক্ত করার জন্য মামুনকে অপছন্দ করতে শুরু করে ছিল। এমনকি এর প্রতিবাদে আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধবাদী ইবরাহীম ইবনে আব্বাসীয়ার হাতে বাগদাদে বাইয়াত করেছিল। আর এভাবে মামুনের সরকার বিভিন্ন দিক থেকে বিপদজনক অবস্থায় পতিত হয়েছিল। সুতরাং মামুন ইমামকে গোপনে হত্যা করতে উদ্যত হল। ইমামের খাদেম আবু দলত বলেন: সকাল হলে হযরত ইমাম রেযা (আ.) কাপড় পরিধান করলেন এবং মামুনের গোলামের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। যথা সময়ে তিনি মামুনের কাছে গেলেন। মামুনের কাছে ফলমূলের ভরা একটি খাঞ্চা রাখা ছিল এবং মামুন আঙ্গুরের গুচ্ছ ধরে রেখেছিল। হযরত রেযাকে দেখে মামুন নিজের আসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন এবং হুজুরের সাথে কোলাকুলি করে তার কপাল চুম্বন করলেন। এরপর আঙ্গুরের গুচ্ছ তাকে দিয়ে বললেন: হে ইবনে রাসূলুল্লাহ্ আপনি এই আঙ্গুরের চেয়ে উৎকৃষ্ট আঙ্গুর কখনও দেখেছেন? তিনি বললেন খান। ইমাম তা থেকে দু দিনটি দানা খেলেন এবং বাকীগুলো রেখে দিলেন। এরপর প্রস্থানোদ্যত হলে মামুন বললেন: আপনি কোথায় যাচ্ছেন? ইমাম জবাব দিলেন যেখানে আপনি পাঠিয়েছেন (অর্থাৎ মৃতের দেশে) অতঃপর তিনি মাথায় কিছু না বেধে বাইরে এলেন। আমি তার সাথে কথা বললাম না। তিনি নিজের সরাইখানায় এসে বললেন: সরাইখানার দরজা বন্ধ করে দাও। এরপর তিনি নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন আমি সরাইখানায় হত

চকিত ও চিন্তিত অবস্থায় অপেক্ষমান রইলাম। হঠাৎ আমি একজন সুশ্রী যুবককে দেখলাম। তাঁর কেশদাম সুবাসিত ছিল। তাঁর আকার আকৃতি ইমাম রেযার চেহারার মত ছিল। আমি দৌড়ে তার কাছে গেলাম এবং আরয করলাম: আপনি এখানে কিরূপে এসে গেলেন? দরজা তো বন্ধ ছিল। যুবক বললেন: আমাকে সেই ব্যক্তি এনেছে যে, মুহূর্তের মধ্যে যে কোন লোককে মদীনা থেকে নিয়ে আসে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কে? তিনি বললেন: আমি হুজ্জাতুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আলী। আমি পিতার কাছে এসেছি। অতঃপর আলী রেযা (আ.) তাকে দেখে দাঁড়ালেন। তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে কপালে চুম্বন করলেন এবং আপন বিছানায় নিয়ে বসতে দিলেন। যুবক তার মুখ মণ্ডলে স্বীয় পিতার দিক করে বসে গেলেন এব কিছু গোপন কথাবার্তা বললেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। এরপর আমি হযরত রেযার উভয় ঠোঁটে বরফের মত সাদা কিছু ফেনা দেখলাম যা মোহাম্মদ ইবনে আলী টেনে নিলেন। এরপর তিনি স্বীয় পিতার পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে হাত ঢুকালেন এবং ছোট পাখির এক বস্তু তার বক্ষ থেকে বের হয়ে এলো এবং মাটিতে পড়ে গেল। ঠিক তখনি হযরত ইমাম রেযার ইন্তেকাল হয়ে গেল" (৮১৭ খৃষ্টাব্দ)। (তথ্য সূত্র: শাওয়াহে দুন-নবুয়ত মূল : আল্লামা আব্দুর রহমান জামী)। উল্লেখ্য মামুন তার কপট ও শঠতাপূর্ণ কর্মের মাধ্যমে কেবলমাত্র ইমামকেই বিষ প্রয়োগ ও হত্যা করে নি বরং ইমামের অনেক আত্মীয়-স্বজন ও বিশ্বস্ত অনুসারী ও ভক্তদের হয় হত্যা করেছিল নতুবা গৃহ হারা করে পাহাড় পর্বতে নির্বাসন দিয়েছিল। তাদের যোগাযোগ এত সংকীর্ণ করে ফেলেছিল যে তারা গোপনে কোন এক কোণে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশেষে কেউ কেউ শাহাদতের পেয়ালা পান করেছিলেন। আবার কেউ কেউ অখ্যাত ও অপরিচিত অবস্থায় দিনাতিপাত করত মৃত্যু বরণ করেছিল তাদের অনেকেরই জীবনী ইতিহাস বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছে। সবচেয়ে ভয়াবহ কথা হলো হযরত ইমাম আলী রেযার মহান জ্ঞান ও শিক্ষা এবং আহলে বাইতের সঠিক মর্যাদা সমাজ জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে অপসারণ করে সে ও তার দরবারী আলেম এক নতুন ইসলাম ধর্ম চালু করেছিল। যার কুফল মুসলিম সমাজে এখন পর্যন্ত সগৌরবে বিরাজমান।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ইমাম মোহাম্মদ ইবন আলী ত্বাকী আল জাওয়াদ (৮১০-৮৩৫)

ইমাম মোহাম্মদ ত্বকী ১৯৫ হিজরী (৮১০ খৃষ্টাব্দ) মদিনায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম রেযার বয়স যখন ৪৫ বৎসর তখন ইমাম ত্বকী জন্মগ্রহণ করেন তাঁর মাতা ছিলেন সাধিকা। তিনি অত্যন্ত পবিত্র চরিত্রের মহিলা ছিলেন। রাসূল (সা.) এর মিশরীয় খৃস্টান স্ত্রী মারিয়া বংশের এই সম্মানিতা মহিলা সর্ম্পকে ইমাম মুসা কাযেম বলেছেন : আমার পুত্র বধু এক অনন্য ধর্মানুসারী মহিলা হবেন। তাঁকে ইমামের সালাম জানানোর জন্য ইমাম মুসা তাঁর একজন সাহাবীকে নির্দেশ দেন।

ইমাম ত্বকীর ইমামত

হযরত ইমাম আলী রেযার অকাল মৃত্যুর পর ইমাম আলী ত্বকী আল্লাহ্‌র নির্দেশে এবং পূর্ববর্তী ইমামগণের নির্দেশনায় ইমামতের পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁর বয়স ছিল আট বৎসর। তিনি ছোট বয়স থেকেই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। বিনয়ী ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর বয়স কম থাকার কারণে জনগণ যুগের ইমামের অনুসন্ধান করতে থাকেন। এমনই এক সময়ে হজের অনুষ্ঠান শেষে ইমানদার মুসলমানদের মহান আলেম, ফকীহ ও জ্ঞানী গুণীজন তাঁর দরবারে উপস্থিত হন। তখন তাঁর কাছে সেই যুগের সবচেয়ে কঠিন ত্রিশ হাজার প্রশ্ন করা হলে তিনি সকল প্রশ্নের জবাব দেন। আব্বাসীয় খলিফা মামুন তার জ্ঞান মেধা সর্ম্পকে অবগত হয়ে তাঁকে বাগদাদে ডেকে পাঠায়। ইমাম বাগদাদে এসে খলিফা মামুনের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে কোন রাস্তায় ছেলেদের সাথে খেলছিলেন। এমন সময় মামুন শিকারের উদ্দেশ্যে ঐ গলি অতিক্রম করছিলেন। অন্য শিশুরা মামুনকে দেখেই দৌঁড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আলী ত্বকী দাঁড়িয়ে রইলেন। মামুন ইমামকে জিজ্ঞাসা করল : তুমি কেন অন্যসব কিশোরদের মত ছুটে পালাও নি? ইমাম উত্তর দিলেন : হে খলিফা, এখানে পথ এমন অপ্রশস্ত নয় যে আমাকে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হবে। আর আমি আপনার কাছে এমন কোন অপরাধ করিনি যাতে ভয়ে আমাকে পালাতে হবে। আর আপনি ও তো কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেন না। ইমামের এ ধরনের সাহস ও সুন্দর ও আকর্ষণীয় চেহারা দেখে মামুন জিজ্ঞাসা করল তোমার নাম কি? ইমাম জবাব দিলেন মোহাম্মদ। তোমার পিতার নাম কি? তিনি উত্তর দিলেন আলী বিন মুসা (রেযা)। মামুন শিকার শেষ করে ফেরার পথে পুনরায় সেই পথ অতিক্রম করেছিলেন। ইতোমধ্যে খলিফা মামুনের পোষা বাজ একটি ছোট মাছ ধরে নিয়ে আসে। মামুন সেই মাছটি তার মুষ্টিতে আবদ্ধ করে রেখেছিল। মামুন ইমামকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার হাতের মুঠোয় কি আছে বল তো? ইমাম জবাব দিলেন : মহান সৃষ্টিকর্তা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে মেঘ সৃষ্টি করেছেন। রাজার বাজ পাখি সেখান থেকে মাছ শিকার করে রাজাকে দেয়। রাজা সেই সৃষ্টিকে গোপন করে নবী বংশের সন্তানদের জিজ্ঞাসা করে : আমার মুঠিতে কি আছে? মামুন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলে : সত্যই তুমি ইমাম আলী রেযার উপযুক্ত সন্তান। মামুন ইমামকে তার সাথে করে রাজ প্রাসাদে নিয়ে যায় এবং তার প্রাসাদের পাশেই তাঁর বাস ভবনের ব্যবস্থা করে। মামুন, ইমামের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, মেধা ও কোরান হাদীসের অসাধারণ ব্যাখ্যার যোগ্যতা দেখে তার বংশের নেতৃস্থানীয় লোকদের ইমামের পরামর্শ অনুযায়ী চলার পরামর্শ দেয়। "কিন্তু আব্বাসীয় বংশের লোকেরা এমনিতেই আহলে বাইতের সদস্যদের প্রতি শত্রুতা ভাবাপন্ন ছিল মামুনের এ প্রস্তাবে আরো মনোক্ষুন্ন হলো। অবস্থার আরো উন্নতি হলো। যখন মামুন ঘোষণা করলো এই ইমামের সাথে সে তার কন্যা উম্মল ফযলকে বিবাহ দিবে " তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই এ প্রস্তাবে অনীহা প্রকাশ করে। তাই মামুন প্রস্তাব করে যে, যেহেতু ইমামের বয়স খুব কম তাই বাগদাদ তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমদের ডেকে ইমামের কুরআন হাদিস ও মাসআলা বিষয়ক জ্ঞান গরিমা পরীক্ষা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে রাজ দরবারে এক মহা সম্মেলন (Grand Council) ডাকা হলো। রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি 'কাজীউল কুজ্জাত' (Chief Justice) ইয়াহিয়া বিন আখতাম ইমামকে প্রশ্ন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। এই সম্মেলনে রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ৯০০ জন আলেম উপস্থিত ছিলেন। ইমামের বয়স তখন মাত্র ১২ বৎসর। প্রধান বিচারপতির কোন ধারণা ছিলনা যে, আহলে বাইতের এই ইমাম যে কি অসাধারণ জ্ঞানী ও বিদ্বান। তাই সে তার ধারনা অনুযায়ী হজ বিষয়ক একটি জটিল মাসআলা ইমামকে জিজ্ঞাসা করলো : কোন এহরাম পরা ব্যক্তি কোন প্রাণীকে শিকার করতে গিয়ে মেরে ফেলে তাহলে তার কর্তব্য কি? ইমাম উত্তরে জিজ্ঞাসা করলেন, শিকারকে হেরেম শরীফের মধ্যে হত্যা করেছে না বাইরে? সে স্বেচ্ছায় হত্যা করেছে না অনিচ্ছায়? সে সকল বিধি বিধান সর্ম্পকে অবহিত হয়ে হত্যা করেছে, না অজ্ঞাত অবস্থায় হত্যা করেছে? সে স্বাধীন ব্যক্তি না ক্রীতদাস ছিল? সে প্রাপ্ত বয়স্ক না অপ্রাপ্ত বয়স্ক? এটা কি তার প্রথম শিকার করা প্রাণী না পূর্বে ও সে আরো শিকার করেছে? সে যে প্রাণীকে হত্যা করেছে সেটা কি পাখি না অন্য প্রজাতির প্রাণী ? শিকার করা প্রাণী ছোট ছিল না বড়? সে এ হত্যা করাতে অনুতপ্ত না অনুতপ্ত নয়? এ কাজটি সে কি রাতে করেছে না দিনে? আর এ ইহরাম হজ্জ উপলক্ষে না ওমরাহ পালনের ইহরাম? ইসলামী খিলাফতের প্রধান বিচারপতি এত সব প্রশ্ন এক সাথে শুনে কিংকর্তব্য বিমুঢ় হয়ে গেল। সে কি উত্তর দিবে তা না বুঝতে

পেরে দিশেহারা হয়ে গেল। তার চেহারার রং পাল্টে গেল এবং তার পরাজয় সবার কাছে স্পষ্ট ধরা পড়লো। মামুন সভার অবস্থা দেখে সকলকে বলল : দেখেছো তো তাকে চিনতে পেরেছো তো। অতঃপর ইমামের দিকে ফিরে বলল, তুমি বিয়ের খুতবা পড়তে পারো। ইমাম হ্যাঁ। মামুন বলল : তোমার জন্য আমার মেয়ে উম্মল ফাজলের বিয়ের খুতবা পড়তে পার। ইমাম বিয়ের খুতবা পড়লেন। এই বিয়ের খুতবাটি তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সভার এক পর্যায়ে খলিফা মামুন ইমামকে ইহরাম পরিহিত ব্যক্তির কাফকারা সম্পর্কে ইমাম কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন সমূহের শরীয়ত সম্মত সমাধান জানতে চাইলে ইমাম বলেন : যদি সেই ব্যক্তি হেরেম শরীফের বাইরে শাখা বিশিষ্ট বড় ধরণের প্রাণী হত্যা করে তাহলে একটি ভেড়া কাফফারা দিতে হবে। যদি সে তা হেরেম শরীফের মধ্যে করে তাহলে এর দ্বিগুন কাফফারা দিতে হবে। যদি সে একটি ছোট পাখি হেরেম শরীফের বাইরে হত্যা করে তাহলে তার কাফফারা হবে একটি ভেড়ার ছানা যা সবে মাত্র মায়ের দুধ খাওয়া বন্ধ করেছে। যদি এটি হেরেম শরীফের মধ্যে করে থাকে তাহলে একটি ভেড়ার বাচ্চা ও পাখির ছানার মূল্যের সম পরিমান অর্থ কাফফারা আদায় করতে হবে। যদি পশুটি বন্য যথা বন্য গর্দভ হয়ে থাকে তাহলে একটি গরু কাফফারা হিসাবে দিতে হবে। যদি প্রাণীটি উট পাখি হয়ে থাকে তাহলে একটি উট কাফফারা দিতে হবে। যদি প্রাণীটি একটি হরিণ হয়ে থাকে তাহলে একটি ভেড়া কাফফারা আদায় করতে হবে। যদি শিকার কার্যটি হেরেম শরীফের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে কাফফারা দ্বিগুন আদায় করতে হবে। ইমামের প্রশ্নোত্তর শুনে মামুন, প্রধান বিচারপতি সহ উপস্থিত আলেম সমাজ স্তব্ধ হয়ে গেল। তখন মামুন ইমামকে বলল : ইমাম কি প্রধান বিচারপতিকে কোন প্রশ্ন করতে আগ্রহী। ইমাম তখন প্রধান বিচারপতিকে প্রশ্ন করলেন : এমন এক ব্যক্তির পরিচয় দিন যে, যার দিনের শুরুতে এক নারীকে স্পর্শ করা হারাম, দিনের মধ্য ভাগের আগে স্পর্শ করা বৈধ, হয়ে যায়। আবার দুপুরে তাকে স্পর্শ করা হারাম হয়ে যায়। অতঃপর বিকালে স্পর্শ, বৈধ হয়ে যায়। অথচ সন্ধাবেলা তাকে স্পর্শ করা হারাম হয়ে যায়। আবার ঈশার সময় তাকে স্পর্শ করা বৈধ হয়ে যায়। তারপর মধ্য রাতে তাকে স্পর্শ করা হারাম হয়ে যায়। আবার ভোর বেলা তাকে স্পর্শ করা বৈধ হয়ে যায়। এখন বল কি কারণে এই মহিলা ঐ পুরুষের জন্য কখনো হারাম আবার কখনো বৈধ হলো? ইয়াহিয়া বলল : এ জাতীয় বিষয় আমি কখনো শুনিনি আর জানিও না। তখন ইমাম বললেন : ঐ মহিলাটি প্রথম অবস্থায় ঐ পুরুষের জন্য ছিল হারাম। কিন্তু যখন বেলা হলো তখন সেই দাসীকে সে ক্রয় করল, ফলে সে তার জন্য বৈধ হয়ে গেল। আর দুপুর বেলা তাকে মুক্ত করে দেওয়া হলো তখন হারাম হয়ে যায়। পুনরায় বিকালে তাকে সে বিয়ে করলো ফলে তাকে স্পর্শ করা তার জন্য বৈধ হয়ে গেল। সন্ধ্যা বেলা তাকে জিহার (স্ত্রী সর্ম্পকে এমন বাক্য উচ্চারণ করা যাতে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়) করলো ফলে সে তার জন্য হারাম হয়ে গেল। অতঃপর ঈশার সময় জিহারের কাফফারা পরিশোধ করে দিলো ফলে সে তার বৈধ স্ত্রী হয়ে যায়। অতঃপর মধ্য রাতে তাকে তালাক দিলো ফলে তাকে স্পর্শ করা তার জন্য হারাম হয়ে গেল। আবার ভোর বেলা সে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করলো ফলে সেই নারী তার জন্য বৈধ হয়ে গেল। এতক্ষণ উপস্থিত সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত নিথর ও চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। খলিফা মামুন তাদের নীরবতা ভেঙে দিয়ে বলল : তোমরা এমন পন্ডিত ও জ্ঞানী কারো সন্ধান রাখ কি? তাও এই বয়সে? সবাই বলল : না, ইবনুর রেযা সকল জ্ঞানী গুনীজনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এভাবে মামুন ইমামকে তার কাছে রেখে দেয়। ইমাম ত্বকী বেশ কিছু দিন বাগাদাদে অবস্থান করার পর মামুনের অনুমতিক্রমে মদিনায় ফিরে যান এবং মামুনের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। খলিফা মামুনের মৃত্যুর পর তার ভাই মুতাসিম (৮৩৩-৮৪২ খৃ) খলিফা হয়। এরপরই খলিফা মুতাসিম ইমামকে পুনরায় বাগদাদে ডেকে পাঠায় এবং তাঁকে নজরবন্দী করে রাখে। সে ইমামকে অপদস্থ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় আলেম ও জ্ঞানীদের আলোচনা সভায় উপস্থিত রাখত এবং বিভিন্ন বিষয়ে ইমামের মতামত চাইত। ইমাম অনেক সময় চুপ থাকতেন বা তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন। এমনই এক সভায় একজন চোরকে উপস্থিত করা হলো যে নিজের চুরির অভিযোগ স্বীকার করেছে। খলিফা বাগদাদের তৎকালীন বিচারপতি ইবনে দাউদের কাছে চোরের শাস্তি ও হাত কাটার পরিমান সর্ম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, হাতের কোন অংশটুকু কাটতে হবে। ইবনে দাউদ : হাতের কব্জী থেকে। খলিফা বলল : তোমার দলিল কি? সে বলল : তায়াম্মমের এই আয়াতটি (সূরা নিসার ৪৩ নম্বর আয়াত) মহান আল্লাহ্ এখানে হাত বলতে কব্জী থেকে নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত অংশকে বুঝিয়েছেন। তাই হাত কাটার অর্থ হলো কব্জী থেকে কেটে ফেলা। এ কথায় উপস্থিত আরো অনেক আলেম ওলামা এর পক্ষে মত দেন। তবে আরেকাংশ আলেম তারা বললেন : কনুই থেকে হাত কেটে ফেলা উচিত। কেননা মহান আল্লাহ্ অজুর আয়াতে বলেন (সূরা মায়েদার ৬ নম্বর আয়াত)। সুতরাং হাত হলো কনুই পর্যন্ত। অতঃপর খলিফা মুতাসিম ইমাম মোহাম্মদ ত্বকীর (আ.) এর দিকে ফিরে বলেন : তুমি কি বলতে চাও? ইমাম বললেন : উপস্থিত সকলেই তো বললেন তাই এ বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করা থেকে আমাকে রেহাই দেন। মুতাসিম কসম খেয়ে বললো না আপনাকে

বলতেই হবে। ইমাম বললেন : ঐ চোরের শাস্তি হলো তার বুড়ো আঙ্গুল বাদে বাকি চারটি আঙ্গুল কাটতে হবে। খলিফা বলল : তোমার দলিল কি? ইমাম বললেন : রাসূল (সা.) বলেছেন। সিজদাতে সাতটি অঙ্গ অবশ্যই মাটি স্পর্শ করতে হবে। এই সাতটি অঙ্গের মধ্যে দু হাতের দুটি তালু। তাই যদি চোরের হাতকে কব্জি অথবা কনুই হতে কাটা হয় তাহলে তার কোন তালুই অবশিষ্ট থাকছে না যা দিয়ে সে সিজদা করবে। আর সিজদার স্থান হলো আল্লাহ্‌র প্রাপ্য তাই এখানে অন্যের কোন অধিকার নাই যে, তারা ঐ অঙ্গ কেটে নেবে। কেননা আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয় সিজদার স্থানসমূহ আল্লাহ্‌র (সূরা জীন : ১৮) খলিফা ইমামের কথা শুনে তা পছন্দ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন চোরের হাত থেকে চারটি আংগুল কাটতে। উল্লেখ্য ইমাম তাকী বা আহলে বাইতের মহান ইমামদের পবিত্র কুরআন ও হাদিস ভিত্তিক সঠিক ব্যাখ্যার অধিকাংশ মুসলিম সমাজে গৃহীত হয় নাই বরং অন্য ব্যক্তিদের সম্মিলিত মত (ইজমা) কিয়াস (সাদৃশ্য মূলক)। ইজতেহাদ (যৌক্তিক সিদ্ধান্ত মতামতের ভিত্তিতে) বর্তমান প্রচলিত ইসলামী ফিকাহ অনুসরণ করা হচ্ছে।

হযরত ইমাম ত্বকীর কেরামত

১. উম্মে ফযলকে বিবাহ করার পর যখন তিনি মদীনা মুনাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন পথিমধ্যে কয়েকদিনের জন্য কুফায় অবস্থান করেন। শেষ দিন তিনি এক মসজিদে গমন করেন। সেখানে একটি কুল বৃক্ষ ছিল। যাতে কোন দিন ফল আসত না। ইমাম ত্বকী পাত্রে পানি নিয়ে বৃক্ষের গোড়ার কাছে বসে ওযু করলেন। এরপর মাগরিব নামায পড়ার জন্য মসজিদে চলে গেলেন। নামায শেষ করে তিনি বৃক্ষের গোড়ায় পৌঁছে দেখলেন যে তাতে বিচি ছাড়া মিষ্ট কুল ধরেছে। মানুষ এই ফল বরকত স্বরূপ নিয়ে খেত।

২. জনৈক প্রত্যক্ষকারী বর্ণনা করেন যে: আমি ইরাকে থাকাকালে শুনতে পেলাম যে সিরিয়াতে কেউ একজন পয়গম্বরী দাবী করেছে এবং তাকে আষ্টে পৃষ্টে বন্দী করে রাখা হয়েছে। আমিও সেখানে পৌঁছে গেলাম। আমি নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে কিছু বকশিস দিয়ে লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার ঘটনা কি? সে বলল: আমি সিরিয়ার সেই মসজিদে ইবাদতে মশগুল ছিলাম, যে মসজিদে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) এর শির মোবারক বর্শার ফলকে রাখা হয়েছিল। কোন এক রাতে আমি যিকিররত থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি আমার কাছে হাজির হল এবং আমাকে দাঁড়াতে বলল। আমি দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। সামান্য দূর যেতেই আমি নিজেকে কুফার মসজিদে আবিস্কার করলাম। লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলো তুমি জান এটা কোন জায়গা? আমি বললাম: এটা কুফার মসজিদ। অতঃপর সে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। আমিও তার অনুসরণ করলাম। নামায শেষে সে মসজিদের বাইরে চলে গেল। আমিও তার সাথে বাইরে এলাম। সে কিছুক্ষণ পথ চলল এবং আমিও চললাম। অতঃপর আমি দেখলাম যে আমি মসজিদে নববীতে এসে গেছি। আমি রাসূল (সা.) এর মাযার জিয়ারত, সালাত, সালাম পাঠ করলাম। কিন্তু সে নামাযে মশগুল হয়ে গেল। আমিও নামায আদায় করলাম। অতঃপর সে বাইরে এলে আমিও বাইরে এলাম। কিছুদূর চলায় আমি নিজেকে মক্কার বায়তুল্লাহ্ শরিফে গেলাম। সে আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং আমি নিজেকে সিরিয়ার সেই প্রথম মসজিদেই গেলাম। এহেন পরিস্থিতিতে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। পরবর্তী বছর আবার এরূপ ঘটল। লোকটি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করল এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে বিগত বছরের ন্যায় বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেল। যখন আমি স্বস্থানে ফিরে এলাম এবং আমাদের একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এল তখন আমি বললাম তোমাকে সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কসম, যিনি তোমাকে এই অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন-বল তুমি কে? সে বলল আমি মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুসা ইবনে জাফর। সকাল হলে আমি এ ঘটনা আমার কিছু আপন লোকের কাছে বর্ণনা করলাম। এক পর্যায়ে তা সিরিয়ার গভর্নরের কাছেও পৌঁছেছে। সে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা নবুয়ত দাবির অভিযোগ এনে আমায় বন্দী করল। এই পরিস্থিতিতে আমি সব কিছু বিস্তারিত জানিয়ে বাদশাহ্‌র কাছে পত্র লিখলাম। বাদশাহ্ আমাকে জানালেন যে ব্যক্তি তোমাকে একই রাতে সিরিয়া থেকে কুফা, কুফা থেকে মদীনা, মদীনা থেকে মক্কা এবং মক্কা থেকে সিরিয়ায় ফিরিয়ে আনতে পারে। তাকেই বল তোমাকে এই বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে। বাদশাহ্‌র এই জবাব শুনে আমি (বর্ণনাকারী) খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি। পরের দিন সকালে তার অবস্থা জানার জন্য জেল খানায় যাই। সেখানে গিয়ে দেখি জেলখানার সকল কর্মকর্তা ভীষণ অস্থিরতায় ভুগছে। আমি বিষয়টি জানতে চাইলে তারা জানায় নবুয়তের দাবীদার লোকটি কাল রাত থেকে উধাও হয়ে গেছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তাকে মাটি গ্রাস করেছে না আকাশ থেকে কোন পাখি বা অন্য কিছু ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

৩. খলিফা মামুন ইন্তেকাল হলে (৮৩৩ খৃস্টাব্দ) ইমাম মোহাম্মদ বললেন, আমার মৃত্যু আজ থেকে ৩০ মাস পরে হবে। প্রকৃত পক্ষেই মামুনের মৃত্যুর পর ত্রিশ মাস অতিবাহিত হলে তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেন (৮৩৫)।

৪. জনৈক বর্ণনাকারী উল্লেখ করেছেন: আমি হযরত ইমাম মোহাম্মদ (আ.) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম: অমুক ধার্মিক ব্যক্তি আপনাকে সালাম বলেছে। সে আপনার কাছে কাফনের কাপড় প্রার্থনা করে। তিনি বললেন: সে এখন এসব বিষয়ের উর্ধ্বে চলে গেছে। একথা শুনে আমি বের হয়ে এলাম। কিন্তু ইমামের বক্তব্যের মর্ম বুঝতে পারলাম না। অবশেষে জানা গেল যে, সে এই ঘটনার চৌদ্দদিন পূর্বেই মারা গিয়েছিল।

৫. একজন রাবী বর্ণনা করেন যে, আমরা ইমাম মোহাম্মদের একজন সহচরের সাথে সফরে যেতে ইচ্ছুক ছিলাম। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আমরা বিদায় নেয়ার জন্য ইমাম পাকের খেদমতে হাজির হলাম। তিনি বললেন: বাইরে যেওনা। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বাইরে আসার পর আমার সঙ্গী বলল: আমি যাচ্ছি। কারণ আমার বন্ধু রওয়ানা হয়ে গেছে। একথা শুনে আমি স্ব স্ব ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং সে চলে গেল। তারা যে উপত্যকায় অবস্থান করছিল। সেখানে ভীষণ বন্যা আসায় তারা ডুবে মারা গেল।

ইমামের শাহাদাত

ইমাম (আ.) তার স্ত্রীর (মামুনের কন্যা) সাথে মদীনায় বাস করতেন। এ সময় ইমাম পাকের জীবন, যাপন, আচার আচরণ গরীবের প্রতি তাঁর সহানুভূতি, সাহায্য ও সহযোগিতা খলিফা কন্যার খুবই অপছন্দ ছিল। সে তার পিতা খলিফা মামুনের কাছে ইমামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করে তার কাছে পত্র লিখত। এর মধ্যে একটি অভিযোগ হলো তিনি আরো একটি বিবাহ করতে চান। খলিফা মামুন এসব অভিযোগের ব্যাপারে কোন গুরুত্ব না দিয়ে তাকে খলিফার নিকট ভবিষ্যতে পত্র না লেখার নির্দেশ দেন। খলিফা মামুনের মৃত্যুর পর অবস্থার মারাত্মক অবনতি হয় আগেই বলা হয়েছে নতুন খলিফা মুতাসিম ইমামের প্রতি অসম্ভব বিরুপ ছিল। এই মুতাসিম তার ভ্রাতুষ্পুত্রী উম্মে ফযলকে প্ররোচনা দিয়ে এই মহান ইমামকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে শহীদ করে (৮৩৫ খৃ:)।

হযরত ইমাম আবুল হাসান আলী আননাকী আল হাদী (আ.) [৮২৭-৮৬৮]

এই মহান ইমাম ২১২ হিজরীর ১৫ই জিলহজ্ব মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার সারিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হলেন হযরত ইমাম জাওয়াদ (আ.) এবং মাতা মহিয়সী রমনী সামানাহ যিনি খোদাভীরু এবং একজন আদর্শ ধর্মপরায়ন মহিলা ছিলেন। এই ইমামের উপাধিসমূহ হলো নাকী এবং হাদী। তাকে আবুল হাসানে ছালহও বলা হয়। ৮৩৫ খৃস্টাব্দে তার মহান পিতার শাহাদাতের পর তিনি ইমামতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর।

ইমাম আলী নকী আল হাদী বাল্যকালে ইমাম হওয়া

ইমাম হাদী তাঁর মহান পিতার শাহাদাতের পর মাত্র আট বছর বয়সে ইমামতের পবিত্র ও মহান দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। আর এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় কেরামতের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। কেননা এ ধরণের মর্যাদা অর্জন করা এবং এই গুরু দায়িত্ব পালন, যা একমাত্র খোদায়ী দান, যা শুধুমাত্র একজন বালকের পক্ষেই নয় বরং এক পরিপূর্ণ বিজ্ঞ মানুষের পক্ষেও কার্যত অসম্ভব। যেহেতু তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত ওলামা ও মুহাদ্দিসগণ প্রত্যেক ইমামের শাহাদাতের পর নতুন ইমামের নিকট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে এবং পবিত্র কুরআন হাদিসের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা জানার জন্য তার দ্বারস্থ হতেন এবং এমনকি কখনো কখনো পরীক্ষাও করতেন। আর হযরত আলী বংশীয় বিজ্ঞ আত্মীয় স্বজন ও তাঁর অনুসারীরাও তাদের সকল ধরণের সমস্যা সমাধানের জন্য তার সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতেন। তাই শুধু মাত্র মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুমোদন সর্বোপরি ঐশ্বরিক বা অলৌকিক জ্ঞান এবং ইমামতের অধিকারী হওয়া ব্যতীত একটি সাধারণ বালকের পক্ষে এই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া ও সকল সমস্যার বাস্তব সমাধান দান করা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। নিঃসন্দেহে একজন সাধারণ লোকও একটি সাধারণ বালক, একজন সচেতন ইমাম বা নেতা থেকে পৃথক করতে পারেন। ইমাম জওয়াদ (আ.) এর জীবনী পর্যালোচনার সময় আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। তাই আমরা সন্দেহাতীতভাবে জানতে পারি যে, ইমামত ও নবুয়াতের ন্যায় একটি আল্লাহ্ প্রদত্ত বিষয়, বাহ্যিক বয়স ও জ্ঞান অর্জন বা সাধনা বা বিদ্যালয়ে পাঠক্রমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। যেমন হযরত ঈসা (আ.) জন্মের সাথে সাথে তিনি নবী হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করা শুরু করেছিলেন।

ইমাম হাদীর বাণীতে ইমামতের মর্যাদা ও যোগ্যতা

রাসুলের উত্তরাধিকারী বার ইমামের প্রত্যেকেই (তাঁদের পবিত্র নূরের উপর সর্বদা আল্লাহ্‌র দরূদ বর্ষিত হোক)। কেবলমাত্র উম্মতের নেতা বা ইসলামের আহকাম ও কুরআন বর্ণনাকারীই ছিলেন না। বরং তাঁর অনুসারীদের সামাজিক জীবনে এই মাসুম ইমামগণ (আ.) হলেন পৃথিবীর বুকে আলাহ্‌র নূর। সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সুস্পষ্ট ও

পরিপূর্ণ দলিল। বিশ্বজগত ও সকল অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু। সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে কল্যাণকামী মাধ্যম স্বরূপ। পরিপূর্ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং মানবীয় শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন শীর্ষে। সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের সমষ্টি। আল্লাহ্‌র নিদর্শন, সকল প্রকার দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত, মাসুম, আলমে মালাকুত, ধরিত্রী, অদৃশ্য লোক এবং ফেরেশতাগণের সাথে সম্পর্কিত। দুনিয়া ও আখিরাতের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। খোদায়ী রহস্যাবলীর ধন ভাণ্ডার এবং আম্বিয়াগণের সকল পরিপূর্ণতার উত্তরাধিকারী। হ্যাঁ, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের পবিত্র অস্তিত্বই হল অস্তিত্ব নামক দিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের সম্মানিত বেলায়েতের আধিপত্য আম্বিয়া ও রাসূলগণের (সা.) বেলায়েতকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর সে মহান কর্তৃত্বকে তারা ব্যতীত অন্য কেউ উপলব্ধি করতে পারেনা আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তা রাসূল (সা.) ও তার আহলে বাইতকে প্রদান করেছেন। কোন লোভীই তাতে লোভাতুর হাত বাড়াতে পারে না, মাসুম ইমামগণের (আ.) মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা বা গণনা করা হয়েছে তাদের প্রকৃত ফজিলত এর চেয়ে বেশী আর তা কুরআনের অকাট্য ভাষ্য এবং রাসূল ও ইমামগণের নির্ভরযোগ্য বক্তব্য থেকে প্রমাণযোগ্য।

ইমাম আলী নকী (আ.) উপর সমসাময়িক খলিফাগণের জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন

হযরত ইমাম আলী নকী (আ.) এর জীবদ্দর্শায় ৭জন আব্বাসীয় খলিফা রাজত্ব করে। তারা হলো ১. মামুন (৮১৩-৮৩৩) ২. মোতাসেম (৮৩৩-৮৪২), ৩. ওয়াসিক (৮৪২-৮৪৭), ৪. মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৮৬১), ৫. মুন্তাসীর (৮৬২-৮৬২), ৬. মুস্তায়ীন (৮৬২-৮৬৬), ৭. মুতাজ (৮৬৬-৮৬৯)। অত্যাচারী ও অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী খলিফাদের সাথে নবী পরিবারের সংগ্রাম ও বিরোধিতা হয়েছিল মূলত ধর্ম ও অধর্মের লড়াই। এই মহান ইমামগণ কখনোই অত্যাচারী যালেম শাসকদের সাথে আপোষ করেন নাই্ বরং সর্বদা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের বিরোধিতা করতেন। জবর দখলকারী শাসকগোষ্ঠী সঠিকভাবেই জানতো যে এই সব ইমাম মানুষের হেদায়েত, সত্য প্রতিষ্ঠা, মজলুমের স্বপক্ষে অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে কখনোই কুণ্ঠাবোধ করবেন না। অত্যাচারী শাসকরা ইমামগণের হেদায়েত পদ্ধতি দিক নির্দেশনা এবং ধারাবাহিকতা ও প্রতিবাদকে সর্বদাই নিজেদের জন্য হুমকি স্বরূপ মনে করতো। এই শাসকরা নবী পরিবারকে কলংকিত করতে এবং অসম্মান করতে তারা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ব্যাপক অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার সৃষ্টি করে।

ইমাম হাদীর জীবনের বেশীর ভাগ সময় আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, চরিত্রহীন, পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী খলিফা মুতওয়াক্কিলের শাসনামালই অতিবাহিত হয়েছিল যা চৌদ্দ বছরেরও অধিক। এই দীর্ঘ সময় ইমাম হাদী (আ.) ও তার অনুসারীদের জন্য জীবনের এক অতি কষ্টদায়ক অধ্যায় হিসাবে পরিগণিত হয়। কেননা মুতাওয়াক্কিল আমিরুল মোমেনীন হযরত আলী (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি সে খুবই বিদ্বেষ পোষণ করত। তার শাসনকালে বহু সংখ্যক আলী বংশীয়কে হত্যা করা হয় অথবা বিষাক্রান্ত হন নতুবা হিযরত করে অন্য কোথায় চলে যেতে বাধ্য হন। মুতাওয়াক্কিল বল প্রয়োগের মাধ্যমে ইমাম শাফীর মাযহাব অনুসরণ করতে জনগণকে বাধ্য করে। সে ইমাম হোসাইন (আ.) এর রওজা মোবারক এবং পার্শবর্তী ভবনসমূহ ধ্বংস করার আদেশ দেয় এমনকি জনগণকে ঐ পবিত্র স্থান জিয়ারত করতে কঠোরভাবে বাধা প্রদান করে। এমন কি বর্ণিত আছে যে, মুতাওয়াক্কিল ১৭ বার ইমাম হুসাইন (আ.)মাযার শরিফ ধংস করার পর বাগদাদের মুসলমানগণ এতই রাগান্বিত হয়েছিল যে, বাগদাদের জনগণ মুতাওয়াক্কিলের বিরুদ্ধে দেয়ালে এবং মসজিদের গায়ে সংগ্রামী কবিতা লিখে রাখত। তার মধ্যে একটি কবিতা এমন : আল্লাহ্‌র কসম বনি উমাইয়া নবী (আ.) কন্যা সন্তানকে হত্যা করেছে। বর্তমানে যারা তার বংশধর (আব্বাসীয়রা) তারা বনি উমাইয়াদের মত অত্যাচারে লিপ্ত। ইহা ইমাম হুসাইনের রওজা মোবারক। আমার জীবনের কসম তা ধ্বংস করা হয়েছে। মনে হয় যে, আব্বাসীয়রা দুঃখিত যে, ইমাম হুসাইন (আ.) এর হত্যাকাণ্ডে তারা জড়িত থাকতে পারেনি এবং বর্তমানে ইমাম হুসাইন (আ.) এর রওজা মোবারক ১৭ বার ধ্বংস করে উমাইয়াদের পদানুসরণ করছে। মোতায়াক্কিল কি ধরনের নবী পরিবার বিদ্বেষী ছিল তা এই ঘটনার মাধ্যমে কিছুটা বুঝা যাবে। বিখ্যাত কবি ইবনে সিক্কিত মুতাওয়াক্কিলের দুই সন্তান মোতায ও মুসতাইনের গৃহ শিক্ষক ছিলেন। মুতাওয়াক্কিল তার গৃহ শিক্ষকের কাছে জিজ্ঞেস করল এ দুইজন তোমার অধিক প্রিয় না ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আ.)। ইবনে সিক্কিত জবাব দিল: কাম্বর (হযরত আলী (আ.) এর গোলাম, তুমি ও তোমার দুই সন্তানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। মুতাওয়াক্কিল ইবনে সিক্কিতের জিহ্বা তার পিছন দিক থেকে কেটে ফেলার জন্য নির্দেশ দেয় সর্বাধিক মর্মস্পশী ব্যাপার হলো যে, অত্যাচারী শাসকদের অপচয়, অপব্যয় এবং ভোগ বিলাসের পাশাপাশি আলী বংশীয় ও রাসূল পরিবারের সদস্যরা অতি কষ্টে জীবন নির্বাহ করতেন। এমনকি আলী পরিবারের সম্মানিত মহিলাদের এক সেট ভাল কাপড়ও ছিল না, যা দ্বারা তারা নামায আদায় করবেন। শুধুমমাত্র একসেট জরাজীর্ণ কাপড় ছিল যা তারা নামাযের জন্য পালাক্রমে

ব্যবহার করতেন। চরকায় সুতা কেটে সেই সূতা বাজারে বিক্রি করে তারা জীবন নির্বাহ করতেন। মুতওয়াক্কিলের মৃত্যু পর্যন্ত তারা এরকম কষ্টের মধ্যে ছিলেন। রাসূল (সা.) এর আহলে বাইতদের প্রতি মুতাওয়াক্কিল এতই কঠোরতা অবলম্বন করতো যে শুধুমাত্র ইমামগণের অনুসরণ এবং তাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করার কারণে জনগণের উপর নির্যাতন করত। উক্ত কারণেই পবিত্র আহলে বাইতদের সদস্যরা তাদের ধর্মীয় কাজ করার ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন। মুতাওয়াক্কিল, ওমর ইবনে ফারাহ রাজীকে মক্কা মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেছিল। আর সে জনগণকে আবু তালীবের বংশধরদের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করতে বাধা দিত। জনগণও জীবনের ভয়ে নবী-পরিবারের সদস্যদের সাহায্য ও সমর্থন করা থেকে বিরত থাকত। যার ফলে রাসূলের আহলে বাইতদের জীবন ব্যবস্থা অতি কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে ছিল। মুতাওয়াক্কিল ও অন্য সকল অত্যাচারী খলিফাগণের ন্যায় মুসলমানদের বায়তুলমাল লুণ্ঠনে খুব বেশী তৎপর ছিল এবং ভোগ বিলাসের ক্ষেত্রে মুক্তহস্ত ছিল। যেমনটি তার জীবনীতে পাওয়া যায় যে, সে বিভিন্ন ধরনের অট্টালিকা গড়ে তুলেছিল। শুধু মাত্র তার রাজপ্রসাদ তৈরীতে ১৭ লক্ষ দিনার স্বর্ণ মুদ্রা খরচ করেছিল। এখনো সামেরাতে যার ভগ্নবিশেষ বিদ্যমান। হযরত আলী (আ.) প্রতি বিদ্বেষ এবং শত্রুতাই ছিল মুতাওয়াক্কিলের এহেন অবিশ্বাস্য হীনমন্যতা ও নীচুতার মূল কারণ। মুতাওয়াক্কিল নাসেরী এবং আহলুল বাইতের দুশমনদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্পর্ক স্থাপন করতো। এমনকি তার অপবিত্র এবং অপবিত্র আত্মার তুষ্টির জন্য তার ভাড়কে তার উপস্থিতিতেই ঘৃন্য এবং লজ্জাজনক কার্যের মাধ্যমে আমিরুল মোমিনুন আলী (আ.) কে উপহাস করার নির্দেশ দিয়েছিল। মুতাওয়াক্কিল তাঁর ভাড়ের অশ্লীল ও কুৎসিত ভাবভঙ্গী দেখে শরাব পান করত এবং মাতাল হয়ে অট্টহাসি করত।

সামারায় ইমাম হাদীর (আ.) বন্দী জীবন

সমাজে ইমামগণের (আ.) ব্যাপক প্রভাব, প্রতিপত্তি ও প্রগাঢ় ভালবাসার জন্য অত্যাচারী খলিফারা সব সময় ক্ষমতা হারানোর আশংকায় আতংকিত থাকত এবং ইমামগণকে স্বাধীনভাবে থাকতে বাধা প্রদান করত। এ কারণেই মুতাওয়াক্কিল ইমাম হাদীকে ২৪৩ হিজরীতে মদীনা থেকে সামরায় নিয়ে আসে। সে ইমামকে সামরিক ঘাঁটির পাশে থাকতে বাধ্য করেছিল। মুতাওয়াক্কিল ইমামকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখত এবং তার পরবর্তী ইমামকে তাঁর শাহাদাত নিশ্চিত করেছিল।

ইমাম হাদী (আ.) নির্বাসন তথা গৃহবন্দী হওয়ার প্রেক্ষাপট হলো : মুতাওয়াক্কিলের খেলাফত কালে আব্দুলাহ ইবনে মুহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি মদিনার সামরিক কমান্ডার এবং নামাযের দায়িত্বশীল ছিল। সে ইমাম হাদীর প্রতি নানা ধরনের অত্যাচার করত এবং মুতাওয়াক্কিলের নিকট ইমামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করত। ইমাম হাদী (আ.) আব্দুলাহ ইবনে মুহাম্মদের মিথ্যাচার ও দুশমনী সম্পর্কে মুতাওয়াক্কিলকে পত্র লিখেন। এই চিঠির উত্তরে মুতাওয়াক্কিল ইমাম হাদীকে সামারায় আসার প্রস্তাব দেয়। নিসন্দেহে ইমাম হাদী (আ.) মুতাওয়াক্কিলের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন কিন্তু সামারাতে যাওয়া ছাড়া ইমামের আর কোন উপায় ছিল না। কেননা তার দাওয়াত গ্রহণ না করা তার বিরুদ্ধাচারীদের জন্য একটি নতুন দলিল হত। আর এভাবে মুতাওয়াক্কিল তাকে নির্যাতন করার বড় ধরনের সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করত। ইমাম হাদী যে উপায়ান্তর না দেখে বাধ্য হয়ে সামারাতে এসেছিলেন এ সর্ম্পকে তিনি নিজেই বলেছেন : আমাকে জোর পূর্বক সামারায় নিয়ে আসা হয়েছে।" যাহোক, ইমাম হাদী (আ.) মুতাওয়াক্কিলের পত্র পেয়ে সামারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন আর ইয়াহিয়া ইবনে ছাবছামা তার সাথে ছিল ইমাম সামারাতে পৌঁছালে মুতাওয়াক্কিল তাঁকে শহরে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে খাযুস সায়ালিক নামক ফকীরদের কলোনীতে থাকার নির্দেশ দেয়। পরে মুতাওয়াক্কিল ইমামকে গৃহবন্দী (House Arrest) করে রাখে। বিশিষ্ট আলেম ইবনে জওজী বলেন : একবার কিছু দুষ্ট লোক মুতাওয়াক্কিলের কাছে ইমাম হাদী (আ.) সর্ম্পকে মিথ্যা রটনা করল যে, তার ঘরে অস্ত্রশস্ত্র আছে, কিছু চিঠিপত্র আছে যা তার অনুসারীরা পাঠিয়েছে যাতে অচিরেই সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা বর্ণনা করা হয়েছে। মুতাওয়াক্কিল ইমামের কাছে একদল গোয়েন্দা পাঠাল। তারা ইমামের (আ.) ঘরে প্রবেশ করে সর্বত্র খোঁজাখুজি করে কোথায়ও কিছু পেল না। বরং দেখল ইমাম হাদী মেঝেতে বসে ইবাদতে মশগুল হয়ে আছেন এবং কুরআন তেলওয়াত করছেন। মুতাওয়াক্কিলের নির্দেশ অনুযায়ী এই গোয়েন্দা কর্মকর্তারা ইমামকে সেই অবস্থায়ই খলিফার দরবারে হাজির করল। ইমামকে দেখে মুতাওয়াক্কিল নিজের অজান্তেই ইমামকে তার পাশে বসাল। এবং ইমামকে তার হাতে রক্ষিত শরাবের গাস আপ্যায়নের জন্য বাড়িয়ে দিল। ইমাম (আ.) বললেন : আমার রক্ত মাংস এই হারাম দ্বারা কখনোই মিশ্রিত হয় নি। কাজেই আমাকে এ থেকে অব্যহতি দাও। মুতাওয়াক্কিল আর পীড়াপীড়ি না করে বলল : একটি কবিতা বলুন। ইমাম হাদী বললেন : আমার কোন কবিতা মুখস্ত নাই। সে বলল : অবশ্যই বলতে হবে। ইমাম হাদী এই কবিতা পাঠ করলেন :

"পার্বত্য এলাকায় পাহাড় চূড়ায় রাত্রি প্রভাত করল। এবং শক্তিশালী ব্যক্তিরা তাদেরকে পাহারা দিচ্ছিল। কিন্তু পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখর তাদের (মৃত্যুর থেকে রক্ষা করতে পারল না)। সম্মানের পর নিরাপদ স্থান থেকে নিচে নামিয়ে তাদেরকে গর্তের মধ্যে স্থান দিল। আর তা কতই না অপছন্দনীয় আশ্রয় স্থল। যখন সমাধিস্থ করা হল, আহবানকারী চিৎকার করে বলল : কোথায় আছে সেই দামী জাঁকাল বাজুবন্ধ, মুকুট এবং জাঁকজমকপূর্ণ পরিচ্ছদ। কোথায় আছে সেই সকল লাজুক ও বিলাসপূর্ণ চেহারা যাদের সম্মানে পর্দা টাঙ্গানো হয়। যাদের প্রাসাদে ঝালোর এবং দারোয়ান ছিল। তাদের পরিবর্তে কবর জবাব দিল : সেই সকল চেহারার উপর এখন কীট পতঙ্গরা বিচরণ করছে।" ইমাম হাদীর এই মহাভীতিকর বাণী মুতাওয়াক্কিলের উপর এমন প্রভাব ফেলেছিল যে সে কেঁদে ফেলেছিল উপস্থিত সকলেই কাঁদছিল। অতঃপর মুতাওয়াক্কিল শরাবের সরঞ্জাম সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দিল এবং ইমাম হাদী (আ.) কে চার হাজার দিরহাম উপহার দিল।

মুতাওয়াক্কিল এক কঠিন ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর ইমাম হাদী (আ.) এর কাছে চিকিৎসার পরামর্শ চায়। সে ইমামের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে উঠে এবং পাঁচশত দেরহাম ইমামকে হাদীয়া স্বরুপ প্রেরণ করে। মুতাওয়াক্কিলের মাতাও মানত মোতাবেক দশ হাজার দিরহামের একটি পুটলি ইমাম হাদী (আ.) এর খেদমতে পাঠিয়েছিল। এই ঘটনার কিছু দিন পর মুতাওয়াক্কিলের এক দুষ্ট কর্মকর্তা বাতহারী তাকে খবর দেয় যে, ইমাম হাদী (আ.) আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি স্বরুপ টাকা-পয়সা, অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করছেন। মুতাওয়াক্কিল তার এক সেনা কমান্ডার সাঈদ হাজাবকে নির্দেশ দিল: কিছু সৈন্য নিয়ে অতর্কিতে ইমামের বাসায় হামলা কর আর ঘরে যা পাবে তা বাজেয়াপ্ত করে তার নিকটে হাজির কর। সাঈদ বলে: যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিল একদল সৈন্য নিয়ে ছাদের উপর দিয়ে ইমামের বাসার দিকে গেলাম। অতঃপর চেরাগ ও মশাল নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দুটি পুটলি যার একটি স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ ছিল এবং তাতে সীল করা ছিল, অপরটিতে সামান্য কিছু মুদ্রা ছিল। আর পুরাতন গেলফে ঝোলানো একটি তলোয়ার ব্যতীত কিছুই পেলাম না। ইমাম (আ.) কে দেখলাম একটি পাটিতে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। তাঁর গায়ে একটি পশমী জুব্বা ও মাথায় একটি টুপি ছিল। তিনি আমাদের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করলেন না। দুই পুটলি মুদ্রা ও তলোয়ারটি মুতাওয়াক্কিলের কাছে নিয়ে গেলাম ও বললাম : সম্পদ ও টাকা পয়সা বলতে যা পেয়েছে তা হলো এই। মুতাওয়াক্কিলের যে পুটলির মধ্যে তার মায়ের সীল ছিল তা দেখে বিষয়টি তার মার কাছে জানতে চাইলো। তার মা বলল : তুই যখন অসুস্থ ছিলি আমি মানত করেছিলাম যদি আল্লাহ্ তোকে সুস্থ করেন তাহলে আবুল হাসানকে (ইমাম হাদী আঃ) দশহাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিব। তোর সুস্থ হওয়ার পর আমি সে মানত পূর্ণ করেছি। মুতাওয়াক্কিল আরও পাঁচশত দিনার দিয়ে সাঈদ হাজারকে বলল : দুটি পুটলি এবং তলোয়ার সহ পাঁচশত দিনার ইমাম (আ.) কে ফিরিয়ে নিয়ে এসো এবং আমার পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিও। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মানত নিয়ে এক শ্রেণীর আলেম বাড়াবাড়ি করে এটাকে শিরক বেদাতের মত মনে করে ইসলামী সমাজে ফেতনার ফাসাদ সৃষ্টি করছে তাদের এ বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, যদি জীবিত লোকের নামে মানত করা ও তা আদায় করা যদি শিরক বা বেদাত হতো তাহলে তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের আমিরুল মোমেনীন এই কাজে অবশ্য বাঁধা দিত বা তার আলেমরাও এটা কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। বিশেষ করে তা ছিল আহলে বাইতদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যারা খলিফার প্রধান শত্রু ছিল। অথচ এটি মুতাওয়াক্কিল ও অনুমোদন করে। তাই এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা আদৌ ধর্ম সঙ্গত নয়। যা হোক, সাঈদ ইমামকে বলে যে : আমীর, ক্ষমা প্রার্থী। আর আমাকেও ক্ষমা করবেন, কেননা আমি কর্মচারী। আমীরের হুকুম পালন করাই আমার কাজ। ইমাম (আ.) বলেন : অচিরেই অত্যাচারীগণ উপলব্ধি করতে পারবে যে, কোথায় প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অবশেষে মুতাওয়াক্কিলের জালেমশাহীর পতন হয়। তার পুত্র মুনতাসীরের ইঙ্গিতে মুতাওয়াক্কিলের অতি জঘন্য ধর্মদ্রোহী কার্যকলাপ সহ্য করতে না পেরে তার অনুগত তুর্কী বাহিনীর একাংশ মুতাওয়াক্কিল ও তার উজির ফাতহ ইবনে খাকানকে যখন তারা নাচ, গান, পান ভোজনে ব্যস্ত ছিল তখন হত্যা করে। মুনতাসীর পরের দিন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তার পিতার প্রবর্তিত অনেক আইন কানুন বাতিল করে তার মধ্যে ইমাম হোসাইন (আ.) মাজার যিয়ারতের উপর নিষেধাজ্ঞাও ছিল। তাছাড়া সে তার পিতার অতি জঘন্য কাজের জন্য নির্বাচিত কিছু প্রাসাদ ধ্বংসের নির্দেশ দেয়। যদিও মুনতাসীর মাত্র ছয় মাস রাজ্য শাসন করে। এরপর এই অবস্থার অবসান ঘটে। মুনতাসীরের পর তার চাচাত ভাই মুসতাঈন খেলাফত গ্রহণ করে এবং পূর্ববর্তী খলিফাদের নীতি গ্রহণ করে। তার হুকুমতকালে হযরত আলী (আ.) অনুসারীরা একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং সকলেই মৃত্যুবরণ করেছিল। মুসতাঈন তার আত্মীয় স্বজন এবং তুর্কী সেনাদের আমোদ প্রমোদের জন্য বাইতুল মাল খুলে দিয়েছিল। অপর দিকে পবিত্র ইমামগণের সাথে অতিশয় অন্যায় ও জুলুম করত। কিছু বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম হাদীর মহান পুত্র ইমাম হযরত হাসান আসকারীর অভিশাপে সে

মৃত্যু বরণ করে। মুসতাঈনের পর মুতাওয়াক্কিলের পুত্র মোতায খেলাফত গ্রহণ করে। আলী বংশ ও তাঁদের অনুসারীদের প্রতি তার আচরণ ছিল অতিশয় মন্দ। তার শাসন আমলে বহু সংখ্যক আহলে বাইত সদস্যদের হত্যা করা হয়েছিল আবার কিছু সংখ্যককে বিষ প্রয়োগে খুন করা হয়েছিল। ইমাম হাদী মোতায এর শাসনকালে দুনিয়া হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

ইমাম হাদী (আ.) কেরামত

১. খলিফা মুতাওয়াক্কিল যখন হযরত হাদীকে মদিনা থেকে ইরাকে তলব করে তখন ইমাম হাদী (আ.) খলিফার আদেশে এক নিম্নশ্রেণীর বাসস্থানে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইমামের ভক্তদের মধ্যে সালেহ ইবনে সায়ীদ নামক এক ব্যক্তি তার খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল : হে ইবনে রাসূসুল্লাহ্! এ দলটি (আব্বাসীয় শাসক গোষ্ঠী) আপনার গুন গরিমা ও পদ মর্যাদাকে জনগণর কাছে গোপন রাখতে এবং আপনার মহান তারকাজ্জোল ব্যক্তিত্বকে মিটিয়ে দিতে সচেষ্ট। এ উদ্দেশ্যেই আপনাকে এ গৃহে রাখা হয়েছে। হযরত আলী হাদী বলেন: হে সাঈদ, তুমিও তো এ স্থানেই আছ। অতঃপর তিনি আপন হাতে ইশারা করলেন। এমনি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বাগ-বাগিচা কলকল শব্দে প্রবাহিত নদী এবং এমন প্রাসাদসমূহ সৃষ্টিগোচর হয়ে গেল। সেগুলোতে সতী, সুশ্রী রমনী ছিল এবং মোতির ন্যায় চাকচাক্যময় কচি বালকগণ ছিল। সালেহ বলেন: আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। ইমাম বললেন: সাঈদ আমরা যেখানেই থাকি এগুলো আমাদের সাথে থাকে।

২. এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন সফরে আমার সাথে আমার পুত্র ও ছিল। আমি হযরত আলী হাদী (আ.) এর খেদমতে আরজ করলাম: আমার পুত্রের যেন পুত্র সন্তান হয়। তিনি বললেন: যখন পুত্র জন্মগ্রহণ করবে তার নাম রাখবে মুহাম্মদ। সে মতে তাই করা হয়।

৩. অনুরূপভাবে অন্য এক ব্যক্তি তার পুত্রের ঘরে পুত্র হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি বললেন: কন্যা অনেক পুত্রের চেয়ে ভাল হয়। সে মতে তার ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

৪. খলিফা মুতাওয়াক্কীলের গৃহে অনেক ছোট ছোট পাখি ছিল। এদের কিচির মিচির শব্দে কারো কথা বুঝা যেতনা। কিন্তু হযরত হাদী যখন খলিফার ঘরে যেতেন, তখন পাখিরা নিশ্চুপ থাকত। এপর যখন তিনি বাইরে চলে আসতেন তখন আবার তারা কিচির মিচির শুরু করত।

৫. জনৈক ভারত বর্ষীয় ভেল্কিবাজ (ম্যাজিসিয়ান) মুতাওয়াক্কিলের কাছে আগমন করেছিল। সে আশ্চর্য ম্যাজিক দেখাত। একদিন মুতাওয়াক্কিল বলল: যদি তুমি আলী হাদীকে লজ্জিত ও অপদস্ত করতে পার তবে তোমাকে এক হাজার দিনার পুরস্কার দিব। ম্যাজিসিয়ান বলল: কয়েকটি চাপাতী রুটি রেখে দিন এবং আমাকে তার পাশের আসনে বসার সুযোগ দিন। খলিফা তাই করল। আহারের সময় ইমামকে প্রদত্ত চাপাতি নিয়ে এমনভাবে উঠানামা করছিল যে, ইমাম তা ধরতে পারছিলেন না। এ রকম তিন বার করা হলে উপস্থিত সবাই হাসতে হাসতে এক তামাশার বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করল। এই মসলিসে একটি কার্পেট ছিল। কার্পেটে একটি সিংহ অংকিত ছিল। হযরত হাদী (আ.) সেই চিত্রের সিংহকে ইশারা করলো যাতে সেটি ম্যাজেসিয়ানকে পাকড়াও করে। অমনি সেই কার্পেটের অংকিত সিংহটি জীবন্ত সিংহে পরিণত হয় এবং ম্যাজিসিয়ানের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং অতঃপর মাটিতে পুঁতে দিয়ে আবার কার্পেটের চিত্র সিংহ হয়ে গেল। এই ম্যাজিসিয়ানকে মাটির থেকে উদ্ধার করার জন্য মুতাওয়াক্কাল ইমাম সাহেবকে অনেক অনুরোধ করে কিন্তু ইমাম বলেন: আল্লাহ্র কসম, এখন আপনি তাকে পুনরায় দেখবেন না।

ইমাম হাদীর (আ.) শাহাদাত

যে কোন ইতিহাসবিদ ও গবেষক ইমাম হাদী (আ.) এর জীবনী পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করতে পারবে যে, ঐ মহান ব্যক্তি তার সমস্ত জীবনে কঠোর সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন ছিলেন। তবে শুধুমাত্র হাদী (আ.) এর সময়ই এ অবশ্যই সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং বনী উমাইয়া এবং আব্বাসীয় শাসকদের শাসনামলে (সাময়িক বিরতি ছাড়া) পরিস্থিতি একই রূপ ছিল। অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী খলিফারা সমাজ ও সমাজের কল্যাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করত না এবং জনগণকে তাদের ভোগ বিলাসের পণ্য হিসাবে মনে করতো। এই অত্যাচারী শাসকদের শাসন ব্যবস্থা এতই কঠোর ও ভীতিপ্রদ ছিল যে জনগণ তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার এবং পবিত্র ইমামগণের জ্ঞান শিক্ষা ও নেতৃত্ব থেকে লাভবান হওয়ার ও সঠিক ইসলামী ধর্মমত জানা ও ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করার ধারণা, শক্তি ও সাহস হারিয়ে ফেলেছিল। আর এ কারণেই উম্মাহ্র সাথে ইমাগণের সম্পর্ক খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। যেমনটি আগে বলা হয়েছে সমসাময়িক কালের শাসকবর্গ ইমাম হাদী (আ.) কে বলপূর্বক মদীনা থেকে এনে সামারায় বন্দী করে রেখেছিল। এতদসত্ত্বেও মহান ইমাম সকল দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার, অবিচার সহ্য করেছেন কিন্তু অত্যাচারীদের সাথে কখনও আপোষ রফা করেন নি বা তাদের সাথে

ন্যুনতম সমঝোতা করেন নি। এটা স্পষ্ট যে, ইমামের ঐশী ও অলৌকিক ব্যক্তিত্ব, সামাজিক অবস্থান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচারণ ও অন্যায়ের পথে সহযোগিতা না করা অত্যাচারী শাসকদের নিকট অপ্রীতিকর ও ভীতিপ্রদ ছিল। আব্বাসীয়রা সর্বদা এ বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল। আল্লাহ্‌র নূরকে নির্বাপিত করার অর্থাৎ তারা ইমামকে শহীদ করার সিদ্ধান্ত নিল। তাই মোতাসেমের খেলাফতকালে তাকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ২৫৪ হিজরীর ৩রা রজব শহীদ করা হয়। মহান ইমামকে নিজ গৃহে সমাহিত করা হয়।

হযরত ইমাম হাসান আসকারী (আ.) [৮৩২-৮৬০ খ্রিস্টাব্দ]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ইন্তেকালের পর তাঁর উম্মতের জন্য তাঁরই রেখে যাওয়া তারই বংশের বারজন ইমামের মধ্যে ইমাম আবু মুহাম্মদ হাসান বিন আলী, আসকারী (আ.) হলেন একাদশ ইমাম। তাঁর পিতা হচ্ছেন দশম ইমাম হযরত হাদী (আ.) ও মাতা মহীয়সী নারী হুদাইসা, সুমান নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। যেহেতু ইমাম সামেরা শহরের "আসকার" অঞ্চলে সৈন্যরা বসবাস করত (আধুনিক ভাষায় যা ক্যান্টনমেন্ট (Cantonment) হিসাবে আখ্যায়িত) তাই তিনি আসকারী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি জাকি ও নাকি খেতাবে ভূষিত হন এবং আবু মুহাম্মদ হচ্ছে তার উপাধি। ইমামের ২২ বছর বয়সে তার পিতা হাদী (আ.) পরলোক গমন করেন। তিনি ৬ বছর ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। ইমাম আসকারীর যাঁরা সাক্ষাৎ পেয়েছেন তারা বলেছেন যে, তিনি শ্যামলা বর্ণের সুনয়ন, আকর্ষণীয় চেহারা বিশিষ্ট, পরোপকারী, সৎকর্মশীল ও মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিল, মুনতাসের মোস্তাইন, মোতায, মোহতাদি ও মোতামেদ এর শাসনামলে তার জীবন অতিবাহিত হয় এবং মোতামেদ এর শাসনকালে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

ইমামের সাথে সমকালীন খলিফাদের জুলুম

আব্বাসীয় খলিফা মোতাজ (৮৬৬-৮৬৯) তার পূর্ব খলিফা তারই চাচাত ভাই মোস্তাইন (৮৬২-৮৬৬) এর খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয় তারই শাসনামলে বেশ কিছু সংখ্যক আলী (আ.) বংশীয় লোকদের বিষ প্রয়োগ ও অন্যভাবে হত্যা করা হয় মোতাযের পর মোহতাদী (৮৬৯-৮৭০) খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হয় সে ইমাম আসকারীকে (আ.) বন্দী করে। এমনকি ইমামকে হত্যার সিদ্ধান্তও নেয়। আহমদ ইবনে মুহাম্মদ বললেন: মোহতাদী যখন অনারব মুসলমানদের পাইকারীভাবে হত্যা করতে থাকে, তখন আমি ইমাম হাসান আসকারীকে লিখলাম: মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি মোহতাদীর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন আমার কাছে এই মর্মে খবর পৌঁছেছে যে সে মোহাতাদী আপনাকে মৃত্যুর হুমকি প্রদান করে বলেছে-আল্লাহ্‌র কসম আমি মুহাম্মদ (সা.) এর বংশধরদেরকে দুনিয়ার মাটি থেকে সমূলে উৎপাটন করবো। ইমাম সেই চিঠির জবাবে নিজ হাতে লিখেন: কত সীমিত আয়ু তার। মাত্র পাঁচদিন পর সে অইমান, অপদস্ত ও লাঞ্ছনাসহ মৃত্যুবরণ করবে। ঠিক তাই ঘটলো যেমনটি ইমাম বলেছিলেন। উল্লেখ্য খলিফা মোহতাদীও তুর্কী সৈন্যদের অভ্যুত্থানে নিহত হয়। মোতামেদ (৮৭০-৮৯২) তার স্থলাভিষিক্ত হয়। মোতামেদও তার পূর্ব পুরুষদের ন্যায় ভোগ বিলাসিতায় ও জুলুম নির্যাতনে এতই মগ্ন থাকতো যে এই সুযোগে তার ভাই মুয়াফফাক ধীরে তার সিংহাসন দখল করে দেশ প্রশাসনের সার্বিক কাজ পরিচালনা করে। মোতামেদ নামমাত্র পুতুলের ন্যায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। মুয়াফ্‌ফাকের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মোতামিদ তার পিতার কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়। অবশেষে ২৭১ হিজরীতে মোতামেদের মৃত্যু হলে মোতায়েদ নিয়মতান্ত্রিকভাবে খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়। এই মোতামেদের শাসনামলে আলী বংশীয়দের নিধন করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে নিকৃষ্টতম পন্থায় হত্যা করা হয় এবং তাদের মৃতদেহ থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ইমাম আসকারী (আ.) তার পূর্ব পুরুষদের ন্যায় শাসকদের নির্যাতন ও নিয়ন্ত্রণের শিকার হন। ইমাম একবার মোহতাদীর শাসনামলে (সোলেহ ইবনে ওয়াসিফ এর কারাগারে) বন্দী হয়েছিলেন খলিফা ইমামকে নির্যাতন করার জন্য দুইজন দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিকে নিয়োগ করে। কিন্তু ঐ দুজন ইমামের ইবাদতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকে। খলিফা আরও একবার ইমামকে নাহ্‌বীর কারাগারে বন্দী করে। কারাগারের জল্লাদ ইমামের প্রতি রুঢ় আচরণ করে। নাহবীরের স্ত্রী জল্ল-াদকে বলেন: আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তুই জানিস না কত বড় মহান ব্যক্তি তোর কারাগারে বন্দী আছেন। অতঃপর ইমামের ইবাদত ও গুণাবলীর কথা বর্ণনা করে বলেন: আমার ভয় হয় ইমামের প্রতি তুই যে অত্যাচার করছিল তোকেই তার ফল ভোগ করতে হবে। মোতামেদ নিজেও তার শাসনামলে ইমাম আসকারী ও তাঁর ভ্রাতা জাফর (জাফর কাজ্জাবকে) আলী জারীন এর কারাগারে বন্দী করে নিয়মিত ইমামের অবস্থার খবরাখবর রাখত। সংবাদদাতাগণ তাকে জানাতো যে, ইমাম সারাদিন রোযা রাখেন ও সারারাত নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন থাকেন। কয়েকদিন পর আবার যখন ইমামের সম্পর্কে জানতে চাইলে আলী জারীন তার কাছে পূর্বে দেয়া সংবাদেরই পুনরাবৃত্ত করলো্ খলিফা একথা শুনে আলী জারীনকে আদেশ করলো: এখনই ইমামের

কাছে গিয়ে আমার সালাম জানিয়ে তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দাও। আলী জারীন বললো: আমি কারাগারে গিয়ে দেখলাম ইমাম পোশাক পরে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। তিনি আমাকে দেখা মাত্রই উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে খলিফার নির্দেশ অবহিত করলাম। ইমাম বাহনে আরোহন করলেন কিন্তু রওয়ানা হলেন না। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন: খলিফা শুধুমাত্র আপনাকেই মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন, জাফরের ব্যাপারে কোন কথা বলেন নি। বললেন : তোমার খলিফার কাছে গিয়ে বল, আমরা দুজন একই পরিবার থেকে এসেছি। যদি তাকে না নিয়ে একা ফিরে যাই তাহলে এ রহস্য তার কাছে লুকিয়ে থাকবে না। আলী জারীন খলিফার কাছে গেল এবং ফিরে এসে বললো; খলিফা বলেছেন তিনি জাফরকে আপনার সম্মানে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি জাফরকে তার ও আপনার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও খেয়ানতের কারণেই বন্দী করেছিলেন। অতঃপর জাফর মুক্তি পেল এবং ইমামের সাথেই বাড়ি ফিরলো। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে: যে সময়গুলোতে ইমাম মুক্ত থাকতেন তখনও ইমামের গতিবিধি খলিফাদের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হতো। ইমামের অনুসারী, সমর্থক ও বন্ধু মহল সহজভাবে তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতেন না। অর্থাৎ অনেক চেষ্টা তদবীর করে ইমামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ করা খুবই আয়াস সাধ্য ছিল।

ইমাম আসকারী (আ.) এর কেরামত

১. মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মুসা ইবনে জাফর বলেন: একবার প্রকট অভাব অনটনে পড়ে গিয়েছিলাম। বাবা বললেন, চল এক সাথে প্রখ্যাত দানশীল ইমাম আসকারী (আ.) এর কাছে যাই। জিজ্ঞেস করলাম তাকে তুমি চেন? বললেন: না তাকে কখনও দেখিনি। এক সাথে রওয়ানা হলাম। রাস্তার মাঝে বাবা বললেন: হায় আল্লাহ্ কি ভালো হতো যদি ইমাম আমাকে ৫০০ দিরহাম সাহায্য করতেন। ২০০ দিরহাম ঋণ পরিশোধ করতাম। ২০০ দিরহাম দিয়ে জামা কাপড় কিনতাম বাকী ১০০ দিরহাম দিয়ে অন্যান্য খরচাদি চালাতাম। আমিও মনে মনে বললাম, হায় আল্লাহ্ যদি তিনি আমাকেও ৩০০ দিরহাম দান করতেন। ১০০দিরহাম দিয়ে একটি উট কিনতাম এবং বাকী ১০০ দিরহাম দিয়ে জামা কাপড় কিনতাম ও বাকী ১০০ দিরহাম দিয়ে অন্যান্য খরচাদি চালাতাম। অতঃপর জাবাল শহরে গেলাম। ইমামের বাড়িতে পৌঁছা মাত্রই তার ভৃত্য এসে বললেন: আলী ইবনে ইব্রাহীম ও তার পুত্রকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আমরা সেখানে প্রবেশ করে ইমামকে সালাম করলাম। তিনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে্ আলী তোমার কি হয়েছে এ পর্যন্ত আমার কাছে আসনি? বাবা বললেন: এমন দরিদ্র দশায় আপনার সাথে দেখা করতে আসতে লজ্জিত হচ্ছিলাম। যখন বাইরে এলাম ইমামের ভৃত্য আমাদের দুজনকে দুই থালি টাকা দিয়ে বললেন: তোমার এখানে (বাবাকে দেয়া থালিতে ৫০০ দিরহাম আছে, ২০০ দিরহাম ঋণ পরিশোধের জন্য, ২০০ দিরহাম জামা কাপড় কেনার জন্য, বাকী ১০০ দিরহাম অন্যান্য খরচাদির জন্য এবং আমাকে বললেন: তোমার এখানে ৩০০ দিরহাম আছে। ১০০ দিরহাম দিয়ে উট কিনবে, ১০০ দিরহাম দিয়ে জামা কাপড় ও বাকী ১০০ দিরহাম দিয়ে অন্যান্য খরচাদি চালাবে। কিন্তু জাবাল শহরের দিকে যেওনা। ইরাকের সুরা শহরের দিকে যাও।

২. মুহাম্মদ ইবনে আইয়াশ বলেন: একদিন আমরা কয়েকজন একত্রে বসে ইমাম আসকারী (আ.) এর কারামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আমাদের মাঝে এক নাসেরী (যারা আহলে বাইতের মর্যাদায় বিশ্বাস করে না) বলল: আমি কয়েকটি প্রশ্ন একটা কাগজের উপর কালিবিহীন কলমে লিখবো। যদি ইমাম জবাব দিতে পারেন তাহলে বিশ্বাস করবো যে তিনি সত্যিকার ইমাম। আমরা সে কথা মত কতগুলো বিষয় লিখলাম নাসেরীর কালিবিহীন কলমে তার প্রশ্নগুলো লিখা হলো। আমরা সেগুলো ইমাম আসকারী (আ.) এর নিকট পাঠালাম। ইমাম সবগুলো প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঠালেন এবং নাসেবীর কাগজের উপর তার নাম তার পিতার নাম, তার মাতার নাম লিখে পাঠালেন। নাসেবী তা দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। তার হুশ ফিরে আসার পর ইমামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো।

৩. আবু হামজা বলেন: অনেকবার দেখেছি ইমাম তার ভৃত্যদের (যারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী ছিল) সাথে তাদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় কথা বলতেন। আমি অবাক হয়ে যেতাম এবং মনে মনে বলতাম, ইমাম মদীনার অধিবাসী অথচ কিভাবে তিনি এত ভাষায় কথা বলেন। ইমাম আমার দিকে ফিরে বললেন: মহান আল্লাহ্ তার প্রতিনিধিদের অন্যান্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং সব কিছুর উপর জ্ঞান দান করেছেন। ইমামগণ বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন বংশ পরিচয় ও মানুষের সকল ধরনের প্রশ্নের জবাব ও সমস্যা সমাধানের পথ দেখানোর জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এ রকম না হলে ইমামের সাথে সাধারণ জনগণের পার্থক্য থাকতে না।

৪. ওমর ইবনে আবি মুসলিম বলেন: সামিউম মুসমায়ি আমার এক প্রতিবেশী যার বাড়ি আমার বাড়ির দেওয়ালের সাথে লাগানো ছিল। সে আমাকে অত্যন্ত জ্বালাতন করতো আমি চিঠি লিখে ইমামকে এব্যাপারে দোয়া করতে অনুরোধ করলাম। তিনি জবাবে লিখলেন: অতি শীঘ্রই তোমার দুঃখ বেদনা লাঘব হবে এবং তুমি উক্ত

প্রতিবেশীর বাড়ির মালিক হবে। এক মাস পরেই লোকটি মারা গেল এবং আমি বাড়িটি কিনে নিলাম এবং ইমামের সম্মানে ঐ বাড়িটি আমার বাড়ির সাথে সংযুক্ত করে ফেললাম।

৫. ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ বলেন: একদিন ইমাম আসকারী (আ.) এর বাড়ির দরজায় বসে তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। যখন তিনি বাইরে এলেন তার সামনে গিয়ে আমার দুঃখ দুদর্শার কথা জানিয়ে অভিযোগ করলাম এবং কসম খেয়ে বললাম, আমার এমন অবস্থা যে একটি দিরহামও আমার কাছে নাই। ইমাম বললেন কসম খেয়ে ফেললি অথচ ২০০ দিরহাম মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিস। অতঃপর বললেন এ কথা বললাম তাই বলে তোকে সাহায্য করব না এমন নয়। এরপর তিনি তার ভৃত্যকে ইশারা করে বললেন তোর কাছে যা আছে তা ইসমাইলকে দিয়ে দে। ভৃত্যটি আমাকে ১০০ দিনার দিলো। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিলাম। এমন সময় ইমাম বললেন, আমার ভয় হয় যখন ঐ ২০০ দিরহাম তোর খুব প্রয়োজন হবে তখন তা পাবি না। আমি ফিরে এসে দিনারগুলো যেখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম তা উঠিয়ে আনতে গেলাম কিন্তু একটি দিরহামও সেখানে পেলাম না। আমার আক্কেল সেলামি হল। পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার ছেলে ওখান থেকে সবগুলো দিনার তুলে নিয়ে ছিল এবং তার এক দিনারও আমার হাতে ফিরে আসেনি। ঠিক যেমনটি ইমাম বলেছিলেন।

হযরত ইমাম হাসান আসকারীর শাহাদাত

আব্বাসীয় খলিফাগণও তাদের পদস্থ কর্মকর্তাগণ অবগত ছিল যে, আহলে বাইতের ইমামগণের সংখ্যা সর্বমোট ১২জন। তাদের মধ্যে দ্বাদশ ইমাম অত্যাচারী ও জালিম শাসকদের ধ্বংস করবেন এবং তাদের দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী সত্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। এ বিষয়টি বিশেষ করে ইমাম হাদী ও ইমাম হাসান আসকারী (আ.) এর আমলে খলিফাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ কারণেই ইমাম আসকারী (আ.) উপর ক্ষমতাসীন খলিফা কড়া নজর রাখত এবং চাইতো যে, তার যেন কোন সন্তান না হয়। সবদিক দিয়েই তাঁর প্রতি কড়া নজর রাখতো এমনকি কয়েকবার তাঁকে বন্দী করে। অবশেষে খলিফা মোতামেদ বুঝতে পারে যে বন্দী করেও ইমামের প্রতি ভালবাসা থেকে মানুষকে দূরে সরানো যাবে না। বরং উত্তরোত্তর ইমামের প্রতি মানুষের আগ্রহ উদ্দীপনা বেড়ে চলেছে। উপরন্তু বন্দীদশা ও কারারুদ্ধতা খেলাফতের জন্য প্রতিকুল পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তাই ইমামকে আর বন্দী করে রাখার সাহস পেলনা। অতঃপর খলিফা মোতামেদ (৮৭০-৮৯২) ইমামকে বিষ প্রয়োগ করে ৮৭৪ খৃস্টাব্দে শহীদ করে।

ইবনে সাব্বাগ মালেকী তার লেখা বই "ফুসুসুল মাহমাহ" এ আব্দুলাহ্ ইবনে খাকান এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, একজন আব্বাসীয় দরবারী কর্মকর্তা লিখেন: ইমাম আবু মোহাম্মদ হাসান ইবনে আলী আসকারী (আ.) এর নিহত হওয়ার কালে আব্বাসীয় খলিফা মোতামেদের এমন অবস্থা হয়েছিল যে, আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা মোটেও কল্পনা করিনি যে তিনি যুগের খলিফা এবং মুসলিম জাহানের সমগ্র ক্ষমতা যার হাতে তার এমন অবস্থা হতে পারে। যখন আবু মুহাম্মদ ইমাম আসকারী (আ.) বিষাক্রান্ত হয়েছিল তখন খলিফার ৫জন বিশেষ দরবারী ফকীহ ইমামের বাড়িতে দ্রুত প্রেরিত হয়েছিল। খলিফা তাদেরকে আদেশ করেন ইমাম যে কাজ ও কথাই বলুক তৎক্ষনাত তা যেন খলিফাকে অবগত করা হয়। কয়েকজন সেবক প্রেরণ করে যাতে ইমামের সার্বক্ষনিক পরিচর্চা করা হয়। কাজী বখতিয়ারকে আদেশ দেন ১০জন বিশ্বস্ত লোক ঠিক করে তাদেরকে সকালে বিকালে দুবার ইমামের বাড়িতে পাঠিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার সম্যক ধারনা রাখতে পারে। দুই অথবা তিন দিন পরে খলিফাকে খবর দেয়া হলো যে, ইমামের অবস্থা আশংকাজনক এবং তার সুস্থ হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই। খলিফা ইমামের বাড়িতে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখার আদেশ জারি করে। নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ খলিফার আদেশ মত ইমামের বাড়িতে কড়া নজর রাখলো এর কয়েকদিন পরে ইমাম পরলোক গমন করেন। ইমামের মৃত্যু সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়লো তখন সমগ্র সামারার অলি গলি, রাস্তা-ঘাট জনতায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বনি হাসিম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী। সৈন্য সেনাপতি, শহরের বিচারপতি, কবি সাহিত্যিকসহ আপামর জনসাধারণ শোক জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল ইমামের নিজস্ব ঘর যেখানে তার পিতা ইমাম হাদীকে দাফন করা হয়েছিল সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হযরত হুজ্জাত ইবনুল হাসান আল মাহদী (আ.)। ২৫৫ হিজরীর ১৫ই সাবান (৮৬৮ খৃস্টাব্দ) শুক্রবার ভোর ইরাকের সামারা শহরে একাদশ ইমামের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাতা হচ্ছেন যথাক্রমে ইসলামের একাদশ পথ প্রদর্শক হযরত ইমাম হাসান আসকারী (আ.) ও সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিতা রমনী নারগিস তাঁর মাতা। যিনি সুসান নামেও পরিচিত। তিনি ইউসায়ার (রোমের বাদশাহর ছেলে) কন্যা, সামাউন সে

সামাউন যে ঈসা (আ.) এর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিল) এর বংশধর ছিলেন, তিনি এমনই সম্মানিতা ছিলেন যে, ইমাম হাদী (আ.) এর বোন হাকীমা খাতুন তাকে নিজের ও তার খানদানের নেত্রী এবং নিজে তার সেবাকারী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। রোমে থাকাকালীন সময়ে তিনি স্বপ্নে নবী আকরাম (সা.) ও ঈসা (আ.) কে স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁরা তাঁকে ইমাম হাসান আসকারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করালেন। অন্য আরও একটি স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত ফাতিমা (সা.) এর দাওয়াতে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছেন। এই সময় মুসলিম ও রোমানদের সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় রোমের বাদশাহ্ যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওয়ানা হন। এদিকে নারজীস খাতুন স্বপ্নের মধ্যে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী সৈন্যদের সেবা করার জন্য যেসব সেবিকা যুদ্ধের ময়দানে পাঠানো হয় তাদের সাথে যেন ছদ্মবেশে একেবারে সীমান্তের কাছাকাছি সৈন্যদের যে তাবু রয়েছে সেখানে চলে আসেন। তিনি তাই করলেন। তাদের সাথে যাওয়ার সময় এ পাশের মুসলমান সীমান্ত রক্ষীরা তাদের বন্দী করে। হযরত নারগিস রাজ পরিবারের সদস্য হিসাবে বুঝতে না পেরে সৈন্যরা অন্যান্য নারী বন্দীদের সাথে বাগদাদে নিয়ে এল। ইমাম হাদী (আ.) রোমান ভাষায় লেখা একটি চিঠি যা তিনি নিজেই লিখেছিলেন তা তার এক ভৃত্যকে দিয়ে বাগদাদে নারগিস খাতুনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইমামের সেই ভৃত্য তাকে দাসী বিক্রয়ের স্থান থেকে কিনে নিয়ে সামারায় ইমামের কাছে পাঠিয়ে দিল। হযরত নারগিস স্বপ্নের মধ্যে যা কিছু দেখেছিলেন ইমাম তা তাকে মনে করিয়ে দিয়ে বললেন। তিনি একাদশ ইমামের স্ত্রী ও এমন সন্তানের জননী যিনি পৃথিবীর অধিকর্তা হবে। আর সে পৃথিবীর বুকে ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠাতা হবে। তারপর ইমাম হাদী (আ.) তাকে তার বোন হাকীমা খাতুনের হাতে তুলে দেন। হাকীমা খাতুন বর্ণনা করেন: একদিন আমি হযরত আবু মোহাম্মদ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন: হে ফুফী আজ রাত আমাদের এখানে অবস্থান করুন। আজ আল্লাহ্তালাহ্ আমাকে কিছু দান করবেন। অর্থাৎ আমাদের গৃহে শিশু জন্মগ্রহণ করবে। বিবি নার্গিসের মধ্যে তো গর্ভের কোন চিহ্নই দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি বললেন: ফুফী, নার্গিস হযরত মুসা (আ.)এর জননীর অনুরূপ। তাই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তার গর্ভ প্রকাশ পাবে না। হাকীমা বলেন: আমি সে রাত সেখানেই অতিবাহিত করলাম। অর্ধ রাত্রি অতিবাহিত হলে আমি উঠে তাহাজ্জুদ পড়ছিলাম। বিবি নার্গিস ও তাহাজ্জুদ আদায় করল। আমি মনে মনে বললাম সকাল প্রায় হয়ে এল কিন্তু আবু মোহাম্মদ (রা.) যা বলেছেন তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। হযরত আবু মোহাম্মদ আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, ফুফী তড়িঘড়ি করবেন না। অতঃপর আমি বিবি নার্গিসের কক্ষে ফিরে গেলাম। পথিমধ্যে তাকে পেলাম। তার শরীরে কম্পন ছিল। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। অতঃপর সুরা এখলাছ ও সুরা কদর ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করে শরীরে ফুঁ দিলাম। তার পেট থেকে পাঠ করার আওয়াজ; অর্থাৎ আমি যা কিছু পড়ছিলাম। তার উদরের শিশুও তাই পড়ছিল। এরপর আমি দেখলাম সমগ্র গৃহ নূরে নূরে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে এবং বিবি নার্গিসের শিশু মাটিতে সেজদায় আছে। আমি শিশুকে কোলে তুলে নিলাম। হযরত আবু মোহাম্মদ আমাকে আওয়াজ দিলেন, হে ফুফী আমার বাচ্চাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন আমি শিশুটিকে তার কাছে নিয়ে গেলে তিনি তাকে কোলে বসালেন এবং আপন জিহ্বা তার মুখে প্রবেশ করিয়ে দিলেন-অতঃপর বললেন: বৎস আল্লাহ্র নির্দেশে বল। শিশু বলল: বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এই দুনিয়ার বুকে আজ যারা অত্যাচারিত তাদেরকে নেতৃত্ব দান করা হবে। এরপ আমি দেখলাম এক ঝাঁক সবুজ পাখি আমাকে ধরে ফেলেছে। হযরত আবু মোহাম্মদ (সা.) একটি সবুজ পাখিকে বললেন: একে ধর এবং এর হেফাজত কর যে পর্যন্ত আল্লাহ্তালা আমাদেরকে এ সম্পর্কে নির্দেশ দেন। আমি হযরত আবু মোহাম্মদকে জিজ্ঞেস করলাম। এই অন্য পাখি গুলি কি? তিনি বললেন: ইনি জিবরাইল (আ.) আর অন্যরা রহমতের ফেরেশতা। অতঃপর বললেন: হে ফুফী একে তার জননীর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আপনি চোখের শীতলতা হাসিল করুন। চিন্তিত হবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্তালার ওয়াদা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। এরপর হযরত হাকীমা শিশুকে তার মাতার কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি (শিশু) জন্মলগ্ন থেকেই মখতুন তথা খাতনাকৃত ছিলেন। হযরত হাকীমা আরও রেওয়াত করেন জন্মর সময় মোহাম্মদ ইবনে হুসাইন (আ.) দুজানু অবস্থায় শাহাদাতের অঙ্গুলি আকাশের দিকে উত্তোলন করে রেখেছিলেন। তাঁর হাচি এলে তিনি আলহাদুলিলহি রাব্বীল আলামীন বলতেন।

জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, একদিন আমি হযরত আবু মোহাম্মদ (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি তার ডানদিকে একটি পর্দা ঝুলানো কামরা দেখলাম। আমি বললাম: প্রভু আপনার পর ক্ষমতায় কে বসবে? তিনি বললেন: পর্দা উত্তোলন কর। তুমি পর্দা উত্তোলন করলে একটি ছোট শিশু বাইরে এল, যার ডান গালে তিল ছিল এবং মাথার কেশ কাঁধের উপর বিক্ষিপ্ত ছিল। সে এসে হযরত আবু মোহাম্মদের কোলে বসে ছিল। তিনি বললেন: আমার পরে এ হবে তোমাদের ইমাম। এরপর শিশুটি তাঁর উরু থেকে উঠে পড়ছিল। হযরত আবু মোহাম্মদ (সা.) শিশুকে বললেন: বৎস নির্দিষ্ট সময়ে দাখিল হও। এরপর শিশুটি গৃহে চলে গেল। আমি তার দিকে

তাকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে হযরত আবু মোহাম্মদ বললেন: উঠ এবং দেখ ঘরে কে আছে। আমি দেখলাম ঘরে কেউ ছিল না।

অন্য এক ব্যক্তি বলেন: খলিফা মুতাহিদ বিল্লাহ্ আমাকে অন্য দুই ব্যক্তির সাথে তলব করলেন এবং বললেন হাসান ইবনে আলী সামারায় পরলোক গমন করেছেন। দ্রুত যাও এবং তার গৃহে যাকে পাও তাঁর শির আমার কাছে নিয়ে এস। আমরা হাসান ইবনে আলীর বাসগৃহে প্রবেশ করে দেখলাম গৃহটি নেহায়েত পাক ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল যেন এই মাত্র তার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আমরা গৃহে পর্দা ঝুলন্ত দেখলাম। পর্দা সরাতেই একটি গুহা দৃষ্টিগোচর হলো। কাছে এলে গুহাটি একটি দরিয়ার ন্যায় দেখা গেল। যার উপর চট বিছানো ছিল। জনৈক সুশ্রী ব্যক্তি তার উপর দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়ছিল। সে আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। আমার জনৈক সঙ্গী তার কাছে পৌঁছার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হল। কিন্তু সে পানিতে নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। অবশেষে আমি তার হাত ধরলে সে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পেল। এরপর আরও এক ব্যক্তি তার কাছে পৌঁছার চেষ্টা করল। কিন্তু তার অবস্থাও তাই হল এবং আমি তাকে উদ্ধার করলাম। আমার বিস্ময়ের কোন সীমা রইল না আমি গৃহকর্তার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললাম: আলাহ্র কসম, আমি এই পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম না এবং তাও জানতামনা কোথায় যাচ্ছি। আমি যা করেছি তার জন্য আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়ে ক্ষমা চাই। কিন্তু গৃহকর্তা আমার কথায় ভ্রূক্ষেপও করল না। আমরা খলিফার কাছে ফিরে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। খলিফা বললেন: এ গোপন রহস্য গোপনই থাকতে দাও। লোকেরা জানতে পারলে তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেবে।

ইমাম, উলিল আমর, ওলী, মুর্শিদ, হাদী বা পীরকে মান্য করার ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে: আমি (আল্লাহ্) বললাম: তোমরা সকলেই এই স্থান হইতে নামিয়া যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসিবে তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিত ও হইবে না, (সূরা বাকারা ৩৮)। এই আয়াতের মাধ্যমে জানা গেল আদম (আ.) থেকে কিয়ামত তক হেদায়তের ধারা চির বহমান। আর এই খোদায়ী হেদায়েতের প্রধান পদবী হলো নবী ও রাসূল? তবে হেদায়েতের জন্য এই পদবীধারাই একমাত্র উৎস নয় বরং পবিত্র কুরআনে আরো কিছু পদবী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যাদেরকে অনুসরণ ও অনুকরণ করা মানবজাতির পবিত্র দায়িত্ব। এ ব্যাপারে আমরা কয়েকটি পদবী ও কিছু মানুষের এমন বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং বর্ণনা করেছেন যা জানা ও মানা মানব জাতির জন্য অবশ্য পালনীয়। এ বিষয়টি রাসূল (সা.) গাদীরে খুমের বক্তৃতায় ও অন্যান্য স্থানে তার বংশগত ১২জন ইমামের কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। ইমামদের ভূমিকা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা: স্মরণ কর, সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে উহাদের নেতাসহ (ইমামসহ) আহ্বান করব। যাহাদের দক্ষিণ হস্তে তাহাদের আমলনামা দেওয়া হইবে, তাহারা তাহাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাহাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হইবে না। আর যে ব্যক্তি এইখানে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট। (সূরা বনি ইসরাইল : ৭১-৭২) অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়, জাতি, জনগোষ্ঠী (Community) এর জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক ইমাম নির্বাচিত রয়েছে। সেই ইমামকে চর্মচক্ষু দিয়ে অনুসন্ধান করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। অন্যথায় সেই ব্যক্তির দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ হয়ে যাবে। যেহেতু এই ইমাম পদবী আল্লাহ্ কর্তৃক হেদায়েতের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক বিশেষ ধরণের ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত। তাই অবৈধ ক্ষমতাধারী শাসক তথা আমিরুল মোমেনীনগণ ও তাদের চামচা ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানী হিসাবে কথিত, ব্যক্তিবর্গ এই 'ইমাম শব্দটির মূল অর্থ সম্পর্কে জনমনে সংশয় ও বিভ্রান্ত সৃষ্টির জন্য এই ইমাম পদবী এমন ব্যক্তির জন্য ব্যবহার শুরু করলেন যারা নিজেরাও কখনও এই ধরণের খোদায়ীভাবে নিয়োজিত ইমাম হবার দাবি করেন নাই। আর তাঁরা কখনই আসলেও ঐশী পন্থায় ইমামত লাভও করেন নি। অথচ কোন বিশেষ ধারার জ্ঞানী হওয়ার জন্য এক ব্যাপক সংখ্যক ব্যক্তিবর্গকে 'ইমাম' পদবীতে আখ্যায়িত তথা সম্মানিত করা হয়েছে। যা ছিল তাদের ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয়। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্যে বেশ কিছু ব্যক্তিকে ইমাম উপাধি দান করে ইসলাম ধর্মীয় ইতিহাসে এক মারাত্মক ফিতনার সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ইত্যাদি যে সব হাদিস সংগ্রহকারী ছিলেন তারা কোন জনগোষ্ঠীর ইমাম বা নেতা ও ছিলেন না। তাছাড়া নিজেরা ধর্মীয়ভাবে এমন কোন ধর্মমত প্রচার করেন নাই যে কারণে তাদেরকে ধর্মীয় নেতা হিসাবে আখ্যায়িত করতে হবে। এ ধরণের অনেক ব্যক্তিবর্গকে অনাবশ্যকভাবে তাদের অন্ধভক্ত তাদেরকে ইমাম হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।

পবিত্র কুরআনে অন্য একটি পদবী 'উলিল-আমর' যাকে মান্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে: হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূল ও তোমাদের মধ্যে যারা (ঐশী ক্ষমতার মাধ্যমে অন্যকে নির্দেশ প্রদানের অধিকারী)

(তাদের আনুগত্য কর) অনেক তাফসীরকারক অবৈধ ক্ষমতাধর শাসকদের প্ররোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, 'উলিল আমর' বলতে যুগের শাসক-ই- এর উদ্দেশ্য। কিন্তু সত্য হলো এই যে, এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা বলে যারা মানবীয় নেতৃত্বের অধিকারী। কেননা আল্লাহ্ যেভাবে নিজের ও নিজ রাসূলের শর্তহীন আনুগত্যের নির্দেশ দান করেছেন, সেই একইভাবে তাদের শর্তহীন আনুগত্য ও সমুদয় বান্দার উপর ফরজ করেছেন। পক্ষান্তরে তাদেরকে মাসুম হওয়া অর্থাৎ পাপশূন্য হওয়া আবশ্যক হয়। কেননা কোন মানব বিবেক একথা গ্রহণ করতে পারেনা একজন জালেম, গুণাহ্গার বা ভুলের অধিকারী কোন শাসকের আনুগত্য করতে আল্লাহ্ ঢালাওভাবে নির্দেশ দিবেন। নির্দেশটি কোন বিশেষ যুগে, সময় বা বিশেষ ব্যক্তির জন্য নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ ও প্রতিটি সময়ের জন্য এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রেও সাধারণ জাগতিক বিষয় বা ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা শর্তহীনভাবে সকল ক্ষেত্রে আনুগত্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। লক্ষ্যণীয় যে," উলিল আমর" বলতে যদি জাগতিক রাজা বাদশাহ্ হয় তবে ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যই ম্লান হয়ে যায়। কেননা কোথাও খৃস্টান বাদশাহ্ রয়েছে আবার কোথায়ও বৌদ্ধ বা হিন্দু শাসনকর্তা রয়েছে, আর যদি মুসলিমই উদ্দেশ্য হয় তবে তাদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি, খারেজী, ওহাবী, মোতাযেলাসহ বিশ্বাসের বহু শাখা প্রশাখা রয়েছে। তাছাড়া এদের ধর্মীয় বিশ্বাস যাই হোক প্রজা নিপীড়নে এরা সবাই সমানভাবে পরিদর্শী হতে পারেন। সেক্ষেত্রে আর "উলিল আমর" না জানা অদৃশ্য বা অজ্ঞাত থাকলে সকল শাসক (মুমিন বা ফাসেক), সকল আলেম ফকীহ, সকল সমরনায়ক, সকল বুদ্ধিমান ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এভাবে অসংখ্য ব্যক্তির আনুগত্য করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। যা পালন করা অসম্ভব। আবার যদি যে কোন একজনের আনুগত্য করলেই চলবে তবে তিনি কে এবং কোন যুক্তিকে তাকে প্রধান্য দেওয়া হবে। তাহলে এটা আবশ্যক হয় যে, এ ধরণের ব্যক্তি ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি এর উদ্দেশ্য হবে তার বিদ্যমানতাও অপরিহার্য। অন্যথায় আল্লাহ্ কর্তৃক "উলিল আমরের" আনুগত্যের নির্দেশ অসার প্রতিপন্ন হয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ যুগের ইমামের পরিচিতি লাভ না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহেলী যুগের ন্যায় কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু কেউ যদি রাজা-বাদশাহ্দের আনুগত্য না করে তবে সে কাফির হয়ে যায় না। এছাড়া হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারীর বর্ণনায়ও এর বিশদ বিবরণ বিদ্যমান যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। 'উলিল আমর' অর্থে যারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষে মান্য করার জন্য দাবি করে, তাদের ধারণা যে ভুল সে সম্পর্কে বলা যায় যে, আল্লাহ্তালা সুনির্দিষ্টভাবে কিছু লোকের আনুগত্য স্বীকার করতে মানবজাতি তথা ইমানদার লোককে নিষেধ করেছেন:

১. মহান আল্লাহ্ পাপীদের আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন (সূরা ইনসান : ৪)
২. এবং যে আল্লাহ্র স্মরণে গাফেল, যে তার খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তার আনুগত্য ও নিষিদ্ধ করেছেন (সূরা কাহাফ: ২৮)
৩. আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তাহার পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তবে উহারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার (আল্লাহ্র) সাথে এমন কিছু শরিক করতে যাহার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদিগকে মানিও না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদিগকে বলে দেব তোমরা কি করতে ছিল। (সূরা আনকাবুত : ৮)। অতঃপর এটা স্থির নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, যে কোন উপায়ে শাসন ক্ষমতা অধিষ্ঠিত হলেই 'উলিল আমর' হওয়া যায় না। বরং এই পদ/পদবী আল্লাহ্ কর্তৃক অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মানবজাতির উপর কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব করার ক্ষমতা প্রাপ্তরাই হলেন 'উলিল আমর'।
৪. সূরা কলমে বর্ণিত ১০টি বৈশিষ্টসম্পন্ন (মিথ্যাচারী কথায় কথায় শপথ করে, পশ্চাতে নিন্দাকারী, একের কথা অপরের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়, কল্যাণের কাজে বাধা দানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রুঢ় স্বভাব, কুখ্যাত ধন সম্পদে ও সন্তান সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী), ব্যক্তি।

অলি আল্লাহ্ ও মুর্শিদ

আল্লাহ্র অলি বা আল্লাহ্র বন্ধু সম্পর্কে আল কুরআন : জেনে রাখ, আল্লাহ্র বন্ধুদের না ভীতি থাকবে আর না তারা দুঃখিত হবে। তারা সেসব মানুষ যারা বিশ্বাস করে এবং পরহেজগরিতা অবলম্বন করে। তাদের জন্যই ইহ কালের জীবনে ও পরকালের সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ্র বাণীসমূহের (আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ও সৃষ্টিগত নিয়মের) কোন পরিবর্তন হয় না। এটাই তো মহা সাফল্য (সূরা ইউনুস : ৬২-৬৪)। আল্লাহ্র পথে নিহতদের কখনও মৃত বলে চিন্তাও করিও না বরং তারা জীবিত, নিজেদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকা পেয়ে থাকে (সূরা বাকারা : ১৫৫)। যেহেতু তাঁরা আল্লাহ্র বিবেচনায় জীবিত তাই তাদের কবর সাধারণ মানুষের কবরের মত নয় বরং তা মাজার বা রওজা শরিফ তাই সেখানে যাওয়া বা কিছু মানত করার সাথে শিরকের কোন দূরতম সম্পর্কও নাই। হেদায়েতের চাবিকাঠি হলো অলি বা মুর্শিদ। এ

ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা : আল্লাহ্ যাকে পথ নির্দেশ (হেদায়েত) দান করেন সে পথ প্রাপ্ত এবং যাকে (আল্লাহ্) পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে রাখেন তার জন্য তুমি কোন অভিভাবক (অলি) ও পথ নির্দেশক (মুর্শিদ) পাবে না। (সূরা কাহফ-১৭)।

আল্লাহ্ বলেন, হেদায়েত তথা আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তাধারা ও আমল সঠিকভাবে জানতে ও মানতে হলে অলি বা মুর্শিদের কাছে যেতে হবে বা তার কথা মানতে হবে। আর যে এই ধরণের অলি বা মুর্শেদ পেতে ব্যর্থ হবে বা অমান্য করবে তার ভাগ্যে আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হেদায়েত বা মুক্তির পথ জুটবে না। এখানে নবী/রসূল শব্দ ব্যবহার না করায় এটা স্থির নিশ্চিতভাবে বুঝা গেল অলি মুর্শেদ প্রকৃতপক্ষে নবী.রাসূলের ন্যায় একই কাজে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিয়োজিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। অর্থাৎ আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য নবী-রাসূল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)। এর তিরোধানের পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়েতের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি একটি অপরিহার্য ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যে বা যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত এই ধরনের ব্যক্তিত্বের উপিস্থিতি অস্বীকার করবে কার্যত সে ইমানহারা হয়ে যাবে।

মহা জ্ঞানী বা জ্ঞানের খনি

পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা যা সাধারণভাবে আলেমরা জানে না তাদেরকে 'রাসেখুন্য ফিল এলেম'দের কাছে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে (সূরা আল ইমরান : ৭)। অনুরূপভাবে আল্লাহ্তালা আহলে যিকর তথা যারা আল্লাহ্র সার্বক্ষণিক যিকর বা স্মরণে থাকেন তাদের কাছেও যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে: সুতরাং, হে লোকেরা তোমরা যা না জানো আহলে যিকিরকে জিজ্ঞাসা কর (সূরা নাহাল: ৪৩, সূরা আম্বিয়া:৭)। স্মরণ রাখতে হবে যে, এই সমস্ত মহা জ্ঞানীদের এমন অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে ফলে তারা মানজাতির সকল কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন: এবং বল, তোমরা কর্ম করতে থাক, আল্লাহ্ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূল (সা.) ও মুমিনগণও (গায়েবের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি) করবে এবং অচিরেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যাহা করিতে তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন (সূরা তাওবা : ১০৫)।

একজন প্রকৃত ইমানদার লোক কি ধরণের লোকের আনুগত্য বা মান্য করবে বা তার সান্নিধ্যে যাবে এবং দীর্ঘ সময় তাকে হুবহু অনুসরণ ও অনুকরণ করবে এ ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশনা: তুমি নিজকে ধৈর্যসহকারে রাখবে উহাদেরই সংস্পর্শে যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে উহাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের কামনা করিয়া উহাদিগ হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইওনা। তুমি তাহার আনুগত্য করিও না-যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়েছি। যে তাহার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে ও যা হবে কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে (সূরা কাহাফ : ২৮)।

একজন আদর্শ ইমানদার ব্যক্তির জন্য শুধুমাত্র মৌখিক ইমান আনাই যথেষ্ট নয় বরং সে যেন সব সময় সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশ, হে ইমানদারগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও (সূরা তাওবা : ১১৯)।

আল্লাহ্ ভালবাসেন

নিশ্চয় আল্লাহ্ পরোপকারীদের ভালবাসেন (মায়িদা : ৪২) আল্লাহ্ পরহেযপার মুত্তাকীনদের ভালবাসেন (সূরা তাওবা: ৪)।

যারা পবিত্র হয় (আত্মিক তথা আধ্যাত্মিক পবিত্রতা যা শুধু নবী/রাসূল ও তাঁর বৈধ উত্তরধিকারীই দান করতে সক্ষম। আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন (সূরা তাওবা : ১০৮)।

আল্লাহ্ ভালবাসেন না

আল্লাহ্ ভালবাসেন না যারা দাম্ভিক ও আত্মম্ভব, যারা কৃপনতা করে ও মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে (সূরা নিসা : ৩৬-৩৭)।

যারা ধংসাত্মক সন্ত্রাসী কাজে লিপ্ত আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন না (সূরা মায়িদা : ৬৪)।

আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না (সূরা মায়িদা : ৮৭, সূরা আরাফ : ৫৫)।

আল্লাহ্ অপচয়কারীদের বিলাসিতা ভালবাসেন না (সূরা ১৪১)।

আল্লাহ্ অত্যাচারীকে যুলুমবাজকে ভালবাসেন না (সূরা আরাফ : ৩৪)।

সাধারণভাবে একশ্রেণীর আলেম ইসলামে তথা পবিত্র কুরআনে চরিত্র সংশোধন ও অন্যান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফরজ, ওয়াজেব সুন্নত, মুস্তাহাব সম্পর্কে কোন রকম পরামর্শ, নির্দেশ বা সমাধান না দিয়ে শুধুমাত্র দৃশ্যমান-নামায, রোজা, যাকাত ও হজ্বের উপর মাত্রারিক্ত গুরুত্বারোপ করে থাকেন। ইসলাম ধর্মে অবশ্যই এই সব ইবাদতের গুরুত্ব অপরীসিম। কিন্তু পবিত্র কুরআন আল্লাহ্

রাব্বুল আলামিন যাদের সঙ্গে থাকেন বলে বলা হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট হিসাবে নামায, রোযা, হজ, যাকাত প্রদান করে, হিসাবে বলা হয় নাই। অর্থাৎ আল্লাহ্ নামাযীদের সাথে থাকেন, আল্লাহ্ রোজাদারদের সাথে থাকেন, আল্লাহ্ যাকাত দাতাদের সাথে থাকেন অথবা আল্লাহ্ হাজীদের সাথে থাকেন এমন কোন আয়াত নাই। বরং এরশাদ হচ্ছে

১. হে ঈমান আনয়নকারীগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। (সূরা বাকারা : ১৫৩)

২. যাহারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি উহাদিগকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করিব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়নদের সঙ্গে থাকে। (সূরা আনকাবুত : ৬৯)

৩. তোমরা মীমাংসা চাহিয়া ছিলে, তাহা তো তোমাদের নিকট আসিয়াছে। যদি তোমরা বিরত হও তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় কর তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দেব এবং তোমাদের দল সংখ্যা অধিক হইলেও তোমাদের কোন কাজে আসিবে না এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের সহিত রহিয়াছেন। (সূরা আনফল : ১৯)

৪. হে ঈমান আনয়নকারীগণ! কাফিরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর এবং উহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখিতে পায়। জানিয়া রাখ আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের সহিত আছেন। (সূরা তাওবা: ১২৩)

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সম্মানিত তাফসিরকারকদের ও আলেমদের নিকট আমাদের নিবেদন তাঁরা যেন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আমানু। মোমিন, মুত্তাকিন, মোহসেনিন মুর্শেদ, হাদী এবং এ ধরণের বিভিন্ন শব্দের অর্থ ঢালাওভাবে ইমানদারগণ না লিখে এই সব শব্দের সঠিক অর্থ অর্থাৎ আল্লাহ্ কি বোঝাতে চেয়েছেন এবং এসব শব্দ যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাদের মধ্যে মর্যাদাগত, ক্ষমতাগত ও অন্যান্য কি কি পার্থক্য আছে তা বর্ণনা করেন তাহলেই তাদেরকে পবিত্র কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যাকারী বলা যাবে অন্যথায় আমরা পরকালে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কাছে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ উত্থাপন করবো এবং কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী দ্বিগুণ শাস্তি দাবি করবো।

পবিত্র কুরআন অনুযায়ী এই সব অসাধারণ মর্যাদা, ক্ষমতা, যোগ্যতা, জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে ভালবাসা তাদের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা, তাঁদের উসিলায় খানাপিনা, কবিতা, জ্ঞান, সামা প্রভৃতির আয়োজন করলেই তা শিরক অথবা বিদআত হয়ে যায় মর্মে এক শ্রেণীর আলেম ও তাঁদের অনুসারী বিশ্বব্যাপী মহা তোলপাড় সৃষ্টি করছেন। অথচ মুসলমান রাষ্ট্রসমূহে খোদাদ্রোহী ও জালেমশাহী রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সামন্তবাদ, জমিদারতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, পুঁজিবাদ, তার ডারউইনবাদ, সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি, অশ্লীলতা, বেলেল্লাপনা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদ, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার অন্ধ অনুকরণ ইত্যাদি মানবজাতির ঘাড়ে জোয়ালের ন্যায় লেগে আছে। অথচ এই ধরণের নব্য বুদ্ধিজীবীবাদের প্রধান লক্ষস্থল হলো আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র ব্যক্তিবর্গ ও যাদের আল্লাহ্ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত ও বাস্তবায়িত। অথচ ইসলাম ধর্ম বলতে তারা ইসলামের এই মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা, প্রশংসা ও খোদায়ী ক্ষমতার স্বীকৃতিকেই ধর্মের প্রধান দুশমন হিসেবে বিবেচনা করলেন তারা অথচ রাজনৈতিক নেতৃত্ব তা সে কত জঘন্য ও অত্যাচারী ও চরিত্রহীন হোক না কেন তাদের সম্পর্কে টু শব্দটি করেন না ।

আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে জানতে পেরেছি যে, এসব আলেমরুপী জালেমদের নির্দেশ শিরক ও বিদআত ভিত্তিক কর্মকাণ্ড মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ:

১. তাওহীদ বলতে তারা আল্লাহ্ এক বুঝেন যেমন শয়তান বুঝেছিল। তাই শয়তান আল্লাহ্র নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সে আদমকে (আ.) সেজদা বা সম্মান করেনি। এই তৌহিদ পালনের জন্য শয়তান ইবলিস বা চির অভিশপ্ত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা মুহাম্মদ (সা.) কে আল্লাহ্ যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও রাসূল (সা.) হিসেবে নিয়োগপূর্বক তাকে অভূতপূর্ণ মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রদান করেছেন তা তাদের কাছে কোন বিশিষ্টতা দান করেনি। তাই তারা নবী মোহাম্মদকে সাধারণ মাটির মানুষ (নূরের নয়, যদিও এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এর সমর্থনে অনেক আয়াত রয়েছে) মনে করে। তিনিও সাধারণ ব্যক্তির মত মৃত যদিও আল্লাহ্ বলেন, তাদেরকে মৃত হিসাবে চিন্তাও করিও না। রাসূল (সা.) এর মর্যাদা বড় ভাইয়ের মত এর বেশী কিছু নয়। যদিও পবিত্র কুরআন অনুযায়ী রাসূল (সা.) এর স্ত্রীগণ ইমানদারদের সম্মানিতা মাতা।

নবীগণ এবং অনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ উম্মতের কর্মকান্ডের সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া তারা মৃত্যু বরণও করেন না। তাই পৃথিবীর যে কোন জায়গায় উপস্থিত হতে তাদের বাধা কোথায়, কিন্তু নব্য বুদ্ধিজীবীদের ধারণা রাসূল (সা.) ও তারা একই ধরণের বুদ্ধি ও শক্তি সম্পন্ন তাই এটা অবিশ্বাস্য এবং এ ধারণা পোষণ করা শিরক ও কাজটা হলো বিদআত। অনুরূপভাবে মিলাদ মাহফিলকে বিদআত ও নাযায়েয বলা হয়। অন্যান্য নবী সম্মিলিতভাবে যত মোজেযা দেখিয়াছেন

রাসূল (সা.) এককভাবে তাঁদের সম্মিলিত মোযেযার চেয়ে বেশি মোযেযা তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এই নব্য বুদ্ধিজীবীদের কাছে এর কোন গুরুত্ব নাই। অর্থাৎ এতে তাঁর মর্যাদা কম বেশী হবে না।

মিলাদ মাহফিল, ঈদে মিলাদুন্নবী বিদআত তাই এগুলো পালন করা নিষিদ্ধ। মাযার যিয়ারত এক ধরণের শিরক, নবী-অলিদের মাযারে দুআ দরুদ পাঠ করাও নাযায়েজ। অনুরূপভাবে উরস, ঈসালে সওয়াব, ফাতেহাখানী কুলখানী চেহলাম ইত্যাদি পালন করা ভয়াবহ শিরক। নামাযের মধ্যে রাসূল (সা.) এর স্মরণ এলে তা কঠিন শিরকে পর্যবসিত হয় (নাউযুবিল্লাহ্)।

এমনকি নবী, সাহাবী, অলিগণের মাযার, ব্যবহৃত স্মৃতি চিহ্ন বা তবারক সংরক্ষণ করা ভয়াবহ শিরক এগুলো যত তাড়াতাড়ি ধ্বংস করা যায় ততই তা ঈমানের জন্য মঙ্গলজনক। পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ৬৮ নম্বর আয়াতে রাসূল (সা.) এর সুপারিশে আল্লাহ্ গুণাহ্ মাফ করেন লিখা থাকলেও তা এই বুদ্ধিজীবী তথা আলেমদের কাছে অগ্রহণযোগ্য। এমনকি আল্লাহ্ ও মোহাম্মদ নাম পাশাপাশি লেখাও এদের দৃষ্টিতে না যায়েয। আবার রাসূলের আহলে বাইতের ইমাম হোসাইন (আ.) কে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম পদ্ধতিতে হত্যা তাঁর পরিবারের সদস্যদের অসম্মান, মদীনায় রাসূল (সা.) মাযারকে ঘোড়ার অস্তাবাল বানানো, সাহাবা হত্যা, মদীনা নগরীতে ১২ হাজার লোককে হত্যা ও মদীনা নগরীর পবিত্র মহিলাদের গণধর্ষণ ও মক্কা শরিফের গিলাফে আগুন ও কাবা ঘরে সেই আমলের কামান দাগা ইত্যাদির হোতা ইয়াজীদের প্রশংসায় এসব আলেমরূপী জালেমরা খুব খুশী।

প্রকৃতপক্ষে এসব নব্য শিক্ষিত মূর্খ আলেম বা বুদ্ধিজীবী নিজ ধর্মের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করায় বুঝতে হবে যে, যতই তারা শিরক বিদআতের ভয় দেখাক আসলে তাদের চিন্তা চেতনায় ও আমলে কোন বড় ধরণের বিভ্রান্তি, অসংগতি, ভুল বা ইসলাম ধর্মে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ রয়েছে। আর তা সৃষ্টি হয়েছে মূলত এরা আল্লাহ্, রাব্বুল, আলামিন হযরত ইবরাহীমকে যে আকাশ ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা (Sky and World Administrative System) দেখিয়েছিলেন তা না জানা, না বুঝা বা কোন ধারণা না থাকা। এ কারণেই এই সব নব্য বুদ্ধিজীবীরা আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে আমি এবং আমরা ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞ এবং তাই এ ব্যাপারে আজেবাজে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এদের ধারণা মতে আল্লাহ্ একজন মধ্যযুগীয় বাদশাহ্ যিনি সেনাপতিও বটে সকল প্রশাসনিক কাজ এককভাবে করে থাকেন। তাই অন্য কোন ব্যক্তি/ বস্তু/ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা থাকাই শিরক। অর্থাৎ বিশ্ব পরিচালনায় যে মধ্যাকর্ষণের ন্যায় আরও বহু আইন-কানুন, বিধি-বিধান আল্লাহ্ স্বয়ং প্রণয়ন ও চালু করেছেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে যা মেনে চলে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ মানব ও ফেরেশতাকে তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি (রাসূল) নিয়োগ করেছেন। যেমন সৃষ্টির মৃত্যুর দায়িত্ব আল্লাহ্তালার কিন্তু এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হযরত আজরাইল (আ.) এর উপর। অনুরূপভাবে বিশ্বের পানি বা বৃষ্টি পরিচালনার দায়িত্ব মিকাইল (আ.) এর উপর। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্ নবী-রাসূল-অলি-মুর্শিদকে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য নিয়োগ করেছেন। এই হেদায়েত কাজ সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে করার সুবিধার্থে এই সব মহান ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে জনগণ বুঝতে পারে এরা কোন সাধারণ ও স্বাভাবিক লোক নয় বরং তারা হলেন আল্লাহ্পাক কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তাই এদের কাছে কিছু চাইলে বা এটা কোন অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করলে তা আল্লাহ্রই মর্যাদার প্রকাশ ও বিকাশকেই বুঝিয়ে থাকে। এর সাথে শিরক বিদআতের কোন সম্পর্ক নাই। যেমন আধুনিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক যদি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির কাছে কোন আবেদন করে তবে বিশ্বের কোন আইনেই রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ড হিসাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয় না। তাই আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করা হলে তা শিরক বা বিদআত বলার কোন সুযোগ নাই। বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টীকরণের জন্যই মহান আল্লাহ্তালা সরকার প্রধান হিসাবে নিজের কাজকে 'আমাদের কাজ' আবার রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে নিজের কাজকে "আমার কাজ" হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

সুফিদের সাথে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীনদের বিরোধিতা

জানা যায় যে, সুফিবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে ইবনে খালদুন বলেছেন, সুফি মতবাদ ইসলামেরই উদ্ভুত ধর্মীয় বিজ্ঞানের একটি অন্যতম বিষয়। রাসূল (সা.), সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং তাঁদের পরবর্তী যুগের ইমাম, সুফি দরবেশদের অনুসৃত নীতিকেই মুসলমানরা সত্যিকার মুক্তির পথ বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। ধর্মীয় ধ্যান ধারণার প্রতি অনুরক্ত হওয়া, আল্লাহ্ রাসূলের ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাগতিক ঐশ্বর্যের মোহ পরিত্যাগ করা আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন থেকে বিরত থাকা, জীবনের আকাংখিত বিষয় যেমন মান-সম্মান, যশখ্যাতি এবং ধন সম্পদের ভালবাসা, আনন্দ উল্লাস, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের লিপ্সা এবং জাগতিক মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে মহা প্রেমময়

আল্লাহ্‌র প্রেমে বিভোর হয়ে আত্ম সমাহিত হয়ে নিসর্গ জীবন যাপন করাই সুফিদের মৌলনীতি ছিল। পবিত্র কুরআন মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র সাথে জীবিত অবস্থায় সাক্ষাতের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে : হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতি পালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে থাক, পরে তুমি তাহার সাক্ষাৎ লাভ করবে। (সূরা ইনশিকারক : ৫) আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ্‌র এমন এক বিশেষ শ্রেণীর বান্দা রয়েছেন যারা অমর বা চিরঞ্জীব তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করাও আল্লাহ্‌ স্বয়ং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন (সূরা আলে ইমরান : ১৬৯)। এই বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় এই মহান বান্দাদের যে আর মৃত্যু হবে না এবং এটি যে এক মহান সফলতা অর্জন করার জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে মর্মে পবিত্র কুরআন:

আমাদের তো আর মৃত্যু হইবেনা। প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও দেয়া হইবেনা। ইহা তো মহা সাফল্য। এই রূপ সাফল্য অর্জনের জন্য সাধকদের উচিত (কঠোর) সাধনা করা (সূরা সাফফাত : ৫৮-৬১)।

আর এই কঠোর সাধনা বলতে বান্দাকে সার্বক্ষণিক আল্লাহ্‌র ইবাদত তথা জিকির ফিকির সালাতে মগ্ন থাকার কথা বলা হয়েছে। আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে জ্ঞানবান (আলবাব) লোকদের জন্য। যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া আল্লাহ্‌র স্মরণ (জিকির) করে এবং আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের প্রতিপালক তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে অগ্নি শাস্তি হইতে রক্ষা কর। (সূরা আলে ইমরান : ১৯০-১৯১)। আল্লাহ্‌তালা এইসব সাধক (সুফিদের) সম্পর্কে বর্ণনা করতে তাদেরকে সর্বপ্রথম সালেহীন বা সৎকর্ম পরায়ণ ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এরশাদ হচ্ছে (তারা তবে) সৎকর্ম পরায়নশীল ব্যক্তিবর্গ, যাহারা সার্বক্ষণিকভাবে সালাতে (জিকির, ইবাদত, শ্বাস-প্রশ্বাসের জিকিরে রত) প্রতিষ্ঠিত। (এবং পরবর্তীতে) নিজেদের সালাতে সদা হেফাজতকারী (সূরা মা মারিজ : ২২, ২৩,৩৪)।

যে সমস্ত মহান ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে চিরঞ্জীব, সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত ও সদা হেফাজতকারী তাদেরকে ঐ অবস্থা প্রাপ্তি অর্থাৎ হক্কুল ইয়াকীন অর্জন করা পর্যন্ত কঠোর রিয়াজত বা সাধনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ্‌র কিছু ওয়ালী বা বন্ধু রয়েছেন যারা তাঁদের জীবনের এক পর্যায় অতিক্রম করার পর দৃশ্যত নামায, রোজা, হজ্ব যাকাত থেকে মুক্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু অন্য সাধারণ লোকদেরকে নামায, রোজায় ইত্যাদিতে বিশেষ যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা: তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর "ইয়াতিক্যাল ইয়াকিন" অর্জন হওয়া পর্যন্ত। (সূরা হিজর : ৯৯)

মহাত্মা আবু রায়হান আল বেরুনী (মৃত্যু ১০৪৮) তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল হিন্দ" এ উল্লেখ করেছেন যে, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে যখন গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান আরবী ভাষায় অনুদিত হতে থাকে, তখন থেকেই মারফতে ইলহিয়া তথা আসমানী কিতাব সমূহের শিক্ষা, আম্বিয়া আউলিয়ার আদর্শ এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রাণকেন্দ্র তাসাওউফ শাস্ত্রের চর্চা পুরোদমে শুরু হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের মুকাবেলায় এসে ইসলামের সুফি দর্শনকে এক ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। তখন বাধ্য হয়ে মুসলিম মনীষীগণ ইসলামের গৌরবময় শিক্ষা ও আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে তাসাওউফ চর্চার পথ বেছে নেন। কেননা, গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানে ধর্মীয় চেতনা অনুপস্থিত ছিল। সুফিতত্ত্বের আত্মকথা: মাওলানা আব্দুর রহীম হাযারী, পৃ-২১। ইতোমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলাম ধর্মের পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ব্যাখার জন্য আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও রাসূল (সা.) কর্তৃক ঘোষিত কর্তৃপক্ষ হলেন আহলে বাইতে রাসূল (সা.) অর্থাৎ সুনির্দিষ্টভাবে হযরত আলী (আ.) বংশধরগণ। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্‌র দুর্ভাগ্য যে, রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর হযরত আলী (আ.) এর মর্যাদার যে অবসান ঘটে তা ইসলামের ইতিহাস আজ পর্যন্ত পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।

উমাইয়া শাসনামলে সরকারীভাবে হযরত আলী (আ.) এর গালিগালিজের বিধান প্রচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। আলী (আ.) ৬৬১ খৃস্টাব্দে ওফাতের পর ইতিহাস হতে জানা যায় যে, যে বছর মুয়াবিয়া ক্ষমতা দখল করে সকলে একত্রিত হয় সে বছরের নাম "আল জামাত" রাখা হয়। ওসমান (রা.) এর শাহাদতের পর মুসলমানরা মূলত দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল হযরত আলী (আ.) এর অনুসারী। অন্যদল মুয়াবিয়ার অনুসারী। হযরত আলী (আ.) এর শাহাদাতের পর হযরত হাসান (আ.) খলিফা হন। অবস্থার চাপে পড়ে হাসান (আ.) মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন এবং মুয়াবিয়া একক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কুরআনের ব্যাখ্যা চালু, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে এবং মিথ্যা হাদিস প্রচারের মাধ্যমে আলী (আ.) এর মর্যাদার চেয়ে প্রথম তিন খলিফার মর্যাদা, সম্মান ও বুজর্গী বেশি এই মতবাদ ধর্মীয় জগতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুয়াবিয়ার ক্ষমতা লাভের বছরের নাম রাখা হয়। 'আল জামাত'। এর অর্থ হলো আহলে সুন্নাত আল জামাত সুন্নাতে মুয়াবিয়ার অনুসারী। মুয়াবিয়া প্রবর্তিত (Religo-Politics) ৭৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল।

উমাইয়াদের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এবং উমাইয়াদের মত আব্বাসীয়রাও আলী বংশ ও তাদের অনুসারীদের তাদের রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে বিবেচনা করা এরই ধারাবাহিকতায় বারতম ইমামের অদৃশ্য হওয়ার পর তারা উমাইয়া ধর্ম রাজনীতির অনুসরণে রাষ্ট্রীয় অনুকূল্যে আহলে সুন্নাত আল জামাত রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে বৃহত্তর মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ প্রজার ধর্ম তাই হবে যা রাজা অনুমোদন করবেন। ইউরোপে পোপ এই নীতি প্রবর্তন করেন যা ১৬৪৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিল। ১৫১৭ খৃস্টাব্দ পোপের দুর্নীতি, অনাচার, সীমাহীন ক্ষমতার অপপ্রয়োগের জন্য মার্টিন লুথার (Martin Luther) সংস্কার আন্দোলন হিসাবে বৃহত্তর খৃস্টান সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আংশিক সফলতা অর্জন করেন। পক্ষান্তরে উমাইয়া/আব্বাসীয় খলিফাদের দুর্নীতি, হেরেমবাজি, স্বৈরতন্ত্র, দাসপ্রথা সামরিকতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র ধনী ও গরীবের সীমাহীন বৈষম্য, বাক স্বাধীনতা ও সকল প্রকার স্বাধীণতার অবসানের লক্ষ্যে যে ধর্মমত সৃষ্টি করে তার নাম দেওয়া হয় 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'। যার শব্দগত অর্থই হলো এর অনুসারীরা সেই সুন্নাতই অনুসরণ করবে যা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের বিবেচনায় সঠিক হবে। অথচ পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে যে, নবী যে সিদ্ধান্ত দেন, তার বিপরীতে কোন বান্দার কোন ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়। অর্থাৎ নবীর সিদ্ধান্ত তার উম্মতের জন্য অবশ্য পালনীয়। এ ব্যাপারে সম্মিলিত সিদ্ধান্তের অর্থ হলো মূল সিদ্ধান্তের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত যা মান্য করা নিষিদ্ধ। আর এই নীতি প্রতিপালনই এই ধর্মমতের প্রধান ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এই ধর্মমত আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ভালবাসা বা মান্যতা ভিত্তিক নয় বরং ফিকাহ্ শাস্ত্রের পণ্ডিতদের দেখানো রাষ্ট্রীয় ভয়ভীতি এই ধর্মীয় মান্যতার প্রধান অনুসঙ্গ হিসাবে নির্দেশিত হয়। তাছাড়া ৪জন ফিকাহ্বিদ যথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম, মালেক, ইমাম, শাফেয়ী ও ইমাম হাম্বল ছাড়া সকল চিন্তাধারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে যে ৬টি হাদিসগ্রন্থ বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিজি, ইবনে মাজা ছাড়া অন্য সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত হাদিস অগ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে মর্মে ঘোষণা করা হয়। ফলে সুফিদের বিভিন্ন চিন্তাধারা, কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় আলেম তথা ফকীহ্দের নিকট ধর্ম বিরোধী তথা রাষ্ট্র বিরোধী হিসাবে বিবেচিত হলো। এ পর্যায়ে আমরা হযরত মনসুর হাল্লাজ সুফি সাধকের সাথে রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধিতার ঘটনা উল্লেখ করব।

হুসাইন ইবনে মনসুর হাল্লাজ ২৪৪ (৮৬৬ খৃস্টাব্দ) হিজরী সনে পারস্যের বায়যা নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মারেফাত ও তাসাওউফ সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাসাওউফ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন খোদা প্রেমে বিভোর ও তন্ময়। স্রষ্টার বিরহে তার চিত্তের কাতরতা ছিল লক্ষ্যণীয়। তিনি ছিলেন একজন নিরেট ও পবিত্রমনা আশেক। তিনি মানুষের নিকট আল্লাহ্র হাকীকতের রহস্যসমূহ বর্ণনা করতেন। প্রকৃতপক্ষে ইবনে মনসুর (রাহঃ) ছিলেন একজন উচ্চ স্তরের কামেল। তাঁকে ভাওতবাজ শ্রেণীর অলি হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি সব সময় এবাদত ও রিয়াজতে মশগুল থাকতেন। তাছাড়া তিনি শরীয়ত ও সুন্নতের খুব পাবন্দ ছিলেন। অথচ তিনি কোন কোন সময় নিজেকে 'আনাল হক' অর্থাৎ 'আমিই সত্য' বলতেন। উল্লেখ্য বোখারী শরিফের একটি সর্বজন বিদিত হাদিসে উল্লেখিত আছে 'হযরত আবু হুজায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন অলির সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছি, তা দ্বারা কোন বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না। বরং বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারাই আমার নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে। অবশেষে আমি (নফল ইবাদতের কারণে) তাকে ভালবাসতে থাকি। এমনকি আমি তার কান হয়ে যাই, যদ্বারা সে শুনতে পায়। আমি তার হাত হয়ে যায় যা দ্বারা সে স্পর্শ করে। আমি তার চোখ হয়ে যাই যদ্বারা সে দেখতে পায়। আমি তার পা হয়ে যাই যদ্বারা সে চলাফেরা করে। আর সে যদি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে আমি তাকে অবশ্যই প্রদান করি। আমি যা করতে চাই তা করতে কোন দ্বিধা সংকোচ করনা- যতটা দ্বিধা সংকোচ করি একজন মোমেনের জীবন সম্পর্কে। কেননা সে মৃত্যু অপছন্দ করে, অথচ আমি তার কষ্ট অপছন্দ করি। (নফল ইবাদতের ফযীলত, অধ্যায়, ছহীহ বাংলা বোখারী শরিফ, ৪০৯২ নম্বর হাদিস পৃ-৭৮৬)

হযরত হুসাইন ইবনে মনসুর হাল্লাজের 'আনাল হক' উক্তির কারণে তদানীন্তন খলিফা মুকতাদর (৯০৮-৯৩২ খৃস্টাব্দ) এর দরবারী একদল আলেম তাঁর বিরোধিতা করেন। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে হত্যা করার ফতোয়া দেয়া হয়। হত্যার কারণ হিসাবে ফকীহরা বলেন, তিনি নিজেকে আমিই খোদা বলতেন, আলেমগণ তাকে 'আনাল হক' না বলে হুয়াল হক অর্থাৎ তিনিই খোদা বলার জন্য দাবি করেন। উত্তরে তিনি বলেন, বস্তুত তিনিই সব এবং সবকিছুই তিনি কিন্তু তোমরা বলছ যে তিনি অদৃশ্য। বাস্তবিক পক্ষে তিনি মোটেও অদৃশ্য নন; বরং হুসাইন অদৃশ্য এবং বিলুপ্ত হয়েছে। সর্বব্যাপি মহাসমুদ্র কি কখনো বিলুপ্ত হয়েছে না হতে পারে? কখনো না।

খলিফার নির্দেশে (স্মরণ রাখতে হবে তদানীন্তন খলিফাগণ পোপের ন্যায় ধর্মীয় প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন) প্রথমে এক বৎসর পর্যন্ত ইবনে মনসুর হাল্লাজ (রাহঃ) কে কারারুদ্ধ করে রাখা হলো। এ সময় বহুলোক তার নিকট বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য এবং তার খোঁজখবর নেয়ার জন্য জেলখানায় যাতায়াত করত। পরে খলিফার তরফ থেকে এ মর্মে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো যে, এখন থেকে কেউ তার সাথে দেখা করতে পারবে না। ফলে ৫ মাস পর্যন্ত কেউ তার নিকট গেলনা।

তিনি যে জেলখানায় বন্দী ছিলেন সেখানে তিনশর মত কয়েদী ছিল। তিনি তাদেরকে বললেন যে, আমি তোমাদেরকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে দিতে পারি। বল তোমরা মুক্তি চাও কিনা? উত্তরে বন্দীরা বলল। আপনি নিজেই তো বন্দী। আমাদের মুক্ত করবেন কিভাবে? পারলে আপনি নিজেই মুক্ত হয়ে যান। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্ পাকের বন্দী এবং শরীয়তের প্রতি লক্ষ্য করছি। তিনি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা মাত্রই বন্দীদের হাত কড়া ও পায়ের বেড়ী ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল। (ইসলামী বন্দী আইনে বন্দীদের সাথে এমন আচরণ সম্পর্কিত কোন বিধান না থাকা সত্ত্বেও মুসলিম শাসকরা কয়েদীদের সাথে কি আচরণ করত লক্ষ্য করুন)। অতঃপর তালাবদ্ধ জেলখানার দেয়ালের দিকে ইশারা করা মাত্রই সেখানে অনেক দরজার সৃষ্টি হলো। এবার তিনি বন্দীদের বললেন, তোমরা এসব দরজা দিয়ে বের হয়ে যাও। বন্দীরা বলল। আপনি আমাদের সাথে বের হয়ে আসুন। জবাবে ইবনে মনসুর বললেন, আমার প্রভুর সাথে আমার এক গোপন রহস্য আছে। আমি শুলে না চড়া পর্যন্ত সে রহস্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়।

সকালে দেখা গেল জেল খানায় কোন বন্দী নাই একলা মনসুর হাল্লাজ বসে আসেন। বন্দীরা সব কিভাবে কোথায় গেল, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলে তিনি বললেন, আমি সব বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিয়েছি। কারাবান্দীরা জিজ্ঞেস করল তবে আপনি পালিয়ে গেলেন না কেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমার প্রভু আমার প্রতি রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট। এজন্য রয়ে গেছি। খলিফা সব কিছু জেনে ইবনে মনসুরকে চাবুক মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মোতাবেক তাকে জেলখানা থেকে বাইরে এনে তিনশত চাবুক মারা হলো। কিন্তু একবারের জন্য উহ্ পর্যন্ত করলেন না। এমনকি নড়লেন না। যে জল্লাদ চাবুক মেরেছিল পরে সে জানায় যে, সে চাবুক মারার সময় একটি গায়েবী আওয়াজ শুনতে পায়, তা হলো, "হে মনসুর ভয় পেওনা"। এভাবে চাবুক মেরে যখন তাকে কাবু করা গেলনা তখন শুলে চড়ানোর মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত হলো। উল্লেখ্য রাসূল (সা.) এর সময়ে বন্দীদের এত নিষ্ঠুরভাবে হত্যার বিধান ছিল না। আব্বাসীয় খলিফারা ইসলামী শাস্তির বিধান বাদ দিয়ে পারস্য ও রোমক শাস্তির বিধান চালু করে তা হযরত মনসুর হাল্লাজকে হত্যা করার জন্য শুলে চড়ানোর জন্য দেয়া হলো। এ সময় তাকে শেষবারের মতো দেখার জন্য এক লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলতে থাকেন হক, হক, আনাল হক, জনতার মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করল এশক্‌কে ইলাহি? জবাবে মনসুর হাল্লাজ বলরেন, এশ্‌ক কি তা তুমি আজ থেকে তিন দিন পর্যন্ত দেখতে পাবে।

শুলে চড়ানোর পূর্ব মুহূর্তে মনসুরের খাদেম তার নিকট কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বলেন, নফসকে সর্বদা আল্লাহ্‌পাকের কোন কাজে মশগুল রেখো। অন্যথায় নফস তোমাকে অসহায় ও অন্যায় কাজে মশগুল করে ফেলবে। আর স্মরণ রেখো, যে নিজের হেফাজত করা জবরদস্ত লোকের কাজ। তারপর তাঁর পুত্র বলল, বাবা আমাকেও কিছু উপদেশ দিয়ে যান, মনসুর বললেন, বাবা। তোমার প্রতি আমার ওসিয়ত এই যে, দুনিয়াবাসী সকলে নেক আমলের জন্য চেষ্টা করছো। তুমি এমন কাজের জন্য চেষ্টা কর যার একবিন্দু জিনও ইনসানের উভয় প্রজাতির সমুদয় নেক আমলের চেয়ে উত্তম হয় তা আর কিছু নয়-শুধু এলমে হাকীকতের একটি বিন্দু। তিনি খুব প্রফুল্ল চিত্তে শূল দন্ডের দিকে এগিয়ে চললেন, উপস্থিত জনতা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, এখন আমি আমার প্রকৃত বাসস্থানের দিকে যাচ্ছি এর চেয়ে আনন্দের মুহূর্ত আর কখনো হতে পারে কি? অতঃপর শূলের নীচে তাঁকে দাঁড় করানো হলো। তিনি কেবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে মোনাজাত করলেন এবং বললেন, যা চেয়েছি তা পেয়েছি। শূলের উপর আরোহন করার পর তাঁর কতিপয় শিষ্য তাকে জিজ্ঞেস করল। আমরা যারা আপনার শিষ্য অর্থাৎ আপনার পক্ষে এবং যারা আপনার বিরুদ্ধ পক্ষ অর্থাৎ যারা আপনাকে হত্যা করতে যাচ্ছে এ উভয় দল সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? উত্তরে মনসুর বললেন, আমার ভক্তরা পাবে এক সওয়াব আর আমার ঘাতকরা পাবে দুই সওয়াব। কারণ তোমাদের শুধু আমার প্রতি সমর্থন এবং ভাল ধারণা আছে আর ওরা তাওহীদের শক্তি এবং শরীয়তের কঠোরতার সম্মুখে কম্পমান। প্রকৃতপক্ষে তাওহীদই শরিয়তের মূল আর নেক ধারণা উহার শাখা।

প্রথমে তার হাত কেটে ফেলা হলো। এ সময় তিনি হাসছিলেন। জনতা তার হাসির কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন- আমার বাহ্যিক হাত কাটা খুব সহজ। এমন কেউ আছে কি যে, আমার বাতেনী হাত কাটতে পারে। যা দ্বারা আমি আরশের উপর থেকে গৌরবের মুকুট টেনে এনেছি। এরপর তাঁর পা দুটি কেটে ফেলা হলো। তিনি মৃদু হেসে বললেন: এ পা দুটির সাহায্যে আমি দুনিয়া ভ্রমণ করেছি। কিন্তু এছাড়াও আমার আরো

পা আছে যা দ্বারা এখনো উভয় জগত ভ্রমণ করতে পারব। তোমাদের যদি শক্তি থাকে তাহলে সে পাগুলো কাট দেখি। তিনি তাঁর কর্তিত ও রক্তাক্ত হাত দ্বারা মুখ মণ্ডল স্পর্শ করে রক্তে লাল করে দিলেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, আমার শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের দরুন মনে হয় আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়েছে। তাই চেহারা লাল ও প্রফুল্ল দেখানোর জন্য আমি মুখে রক্ত মাখালাম। কেননা চেহারার চাকচিক্য উহার রক্ত। লোকেরা জিজ্ঞেস করল: হাতে কনুই পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত করলেন কেন? তিনি বললেন, ওযু করছি। এশ্‌কের নিদর্শন স্বরূপ দুই রাকাত নামায রয়েছে যার ওযু রক্ত ছাড়া শুদ্ধ হয় না। অতঃপর তার চোখ দুটি খুলে ফেলা হল। এ সময় উপস্থিত জনতার মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। জিহ্বা কাটার পূর্বে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে বললেন, এলাহি আপনার জন্য এরা আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে। আপনি তাদেরকে আপনার রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন না। সে মহা সম্পদ হতে এদেরকে বঞ্চিত করবেন না। আলহামদুলিল্লাহ্। যদিও এরা আমার হাত পা কেটেছে তবু তারা আপনার পক্ষেই কেটেছে। আর যদিও আমার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে যাচ্ছে তথাপি আপনার মহান প্রতাপ দর্শনের ভিতর দিয়েই বিচ্ছিন্ন করছে। শূলের উপরে তার কান, নাক কেটে ফেলা হল। তার সর্বশেষ বাণী ছিল আমি তৌহিদের পাগল। তাওহীদের মহব্বত হল একককে এককত্বের কারণে একক বলে দৃঢ় বিশ্বাস করা। অতঃপর তিনি আয়াত শরিফ তেলওয়াত করেন "যারা কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করে না তারাই উহাকে শীঘ্রই আনয়নের জন্য বলে। পক্ষান্তরে যারা ইমান এনেছে তারা সে ভয়ংকর দিবসের নাম শুনলে ভীত ও আতংকিত হয় এবং কুকর্ম থেকে বিরত থাকে। তারাই কিয়ামতকে সত্য বলে জানে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।" দিন শেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। খলিফা নির্দেশ দিলেন, তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেল, মাথা বিচ্ছিন্ন করার সময় তিনি অট্টহাস্য করে উঠলেন এবং শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এদিকে তাঁর দেহের খণ্ডিত প্রতিটি অঙ্গ হতেই "আনাল হক" শব্দ উত্থিত হচ্ছিল্ দেহ নিঃসৃত রক্ত বিন্দুটিও মাটিতে পড়া মাত্র গড়িয়ে গড়িয়ে 'আনাল হক' এর নাম একে চলছিল। এসব দেখে তার প্রতিটি কর্তিত অংশকে টুকরা টুকরা করে কাটা হলো। কেবল ঘাড় ও পিঠ অবশিষ্ট রইল। তখন ঘাড় ও পিঠ থেকে একই আওয়াজ উঠতে লাগল। সকলে ধারণা করল এভাবে যদি আনাল হক আওয়াজ উঠতে থাকে তাহলে ফেতনার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং, ফকীহদের ফতোয়া অনুযায়ী তাঁর সমুদয় অংগ প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রে করে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হলো। কিন্তু সকলে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করে দেখলো ও শুনতে পেলো ছাইগুলো থেকেও আনাল হক শব্দ উঠছে। এতে ফেতনার আশংকা আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় খলিফার নির্দেশে ছাইগুলো দজলা নদীর পানিতে ফেলে দেয়া হলো। কিন্তু নদীতে ফেলার পর ছাইগুলো পানির উপর আনাল হক নকশা আঁকতে লাগল। অতঃপর নদীতে উত্তাল তরঙ্গ ও জলোচ্ছ্বাস শুরু হলো। বাগদাদ শহর ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। জনমনে তীব্র আতংক দেখা দিল। এ সময় হযরত মনসুর হাল্লাজের খাদেম তার প্রভু আল্লাহ্ প্রেমিক মনসুর হাল্লাজের পরিধানের পোশাকটি এনে নদীকে দেখালেই (যা তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন) নদী শান্ত হয়ে গেল। ছাইগুলো ভাসতে ভাসতে তীরে এসে জমা হল। অতঃপর ঐগুলো উঠিয়ে মাটির নীচে দাফন করা হলো। এভাবেই আল্লাহ্‌র প্রেমের আগুনে পোড়া এক প্রেমিক "প্রেমের মরা জলে ডোবে না। তা বাস্তবিক আগুনে পুড়ে জীবন দিয়ে প্রমাণ করলেন।" হযরত হোসাইন ইবনে মনসুর হাল্লাজকে পৃথিবীর নৃশংসতম ও হিংসাত্মক পদ্ধতিতে নির্যাতনপূর্বক হত্যা করেই ঘাতকরা খুশী হয় নাই বরং তার লাশ মোবারক আগুনে পুড়িয়েছে। এ ব্যাপারে বোখারী শরিফের একটি হাদিসে বলা হয়েছে : আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া আল্লাহ্‌তালা ব্যতীত অন্য কারো জন্য সমীচীন নয়। (সহীহ্ বাংলা বোখারী শরিফ, ২০৯৭ নম্বর পৃ-৪৪১)

এ কারণে আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, আব্বাসীয় খিলাফত যে ধর্মমত তৈরি করে তার মধ্যে প্রকৃত কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিফলন ছিল না তাই রাজার অনুগত ফকিহ্‌গণ তাসাওউফন্থী সুফিদের বিভিন্নভাবে অন্যায়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা, অইমান করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে হত্যা করা তাদের রাষ্ট্রীয় নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। যে কারণে এইসব ফকিহ্‌রা গাউসুল আযম শেখ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী, ইবনুল আরাবীর মত সুফি দরবেশদের কাফের ফতোয়া দিতে দ্বিধা করে নাই। এই ফিকাহর অনুসারীরাই এই উপমহাদেশে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সাথে বেআদবী, হযরত মুজাদ্দিদ আল ফেসানীকে জেলে পাঠিয়ে ও জুলুম করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। আধুনিক যুগে ড. আল্লামা ইকবালের মত আশেকে রাসূল ও আমাদের জাতীয় কবি আহলে বাইতে রাসূলের একান্ত অনুরাগী কাজী নজরুল ইসলামকেও কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন। যেহেতু সাধারণ লোকের মন-মানস থেকে বর্তমানে এ ধরণের ধর্মীয় সিদ্ধান্ত তথা ফতোয়াকে গুরুত্বহীন মনে করা হয় বিধায় কেহ এর নিয়ে মাথা ঘামায় না। মনে রাখতে হবে, এসব ফতোয়াবাজদের উত্তরসুরীরাই আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে বলে ফতোয়া দিয়েছিল আবার এরাই ১৯৭১ সালে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে

তাদের জারজ সন্তান এবং বাংলাদেশের মা বোনদের গনীমতের মাল হিসাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ভোগের বস্তু হিসাবে ফতোয়া দিয়েছিল। ধর্মীয় ক্ষেত্রে দেখা গেল, এই ফকীহ্‌রা যে ধর্মমত প্রচার করলেন তার মধ্যে আল্লাহ্ রাসূলের প্রেম মহব্বত অনুপস্থিত তাই এই যান্ত্রিক ও অনুষ্ঠান সর্বস্ব কলেমা, নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত দিয়ে বা নিয়ে যে মুক্তি লাভ করা যাবে না, এ ব্যাপারে প্রকৃত সুফি সাধকগণ স্থির নিশ্চিত হলেন। তাই এ সময়ে আলেম সমাজ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন। একদল হলেন- ক্ষমতাসীন, বিত্তবান ও স্বৈরশাসকের তল্পীবাহক উলেমা। আর একদল ত্যাগী বিত্তহীন, সত্য ও সঠিক কথা বলে বলতে সাহসী, ইলমে লাদুনীতে সমৃদ্ধ ও সর্বোপরি এলমে গাইব বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তাসাওউফপন্থী সুফি সাধক। এরই ফলশ্রুতিতে তাসাওউফপন্থী বিজ্ঞ ধর্মবিজ্ঞানীগণ তাসাওউফ বা সুফিবাদ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও লেখনী জনসম্মুখে তুলে ধরলেন। উল্লেখ্য এসব তাসাওউফ বিজ্ঞানীরা জাহেরীভাবে তদানীন্তন বিশ্ব সমাজে শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি ও ইমাম গাজ্জালী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুফি সাধক ও ত্বরিকা

আমরা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি যে, নবী-রাসূলদের প্রধান দায়িত্ব হলো, পবিত্র কুরআনের মর্মানুযায়ী "আল্লাহ্-মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। যে তাহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তেলওয়াত করে, তাহাদিগকে পরিশোধন (পবিত্র করেন) এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তাহারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল। (সূরা আলে ইমরান: ১৬৪)। আর এই মহাসমুদ্ররূপ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা রাসূল (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক নর নারীর জন্য অবশ্য পালনীয়। আর ব্যাপক কুরআন পাঠ, অধ্যয়ন, গবেষণা, পর্যালোচনা ও ব্যক্তি জীবনে এই জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে পরিশুদ্ধতা অর্জন একটি বিরাট সময় ও আয়াস সাপেক্ষ বিষয়। রাসূল (সা.) ও তার উম্মতদের ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এ কারণে আমরা দেখতে পাই যে পুরুষ ও স্ত্রী লোক নির্বিশেষে রাসূল (সা.) এর নিকট কয়েকটি বিষয়ে অঙ্গীকার প্রদান পূর্বক রাসূল (সা.) এর হাতে বাইয়াত হতেন।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে : যাহারা তোমার হাতে বাইয়াত করে, তাহারা তো আল্লাহ্‌র হাতে বায়আত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাহাদের হাতের উপর অতঃপর যে উহা ভঙ্গ করে। উহা ভঙ্গ করিবার পরিনাম তাহারই এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে মহা পুরস্কার দেন। (সূরা ফাতহ্ : ১০)।

অনুরূপভাবে মুসলমান ইমানদার নারীদের ব্যাপারেও বলা হয়েছে: হে নবী! মুমিন নারীগণ যখন তোমার নিকট বায়আত করে এই মর্মে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরিক স্থির করবেনা, চুরি করবেনা, ব্যভিচার করবেনা, নিজেদের সন্তান হত্যা করবেন না, তাহারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করিয়া রটাইবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করিবেনা তখন তাহাদের বায়আত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু। (সূরা মুমতাহিনা : ১২)।

এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্‌র নবীর/রাসূলের বৈধ উত্তরাধিকারীগণ মুমেন নর-নারীকে ধর্ম শিক্ষা ও অনুশীলনের যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যা ইসলামী পরিভাষায় ত্বরিকা বলা হয়। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সুফি সাধকের পথ পরিক্রমন বা পবিত্র ভ্রমণকে ত্বরিকত বলে। 'তরক' ধাতু হতে ত্বরিকত শব্দের উদ্ভব। তরক অর্থ পথ চলা। অর্থাৎ তাওহীদের পথে চলাকে ত্বরিকত বলা হয়েছে। শরীয়ত অর্থ বিধিবিধান, পথ এবং ত্বরিকত অর্থ খোদায়ী বিধান তথা রাস্তা ধরে তাওহীদের দিকে অগ্রসর হওয়া। ত্বরিকত সুফির কর্মকাণ্ডে বা সাধনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। হাদিসে ব্যক্ত হয়েছে 'আত্তারিকাতো আফওয়ালিহী' অর্থাৎ রাসূল (সা.) বলেছেন : আমি যা করেছি তাই তরিকৃত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্মকে ইসলামের ধর্মীয় সাহিত্যে ত্বরিকত রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাসাওউফে ত্বরিকত শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন : তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হও। আল্লাহ্‌র এ গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আখলাক লাভ করার এক কঠোর মুযাহিদা বা সাধনা চলে সুফি জীবনের স্তরে। এ কঠোর সাধন ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক বা গুরুর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এই গুরুর সুফি পরিভাষায় পীর, শায়েখ বা মুর্শিদ। মুর্শিদ আধ্যাত্মিকতার আলোকে আলোকিত ইনসানে কামিল তথা পূর্ণ মানব (Perfect Man)। সেজন্য তাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে আধ্যাত্মিক আলোক অর্জন করতে হয়।

মুরিদের (ভক্ত/অনুসারী) চরিত্রে ও স্বভাবে কলুষমুক্ত পবিত্র নির্মল ও সুন্দর করে গড়ে তুলবার ব্যাপারে এ স্তরে মুর্শিদ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সেজন্য মুর্শিদ বিশেষ কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট পরিবর্জন ও অর্জনের উপর জোর দিয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে কিছু নিয়ম পদ্ধতিগত কর্মকাণ্ডের নির্দেশ প্রদান করেন। অধিকাংশ

সুফিয়ায়ে কেরাম নিম্নে বর্ণিত অন্যায় ও অবৈধ কাজ ও মন্দ চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও দোষত্রুটি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ প্রদান করে থাকেন যথা:

১. কামুকতা ২. মিথ্যা বলা ৩. কিনা (মনের দ্বেষ) ৪. হাসাদ (হিংসা) ৫. হারস (লোভ-লালসা) ৬. হারাম (সকল প্রকার অবৈধ) ৭. তাকাব্বরী (অহংকার) ও ওষ্ট জব (না পছন্দী) ৮. গীবত (পরনিন্দা) ৯. রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত ও কার্যক্রম) ১০. দুনিয়া (দুনিয়ার প্রতি অবৈধ ভালবাসা), ১১ বখিল হুজ্জে কৃপণতা ১২. গরুর (ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল মনে করে বিভ্রান্ত হওয়া)। উক্ত ১২টি দোষ পরিত্যাগ করে নিম্নে বর্ণিত ১২টি গুণ অর্জন করার জন্য সুফি শিক্ষকগণ নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

১. তাওবা ২. সবর ৩. শোকর ৪. খওফ ৫. রেজা ৬. যুহদ ৭. তাওয়াক্কাল ৮. ফকর (দারিদ্র) ৯. তাওহীদ-একত্ব ১০. ইখলাস ১১ মহব্বত ও শওক, ১২. মোরাকাবা।

এতদ্ব্যতীত আরো ১২টি অতিরিক্ত গুণ অর্জন করার প্রতিও সুফি দরবেশগণ জোর দিয়ে থাকেন। যথা ১. তাকওয়া (মন্দকাজ থেকে বিরত থাকা) ২. অরা (বেহুদা কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকা) ৩. কানায়াত আল্লাহ্‌র দানে তুষ্ট থাকা ৪. একিন (দৃঢ় বিশ্বাস, অর্থাৎ বিল একিন, আয়নাল একিন, হক্কুল একিন ও হুয়াল একিনে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন ৫. যিকির ও ফিকিরে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও চিন্তা ৬. ইস্তেকামাত (সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা) ৭. হায়া (লজ্জা) ৮. আদব (আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সৌজন্য ব্যবহার) ৯. ইলম (জ্ঞান-জাহিরি ও বাতিনি জ্ঞান অর্জনে গুরুত্বারোপ করা। ১০ আবিদিয়াত (আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও তদ্রুপ মনোভাব সৃষ্টি) ১১. হুরয়িাত বা ইচ্ছার বিপরীতে (স্বার্থপরতা ত্যাগ করে অন্য ভাইকে উপকার করার মানসিকতা) ১১. মোশাহেদা (আল্লাহ্‌র দর্শন ও ধ্যানজনিত সত্যোপলব্ধি)। ১২. সত্য উপলব্ধি। এছাড়া কোন কোন সুফি সাধক চারটি বিষয়ের উপর, মান্যতার উপর বিশিষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন।

১. শরীয়ত মেনে চলা ২. হারাম ত্যাগ করা ৩. মিথ্যা ত্যাগ করা ৪. সবর বা ধৈর্য ধারণ করা।

নবম দশ অধ্যায়

এজিদি ইসলাম ও সুফি ইসলামের পার্থক্য

এ পর্যায়ে আমরা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসছি অর্থাৎ বিদ্যমান ফেকাহ্‌বিদদের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-রাজনীতিতে (Religo Politics) এ মুসলমানদের মুক্তির দিশা রয়েছে কি? এ প্রশ্নের একমাত্র সঠিক উত্তর হচ্ছে অবশ্যই নাই। বিষয়টি স্পষ্টিকরণ ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে আমরা প্রচলিত ইমান, কলেমা, নামায, রোজা, হজ্ব যাকাত এর ফিহাকবিদদের চিন্তাধারা ও ধর্মের এইসব স্তম্ভর মর্মার্থ ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি জানার জন্য হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তির আসারে হাকিকি ও পত্রাবলীর তুলনামূলক পর্যালোচনা পাঠকদের সদয় অবগতি ও অনুসরণের জন্য পত্রস্থ করা হলো।

আমার প্রিয় বন্ধু,

আমার প্রাণ প্রিয় ভাই ও আমার তরিকার মুকুট খাজা কুতুবুদ্দিন দেহলবি, রাব্বুল আলামিন তোমার যাবতীয় কাজে তোমাকে দেশনা প্রদান করুন। কুতুবুদ্দিন, মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র তাওহিদ তত্ত্ব এবং তদ্বিষয়ে হেদায়েত প্রাপ্তি সম্পর্কে আমি কিছু বিশেষ গুপ্তজ্ঞান তাজেদারে মদিনা মহানবির (সা.) কাছ থেকে রুহানি ফয়েজের বরকতে পেয়েছি। আজ আমি তা তোমাকে লিখে পাঠাচ্ছি। এ বিষয়গুলোর ওপর আমার পূর্ণ এতোমাদ ও এতেক্বা'দ (বিশ্বাস ও আস্থা) আছে। তুমিও মনোযোগ সহকারে এ বিষয়গুলো পাঠ করো এবং তদনুযায়ী আমল করো।

তাওহিদতত্ত্ব বা কালেমা তাইয়্যোবার হাকিকত

একদা রাসূল (সা.) কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবির কাছে হাকিকতের গভীর তত্ত্ব ও মারেফাতের গুঢ় রহস্য বর্ণনা করছিলেন। সে মজলিসে হযরত আলী, হযরত আবু বকর, হযরত উসমান, ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন, হযরত আবু হোরায়রা, হযরত আনাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত বেলাল প্রমুখ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। হযরত উমর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। হাকিকত ও মারেফাতের গভীর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা চলাকালে হযরত উমর সেখানে হাজির হলেন। হযরত উমরকে দেখে রাসূল (সা.) আলোচনা বন্ধ করে দিলেন। এতে সাহাবিগণ বিস্মিত হলেন এবং মনে করেছেন যে, রাসূল (সা.) হয়তো হযরত উমরের সামনে হাকিকত ও মারেফাতের গভীর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চান না। তখন হযরত আবু বকর আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের কাছে হাকিকতের তত্ত্ব আলোচনা করলেন, কিন্তু উমরের কাছে এসব গূঢ় রহস্য গোপন রাখলেন। এর প্রকৃত কারণ কী ?" উপস্থিত সকল সাহাবির প্রতি লক্ষ্য করে রাসূল (সা.) বললেন, "আমি মারেফাতের গুপ্তভেদ উমরের কাছে গোপন করি নি। বরং ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে, কোন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে যদি ঘৃত পরিপক্ক হালুয়া ও গোশ্‌ত ইত্যাদি ভারি খাদ্য খাওয়ানো হয় তা হলে নিশ্চয়ই শিশু অসুস্থ হয়ে পড়বে। আবার শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হলে এসব খাদ্য শরীরের পুষ্টিসাধন করে। পানাহারের কোন দ্রব্যই তখন আর তার অনিষ্ট করতে পারে না।"

এরপর রাসূল (সা.) হযরত উমরের বাতেনি জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী আসরারে মারেফাত বর্ণনা করতে লাগলেন। বস্তৃত তিনি মঞ্জিলে লাহুত ও মঞ্জিলে জাবারুত সম্পর্কে হযরত উমরকে শিক্ষা প্রদান করতে লাগলেন। তখন তিনি বললেন "হে উমর, যে ব্যক্তির আল্লাহ্‌র মারেফাত হাসিল হয়েছে সে কখনো আল্লাহ্‌কে 'আল্লাহ্' বলবে না (অর্থাৎ তার মুখে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলার প্রয়োজন হয় না) এবং যে ব্যক্তি মুখে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলে ডাকে সে মহিমান্বিত আল্লাহ্‌কে চিনতে সক্ষম হয় নি। তার আল্লাহ্‌র মারেফাত হাসিল হয় নি।" এ কথা শুনে হযরত উমর আরজ করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এটা কেমন মারেফাত জ্ঞান যে, বান্দা তার রবের নাম করবে না এবং আল্লাহ্‌কে আল্লাহ্ বলে ডাকবে না!" রাসূল (সা.) উত্তরে বললেন যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ নিজেই বলেন, ঃ "তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের সাথেই আছেন" (৫৭ : ৪)। এখন চিন্তা করে দেখ, হে উমর, যিনি সদা সর্বদা সাথেই আছেন এবং ক্ষণিকের জন্যও দৃষ্টির অন্তরাল হন না। তাঁকে ডাকা কিভাবে প্রয়োজন হতে পারে? হযরত উমর আরজ করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্ যখন আমাদের সাথেই আছেন তখন তিনি কোথায় অবস্থান করেন?" উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন, "তিনি মোমিন বান্দাগণের হৃদয়ে (ক্বাল্‌ব্) অবস্থান করেন।" হযরত উমর পুনরায় আরজ করলেন, "হে রাসূলাল্লাহ বান্দার হৃদয় কোথায় অবস্থিত?" রাসূল (সা.) উত্তরে বললেন, "বান্দার হৃদয় "কালবে ইনসানে" অবস্থিত। মনে রেখো, হৃদয় দু প্রকার। প্রথমত মাজাজী হৃদয়; দ্বিতীয় হাকিকী হৃদয়। হে উমর! হাকিকী হৃদয় না ডানে, না বামে, না। সামনে, না। পিছনে না উপরে, না নিচে অবস্থিত এবং না নিকটে, আর না দূরে সীমাবদ্ধ। এ হাকিকী হৃদয়ের পরিচয় জানতে পারা সহজ কাজ নয়। যারা সর্বদা মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে ডুবে থাকে তারাই এটা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে।

মনে রেখো, মোমিনের হৃদয় আল্লাহ্‌র আরশ। তত্ত্বদর্শী কামেল ব্যক্তির সংসর্গে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া আল্লাহ্‌র নৈকট্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কামেল ব্যক্তি ও সত্যিকার তালেব সওয়াল জবাব করবে না। বরং সে স্তব্ধ হয়ে আদব সহকারে অবস্থান করবে। মনে রেখো, মোমিনের হৃদয়ে সর্বদা জেকেরে খফি মজুদ থাকে। এজন্য সে অমরত্ব লাভ করে। অপরপক্ষে যে মুসলিমের হৃদয় জেকেরে খফি থেকে গাফেল। সে জন্য তাকে মৃত গণ্য করা যায়।" হযরত উমর আবার জিজ্ঞেস করলেন, "মোমিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কি?" উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, "মোমিন হবার মুখ্য সনদ হলো আল্লাহ্‌র মারেফাত সম্পর্কে জ্ঞানী (আরেফ) হতে হবে। আরেফগণ সর্বদা স্তব্ধ ও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় কালাতিপাত করে এবং আল্লাহ্‌র জেকের ও ফেকেরে মশগুল থাকে। অপরপক্ষে মুসলিমগণ সাধু ও অনাড়ম্বর (জোহদ) গুণ বিশিষ্ট হয়। তারা শুধু বাহ্যিক অবস্থা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যারা মসজিদে একত্রিত হয়ে শুধু মৌখিকভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ পাঠ করে তারা মোমিন নয়। হে উমর, এরূপ মৌখিক পাঠকারী কালেমার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কালেমার প্রকৃত তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এদের একবিন্দুও জ্ঞান নেই। এরা মুখে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করলেও লা।" দ্বারা কাকে নিসৃত বা নাই করা হচ্ছে এবং ইল্লাল্লাহ' দ্বারা কাকে প্রতিষ্ঠিত (সাবেত) করা হচ্ছে। এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। এরূপ অজ্ঞতা ও সন্দেহের মধ্যে কালেমা পাঠ করা শেরেকের শামিল।"

এরপর হযরত উমর আরজ করলেন, "হে রাসূলাল্লাহ, কালেমার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?" রাসূল (সা.) উত্তরে বললেন, "কালেমার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমান ও অদ্বিতীয় মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র সত্তা (জাত) ব্যতীত আর কোন কিছুর অস্তিত্ব (মজুদ) নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রকাশ বা নমুনা (মাযহার) স্বরূপ। কাজেই আল্লাহ্‌র মারেফাত শিক্ষার্থীর উচিত সে যেন আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন খেয়াল তার হৃদয়ে প্রবেশ করতে না দেয় এবং সর্বদা সর্বস্থলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিদ্যমান বলে মনে করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ বলেছেন : "পূর্ব ও পশ্চিম সব দিকই আল্লাহ্‌র; তোমরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর না কেন সে দিকেই আল্লাহ্‌র মুখ বর্তমান" (২ : ১১৫)। হে উমর, যখন সালেক আমিত্বসহ যাবতীয় অস্তিত্ব বিলীন করে শুধু আল্লাহ্‌র সত্তাকে মজুদ জানে তখন সে কামালিয়তের দরজায় পৌছে। এ মঞ্জিলে সালেক বোবা ও খোড়া হয়ে যায়। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মারেফাত অর্জন করেছে সে আরেফ ও কামেল এবং তার অবস্থা এক অপূর্ব তন্ময়তায় ও মত্ততায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সে আহাজারি ও বিরহ জ্বালায় জ্বলতে থাকে। তার এ অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার প্রেমাস্পদকে পায়। প্রেমিক বহু আশা-আকাঙ্খা, ধ্যান-সাধনা ও প্রচেষ্টার পর যখন তার প্রেমাস্পদকে পাশে পায় তখন তার সকল ব্যথা-বেদনা মুহূর্তে দূরীভূত হয়ে যায়। প্রেমাস্পদের মিলনানন্দের অপূর্ব রসাস্বাদনে প্রেমিক একেবারে নীরব হয়ে যায়। আরেফ-কামেল ব্যক্তির অবস্থা আশেকের মতোই হয় এবং তখন সে শাহানশাহ্‌ হয়ে যায়। এ অবস্থায় আরেফ-কামেলের কাছে একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া অন্য কোন কিছু প্রতিভাত হয় না এবং কোন কিছুতেই তার ভয় ও চিন্তা থাকে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র বলেন: "জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তাদের কোন দুঃখ-চিন্তাও নেই" (১০ : ৬২)। হে উমর, মনে রেখো, যে পর্যন্ত সালেক তার হৃদয় থেকে গায়রুল্লার খেয়াল দূরীভূত করতে না পারবে, সে পর্যন্ত সে মারেফাতের রাস্তায় এক কদমও অগ্রসর হতে পারবে না। আরেফ-কামেল আল্লাহ্‌কে ইয়াদ করাও বিস্মৃত হয়। কারণ ইয়াদও এক প্রকারের দ্বিত্ব এবং দ্বিত্ব আরেফের কাছে কুফরি তুল্য। যে পর্যন্ত শিক্ষার্থী (তালেব) হাকিকতের এ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে না পারবে সে পর্যন্ত সে তওহিদের মর্ম বুঝতে পারবে না এবং দ্বিত্বের সাগরে ডুবে থাকা অবস্থায় তাওহিদভুক্ত হবার দাবি করা বিলকুল মিথ্যাচার বলে প্রতিপন্ন হবে।"

টীকা:

১। মহিমান্বিত আল্লাহ্‌কে জানতে হলে পাঁচটা স্তর বা মোকাম বা আলমের মাধ্যমে জানা যায় বলে সুফি সাধকগণ সাব্যস্ত করেছেন; কেউ কেউ এ স্তরগুলোকে ছয়টা আবার কেউ কেউ সাতটা বলে উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ সুফি দার্শনিক পাঁচটা স্তরের কথাই বলেছেন। মূলত যারা ছয়টা বা সাতটা স্তরের কথা বলেছেন তারা পাঁচটার কোন একটা বা দুটাকে ভেঙ্গে স্তর সংখ্যা বাড়িয়েছেন। সুফি সাধকগণ মুর্শিদের তত্ত্বাবধানে সাধনার দ্বারা আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে এসব স্তর বা আলম অতিক্রম করে আল্লাহ্‌কে লাভ করেন। সুফি সাধনার স্তর বা মঞ্জিল বা আলমগুলো হলো :

১. আলম-ই-নাসুত ঃ বস্তুজগত বা জড় জগতকে আলম-ই-নাসুত বলে। আলম-ই-আজসাম (জড়) ও আলম-ই-ইনসান (মানবী) মিলেই এ স্তর। সাধকের কাছে আল্লাহ্‌র দাসত্বের (উবুদিয়াত) প্রকৃত পরিচয় এ স্তরেই ঘটে। আধ্যাত্মিক জগতে পাড়ি জমানোর জন্য এ স্তরটি হলো ভিত্তিভূমি। মূলত আধ্যাত্মিক জগতের প্রতিবিম্ব হলো আলমে-ই-নাসুত। এ স্তরটিকে কেন্দ্র করেই সুফি দর্শনে দেহতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। দেহতত্ত্ব আত্মতত্ত্বের ভিত্তি এবং আত্মতত্ত্ব আল্লাহ্‌ তত্ত্বের মূল।

২. আলম-ই-মালাকুত ঃ এ স্তরকে আত্মিক জগত বলা যেতে পারে। রুহু বা আত্মা ও ফেরেশতাসহ সূক্ষ্ম দেহধারী সব কিছুই এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এ স্তরকে ধারণা বা ভাবের জগত বলা যায়। জগতে যা কিছু বস্তু বা জড় হিসাবে প্রকাশ পায় তার বস্তুহীন সূক্ষ্মতা (form) এ স্তরে বিরাজ করে। মানবাত্মা দেহে প্রবেশের পূর্বে এবং মৃত্যুর পরে এ জগতে থাকে। সালেক এ স্তরে আরোহণ করার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এ স্তরে সাধক কঠোর ইবাদতে গভীরভাবে মগ্ন হয় এবং জিকির, ফিকির, মোরাকাবা ও মোশাহেদায় নিমগ্ন হয়। এ স্তরে সাধক অপবিত্র এবং অবৈধ চিন্তা ও কাজ পরিত্যাগ করে।

৩. আলম-ই-জাবারুত ঃ এ স্তরে আল্লাহ্ সিফাত পৃথক পৃথক ও বিস্তৃতভাবে প্রকাশ পেয়ে তাঁর অসীম ক্ষমতা, গৌরব, ঐশ্বর্য, মাহাত্ম্য ও কুদরত সাধক অনুভব করতে পারে। এটা প্রভুত্বের (রবুবিয়াত) স্তর। এ স্তরে উপনীত হয়ে সাধক আল্লাহ্র কুদরত অনুভব করে নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করতে পারে। ফলে সাধক আল্লাহ্র দয়া ও প্রেম যাচনা করতে থাকে। সাধক আল্লাহ্র রবুবিয়াত অনুভব করে নিজের উবুদিয়াতের (দাসত্ব) হাকিকত উপলব্ধি করতে পারে। এ স্তরে সাধক আত্মতত্ত্ব সাধনার ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। এটা সম্পূর্ণ রূপে আধ্যাত্মিক জগত।

৪. আলম-ই-লাহুত ঃ এ স্তরটি মহিমান্বিত আল্লাহ্র বিশিষ্ট স্থান। এতে আল্লাহ্র সংক্ষিপ্ত ও সমষ্টিগত গুণাবলী প্রকাশ পায়। এ স্তরে জগতের সবকিছুতে আল্লাহ্র সত্তার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। এ স্তরে যেহেতু জগতের সবকিছুর মধ্যে আল্লাহ্র সত্তা দৃষ্ট হয়। সেহেতু সাধক এখানে আরোহণ করেই নিজেকে ঐশ্বরিক অস্তিত্বের মধ্যে নিহিত বা নিমজ্জিত বলে উপলব্ধি করে। সুফি সাধকদের ফানা ফিল্লাহ্ অবস্থা এ স্তরেই ঘটে থাকে। সিফাত যখন জাতে পরিণত হয়, তখন সাধক এক অভূতপূর্ব আনন্দ ও ভাবাবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। এ স্তরটি সম্পূর্ণ উপলব্ধির স্তর। এ স্তরেই সাধক "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর অর্থ ও ব্যঞ্জন গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং সমস্ত জগতের মূল কারণ যে এ কলেমাতেই গুপ্তাবস্থায় নিহিত তাও অনুভব করেন ।

৫. আলম-ই-হাহুত ঃ এটাই সর্বশেষ স্তর বা মোকাম। এ স্তরে আল্লাহ্র একক জাত ও তাঁর অনন্ত-অসীম কুদরত ব্যতীত আর কিছু নেই। এ স্তর স্থান, কাল ও আপেক্ষিকতার বাইরে এ স্থানকে লা-মোকাম বা স্থান শূন্যও বলা হয়। এ স্থান মহিমান্বিত আল্লাহ্র হাইউল, কাইউম' বা চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী অবস্থাসহ নির্গুণ ও অব্যক্ত মূল সত্তার স্থান। এ স্থান সকল কল্পনা ও চিন্তা শক্তির উর্ধে। সমস্ত কিছুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম কারণ ও আদিরূপ হিসাবে এ স্থান পরিচিহ্নিত। এ স্তরের অনুভূতি প্রকাশ করা সাধকের পক্ষে সম্ভব নয় এবং বৈধও নয়। এ স্তর বাকাবিল্লাহ্র মোকাম।

২। আল্লাহ্র সত্তাসারের বা তৌহিদতত্ত্বের মূল হলো কালেমা তাইয়্যেবা। এ কালেমা হলো–'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ' অর্থাৎ নেই কোন উপাস্য আলাহ্ ব্যতীত এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল। কিন্তু সুফি সাধকগণ কলেমা তাইয়্যেবার গূঢ়তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করে এর অর্থ করে থাকেন, 'নেই কোন সত্তা আল্লাহ্ ব্যতীত এবং মুহাম্মদ তাঁর মাযহার' । মূলত মানুষের মুক্তির জন্য তিনটা শর্ত রয়েছে-(১) তওহিদে কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত হওয়া, (২) বান্দা বা আব্দ্ হিসাবে ইবাদত করা এবং (৩) সৃষ্টির সেবা বা কল্যাণকর কাজ (আমলে সালেহা) করা। মানুষের মুক্তির প্রথম সোপান হলো তওহিদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এ শর্তটি পরিপূর্ণ না হলে অন্য শর্তগুলো পণ্ড হয়ে যায়। আবার অপর দুটি শর্ত ছাড়া এ শর্তটি দুর্বল হয়ে থাকে। এ শর্তত্রয় একে অপরের পরিপূরক। এখানে প্রথম শর্তটি আলোচনা করা হবে। অপর দুটি পরবর্তীতে আলোচিত হবে।

তাওহিদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ বিষয় নয়। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বললেই তওহিদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। এ কালেমার অনুসারীদের মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায় লক্ষ্য করা যায় (১) যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে, (২) যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু জানে, (৩) যারা লা-ইলাহা ইলালাহুতে প্রতিষ্ঠিত (কায়েম) । সুফি সাধকগণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা দ্বারা কলেমার মৌখিক উচ্চারণ, এটা জানা দ্বারা এর নিগুঢ়তত্ত্ব অবগত হওয়া এবং এটায় কয়েম হওয়া দ্বারা আল্লাহ্র সত্তায় ফানা হওয়া বুঝে থাকেন। এ বিষয়ে ক'টি হাদিস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যাতে রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন :

১. "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" আমার দূর্গ। যে ব্যক্তি এটা বলে সে আমার দূর্গে প্রবেশ করলো এবং আজাব থেকে মুক্তি পেল;
২. যে ব্যক্তি একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমল করবে। সে বেহেশতে দাখিল হবে;
৩. ঈমানের ছোট দরজা হলো দুনিয়া ত্যাগ করা এবং শ্রেষ্ঠতম দরজা হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুতে কায়েম হওয়া;
৪. একজন সাহাবি আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলালাহু, লা-ইলাহা ইলালাহু একবার আমল করলেই যদি বেহেশত লাভ হয় তবে অন্যান্য ইবাদত ও রিয়াজতের প্রয়োজন কী? উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, "এ কালেমা যদি কেউ হাজার বার

পাঠ করে, অথচ এর কায়দা বা মূলতত্ত্বে জ্ঞান লাভ করে না, সে কাফের (হোসাইন? পৃ-১৩৪)।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা ও জানা এবং তাতে আমল অভ্যাসে বেহেশত লাভ করা যেতে পারে; কিন্তু ইমানের পূর্ণতার জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুতে কায়েম হবার প্রতি ইঙ্গিত উক্ত হাদিসে প্রদান করা হয়েছে। একজন সুফির কাছে বেহেশতের আকর্ষণের চেয়ে ইমানের পূর্ণতা অধিক লোভনীয়। সে কারণে তওহিদে কায়েম হওয়ার ধারণা সুফিদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। মূলত এলমে তাসাওফের অনুসারীদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইল্লাল্লাহ্তে কায়েম হওয়া। এ স্তরে তারা আল্লাহ্ একক সার্বভৌম সত্তার উপলব্ধি থেকে সাক্ষ্য বাক্যের (কালেমা শাহাদত) অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। হযরত খাজা মুইনুদ্দিন চিশতিও তাঁর এ তাওহিদতত্ত্বে একই ভাবধারা প্রকাশ করেছেন। কালেমা মুখে বলা বা মৌখিক স্বীকৃতির পরিবর্তে তার গূঢ়তত্ত্ব জেনে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার কথাই তিনি বলেছেন। তাই তাঁর প্রবর্তিত চিশতিয়া তরিকায় "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" আমল করার প্রক্রিয়ায় বলা হয়েছে যে, "লা-ইলাহা" দ্বারা সাধক নিজের সত্তা (হাস্তী) অস্বীকার করবে এবং 'ইল্লাল্লাহ' দ্বারা আল্লাহ্র হাস্তীর নিশ্চয়তা বিধান করবে। এ জন্যই লা-ইলাহাকে দাসত্বের স্তর (উবুদিয়াত মোকাম) এবং ইল্লাল্লাহকে প্রভুত্বের স্তর (উলুহিয়াত মোকাম) বলা হয়। লা-ইলাহাতে যখন সাধক ফানা হয়ে যায়। তখন শুধু ইল্লাল্লাই অবশিষ্ট থাকে। আর এ অবস্থায় উপনীত হয়েই বায়জিদ বলতেন–আমিই পবিত্র সত্তা; ফরিদ বলতেন-আমিই সে; হাল্লাজ বলতেন-আমিই মহাসত্য। তারা যে অবস্থান থেকে এসব রহস্যাবৃত কথা বলতেন সেখানে পৌঁছার কোন চেষ্টা না করেই শরিয়তপন্থী বিদ্বানগণ সমাজে অনেক অহেতুক ঘটনা ঘটিয়েছেন এবং হাল্লাজসহ অনেককে খুন করেছেন। অথচ এটা সুস্পষ্ট যে, সাধকদের এসব উক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' থেকেই উদ্ভূত। এ কালেমাটি শরিয়তপন্থীরা শুধু মুখেই বলে থাকেন –এর অন্তর্নিহিত রসাস্বাদন করেন না বলেই তারা সাধকদের ভুল বুঝেন। এ জন্যই এ কালেমার মূলতত্ত্ব উপলব্ধি না করে মুখে বলা কুফরি বলে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি লিখেছেন।

নামাযের হাকিকত

নামাযের হাকিকত সম্বন্ধে রাসূল (সা.) এরশাদ করেন যে, হুজুরি কালব্ ব্যতীত নামায সিদ্ধ হয় না। হাকিকী নামায দ্বারা মোমিনে কামেল ও আরেফে এলাহি স্থায়ী হুজুরি লাভ করতে সমর্থ হয়। নামায দু প্রকার- (১) জাহেরি আলেম, ফকিহ ও জাহেদগণের খোস্ক (নীরস) নামায যা শুধু রুকু, সেজদা, কেয়াম, কেরাত ইত্যাদি শারীরিক কসরতে পর্যবসিত হয়। এ নামাযে খোদাপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না। এ জন্যই এ নামায আলম-ই-নাসুতে নফসানি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, (২) আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের নামায যা হুজুরি কাল্ব সহকারে আদায় করা হয়। এ নামায দ্বারা খোদা প্রাপ্তি ঘটে এবং এটা আলম-ই-জাবারুতে রহমানি পর্যন্ত পৌঁছে। হে উমর, হাকিকী নামাযই প্রকৃতপক্ষে রহমানি নামায। যে সব জাহেরি আলেম ও রিয়াকার সুফি জুব্বা-দোস্তার জাহেরি শান শওকতে সজ্জিত হয়ে লোক দেখানোর জন্য মসজিদে লম্বা নামাযে মশগুল হয়ে থাকে তাদের নফ্স হামবড়াভাব ও গরুরির কদমে পরিপূর্ণ। ফলে তাদের না নামায হয় আর না নামাযের শুভ ফল স্বরূপ ভেসলে এলাহি (আল্লাহ্র সাথে মিলন) হাসিল হয়। কারণ এরা নফসের তাবেদার। নফসের তাবেদার প্রকৃতপক্ষে মানবরূপী শয়তান। এসব ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য হলো কোন কামেল ব্যক্তির সংসর্গে থেকে নফসকে যাবতীয় কলুষতা মুক্ত করে মারেফাতের নুরে নিজকে উদ্ভাসিত করা। এ অবস্থায় উপনীত হলেই তাদের নামায হাকিকী নামায বলে পরিগণিত হবে। সৌভাগ্যবশত লাখের মধ্যেও যদি দু একজন হাকিকী নামাজি পাওয়া যায়। তবে তার খেদমত ও সোহবত (সেবা ও সংসর্গ) অবলম্বন করা হাজার বছরের ইবাদতের চেয়ে শ্রেয়। এরপর রাসূল (সা.) আরো বলেন, 'জিকরিল লিসানি লক্লকাতুন ওয়া জিকরিল কালবি ওস্ওয়াসাতুন ওয়া জিকরুর রুহি মোশাহেদাতুন ওয়া জিকরুল খাফি দায়িম"। অর্থাৎ মৌখিক জিকির লকলকা সদৃশ, কালবের জিকির ওসওয়াসা সদৃশ, রুহের জিকির মোশাহেদা এবং জিকিরে খাফি স্থায়ী (দায়েম)।

হুজুরি কালব্ ব্যতীত নামায আদায়কারীগণ প্রকৃতপক্ষে বুতপরস্তী। কিন্তু। এরা নিজেদের আমলের জন্য গর্ব করলেও উপলব্ধি করতে পারে না যে, তারা বুতপরস্তী করছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো–এদের জাহেরি নামায দেখে সাধারণ মানুষ এসব রিয়াকারগণকে প্রকৃত নামাজি বলে সম্মান করে। অথচ হাকিকতবিহীন নামায একেবারে মূল্যহীন শারীরিক কসরত মাত্র। আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ হুজুরি কালব্ সহকারে হাকিকী নামায আদায় করে থাকেন এবং তারা সর্বদা নিজেদেরকে গায়রুল্লাহ্র খেয়াল থেকে মুক্ত রাখেন। তারা নামাযে স্বীয় লতিফাগুলোকে আল্লাহ্র জেকের ও ফেকেরে মশগুল রাখেন এবং প্রতিটি নিঃশ্বাসের হিসাব তারা রাখেন। তারা ইয়াদে এলাহি ব্যতীত কোন নিঃশ্বাস ছাড়েন না। এরাই প্রকৃত নামাযি। হে উমর, এরূপ নামাযে খোদাপ্রাপ্তি হাসিল হয়। জিকিরে খাফি ও নামাযে হাকিকী হলো–আমিত্বকে (হাস্তী) বিলীন করে দেয়া। আবেদগণের নামায শুধু রুকু, সিজদা ও কেয়ামে সীমাবদ্ধ থাকে না। তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছু মজুদ বলে মনে

করেন না এবং হৃদয় থেকে সম্পূর্ণরূপে গায়রুল্লাহ্‌র অজুদ (অস্তিত্ব) দূরীভূত করে ফেলেন। এরকম নামাযই হলো মোমেনের জন্য মেরাজ স্বরূপ ।

টীকাঃ

১। ইসলামি শরিয়তে নামায শ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং নামায সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযে কোন ছাড় নেই। নামায ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। অন্যান্য স্তম্ভ বা ইবাদতগুলোর ক্ষেত্র বিশেষে শিথিলতা থাকলেও নামাযে তা নেই। নামায ফারসি শব্দ। কুরআনে এর প্রতিশব্দ হলো–সালাত। মূলত কুরআনিক সালাতকেই ফারসিতে নামায বলা হয়েছে এবং এ শব্দটিই বহুল প্রচলিত হয়ে পড়েছে। কুরআনে সালাত সম্পর্কে বহু আয়াত রয়েছে। কখনো অন্য কোন স্তম্ভের সাথে যুগ্মভাবে আবার কখনো এককভাবে সালাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত অন্য দুটি ইবাদত–রুকু ও সেজদা ইসলামি শরিয়তে নামাযের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সালাতের হাকিকত বা দর্শন পর্যালোচনার পূর্বে এর কুরআনিক অবস্থান জানো একান্ত প্রয়োজন বিধায় তদসংক্রান্ত আয়াতগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. (তারাই মোত্তাকি) যারা গায়েবের সাথে ইমানের কাজ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমরা যে রেজেক দেই তা থেকে ব্যয় করে (২ঃ ৩)।

২. তোমরা সালাত কায়েম কর ও জাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর (২ঃ ৪৩)।

৩. তোমরা সবর ও সালাতের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং বিনীতগণ ব্যতীত অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে এটা কঠিন (২ঃ ৪৫)।

৪. বনি ইসলাইলদের অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে তারা সালাত কায়েম করবে ও জাকাত দেবে। কিন্তু অল্প সংখ্যক ছাড়া সবাই মুখ ফিরিয়ে নিল এবং সরে গেল (অঙ্গীকার থেকে) (২ঃ৮৩)।

৫. তোমরা সালাত কায়েম কর ও জাকাত দাও। উত্তম যা কিছু তোমরা পূর্বে প্রেরণ করবে তা আল্লাহ্‌র কাছে থেকে পাবে। তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ তার দ্রষ্টা (২ঃ ১১০) ।

৬. তোমরা মোকামে ইব্রাহিম (ইব্রাহিমের মর্যাদার স্তর) থেকে মুসালা (সালাতের অবস্থান বা আসন) গ্রহণ করা। এবং আমরা ইব্রাহিম ও ইসমাইলের প্রতি আদেশ দিয়েছিলাম তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকুকারী ও সেজদাকারীদের জন্য আমার ঘর পবিত্র রাখতে (২ঃ ১২৫)।

৭. হে আমানুগণ, সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন (২ঃ১৫৩)।

৮. পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফেরানোতে কোন কল্যাণ নেই; কিন্তু কল্যাণ আছে আল্লাহ্‌, আখেরাত, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব ও নবীগণের প্রতি ইমান আনাতে এবং আল্লাহ্‌র প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে মাল দান করায় এবং সালাত কায়েম করার মধ্যে ও জাকাত দেয়ার মধ্যে (২ঃ১৭৭)।

৯. তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের (সালাতুল উসতা) প্রতি এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও (২ঃ ২৩৮)।

১০. যদি তোমরা পদাতিক অথবা আরোহী অবস্থায় আশঙ্কা কর তবে যখন নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না (২ঃ২৩৯)।

১১. যখন জাকারিয়া মেহরাবে সালাত কায়েম করছিলো তখন ফেরেশতা তাকে বললো "আল্লাহ্‌ আপনাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহ্‌র বাণীর সমর্থক, নেতা, জিতেন্দ্রিয় ও পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবি (৩ঃ৪৩)।

১২. হে মরিয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও, সিজদা কর এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর (৩ঃ৪৩)।

১৩. হে আমানুগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত, মোহাবিষ্ট ও অচেতন অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যা বল তা অনুধাবন করতে না পারো এবং যদি তোমরা পথবাহী না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা শৌচস্থান থেকে আসা অথবা নারী স্পর্শ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তয়ম্মম করবে এবং তা মুখ ও হাতে নেবে। আল্লাহ্‌ পাপমোচনকারী ক্ষমাশীল (৪ঃ৪৩)।

১৪. তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যাদের বলা হয়েছিল, "তোমাদের হাত গুটিয়ে লও (বিরত থাক) সালাত কায়েম করো এবং জাকাত দাও" (৪ঃ৭৭)।

১৫. এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর করবে এবং যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফেরগণ ফেতনা সৃষ্টি করবে তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। কাফেরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (৪ঃ১০১)।

১৬. এবং তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সাথে সালাত কায়েম করবে তখন তাদের একদল যেন তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজদা করা হয়ে গেলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা সালাতে শরিক হয় নি। তারা যেন সালাতে শরিক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে..... (৪ঃ১০১)।

১৭. যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে; যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথভাবে সালাত কায়েম করবে। নিশ্চয়ই সালাত মোমিনদের জন্য একটা সময়ভুক্ত কিতাব। (৪ঃ১০৩)।

১৮. মোনাফেকগণ আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করতে চায়; বস্তুত তিনিই তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্‌কে তারা অল্পই স্মরণ করে (৪ঃ১৪২)।

১৯. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা ও মোমিনগণ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান আনে এবং যারা সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ্‌ ও পরকালে ইমান রাখে তাদেরকেই মহাপুরস্কার দেব (৪ঃ১৬২)।

২০. হে আমানুগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমাদের, মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মসেহ্‌ করবে ও পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে। যদি তোমরা জুনুব (বীর্যপাত হেতু অপবিত্র) থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা শৌচস্থান থেকে আস, অথবা নারী স্পর্শ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়ম্মুম করবে এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে মসেহ্‌ করবে.....(৫ঃ৬)।

২১. ....আর আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, "আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি ইমান আন ও তাদেরকে সম্মান কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান কর। তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করবো.....(৫ঃ১২)।

২২. তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল এবং আমানুগণ যারা সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় ও বিনয়াবনত হয়। (৫ঃ৫৫)।

২৩. তোমরা যখন সালাতের জন্য আহবান কর তখন তারা ওটা হাসি-তামাশা ও ক্রীড়া কৌতুক রূপে গ্রহণ করে–এটা এ জন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই (৫ঃ৫৮)।

২৪. শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ জিকির ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না (৫ঃ৯১)।

২৫. হে আমানুগণ! তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে অসিয়ত করার সময় দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; সফরে তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে অন্য লোকের মধ্য হতে দুজন সাক্ষী মনোনীত করবে। সালাতের পর তাদেরকে অপেক্ষমান রাখবে। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে..... (৫ঃ১০৬)।

২৬. (আমরা আদিষ্ট হয়ে) সালাত কায়েম করতে ও তাকে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করতে.....(৬ঃ৭২)।

২৭. .....যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা ওটা (কল্যাণময় কিতাব)। বিশ্বাস করে এবং তাদের সালাতের হেফাজত করে (৬ঃ৯২)।

২৮. বল, "আমার সালাত, আমার ইবাদত (হজ ও কুরবানি), আমার জীবন ও আমার মরণ রাব্বিল আলামিন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (৬ঃ১৬২)।

২৯. প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাকে ডাকবে (৭ঃ২৯)।

৩০. হে বনি আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। আহার করবে ও পান করবে। কিন্তু অমিতাচার করবে না। তিনি অমিতাচারীকে পছন্দ করেন না। (৭ঃ১৭০)।

৩১. যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে, আমি এরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না। (৭ঃ১৭০)।

৩২. যারা তোমার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা অহঙ্কারে ইবাদতে বিমুখ হয় না; বরং তারা তারই মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁরই সমীপে সিজদাবনত হয় (সিজদার আয়াত) (৭ঃ২০৬)।

৩৩. যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে দান করে তারাই মোমিন (৮ঃ৩)।

৩৪. এরপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয়। তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ঃ৫)।

৩৫. এরপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয়। তবে তারা তোমাদের ধর্মভাই (৯ঃ১১)।

৩৬. তারাই তো আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা ইমান আনে আল্লাহ্ ও পরকালে এবং সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। এরাই হেদায়ত প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে (৫ঃ১৮)।

৩৭. মোমিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু; এরা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজ নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে (৯৪৭১);

৩৮. সালাত কায়েম করবে। দিবা ভাগের দু প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয় (১১৪১১৪);

৩৯. তুমি তোমার রবের প্রশংসা দ্বারা তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সিজদাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত হও (১৫৪৯৮)।

৪০. সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত (কুরআনাল ফাজারি)। ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হবে বিশেষভাবে (১৭:৭৮)।

৪১. এবং রাতের বিশেষ অংশে তাহাজ্জুদ করবে; এটা তোমার জন্য নফল। এতে প্রত্যাশা করা যায় যে, তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমুদ উন্নীত করবেন (১৭ঃ৭৯)।

৪২. সালাতে স্বর উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না; এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো (১৭ঃ১১০)।

৪৩. (ঈসা বললেন) তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন বেঁচে থাকি সালাত কায়েম করতে ও জাকাত আদায় করতে (১৯ঃ৩১)।

৪৪. সে (মুসা) তার পরিজনবর্গকে সালাত ও জাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষভাজন (১৯ঃ৫৫)।

৪৫. আমিই আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর (২০ঃ১৪)।

৪৬. .....সুর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিবসের প্রান্ত সমুহেও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পোর। (২০ঃ১৩০)।

৪৭. এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচলিত থাক (২০ঃ১৩২)।

৪৮. তাদেরকে ওহি প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে ও জাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই ইবাদত করতো। (২১ঃ৭৩)।

৪৯. এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখবে তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজদা করে (২২ঃ২৬)।

৫০. এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করলে, যারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে (২২ঃ৩৫)।

৫১. আমি এদেরকে (মুসলিম) প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে। এবং সৎকর্মের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্য নিষেধ করবে (২২ঃ৪১)।

৫২. হে আমানুগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদের রবের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাতে সফলকাম হতে পার (২২ঃ৭৭) (সিজদার আয়াত)।

৫৩. সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক ও কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি (২২ঃ৭৮)।

৫৪. অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মোমিনগণ যারা বিনয়-নম্র তাদের সালাতে (২৩ঃ১-২)।

৫৫. এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান (২৩ঃ৯)।

৫৬. সে সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ, সালাত কায়েম ও জাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না (২৪ঃ৩৭)।

৫৭. সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার (২৪ঃ৫৬)।

৫৮. হে আমানুগণ! তোমাদের দাস-দাসি ও অপ্রাপ্ত বয়স্কগণ তিন সময়ে তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে যেন অনুমতি গ্রহণ করে--ফজরের সালাতের পূর্বে,

দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা পোষাক খুলে রাখো এবং এশার সালাতের পর (২৪ঃ৫৮)।

৫৯. তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র ওপর যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (সালাতের জন্য) এবং দেখেন সিজদাকারীদের সাথে তোমার ওঠা-বসা (২৬ঃ২১৭-২১৯)।

৬০. তা-সিন; এগুলো কুরআনের আয়াত এবং সুস্পষ্ট কিতাবের; পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ মোমিনদের জন্য, যারা সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয় এবং তারাই আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী (২৭ঃ১-৩)।

৬১. তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব তিলাওয়াত কর এবং সালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে (২৯ঃ৪৫)।

৬২. তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে এবং অপরাহ্নে ও জুহরের সময়ে (৩০ঃ১৭-১৮)।

৬৩. বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না (৩০ঃ৩১)।

৬৪. যারা সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয় তারাই আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। (৩১ঃ৪)।

৬৫. সালাত কায়েম করো, সৎকর্মে আদেশ দিয়ো, অসৎকর্মে নিষেধ করো এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করো। এটাই তো দৃঢ়য়সংকল্পের কাজ (৩১ঃ১৭)।

৬৬. (হে নবি-পত্নীগণ) তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে। জাহেলি যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও জাকাত দেবে এবং আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের অনুগত থাকবে (৩৩ঃ৩৩)।

৬৭. তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য দাড়াঁও (সালাতে), প্রথমত জোড়ায় জোড়ায় তারপর একা একা (৩৪:৪৬)।

৬৮. তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে (৩৫ঃ১৮)।

৬৯. যারা আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি যে রিজিক দেই তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে তাদের এ ব্যবসায় কোন ক্ষয় নেই (৩৫ঃ২৯)।

৭০. যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে তা করে না (৩৯ঃ২৯)।

৭১. যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, আমি যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে (তাদের পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে আছে।) (৪২ঃ৩৮)।

৭২. তোমরা প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাতের একাংশে ও সালাতের পরে (৫০ঃ৩৯-৪০)।

৭৩. ধৈর্য ধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছে। তুমি তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর, রাত্রিকালে ও তারকার অস্তগমনের পর (৫২ঃ৪৮-৪৯)।

৭৪. অতএব আল্লাহ্‌কে সিজদা কর এবং তার ইবাদত কর (সিজদার আয়াত) (৫৩ঃ৬২)।

৭৫. তোমরা কি (রাসূলের সাথে) চুপি চুপি কথা বলার পূর্বে সাদাকা প্রদান কষ্টকর মনে কর, যখন তোমরা সাদাকা দিতে পারলে না, আর আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন; অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর (৫৮ঃ১৩)।

৭৬. মানুষ অতিশয় অস্থিরচিত্ত, বিপদে তারা হা-হুতাশকারী, আবার কল্যাণে তারা কৃপণ; শুধুমাত্র মুসল্লি (সালাতকারী) ব্যতীত যারা তাদের সালাতে নিষ্ঠাবান (৭০ঃ১৯-২৩ ও ৩৪)।

৭৭. তোমার রব তো জানেন যে, তুমি জাগরণ করো কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ, আবার কখনো এক-তৃতীয়াংশ এবং তোমাদের সাথে যারা আছে তাদের একটা দলও জাগরণ করে। কাজেই কুরআন থেকে যতটুকু সহজসাধ্য তিলাওয়াত কর; সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে দাও উত্তম ঋণ (৭৩ঃ২০)।

৭৮. তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে, কিসে তোমাদের সাকারে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, "আমরা মুসল্লিদের (সালাতকারী) অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না' (৭৪ঃ৪২-৪৩)।

৭৯. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে। যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে (৮৭ঃ১৪-১৫)।

৮০. তুমি কি তাকে দেখেছে, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে (৯৬ঃ৯-১০)।

৮১. তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও জাকাত দিতে; এটাই সঠিক দ্বিন (৯৮ঃ৫)।

৮২. সুতরাং দুর্ভোগ সে-ই সালাতকারীগণের যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন; যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত করে (১০৭ঃ৪-৬)।

পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে প্রত্যক্ষভাবে সালাত কায়েমের কথা বলা হয়েছে। পরোক্ষভাবে সালাত কায়েমের নির্দেশ সম্বলিত আরো অনেক আয়াত রয়েছে। ইসলামি শরিয়তে রুকু ও সিজদা সালাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে জিকির শব্দও সালাতরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সে সব আয়াত সংযোগ করলে সালাত সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে যে, পবিত্র কুরআনে ৮২ বার সালাতের কথা বলা হয়েছে। একথা সঠিক যে, ৮২ বার সরাসরি সালাতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরোক্ষভাবে বহুবার সালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন সালাতের গুরুত্ব যেন মানুষ অনুধাবন করতে পারে সেজন্য বারবার এ বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা কিন্তু তা নয়। ঐশী নির্দেশ একবার দিলে যতটুকু গুরুত্ব বহন করে, বহুবার দিলেও একই গুরুত্ব বহন করবে। উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে বহুবার সালাতের উল্লেখ করার কারণ হিসেবে নিম্নের বিষয়গুলো পাওয়া যাবেঃ

১. রাসূলের (সা.) পূর্বের নবিগণের সালাতের বিষয়াদি;

২. ইসলামি শরিয়তে সালাতের সময় নির্ধারণ;

৩. বিভিন্ন জাগতিক, মানসিক ও আত্মিক অবস্থায় সালাত;

পূর্ববর্তী নবিগণের সালাত

সালাত প্রক্রিয়ার ইবাদত পদ্ধতি ইসলামের অনেক পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইব্রাহিমের (আ.) সময় থেকেই সালাত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ওপরের ক্রমিক ৪, ৬, ১১ ও ১২ তে ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা, জাকারিয়া প্রভৃতি নবিগণের সালাতের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। তাদের সালাতের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের তেমন কিছু জানা নেই। তাদের শরিয়ত অনুযায়ী তারা সালাত কায়েম করেছেন। একইভাবে তাদের শরিয়তে রুকু ও সিজদা আলাদা ইবাদত ছিল। তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিলে নবিদের সালাত কায়েমের পদ্ধতি বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয় নি। মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসর্ম্পণের একটা প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে সালাতের প্রচলন হয়। এতে বুঝা যায় যে, সালাত একটা আবহমান প্রক্রিয়া যদ্বারা মানুষ তার প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করে চির-মুক্তির পথ করে নিয়েছে।

ইসলামি শরিয়তে সালাত

ইসলামি শরিয়তে দৈনিক পাঁচবার সালাত প্রচলিত আছে এবং এ পাঁচবারের জন্য নির্ধারিত সময়ও রয়েছে। পবিত্র কুরআনে সালাতের জন্য এভাবে সময় বেঁধে দেয়া না থাকলেও উম্মতের সুবিধা ও সালাতের সমান অবস্থা (uniformity) বজায় রাখার মানসে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রচলন হয়ে আসছে। উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের ক্রমিক ৩৮, ৪০, ৪৬, ৬২, ৬৯, '৭১, ৭২, ও ৭৬-এ সালাতের সময় সংক্রান্ত নির্দেশাবলী রয়েছে। এ আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে সালাতের সময় সংক্রান্ত যে ধারণা পাওয়া যায় তা পাচ ভাগে উল্লেখ করা যায় (১) আলোর আগমনে (২) আলোর ঔজ্জ্বল্যে, (৩) আলোর অবসানে, (৪) অন্ধকারের আগমনে ও (৫) গাঢ় অন্ধকারে। এ সময়ের মধ্যে পবিত্র কুরআনে আরো ক'টি সালাতের কথা ক্রমিক ৯, ১০, ১৫, ৪১ এ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- (১) মধ্যবর্তী সালাত (সালাতুল উস্‌তা), (২) সংক্ষিপ্ত সালাত (সালাতুল কসর) ও (৩) তাহাজ্জুদ সালাত। ক্রমিক ১৩ ও ২০-এ সালাতের প্রস্তুতিকালে হাত, মুখ ও পা ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র মাটি দ্বারা হাত ও মুখ মসেহ (তায়ম্মুম) করার নির্দেশ রয়েছে। ক্রমিক ৪২ এ বলা হয়েছে সালাতে স্বর উচ্চ অথবা ক্ষীণ না করতে–এ দুয়ের মধ্যবতীর্ণ রাখতে। শরিয়তে যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বেঁধে দিয়েছে তার সময় পবিত্র কুরআনের সময়ের সাথে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আলোর আগমনে ফজর, প্রখর আলোতে জোহর, আলোর অবসানে আসর, অন্ধকারের আগমনে মাগরিব ও গাঢ় অন্ধকারে এশা নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়া গাঢ় অন্ধকারে ঐচ্ছিক হিসাবে অনেকেই তাহাজ্জুদ সালাত এবং ভ্রমনে কসর সালাত করে থাকেন। উপর্যুক্ত আয়াত সমূহের ১৮ ও ৮১ তে লোক দেখানো (রিয়া) সালাত এবং সালাতের প্রতি উদাসীনতার জন্য ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে এবং ক্রমিক ৬৭ তে সালাত কায়েমের জন্য জোড়ায় জোড়ায় ও পরে একা একা দাঁড়াতে বলা হয়েছে।

সালাতের প্রকৃতি সালাতের জন্য যে সময়সূচি পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে তার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সালাত একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া (continuous process) যা একটা আলোর আগমন থেকে পরবতী আলোর আগমন পর্যন্ত চলেছে। কিন্তু শরিয়তে দৈনিক পাঁচবার সালাতের সময় নির্ধারণ

করে দিয়েছে। সাধারণ আমানুগণের জন্য এটা একটা প্রকৃষ্ট উপায়। আসলে পবিত্র কুরআনে সালাত বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে একটা ধারণা থাকা দরকার । আমরা সালাতে প্রথমত নিয়্যত বা মনোনিবেশ করি । তারপর ফাতেহার মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রশংসা করি। তারপর পবিত্র কুরআনের কটি আয়াত আবৃত্তি করি এবং প্রতি রাকাতে রুকু বা আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি ও সিজদার মাধ্যমে সম্পূর্ণ আত্মসর্পণ করি। সালাতের এ কর্মকান্ড বা আত্মসমর্পণের মূল দর্শনটি কী তা খতিয়ে দেখা আবশ্যক। এ কাজগুলোর মূল দর্শন হলো আল্লাহ্র সাথে সংযোগ স্থাপন করা। এজন্যই সালাতকে মোমিনের মিরাজ (ঘনিষ্ট সংযোগ) বলা হয়েছে। এ সংযোগ সার্বক্ষণিক এতে কোন ছেদ থাকতে পারবে না। কিন্তু সকল মানুষের পক্ষে এমন নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ সংরক্ষণ করা প্রায় অসম্ভব বলেই শরিয়তে অন্তত দৈনিক পাঁচবার তাহাজ্জুদসহ ছয়বার সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। এ পাঁচ বা ছয়বার সংযোগ স্থাপন প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য অবশ্য পালনীয়। এটাই ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের দ্বিতীয় ভিত্তি যার কোন শর্ত বা ব্যত্যয় নেই। প্রথম ভিত্তি হলো তওহিদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর দ্বিতীয়টি সালাত। এ দুটো ভিত্তি ধনী-নির্ধন, গরীব-দুঃখী, আমির-বাদশা, সুস্থ-অসুস্থ সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। মানুষ জীবনে তিনটি অবস্থার বাইরে যেতে পারে না। এ অবস্থাগুলো হলো–দাঁড়িয়ে থাকা, বসে থাকা ও শুয়ে থাকা। এ তিন অবস্থায় সালাত কায়েম করতে বলা হয়েছে। ইসলামের অন্য ভিত্তিগুলো শর্ত সাপেক্ষ যেমন-হজ করার মত সামর্থ থাকলে হজ করতে হবে, উদ্বৃত্ত অর্থ থাকলে জাকাত দিতে হবে এবং শারীরিক সামর্থ্য থাকলে সিয়াম পালন করতে হবে।

কিন্তু সালাতের বেলায় কোন শর্ত নেই। সকলের জন্য এটা সমভাবে পালনীয়। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম সালাতের মূল দর্শন হলো আল্লাহ্র সাথে সংযোগ স্থাপন করা। কিন্তু মহিমান্বিত আল্লাহ্ পরম পবিত্র সত্তা। সে সত্তার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হলে মানুষকেও পবিত্র হতে হবে। না হয় তেল আর পানির মিশ্রনের মতো অবস্থা হবে। মানুষ তার চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, জিহ্বা, তক, মন ও মস্তিস্কের মাধ্যমে প্রতি নিয়ত অসংখ্য বিষয়রাশি (phenomena) গ্রহণ করে থাকে। ইন্দ্রিয় পথে আগমনকারী এসব বিষয়রাশির মধ্যে ভালো ও মন্দ, সু ও কু, কল্যাণ ও অকল্যাণ, পাপ ও পুণ্য থাকে। মন্দ বিষয়গুলো মানুষের মধ্যে প্রবেশ করলেই মানুষ অপবিত্র হয়ে পড়ে। তখন আর পরম পবিত্র সত্তার সাথে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয় না। তাই ইন্দ্রিয় পথে আগমনকারী বিষয়রাশির প্রতিটিকে প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে সকল মন্দ ও কু কে বাধাগ্রস্ত করার প্রক্রিয়াই সালাত। এতে কু বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সু নিদ্বিধায় প্রবেশ করতে পারে এবং মানুষ পবিত্র হয়ে পরম পবিত্র সত্তার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। সালাতের এ দর্শনটি সার্বক্ষণিক ও সর্বাবস্থায়। এ জন্যই ক্রমিক ৫৬-তে বলা হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় সালাত থেকে বিরত রাখে না এবং ক্রমিক ২৯-এ সালাতে লক্ষ্য স্থির রাখার কথা বলা হয়েছে। সালাতের এ প্রক্রিয়াকে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি দায়েমি বা স্থায়ী সালাত বলে উল্লেখ করেছেন। Salat is to observe every coming phenomenon one after another accurately, precisely and exactly, আমাদের এ কথার অর্থ এ নয় যে, আমরা পাঁচ ওয়াক্তের আনুষ্ঠানিক সালাতকে গুরুত্ব দেই না। বরং দায়েমি সালাতের পর্যায়ে পৌছার জন্য আনুষ্ঠানিক পাঁচ ওয়াক্তের সালাত অপরিহার্য। আবার সবাই যে দায়েমি সালাতের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। একজন সৈনিকের পিটি ও প্যারেড যুদ্ধ নয়। কিন্তু তার মূল কাজ যুদ্ধ করা। এ মূল কাজটির প্রস্তুতিই হলো পিটি ও প্যারেড। এতে তার দেহ ও মন যুদ্ধ করার উপযোগী হয়। জীবনে একবারও যুদ্ধ না করলে দৈনিক পিটি ও প্যারেড চালিয়ে যেতে হয়।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের ক্রমিক ৬৭-তে বলা হয়েছে প্রথমে জোড়ায় জোড়ায় এবং পরে একা একা সালাত কায়েম করতে। আল্লামা ইউসুফ আলী (পৃ-১১৪৮) জোড়ায় জোড়ায় শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: A crowd mentality is not the best for the perception of the final spiritual truths. For these, it is necessary that each soul should commune within itself with earnest sincerity as before God; if it requires a Teacher, let it seek out one, or it may be that it wants the strengthening of the inner convictions that dawn on it, by the support of a sympathiser or friend. But careful and heart-felt reflection is necessary to appraise the higher truths.

এখানে আল্লামা ইউসুফ আলী যাকে Teacher বলেছেন আমাদের সমাজে আমরা তাকে পির, মুর্শিদ বা গুরু বলে থাকি। অর্থাৎ মুর্শিদের তত্ত্বাবধানে প্রথমত সালাত কায়েম করতে হবে। তিনি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিষ্যকে দায়েমি সালাতে পৌছে দেবেন। শিষ্যের সালাত দায়েমি বা স্থায়ী হয়ে গেলে অর্থাৎ শিষ্য মনের তাওহিদ মঞ্জিলে পৌছে গেলেই মুর্শিদ সরে পড়ে শিষ্যকে ফারদানিয়াতের মঞ্জিলে একাকীত্বের মাঝে ফেলে তাওহিদ ভাবের চরম সত্য উপলব্ধি করার ও দেখার দৃষ্টি দান করেন। শিষ্য তখন একাই স্থায়ী সালাতে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। এ জন্যই মুর্শিদ এক আর শিষ্য এক (সংখ্যা যতই হোক না কেন) এবং এ দুয়ে মিলে এক জোড়া। উল্লেখিত আয়াতসমূহের ক্রমিক ৯ ও ১০ এ সালাতুল উস্তার কথা বলা হয়েছে। শরিয়তে

আসর সালাতকে সালাতুল উস্‌তা বা মধ্যবর্তী সালাত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শরিয়তের দৃষ্টিতে এটা মধ্যবর্তী সালাতুল উস্‌তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। সালাতুল উস্‌তা আসলে জেহাদের মধ্যবর্তী সালাত। হাদিসে উল্লেখ আছে যে, জেহাদ দু'প্রকার--(১) জেহাদে আসগর অর্থাৎ আল্লাহ্‌ দ্বিনের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে বা বিপথগামী বা খোদাদ্রোহির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধ করা, (২) জেহাদে আকবর অর্থাৎ নিজের কু-প্রবৃত্তি ও রিপুর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত রুখে দাঁড়ানো।

জেহাদে আসগরে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি যত্নবান থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ জন্য যে, জেহাদ যেন পার্থিব যুদ্ধে পরিণত না হয়। এটা সালাতের চরম পরীক্ষার সময়। জেহাদে শত্রুকে ভূপাতিত করে কতল করতে যাবেন। এ সময় শত্রু হযরত আলীর মুখে থুথু নিক্ষেপ করলে তিনি তারবারি সম্বরণ করে শত্রুকে ছেড়ে দিলেন। শত্রুর থুথু নিক্ষেপের কারণে তাঁর মনে হয়তো এমন ঘৃণা বা ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে যাতে শত্রুকে কতল করলে জেহাদের আদর্শ থাকে না। সে কারণে তিনি শত্রুকে ছেড়ে দিয়েছেন। এটাই জেহাদে আসগরে সালাতুল উস্‌তার মূল হাকিকত। এরূপ জিহাদে রত অবস্থায় জীবনের আশঙ্কা থাকলে নিরাপদ হলে আল্লাহ্‌ জিকির করতে বলা হয়েছে। জেহাদ চলাকালে কিভাবে আনুষ্ঠানিক সালাত কায়েম করতে হবে তাও পবিত্র কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে। যা ক্রমিক ১৬-তে বিধৃত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে একদল সালাতে দাঁড়াবে অন্যদল সশস্ত্র অবস্থায় পাহারা দেবে এবং এদের সিজদা হয়ে গেলে এরা পিছনে যাবে এবং যারা পাহারায় ছিল তারা সালাতে দাঁড়াবে।

জেহাদে আকবর হলো দুনিয়ার মোহের (জাগতিক বিষয়াবলীর মোহ বা বস্তুমোহ) বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। দুনিয়ার মোহ মানুষকে এমনভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ফেলে যে, মানুষ দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে জীবনের দর্শন বিসর্জন দিয়ে পরম স্রষ্টা প্রভুকেও ভুলে যায়। পূর্ব দিকে যত এগিয়ে যাবে পশ্চিম দিক থেকে ততই দূরে সরে পড়বে। একইভাবে দুনিয়াতে যত জড়িয়ে পড়বে আল্লাহ্‌ থেকে ততই দূরে সরে পড়বে। বস্তু মোহের এ অবস্থায় সালাত কায়েম না করলে মানুষ প্রভু থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে রসাতলের শেষ সীমায় পৌছবে। এ কারণে পবিত্র কুরআনে ৮২ বার সালাতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মানসিক, আত্মিক ও জাগতিক বিভিন্ন অবস্থায় সালাত কায়েম করবে। জাগতিক মোহের অতলে নিমজ্জিত হবার মধ্যবতী সময়ে সালাতুল উস্‌তার প্রতি যত্নবান হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা না হলে মানুষ প্রভু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংযোগ হারা অবস্থায় ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যাবে। দিনের আলো যতই বাড়তে থাকে মানুষের জাগতিক মোহ ততই বাড়তে থাকে। আলো যতই পড়তে থাকে জাগতিক মোহ ততই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। How Much Land Does a Man Require-এ গল্প থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায়। বাদশা একজন লোককে বললেন, "সূর্যোদয় থেকে দৌঁড়াতে শুরু করে যতটুকু পথ অতিক্রম করে সূর্যাস্তের পূর্বে আমার সামনে ফিরে আসতে পারবে ততটুকু এলাকা তোমাকে দিয়ে দেব।" লোকটি দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে অনেক পথ এগিয়ে গেল। পড়ন্ত বেলায় ফিরে আসতে লাগলো। সূর্যাস্তের পূর্বে বাদশার সামনে যেতে না পারলে সবই পণ্ড। কাজেই বেলা যতই পড়ছে সে ততই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে আর দৌড়াচ্ছে। কিন্তু বাদশার সম্মুখে উপস্থিত হবার কিছুক্ষণ আগে একেবারে বেলা শেষে সে পড়ে মারা গেছে। তখন শুধু কবরের জায়গাটুকু পেয়েছে। এতে বুঝা গেল বেলা যতই পড়তে থাকে দুনিয়ার মোহ ততই বাড়তে থাকে। আর হয়তো সে কারণেই শরিয়ত সালাতুল উস্‌তা হিসাবে আসর সালাত নির্ধারণ করে দিয়েছে। তবে সালাতুল উসতা হিসাবে আসর সালাতই চূড়ান্ত ব্যবস্থা নয়। এটা আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বদা পালন করতে হবে। বস্তুত দুনিয়ার মোহ যখন মানুষকে জড়িয়ে ফেলতে চায় তখন সালাতুল উস্‌তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাতে মানুষ নিস্কৃতির পথ খুঁজে পায়। আমরা আগেই বলেছি বিষয়রাশি ইন্দ্রিয় পথে মানুষের ভেতর প্রবেশ করার সময় তা প্রত্যক্ষণ করে বাছাই করাই হলো সালাত। সালাতুল উস্‌তা হলো সালাতের গভীর অবস্থা বা পরিপূর্ণ রূপ যা শুধু বাছাই করেই ক্ষ্যান্ত হবে না, প্রবেশ পথ রোধ করেও দাঁড়াবে।

ক্রমিক নং ৪১ এ দেখা যায় রাতের বিশেষ অংশে (শরিয়াত মধ্য রাতের পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছে) তাহাজ্জুদ সালাত কায়েম করতে বলা হয়েছে। অনেকে মনে করেন এ আদেশ রাসূলের (সা.) জন্য। ফলে উম্মতের জন্য এটা ঐচ্ছিক। এ ধারণা সঠিক নয়। এ আয়াতে 'তুমি' বলতে মানুষকে বুঝানো হয়েছে। এ সালাতের প্রাপ্তি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। তা হলো নফল বা একটা বিশেষ লাভ (Special spiritual profit), এ বিশেষ লাভটি হলো মাকামে মাহমুদায় বা প্রশংসিত স্তরে উন্নীত হওয়া । রাসূলের (সা.) নামানুসারেই তো আধ্যাত্মিক উন্নতির এ স্তরটির নামকরণ করা হয়েছে। মানব জীবনের চরম ও পরম উৎকর্ষ হলো এ স্তর লাভ করা। এ স্তরেই তো পরম মুক্তি। এ স্তরে উন্নতি প্রাপ্তদের আনফাল অর্থাৎ বহুবিধ লাভের লোভ থাকে না। বেহেশত, হুর, গেলমান, আঙ্গুর রস, ফল-ফলাদি এসব কিছু তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। তারা মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা ভাজন হয়ে তাঁর মহান সান্নিধ্য লাভ করে। যে সালাত এমন একটা মহান স্তরে নিয়ে যায় তা রাসূলের (সা.) জন্য মুখ্য এবং উম্মতের জন্য গৌণ হতে

পারে না। রাসূল (সা.) তো এ স্তরেই রয়েছেন। কাজেই এ মহান স্তরটি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা উম্মতের থাকতে হবে এবং সে জন্যই Prescription হলো তাহাজ্জুদ।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের ক্রমিক ১৩ ও ২০-এ অজু ও তায়ম্মুমের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সালাতের প্রস্তুতি হিসাবে হাত, পা, মুখমন্ডল ধৌত করা ও মাথা মসেহ করার বিধান দেয়া হয়েছে এবং অপবিত্র অবস্থায় গোসল করার কথাও বলা হয়েছে। যদি পানি না পাওয়া যায়। তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়ম্মুম করার কথা বলা হয়েছে। শরিয়তে অজু, গোসল ও তয়স্মুমের এ বিধানগুলো প্রচলিত আছে এবং আমরা এগুলো পালন করে আসছি– পালন করে যাবো– কোন ব্যত্যয় করা যাবে না। একই আয়াতে নেশাগ্রস্ত, মোহাবিষ্ট ও যা বলা হয় তা অনুধাবন করতে না পারলে সালাত পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবার ক্রমিক ২৯-এ বিশুদ্ধচিত্ত ও একনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য স্থির রেখে সালাতে আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। এ বিধানগুলোর বাহ্যিক অনুষ্ঠান আমরা পালন করব। কিন্তু এর দর্শন কী সে বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। ধরা যাক, একজন লোক বাহ্যিকভাবে অপবিত্র হয় নি। তাহলে কী সালাতের প্রস্তুতি হিসাবে তার অজু করা লাগবে? কুরআন কিন্তু অপবিত্রতার কথা প্রথমত না বলে সালাতের জন্য প্রস্তুত হলেই অজু করতে বলেছে। এক্ষেত্রে স্পষ্ট বিধান হলো-সালাতের জন্য প্রস্তুত হতেই অজু করা লাগবে। এখানে পবিত্রতা-অপবিত্রতার প্রশ্ন নেই। মানুষ বাহ্যিকভাবে অপবিত্র না হলেও তো মানসিকভাবে অপবিত্র হতে পারে। কাজেই অজু অথবা গোসল অথবা তায়ম্মুম অপরিহার্য। এ আয়াতগুলোতে বিষয়গুলো অত্যন্ত রূপকভাবে উল্লেখিত হয়েছে। তাই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন ।

আমানু অর্থাৎ যারা মোমিন হবার সাধনায় লিপ্ত তাদেরকে লক্ষ্য করেই কুরআন বলছে যে, তারা দুনিয়ার মোহে ও লোভে এমন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে যাতে তাদের মন বিষয় থেকে বিষয়মোহে ধেয়ে চলে বলে তারা চেষ্টা করেও সালাতের নিকটবতী হতে পারে না। এ মোহান্ধতার জন্যই তারা তাদের কথা ও কাজ অনুধাবন করতে পারে না। এরা কষ্টে সৃষ্টি কোন একটা পথের পথিক (আবেরিস সাবিলিন) হলেও অর্থাৎ তাদের সাধক-মন যখনই আল্লাহ্‌কে পাবার কোন একটা কর্ম-পথ বা চিন্তা-পথের পথিক হতে চায় আমনি জাগতিক বিষয়রাশি তাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে অপবিত্র করে তোলে। কাজেই পথের পথিক হতে হলে জ্ঞান রূপ পানিতে গোসল করতে হবে। জ্ঞান সাগরে গোসল করতে না পারলে আমিত্বের ভাবে তিরোহিত হবে না এবং সজ্ঞান অবস্থায় আমল ও সাধনা বা সালাত না করলে পথিক পদে পদে কলুষাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। এ জন্যই সালাতের পূর্ব-শর্তই হলো পবিত্রতা অর্জন বা অজু করা বা মোহ ও লোভ ত্যাগ করে সালাতের মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করা। এ কারণে বিশুদ্ধচিত্তে অর্থাৎ কলুষমুক্ত চিত্তে একনিষ্ঠভাবে সালাত কায়েম করতে বলা হয়েছে (কুরআন- ৭ : ২৯) এবং সালাতে উদাসীনতা, শৈথিল্য, অলসতা ও লোক দেখানো ভাবের জন্য মোনাফিক আখ্যা দিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে।

যখন কোন ব্যক্তি জ্ঞান রূপ পানিতে গোসল করতে বা হাত, পা ও মুখ ধুয়ে নেয়ার মতো আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত রূপ পানি না পায় তার জন্য Prescription হলো পবিত্র মাটিতে (সাইয়্যেদান তাইয়্যেবান) তায়ম্মুম করা। পবিত্র কুরআনে মানুষ সৃষ্টির আয়াতে মাটির অবস্থা ভেদে তিনটা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন– তিনা অর্থাৎ কাদা মাটি, তোরাব অর্থাৎ শুকনা মাটি ও সালসল অর্থাৎ ঠনঠনে মাটি (৫৫ : ১৪)। কিন্তু বর্তমান আয়াতদ্বয়ে (৪ : ৪৩ ও ৫ : ৬) সাইয়্যেদান তাইয়্যেবান বা পবিত্র মাটি দ্বারা সালাতের পূর্ব-শর্ত অজুর পরিবর্তে তয়ম্মম করতে বলা হয়েছে। তা হলে এটা নিশ্চিত যে, এ পবিত্র মাটি বলতে উক্ত তিন প্রকার মাটির চেয়ে উন্নত মাটিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণভাবে রক্ত-মাংশের মানুষের চেয়ে উন্নত মানুষকে বুঝানো হয়েছে। যিনি জ্ঞান রূপ পানিতে গোসল সেরে এখন জ্ঞান সমুদ্রে ডুবে সালাতের দায়েমি (স্থায়ী) স্তরে অবস্থান করছেন এমন উন্নত যাকে মুর্শিদ, পথপ্রদর্শক, পির বা গুরু বলা হয়। এরূপ পবিত্র মাটিতে তায়ম্মুম করতে হবে। তবে তায়ম্মুমের শর্ত দেয়া হয়েছে পাঁচটি ঃ

১. অসুস্থতা ঃ অসুস্থতা বলতে শারীরিক অসুস্থতাই বুঝায়। আবার মানসিক অসুস্থতাও বড় ধরনের অসুস্থতা। শারীরিক অসুস্থতা যদি এমন অবস্থার হয় যে, পানি স্পর্শ করা যাবে না তাহলে তায়ম্মুম করার বিধান শরিয়তে রয়েছে। আবার মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিও সালাতের যোগ্যতায় আসে না। সালাতে সুস্থ-সবল মনের প্রয়োজন হয়। রিপুর তাড়নাজনিত অসুস্থতায় যারা ভুগছে–আমিত্বে অহংবোধ যাদের রয়ে গেছে, গায়রুল্লার প্রবঞ্চনার যারা শিকার, তাওহিদের পথের দিশা যারা পায় নি–এসব বিশেষ অসুস্থতার জন্য পবিত্র মাটি অর্থাৎ মুর্শিদের তায়ম্মুম ছাড়া দেশনা পাবার কোন পথ নেই;

২. সফরে থাকা ঃ সচরাচর বসবাসের স্থান থেকে একটা নির্ধারিত দূরত্বে কার্যব্যাপদেশে গেলে তাকে সফরে থাকা বলে। সফরে থাকলে তায়ম্মুম করা শরিয়তের বিধান। কিন্তু একই স্থানে থেকেও মানুষ মানসিক বা আত্মিকভাবে সফর করতে পারে। মানুষের মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ (Phenomenal Travelling) করে বেড়ায়। বিষয় রাশি বা বস্তুমোহ তাকে একটার পর একটা জাগতিক বিষয়ে এমনভাবে ভ্রমণরত রাখে যে, সে আর

সালাতমুখী হতে পারে না। মনের এ অবস্থায় যারা স্থিরতা এনে সালাতের মাধ্যমে প্রভুর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে না পারে তারা মুর্শিদের তায়ম্মুমের মাধ্যমে সফর রুদ্ধ করে স্থিরতা অর্জন পূর্বক সালাত কায়েম করবে;

৩. শৌচ স্থান বা পায়খানা যাওয়া ঃ পায়খানা অর্থাৎ মল-মূত্র ত্যাগের পর পানি না পেলে তায়ম্মুম করার বিধান শরিয়ত সম্মত। প্রকান্তরে পায়খানা রূপ জাগতিক মোহ বা দুনিয়ার মোহ বা কলুষিত বস্তুবাদ অর্থাৎ লোভ ও মোহ রিপুর যাবতীয় কর্মকান্ড মন থেকে বিদায় করে সালাতি মন প্রতিষ্ঠার জন্য মুর্শিদের তায়ম্মুম করা দরকার;

৪. নারী স্পর্শ করা ঃ নারীর সাথে যৌন ক্রিয়ার পর গোসল করা শরিয়তের বিধান। কিন্তু পানি পাওয়া না গেলে তায়ম্মুম করার বিধানও রয়েছে। মানুষ শুধুমাত্র দৈহিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও নারীর সংস্পর্শে আসে। এটা কাম রিপুর প্রভাব। মানসিক স্পর্শ অবিরামভাবে মানুষের মধ্যে চলে। এই কামভাব বা কাম রিপুকে প্রদমিত করে সালাত।

৫. যদি পানি না পাও ঃ ওপরের (১) হতে (৪) ক্রমিকের কার্যাবলী সম্পাদিত হলে অজু ও গোসল অপরিহার্য করা হয়েছে। পানি পাওয়া না গেলে তায়ম্মুমের ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত কার্যাবলীর মানসিক অবস্থা থেকে নিস্কৃতির জন্য পানি বলতে উপায় বা 'জ্ঞান' বুঝানো হয়েছে। কাম, লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপুর তাড়না প্রতিহত করে সালাতি মনোভাব সৃষ্টির মতো উপায় বা জ্ঞান রূপ পানি যদি না পায় তবে পবিত্র মাটি (সাইয়্যেদান তাইয়্যেবা) বা মুর্শিদের তায়ম্মুম করলেই উক্ত রূপ জ্ঞান বা উপায় লাভ করা যায়।

সালাত, অজু ও তায়ম্মুম সংক্রান্ত বিষয়ে এ পর্যন্ত যে টুকু আলোচনা হয়েছে। তাতে কোন ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই। এ বিষয়গুলো শরিয়তে আনুষ্ঠানিকভাবে যে পদ্ধতিতে পালনের নির্দেশ রয়েছে তা সেভাবেই পালন করতে হবে। তাতে কোন ব্যত্যয় করা চলবে না। যারা শরিয়তে পাবন্দি থেকে বিষয়গুলোর আরেকটু উন্নততর চিন্তা করে তাদের জন্য এ বিষয়গুলোর দর্শন ভিত্তিক বা অভ্যন্তরীণ দিক বিবেচনার জন্য আমি একটু মোমবাতি জ্বালাতে চেষ্টা করলাম। এ থেকে জ্ঞানী-গুণীজন হয়তো বিজলী বাতি জ্বালাবেন।

রোজার' হাকিকত

[রাসূল (সা.) বললেন] হে উমর, রোজা হাকিকীর অর্থ হচ্ছে মানুষ তার অন্তর বা দেল থেকে সর্বপ্রকার দ্বিনি ও দুনিয়ার আশা আকাঙ্খা দূরীভূত করবে। কারণ দ্বিনের খাহেশ, যেমন–বেহেশতের আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি ও হুরের আকাঙ্খা–আবেদ ও মাবুদের মাঝে পর্দার অন্তরাল সৃষ্টি করে। এ রকম আকাঙ্খা বিদ্যমান থাকাবস্থায় বান্দা কখনো তার মাবুদের হাকিকতের নৈকট্য লাভ করতে পারে না। অপরদিকে দুনিয়ার খাহেশ হলো-ধন-দৌলত, শান-শওকত, ক্ষমতার দম্ভ, নফসের খাহেশ ইত্যাদি জাগতিক বিষয়াদির আকাঙ্খা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দুরে সরিয়ে নেয় এবং এগুলো একেবারে শেরেক। গায়রুল্লার প্রতি খেয়াল ও ফেকের করা–কেয়ামতের ভয়, বেহেশতের আশা ও আখেরাত সম্পর্কে ফেকের করা –এ সবগুলোই রোজা হাকিকী নষ্ট করে। রোজা হাকিকী তখনই সঠিক হবে যখন মানুষ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সবকিছু দেল থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় যাতে গায়রুল্লার এলেম পর্যন্ত থাকে না এবং সব রকমের উমিদ (আশা) ও ডর দেল থেকে দূরীভূত করে। হে উমর, আল্লাহ্র দিদার ব্যতীত অন্যকোন কিছুর জন্য আমি আকাঙ্খিত নই। রোজা হাকিকীর ইফতার শুধু দিদারে এলাহি এবং রোজা হাকিকীর আরম্ভ ও শেষ দিদারে এলাহি। দিদারে এলাহি দ্বারা রোজা রাখো এবং দিদারে এলাহি দ্বারা ইফতার করা। হে উমর, রোজা হাকিকীর আরম্ভ ও শেষ সম্পর্কে বেশ ভালোভাবে খেয়াল রেখো। এটা অবগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য যে, রোজা হাকিকী কোন বস্তুর ওপর রাখা প্রয়োজন এবং কোন বস্তুর ওপর ইফতার করা প্রয়োজন। স্মরণ রেখো, রোজা হাকিকীর আরম্ভ হচ্ছে আল্লাহ্র মারেফাত অর্জন থেকে এবং এর শেষ বা ইফতার হচ্ছে কেয়ামতে আল্লাহ্র দিদার লাভ করায়। রোজাদারদের জন্য দুটি সুখবর রয়েছে–প্রথমত ইফতারের সময় এবং দ্বিতীয়টি আল্লাহ্র দিদার লাভের সময়।

হে উমর, সাধারণত মানুষ প্রথমে রোজা রাখে এবং রোজা শেষে ইফতার করে। কিন্তু হাকিকী রোজার প্রথমে ইফতার এবং তারপর রোজা আরম্ভ হয়। মজ্জুব, সালেক ও যারা খোদার পথের পথিক তারা সদা-সর্বদা রোজা অবস্থায় কালাতিপাত করে; ক্ষণিকের জন্যও তারা ইফতার গ্রহণ করে না। কারণ রোজা হাকিকীর জন্য ইফতার করা শর্ত নয়; বরং ইফতারের জন্য রোজা রাখা শর্ত। ওয়াসোলানে এলাহির (আল্লাহ্র সাথে মিলনকারীগণ) অবস্থা এমন নয় যে, তারা কখনো কখনো রোজা রাখবে। আবার কখনো কখনো ইফতার করবে। কারণ তারা সদা-সর্বদা রোজা অবস্থায় থাকে।

হে উমর, সাধারণ মানুষ যে রোজা রাখে (যাতে শুধু পানাহার ও জেনাহ থেকে পরহেজ থাকে) তা হাকিকী রোজা নয়–বরং সেটা মাজাজী রোজা। এরূপ রোজা দ্বারা আসূরারে এলাহি (আল্লাহ্র রহস্য জ্ঞান) হাসিল হয় না। এরূপ রোজা শুধুমাত্র জাহেরি সূরাতে

সীমাবদ্ধ এবং হাকিকত সম্বন্ধে এ রোজা সম্পূর্ণ অন্ধকারে থেকে যায়। এ রকম রোজা দ্বারা গায়রুল্লা পরিত্যাগ সম্ভব হয় না; বরং এতে সর্বপ্রকার নফসানি ও ইনসানি কলুষতা থেকে যায়। এরূপ রোজাদারের যাবতীয় বাক্য ও কার্যাবলী গায়রুল্লাতে পরিপূর্ণ থাকে। এরূপ জাহেরি ও মাজাজী রোজা দ্বারা এতটুকু লাভ হতে পারে যে, গরীব, দুঃখী ও মিসকিনগণের দুঃখ-ব্যথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং তাতে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তাদের অভাব কিঞ্চিত লাঘব করা যায়। মনে রেখো, যে ব্যক্তির শায়েখ, মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শক নেই তার দ্বীন নেই। যার দ্বিন নেই তার মারেফাতে এলাহি নেই। যার মারেফাতে এলাহি নেই সত্যপথের পথিকদের সাথে তার সম্পর্ক নেই। সত্যপথের পথিকদের সাথে যার সম্পর্ক নেই তার কোন শুভাকাঙ্খী নেই। যার শুভাকাঙ্ক্ষী নেই তার কোন বন্ধু বা মাওলা নেই। আমার আউলিয়াগণ আমার কাবার (হাঁটু) নিচে; তাদের মর্তবা শুধু আমিই অবগত –আর কেউ তাদের সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত নয়। হে উমর, সালেকানে গায়ের মজুব কামেল ব্যক্তির সংসর্গে লাভ করা ছাড়া আল্লাহ্ মারেফাত অর্জন করা যায় না। প্রকৃত কামেল ব্যক্তির বাতেনি তাওয়াজ্জু ব্যতীত কেউ আলমে জাবারুতে পৌঁছতে পারে না এবং এরা আলমে নাসুত ও আলমে মালাকুতে ঘুরে বেড়াবে। এ রকম মানুষ শাহওয়াত ও শহরতের তলবগার ও তাবেদার (কাম প্রবৃত্তি ও খ্যাতি অন্বেষণকারী)।

হে উমর, যে সব আলেম, ফকিহ ও সালেক গায়ের মজুব অবস্থায় আছে এবং কোন কামেল ব্যক্তির সংসর্গে থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নি তারা আস্‌রারে এলাহির জলোয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ রকম ব্যক্তি দুনিয়াদারির রওনক ও নফসের খাহেশের পিছনে কুকুরের মতো ঘুরে। যদিও এরা জুব্বা, দোস্তার ও সুফিদের পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে থাকে তাদের বাতেন হেরেস, হওয়া (লোভ ও লালসা) এবং নফসানি খাহেশে পরিপূর্ণ। ফকিরি লেবাস পরিধান করার পিছনে এদের উদ্দেশ্য খোদাভক্ত হওয়া নয়–বরং দুনিয়ার ধন-দৌলত ও রওনক বৃদ্ধি করাই এদের উদ্দেশ্য। এদের কলেমা, নামায ও রোজার কোন হাকিকত নেই। যে ব্যক্তি মোহাক্কেক সালেকের দলভুক্ত হয়ে মারেফাতে এলাহির কামাল দরজায় পৌঁছতে চায় তার জন্য ফরজ হলো হাস্তী বা আমিত্বকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। যে আমিত্বকে নিস্‌ত বা ধ্বংস করতে সমর্থ হয় নি সে শতবার সুফির লেবাস পরলেও মঞ্জিলে এরফানে অগ্রসর হতে পারবে না। মানুষ তখনই মারেফাতে এলাহির মঞ্জিলে পৌঁছতে পারে যখন সে স্বীয় হাস্তী বা আমিত্বকে বিনাশ করে সর্বদা জাতে এলাহির মাতলুবা (অভিলাসী) হয়।

টীকাঃ

১। ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ রোজা বা রমজান । রমজান শব্দটি 'রমজ' ধাতু থেকে নিস্পন্ন যার অর্থ হলো পোড়ানো বা দাহন (burning)। এ দাহন হলো মানব জীবনের কুপ্রবৃত্তির দাহন। এটা মানব জীবনে সংহতি, ঐক্য, প্রেম, মৈত্রী ও ভালোবাসার সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অপরদিকে কু-প্রবৃত্তিগুলো আমাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও অসহায় করে মানব জীবনকে অন্ধকারের অতল তলে তলিয়ে দেয় এবং মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যাহত করে তোলে। কামপ্রবৃত্তির অসংযত সন্তোষ বিধানের ফলে মানুষ পশুত্বের চরম স্তরে নেমে যায়। ক্রোধ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে। লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এসব কু-প্রবৃত্তি মানবাত্মাকে কলুষিত করে আত্মিক উন্নতি সাধনের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। সোনা যেমন আগুনে পুড়ে খাটি হয় রমজানেও তেমনি কুপ্রবৃত্তিগুলোকে দাহন করে মানুষকে খাঁটি করে দেয় যাতে সে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি (vicegerant) হিসেবে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। পবিত্র কুরআনে রমজান" মাসের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হিসাবে যে শুদ্ধি অভিযানের কথা বলা হয়েছে তা সিয়াম (একবচনে সওম) বলে উল্লেখ করা হয়েছে (আমরা যাকে রোজা বলি)। সওম অর্থ হলো কোন কিছু থেকে বিরত থাকা বা সংযম সাধন করা। পবিত্র কুরআনে সিয়াম সংক্রান্ত যে ক'টি আয়াত রয়েছে তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

১. হে আমানুগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববতীগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার (২ঃ১৮৩)।

২. নির্দিষ্ট ক'টি দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা ভ্রমণে থাকলে সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। এটা যাদের জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক তাদের ফিদয়া (মুক্তিপণ) হলো একজন মিসকিনকে আহার্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফুর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার জন্য অধিক কল্যাণকর । যদি তোমরা উপলব্ধি করতে, তবে বুঝতে যে, সিয়াম পালন করাই কল্যাণকর (২ঃ১৮৪)।

৩. রমজান মাস, এতে নাজেল করা হয়েছে কুরআন যা মানুষের জন্য হেদায়েত ও হেদায়েতের বিশদ ব্যাখ্যা এবং ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী)। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন সিয়াম করে। তবে যে পীড়িত অথবা সফরে আছে তাকে অন্য সময় গণনা পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্

তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান–কাঠিন্য চান না এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর ও আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার (২৪ঃ১৮৫)।

৪. সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য নারী-গমন হালাল করা হলো । তারা তোমাদের লেবাস এবং তোমরা তাদের লেবাস। আল্লাহ্‌ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতএব তিনি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন তা (অর্থাৎ সিয়াম) কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণ রেখা হতে প্রভাতের শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করা। তোমরা মসজিদে এতেকাফ রত অবস্থায় নারী-গমন করো না। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা। সুতরাং এগুলোর নিকটবতী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ্‌ তাঁর নিদর্শনাবলী মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে (২ঃ১৮৭)।

৫. ..... যে পর্যন্ত কুরবানির পশু যথাযথ স্থানে না পৌঁছে সে পর্যন্ত তোমরা মাথা মুন্ডন করো না। যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা মাথায় ক্লেশ থাকে। তবে সিয়াম অথবা সদকা অথবা কুরবানি দ্বারা তার ফিদয়া দেবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যে ব্যক্তি হজের সাথে উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানি করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায় তবে হজের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন (পূর্ণ দশ দিন) সিয়াম পালন করবে.....(২ঃ১৯৬)।

৬. .....কোন সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ প্রদান করবে এবং একজন কৃতদাস মুক্ত করবে। সামর্থ্য না থাকলে একাদিক্রমে দুমাস সিয়াম করবে। (৪:৯২) ।

সিয়াম সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট। কেবলমাত্র মুসলিম সমাজে নয়, পুরাকাল থেকে উপবাসকে দাহনের উপায় বলে অনেক সম্প্রদায় গণ্য করে আসছে। চিত্তশুদ্ধির জন্য হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদি প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী উপবাসের বা রোজার আশ্রয় গ্রহণ করে। উপবাস করে মন্দিরে, গির্জায়, প্যাগোডায় গমন পূর্বক প্রার্থনার রীতি সকল ধর্মাবলম্বীর মাঝেই রয়েছে। তবে তাদের জন্য উপবাস অবশ্য কর্তব্য নয়। মুসলিমদের কাছে সিয়াম অবশ্য কর্তব্য। এক্ষেত্রে সিয়ামের সাথে উপবাস বা রোজার বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। সিয়াম শুধুমাত্র পানাহার থেকে বিরত থাকা বা উপবাস নয়। সর্ববিধ কামনা-বাসনা তথা রিপুর তাড়না থেকে বিরত থাকা সিয়াম সাধনার মূল উদ্দেশ্য। তাই সিয়ামকে সংযম সাধনাও বলা হয়ে থাকে। সর্বপ্রকার প্রবৃত্তির ও ইন্দ্রিয়ের সঠিক সংযমের প্রশ্ন সিয়ামের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের প্রবৃত্তি সীমার মধ্যে থাকলে তা বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাবধারার অনুরূপ হবে। কিন্তু প্রবৃত্তিকে সীমার মধ্যে রাখা এক দুরূহ ব্যাপার। প্রবৃত্তি কখনো বাঁধ মানতে চায় না। সীমালংঘনই এর স্বভাব। ফলে যে কোন সুযোগে মানুষের প্রবৃত্তি তার বিবেক বোধকে বন্দী করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য, নিয়ম-নীতি ও ঐশী নির্দেশ ভুলে প্রবৃত্তির দাবি পূরণে নিযুক্ত হয়ে পড়ে এবং মানুষের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পূণ্য বিচার-বিবেচনা করার ইচ্ছাশক্তিকে বিলোপ করে দেয়। সিয়াম বা সংযম সাধনা প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে তার ওপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করার জন্য মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলে।

দ্বিতীয় হিজরি সনে সিয়ামের বিধান নাজেল হয়েছিল। মুসলিমগণ তখন থেকেই সিয়াম পালন করে আসছে। শরিয়তের বিধান মতে আমরা ফজরের পূর্ব মুহূর্তে সেহেরি খেয়ে পানাহার থেকে বিরত থাকি এবং মাগরেবের পূর্ব মুহূর্তে ইফতার করে সিয়াম ভঙ্গ করি। রমজান মাসের ২৯/৩০ দিন এভাবে সিয়াম পালন করা হয়। এছাড়াও যারা হজের সাথে উমরা পালন করে কুরবানি করতে না পারে তাদের জন্য মক্কায় তিনদিন ও গৃহে ফেরার পর সাত দিন–এ দশদিনের সিয়ামের বিধান পবিত্র কুরআনে বিধৃত আছে। পবিত্র কুরআনের এ দুটি সময়ের বাইরে মুসলিমগণ বছরের বিভিন্ন সময়ে আরো কয়েকবার নফল সিয়াম পালন করে থাকেন। এমনও কাউকে দেখা গেছে, যিনি বছরের প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার সিয়াম পালন করেন। সুফি সাধকগণের সকলেই সারা বছর ধরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সিয়াম পালন করে থাকেন। সিয়াম আত্মসংযমের একটা প্রকৃষ্ট উপায় বলেই নাফসকে প্রদমিত রাখার মানসে সিয়াম একটা ইবাদত। এ ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন। সিয়ামে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা ইবাদত নয়। এটা ইবাদতের বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। এ অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্য হলো মুসলিমের মনে আল্লাহ্‌ ভয় ও ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্থির থাকতে পারা। এ আত্মিক শক্তিলাভ করতে হলে সিয়ামের আসল তাৎপর্য অনুধাবন করে নফসের খাহেশ থেকে মনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সায়েম সিয়ামের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বুঝতে না পারলে এবং তার মন-মস্তিষ্কে তা অঙ্কিত করে চিন্তা-চেতনা, কল্পনা, ইচ্ছা ও কর্মে সিয়ামের প্রভাব বিস্তার করতে না পারলে সিয়াম দ্বারা কোন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সে লাভ করতে পারবে না। রাসূল (সা.)

বিভিন্নভাবে সিয়ামের আসল উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করবে না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই।" তিনি আরো বলেন, "এমন অনেক সায়েম আছে যাদের ভাগ্যে ক্ষুধা আর পিপাসা ছাড়া কিছুই জোটে না। ইমান ও ইহ্‌তেসাবের সাথে যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে তার অতীতের সব গুনা মাফ করে দেয়া হবে।" ইহ্‌তেসাব অর্থ হলো সবসময় চিন্তা-ভাবনা করে নিজের কাজ-কর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে আল্লাহ্‌র আদেশের বিরুদ্ধে না চলা (শামী, পৃ: ৮০-৮১)। আমরা আগেই বলেছি যে, মানুষের সপ্ত ইন্দ্রিয় পথে অহর্নিশ বিষয়রাশি (phenomena) প্রবেশ করতে থাকে। এ বিষয়রাশি সু ও কু, ভালো ও মন্দের সংমিশ্রনে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে প্রবৃত্তিকে নাড়া দেয়। মানুষের অন্তরে প্রবেশকারী বিষয়রাশিকে সালাত প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষণ করে যাচাই বাছাই পূর্বক সু ও কু চিহ্নিত করা হয়। কু-এর প্রবেশ প্রতিরোধ করা হলো সিয়াম। অর্থাৎ মনকে বস্তুমোহ থেকে মুক্ত করা। হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি আরো একধাপ এগিয়ে বলেছেন যে, শুধু বস্তুমোহ নয়। পরকালের আরাম-আয়েশ, সুখ-সম্ভোগের খাহেশ পরিত্যাগ করাই সিয়াম। শরিয়াতে রাতের কৃষ্ণরেখার আগমনে আমরা ইফতার করি। কিন্তু হাকিকতে আগে ইফতার তারপর রোজা শুরু বলে তিনি উল্লেখ করেন। তার এসব উক্তিতে সুগভীর তত্ত্ব-দর্শন রয়েছে। আমরা একটা দ হাদিস প্রতি বছর রমজানে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাই। হাদিসটি হলো-রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে যত শীঘ্র ইফতার করে সে আমার তত প্রিয়।" জ্ঞানের মহানগরীর কী গভীর দার্শনিক উক্তি। পবিত্র কুরআনের বিধান হলো কৃষ্ণরেখার আগমনে ইফতার করতে হবে। এটা কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। এখানে শীঘ্রতার মাপকাঠি কোথায়! কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তো একই এলাকার সবাই ইফতার করে ফেলে। শীঘ্রতার প্রশ্ন তখনই হতো যদি ইফতারের সময়ের একটা range থাকতো। অর্থাৎ এতটা থেকে এতটার মধ্যে ইফতার করতে হবে। এমন কোন range শরিয়তে নেই। কাজেই মহাজ্ঞানী রাসূলের (সা.) এ উক্তির রহস্য অন্য কিছু যা আমরা বুঝতে অপারগ। সম্ভবত এ উক্তি দ্বারা রাসূল (সা.) যা বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির 'আগে ইফতার তারপর রোজা"। ইফতার শব্দটি ফাতার শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হলো– ভেঙ্গে ফেলা, চূর্ণ-বিচূর্ণ করা। মানুষ তার রিপুকে বা কুপ্রবৃত্তিকে জীবনের যত শীঘ্র চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারবে সে তত বেশি সময় ধরে মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন করতে পারবে। এ উৎকর্ষ সাধনের সময় যার যত বেশি সে রাসূলের কাছে তত বেশি প্রিয়। ধরা যাক, দুজন লোকের উভয়ে ষাট বছর বেঁচে থাকবে। একজন ত্রিশ বছর বয়সে তার রিপুকে প্রদমিত করে ফাতার বা ভেঙ্গে দিয়েছে। তাহলে সে জীবনের অবশিষ্ট ত্রিশ বছর একজন ভালো মানুষ বা ইনসানুল কামেল হিসাবে জীবনের উৎকর্ষ সাধন করে মানব জীবন সার্থক করেছে। অপরজন পঞ্চাশ বছর বয়সে রিপুকে "ফাতার" করে দশ বছর মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন করেছে। সঙ্গত কারণেই প্রথমোক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির চেয়ে রাসূলের (সা.) অধিক প্রিয় হবেন। কাজেই শুধু উপবাস ভঙ্গ করা ইফতার নয়। জীবনের সকল কু কে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা প্রকৃত ইফতার। এ ইফতার একবার কেউ করলে তার রোজা বা বস্তুমোহ পরিত্যাগ শুরু হয়ে যায় যা আর কখনো ভাঙ্গে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কারো এ রোজা ভেঙ্গে যায়। তবে সে ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যায়। তার মুক্তির আর কোন পথ খোলা থাকে না–জাহান্নাম তার চিরস্থায়ী ঠিকানা।

জাকাতের হাকিকত

[রাসূল (সা.) আরো বলেন] হে উমরা! শরিয়াত মোতাবেক দুশ দিনারের মধ্যে মাত্র পাঁচ দিনার জাকাত দান করা ফরজ। আহলে তরিকতগণের কাছে দুশ দিনারের মধ্যে মাত্র পাঁচ দিনার নিজের জন্য রেখে বাকি সবটুকু দান করা ফরজ। মনে রেখো, জাকাত স্বাধীন (আজাদ) ব্যক্তির ওপর ফরজ, গোলাম বা ক্রীতদাসের ওপর ফরজ নয়। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নফসের (খাহেশের) তাবেদারি থেকে মুক্ত হতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আজাদ হতে পারে না। যে পর্যন্ত সে আজাদ হতে না পারে সে পর্যন্ত তার ওপর কী করে জাকাত ফরজ হতে পারে? অতএব বান্দার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে নফসের তাবেদারি থেকে আজাদি হাসিল পূর্বক জাকাতে হাকিকী আদায় করার যোগ্যতা (কাবেলিয়ত) অর্জন করা।

জাকাত সুস্থ মস্তিষ্ক (আকেল) ও সাবালক ব্যক্তির ওপর ফরজ। উন্মাদ (দেওয়ানা) ও নাবালকের ওপর জাকাত ফরজ নয়। যে ব্যক্তি গাফলতি ও নাফসানিয়াতরূপ শয়তানের কুহকজালে আবদ্ধ হয়ে আছে সে আরেফে এলাহিগণের কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু হিসাবে গণ্য। আহলে মারেফাতগণ তাকে একেবারে অথর্ব বলে মনে করে। ফলে তার ওপর জাকাতে হাকিকী কী করে ফরজ হতে পারে? কাজেই বান্দার প্রধান কর্তব্য হলো নফসানিয়াতের অন্ধকার থেকে মুক্তি অর্জন করে মারেফাতে এলাহি মোতাবেক আকল ও আজাদি হাসেল করা। এতে সে জাকাতে হাকিকী আদায় করার উপযুক্ততা লাভ করবে। শরিয়াত যে জাহেরি জাকাত ফরজ করেছে তার উদ্দেশ্য হলো ধনী

ব্যক্তিগণ জাকাতের অসিলায় গরীব-আতুর ও মিসকিনকে সাহায্য করবে এবং এতে তাদের অভাব কিঞ্চিত লাঘব হবে।

হে উমর, গঞ্জে হাকিকীর (হাকিকতের সম্পদ) অধিকারী ব্যতীত জাকাতের হাকিকত সম্বন্ধে কারো কোন জ্ঞান নেই। গঞ্জে হাকিকী মূলত সেরূরে রবুবিয়াত (রাবের গুপ্ত রহস্য)। আরেফগণের দেল (অন্তর) এ সেরূরে রবুবিয়াতের গঞ্জিনা (ধনাগার) সদৃশ। কাজেই আরেফগণের ওপর ফরজ হলো –তারা তাদের গঞ্জে হাকিকী থেকে আসরারে এলাহি রূপ জাকাত অজ্ঞ ও গোমরাহগণকে দান করবে। কারণ এরূপ দান পাবার উপর্যুক্ত ব্যক্তিগণকে দান করাই প্রকৃত জাকাত এবং এটাই হাকিকী জাকত।

টীকাঃ

১। ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ জাকাত। শরিয়তের বিধান মতে বছরের শেষে উদ্বৃত্ত অর্থ ও স্বর্ণ-রৌপ্যের মূল্যের ওপর শতকরা আড়াই ভাগ এতিম, দুঃস্থ ও মিসকিনকে দান করতে হয়। এটা বাধ্যতামূলক দান। পবিত্র কুরআনে যতবার সালাত কায়েম করতে বলা হয়েছে প্রায় ততবার জাকাত দানের কথা রয়েছে। আকিমুস সালাত ওয়া তুজ জাকাতা'-এ বাক্যাংশটি এমনভাবে বলা হয়েছে যেন একটা আরেকটার সম্পূরক। যে কোন একটাকে বাদ দিলে ব্যাকাংশটি মনে হয় অপূর্ণ থেকে যায়। সালাত আর জাকাত পবিত্র কুরআনে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

হযরত খাজা মুঈনুদিন চিশতি বলেছেন যে, পূর্ণ মানব (ইনসানুল কামেল) তার প্রভুর পরিচয় লাভ করার পর তাঁর রহস্য ভান্ডার থেকে যা কিছু লাভ করেছে তা অজ্ঞ লোকদের দান করে হেদায়তের আলোর দেশনা প্রদান করাই হলো জাকাত। আমরা আগেই বলেছি বিষয়রাশি (phenomena) সপ্ত ইন্দ্রিয় পথে আমাদের মাঝে প্রবেশ করে। এসব বিষয়রাশির মধ্যে যেগুলো কু সেগুলো আমাদের প্রবৃত্তিকে নাড়া দিয়ে মানবীয় সত্তাকে পরাভূত করে ষড় রিপুর কার্য সম্পাদন করে। এতেই আমরা পাপ-অন্যায়-অপরাধ-অকল্যাণে জড়িয়ে পড়ি। আগেই বলা হয়েছে কু বিষয়রাশিকে প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া হলো সালাত এবং তার প্রবেশ প্রতিহত বা প্রতিরোধ করা হলো সিয়াম। এখন এ চিহ্নিত ও প্রতিরোধকৃত কু বিষয়রাশিকে হটিয়ে দেয়া বা বিতাড়িত করাই জাকাত। আসলে কুরআনিক দর্শনের দৃষ্টিতে মানবীয় আমিত্বের (খুদি) উৎসর্গের নাম জাকাত। অন্যভাবে বলা যায় দুনিয়ার মোহ (worldly affairs) বর্জন করে মনের মধ্যে মহাশূন্যভাব জাগিয়ে তোলাই জাকাত (vacating the mind from whole-hearted material attachment). শূন্যভোব জেগে ওঠলেই তাতে প্রভুর (রবের) আশ্রয় হয়। বস্তুগত যে দান আমরা দিয়ে থাকি তা জাকাতের অনুষ্ঠান মাত্র। পবিত্র কুরআনের আয়াতটি (৫৮ঃ১৩) এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ আয়াতে বলা হয়েছে রাসূলের সাথে কোন গোপন বিষয় আলোচনা করলে সদকা প্রদান কষ্টকর হলে সালাত কায়েম করতে ও জাকাত দিতে। সদকা একটা বস্তুগত দান। তা দেয়ার ক্ষমতা যার নেই তাকে জাকাত দিতে বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জাকাতের গুরুত্ব বস্তগত দানের বাইরে অন্য কিছুতেও নিহিত আছে।

শরিয়তের বিধান মতে বছরের উদ্বৃত্তের ওপর শতকরা আড়াই ভাগ প্রদান করা জাকাত। আবার বস্তু দ্বারা সদকা প্রদানেরও বিধান পবিত্র কুরআনে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে কাজেই জাকাতকে ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য সদকা প্রদান বিষয়টিও এখানে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমেই সদকা সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত উদ্ধৃত করা হলো ঃ

১. পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফেরানোতে কোন কল্যাণ নেই; বরং কল্যাণ আছে.....আল্লাহ্‌র প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, সফরকারী, সাহায্যপ্রার্থী ও দাস মুক্তির জন্য দান করলে....(২ঃ১১৭)।
২. লোকে কী ব্যয় করবে। সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বলে, "তোমাদের উত্তম ব্যয় হলো যা তোমরা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত" ও মুসাফিরের জন্য ব্যয় করবে.....(২ঃ২১৫)।
৩. .....লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে কী তারা ব্যয় করবে? বলে দাও উদ্বৃত্তের সমুদয়'.....(২ঃ২১৯)।
৪. কে সে, আল্লাহ্‌কে যে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তিনি তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন; (২ঃ২৪৫)।
৫. হে আমানুগণ, আমরা যে রেজেক তোমাদের দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বে যখন কোন ক্রয়-বিক্রি, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না (২ঃ২৫৪)।
৬. যারা তাদের ধনৈশ্বর্য....আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটা শস্য বীজ যা সাতটা শীষ উৎপাদন করে এবং প্রতিটি শীষে এক শ শস্যকণা.....(২ঃ২৬১)।
৭. যারা আল্লাহ্‌র পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না (অথবা খোটা দেয় না) ও কষ্ট বা ক্লেশ দেয় না তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। (২ঃ২৬২)।

৮. যে সদকার পর ক্লেশ দেয়া হয় তা অপেক্ষা ভালো কথা ও ক্ষমা উত্তম (২ঃ২৬৩)।
৯. হে আমানুগণ! তোমরা তোমাদের সদকা নিস্ফল করো না মান্না ও আজ দ্বারা (অর্থাৎ দান গ্রহীতার প্রতি খোটা ও দুর্ব্যবহার দ্বারা)-সে ব্যক্তির মতো, যে লোক দেখানোর জন্য ধন ব্যয় করে থাকে. (২ঃ২৬৪)।
১০. যারা আল্লাহ্ সন্তুষ্টি লাভার্থে ও তাদের নাফস দৃঢ় করণার্থে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন উঁচু ভূমিতে অবস্থিত একটা উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবু লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট (২ঃ২৬৫)।
১১. তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটা বাগান থাকুক যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে, আর সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং সন্তান-সন্ততি দুর্বল। এরপর এক অগ্নিক্ষরা ঝঞ্ঝা বায়ু আপতিত হয় এবং বাগান জ্বলে যায় ?.....(২ঃ২৬৬)।
১২. হে আমানুগণ! তোমরা যা পবিত্র উপার্জন কর এবং আমরা যা ভূমি থেকে উৎপাদন করে দেই তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক (২ঃ২৬৭)।
১৩. (সদকা প্রদানে) শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় ও কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। (২ঃ২৬৮)।
১৪. যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর (নজর) আল্লাহ্ তা জানেন (২ঃ২৭০)।
১৫. যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকা দাও। তবে তা ভালো; আর যদি গোপনে দাও অভাবগ্রস্থকে তবে তা আরো ভালো; এবং তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের দোষ ঢেকে দেবেন (২ঃ২৭১)।
১৬. .....যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমরা শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করে থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না (২ঃ২৭২)।
১৭. এটা প্রাপ্য ফকিরগণের যারা আল্লাহ্ পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, (জীবিকার সন্ধানে) দেশময় ঘুরাফিরা করতে পারে না; যাচনা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাব মুক্ত বলে মনে করে; তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে যাচনা করে না (২ঃ২৭৩);
১৮. যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের জন্য রবের কাছে প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না (২ঃ২৭৪)।
১৯. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সম্বরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন (৩ঃ১৩৪)।
২০. যারা কৃপণতা করে ও মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং গোপন করে যা আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে দান করেছেন এবং কাফেরদের জন্য আমরা প্রস্তুত রেখেছি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (৪ঃ৩৭)।
২১. (এরাই তারা) যারা মানুষকে দেখানোর জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না (৪ঃ৩৮)।
২২. হে আমানুগণ! পন্ডিত ও সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে; এবং যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মভুদ শাস্তির সংবাদ দাও (৯ঃ৩৪)।
২৩. তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে সদকা বন্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে; এরপর তাদের কিছু দিলে তারা পরিতুষ্ট হয় এবং কিছু না দিলে তারা বিক্ষুব্ধ হয় (৯ঃ৫৮)।
২৪. সদকা তো কেবল ফকির, মিসকিন, সংশ্লিষ্ট (আদায়কারী) কর্মচারিদের জন্য, অনুরাগী অন্তর-বিশিষ্টগণের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণভারাক্রান্তগণের জন্য, আল্লাহ্র পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরের জন্য। এটা আল্লাহ্র বিধান (৯ঃ৬০)।
২৫. মোমিনগণের মধ্যে সদকা প্রদানে যারা অত্যানুরাগী এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতীত দান করার কিছুই পায় না তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও উপহাস করে তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি (৯ঃ৭৯)।
২৬. আরবগণের মধ্যে এমন আছে যে, তারা যা ব্যয় করে তা অর্থদন্ড বলে গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র তাদেরই ওপর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (৯ঃ৯৮)।
২৭. আরবগণের মধ্যে এমন আছে যে, যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এবং যা ব্যয় করে তা আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও রাসুলের সংযোগ (সালাত) লাভের উপায় মনে

করে। নিশ্চয়ই এটা তাদের জন্য নৈকট্য লাভের উপায়; শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ঃ৯৯)।

২৮. যখন তাদেরকে বলা হয়, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে রেজেক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর'। তখন কাফেরগণ আমানুগণকে বলে, "আল্লাহ্র ইচ্ছা করলে যাকে খাওয়াতে পারতেন। আমরা কেন তাকে খাওয়াবো (৩৬ঃ৪৭)।

২৯. কে আছে যে আল্লাহ্কে দেবে উত্তম ঋণ ? তাহলে তিনি এটা তার জন্য বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার (৫৭ঃ১১);

৩০. দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার (৫৭ঃ১৮)।

৩১. হে আমানুগণ! তোমরা রাসুলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সদকা প্রদান করবে; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক; যদি তাতে অক্ষম হও, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (৫৮ঃ১২)।

৩২. লেলিহান অগ্নি শিখা থেকে অনেক দূরে রাখা হবে.যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্ম-শুদ্ধির জন্য; এবং কারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নয় (৯২ঃ১৪-১৯)।

৩৩. তুমি কি দেখেছে তাকে যে, দ্বিনকে প্রত্যাখ্যান করে ? সে তো ওই ব্যক্তি যে এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং মিসকিনকে খাদ্য দানে অনুপ্রাণিত করে না। (১০৭ঃ১-৩)।

সদকা বিষয়ে পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সদকা বা দান ইসলামে সৎকর্ম হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। জগতের কোন কিছুর যিনি মুখাপেক্ষী নন, যিনি সকল বস্তুমোহ নিরপেক্ষ সে-ই সর্বশক্তিমান মহিমান্বিত আল্লাহ্ তার বান্দার জন্য আমাদের কাছে 'কর্জে হাসানা" বা উত্তম ঋণ চাচ্ছেন। এতেই সদকার গুরুত্ব সহজে অনুমেয়। কী আমরা ব্যয় ও দান করবো এবং কার জন্য ব্যয় এবং কাকে দান করবো তাও পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে। ওপরের ক্রমিক ৩-এ বলা হয়েছে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করতে। এখানে আরো একটা শর্ত দেয়া হয়েছে যে, যা আমরা নিজেরা গ্রহণ করবো না তা অন্যকে দেয়া যাবে না। কার জন্য আমরা ব্যয় করবো এবং কাকে সদকা দেবো তা ক্রমিক ১,২, ১৭ ও ২৩-এ উল্লিখিত হয়েছে তা সংক্ষেপিত করলে যা দাঁড়ায় তা হলো-১, পিতামাতা ২. আত্মীয়-স্বজন ৩. এতিম ৪. মিসকিন ৫. সাহায্যপ্রার্থী ৬. মুসাফির ৭. ফকির ৮. দাস বা বন্দী। এ আট প্রকার সাহায্য গ্রহীতার মধ্যে মিসূকিন বা দুঃস্থ হলো তারা যাদের জীবন আছে অথচ জীবিকা অর্জনের শারীরিক ক্ষমতা নেই এবং ফকিরদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেই (২ঃ২৭৩) বলে দিয়েছে এরা আল্লাহ্র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, এরা রুটি-রুজির পথ ছেড়ে দিয়েছে–এরা কিন্তু কারো কাছে হাত পাতে না এবং আমরা আমাদের অজ্ঞতা বশত মনে করি তাদের কোন অভাব অনটন নেই। জাকাত ও সদকা উভয়টি দান। এর পরিমাণ ও ক্ষণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কোন কিছু উল্লেখ নেই।

শরিয়তে জাকাতের পরিমাণ ও ক্ষণ বেঁধে দেয়া হয়েছে। বছরান্তে উদৃত্ত অর্থ ও স্বর্ণ-রৌপ্যের মূল্যের শতকরা আড়াই ভাগ জাকাত প্রদান করতে হবে। সদকার কোন পরিমাণ শরিয়াতেও নেই। এটা যখন তখন যে কোন পরিমাণ প্রদান করা যায়। এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে বিবেচ্য যে, যেখানে পবিত্র কুরআনে উদ্বৃত্তের সমুদয় ব্যয় করতে বলেছে (ক্রমিক-৩/২ঃ২১৯) সেখানে জাকাত কোথা থেকে দেয়া হবে ? অপরদিকে ক্রমিক-৩০ এ বলা হয়েছে রাসুলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে হলে সদকা দিতে হবে। সদকা দিতে অক্ষম হলে জাকাত দিতে হবে (৫৮ৎ১২-১৩)। যার সদকা দেয়ার সামর্থ্য নেই তার জাকাত দেয়ার সামর্থ্য হবে কী করে? এসব আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জাকাত বস্তগত দান নয়। বস্তুগত দান জাকাতের একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। মনসুর হাল্লাজের বিচার চলাকালে শরিয়াত সম্পর্কে তার ধ্যান-ধারণা জানার জন্য কাজিদের একজন জিজ্ঞেস করেছিল, "বলো তো ২০ দিনারের জাকাত কত?" হাল্লাজ নিদ্বিধায় বললেন, "২০ দিনারের জাকাত সাড়ে ২০ দিনার।" কাজি বললেন, "এ শিক্ষা তুমি কোথা থেকে গ্রহণ করেছো?" হাল্লাজ বললেন, "হজরত আবু বকরের (রা.) কাছে এ শিক্ষা পেয়েছি। তিনি তার জমানো ৪০ হাজার দিনারের সমুদয় আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের জন্য রাসুলের (সা.) পায়ের কাছে রেখে দিয়েছিলেন।" কাজি বললেন, "সে তো ২০ দিনারে ২০ দিনার হয়। তুমি আধা দিনার কোথা থেকে বাড়িয়ে দিলে?" হাল্লাজ বললেন, "বিশ দিনার জমিয়ে রাখার অপরাধে নিজের খরচ কমিয়ে আধা দিনার জরিমানা দিতে হবে–এটা আমার দৃষ্টিতে শরিয়াত সিদ্ধ।" তাঁর ব্যাখ্যা শুনে কাজি হতবাক হয়ে গেলেন; আমরাও হতবাক। তবুও চাপের মুখে হাল্লাজের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল। হাল্লাজের কথায়ও বুঝা যায় উদ্বৃত্ত রাখা যাবে না। উদৃত্ত না থাকলে বস্তুগত জাকাতের প্রশ্নও ওঠে না।

সূরা বাকারার ২১৯ আয়াতে (ক্রমিক-৩) উল্লিখিত উদ্বৃত্ত বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা দরকার। এ আয়াতে বলেছে উদ্বৃত্তের সমুদয় বা যা উদ্বৃত্ত থাকে তা ব্যয় করতে হবে। উদ্বৃত্তের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Surplus এবং এর সাধারণ সংজ্ঞা হলো–that which is left over; excess over what is required;

excess of revenue over expenditure. সাদামাটা কথায়, সারা বছর আয় থেকে খরচ মিটিয়ে বছরান্তে যা হাতে থাকে তা উদ্বৃত্ত বা surplus, সমাজতান্ত্রিক সমাজে এ surplus নিয়ে অনেক হৈ চৈ। surplus-ই শোষণের একমাত্র হাতিয়ার বলে তারা মনে করে। তাই রাষ্ট্রের মাধ্যমে surplus কাজে লাগানো ও equitable distribution-এ তারা বিশ্বাসী। আবার পুঁজিবাদী সমাজে বলা হয় surplus পুঁজি গঠনের প্রধান উপায়।

surplus না হলে অর্থনৈতিক উন্নতি স্থবির হয়ে পড়বে–অর্থনৈতিক উন্নতি না হলে কোন জাতি বা সমাজ ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না।

সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছে। এখন পবিত্র কুরআনের সুদ তথা রিবা সংক্রান্ত আয়াতগুলো নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

১. যারা রিবা খায় তারা শয়তানের স্পর্শে মত্ত ব্যক্তির ভঙ্গী ছাড়া দাঁড়ায় না। এটা এ জন্য যে, তারা বলে : বেচাকেনা তো রিবার মতো। কিন্তু আল্লাহু বেচাকেনা হালাল করেছেন এবং রিবা করেছেন হারাম। অতএব যার কাছে তার রবের উপদেশ এসেছে সে বিরত হয়েছে। তবে অতীতে যা হয়েছে তা আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। যারা পুনরায় আরম্ভ করবে। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে (২ : ২৭৫)।

২. আল্লাহ্ রিবা ধ্বংস করেন এবং বর্ধিত করেন সদকা এবং আল্লাহ্ সত্য আবরণকারী পাপীদেরকে ভালোবাসেন না (২ : ২৭৬);

৩. হে আমানুগণ, আল্লাহ্‌র তাকওয়া কর এবং রিবা থেকে যা বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর যদি তোমরা মোমিন হতে চাও (২ : ২৭৮)।

৪. যদি তোমরা (রিবা) ত্যাগ না কর তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা রইলো এবং যদি তোমরা তওবা কর তাহলে তোমাদের জন্য তোমাদের মালের মাথা (মূলধন) রইলো। তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিতও হয়ো না (২ : ২৭৯)।

৫. যদি (খাতক) দুর্দশাগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত (আসলের জন্য) অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা সদকা হিসাবে ছেড়ে দাও। তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝ (২ : ২৮০)।

৬. হে আমানুগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে রিবা খেয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হও (৩ : ১৩০)।

৭. ধন বৃদ্ধি পাবার জন্য তোমরা রিবায় যা দিয়ে থাক। আল্লাহ্ দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি নয়; কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে জাকাত দিয়ে থাক তা বৃদ্ধি পায় এবং ওরাই (যাকাত প্রদানকারী) সমৃদ্ধিশালী (৩০ : ৩৯)।

পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতগুলো স্বব্যাখ্যাত। রিবা ছাড়া বান্দার আর কোন পাপ কার্যের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। এ একটা কথাতেই রিবা যে কত বড় পাপ তা সহজেই অনুমেয়। যে রিবা এত বড় পাপ তা কী সে বিষয়টি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। রিবা আরবি শব্দ যার অর্থ হলো-বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, সম্প্রসারণ, প্রবৃদ্ধি, সুদ। সকল প্রবৃদ্ধি বা বৃদ্ধিকে রিবা বলা হয় না। শুধুমাত্র ঋণের সাথে সম্পৃক্ত বৃদ্ধি বা শর্ত হিসাবে অতিরিক্ত আদায়কে রিবা বলে। বাংলা ভাষায় রিবার প্রতিশব্দ হিসাবে সুদ শব্দ বহুল প্রচলিত। কারো কারো মতে, মানুষের মনের মধ্যে যে লোভ ও মোহ জন্মে তা লালন করাও রিবা। এ ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত ব্যাপক ও তাত্ত্বিক। সুদ শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে অবিকল বাংলা ভাষায় এসেছে। ফারসি ভাষায় সুদ অর্থ হলো লাভ যা এ গ্রন্থের অনেক গজলে ব্যবহৃত হয়েছে। সুদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো-interest or usury. আল্লামা ইউসুফ আলী আরো ব্যাপক অর্থে রিবার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন,

Usury is condemned and prohibited in the strongest possible terms. There can be no question about the prohibition. When we come to the definition of usury there is room for difference of opinion. Our Ulama, ancient and modern, have worked out a great body of literature on usury, based mainly on economic conditions as they existed at the rise of Islam. I agree with them on the main principles, but respectfully differ from them on the definition of usury. The definition I would accept would be-undue profit made, not in the way of legitimate trade, out of loans of gold and silver, and necessary article of food. My definition would include profiteering of all kinds, but exclude economic credit, the creature of modern banking and finance (Ali', p.-111),

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবে রিবা প্রথা চালু ছিল। তখন এক ধরনের মহাজন ঋণ দিতো এবং মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত আদায় করতো এবং তাতে আসলের পরিমাণ ঠিক থাকতো। আমাদের দেশেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দু মহাজন ও মুসলিম কাবুলিওয়ালার কথা সকলের জানা। যেহেতু রিবার প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলা

ভাষায় সুদ বহুল প্রচলিত সেহেতু আমরা এখানে সুদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করবো। সুদের বৈশিষ্ট্য হলো-

১. সুদের উৎপত্তি হলো ঋণ থেকে, সে ঋণ নগদ অর্থ হোক আর পণ্য সামগ্রী হোক;
২. ঋণের শর্ত হিসাবে সুদের ফলে আসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় (যেমন চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে);
৩. ঋণ ও সুদ যখন অত্যাচার বা শোষণের হাতিয়ার হয়।

পবিত্র কুরআন এবং সুন্নায় রিবা বা সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এতে আমাদের সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দু নেই। যে কোন লেনদেনে ওপরের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে তা সুদ হয়ে যাবে। আমরা বিষয়টির সূত্রপাত করেছিলাম ব্যাংক সুদ জায়েজ কিনা তা আলোচনার জন্য। আমরা ব্যাংকে যে টাকা গচ্ছিত রাখি তা ঋণ নয়–আমানত। আবার ব্যাংক তার কাছে গচ্ছিত আমানতসমূহ ব্যবসায়, শিল্প ও কল-কারখানায় ঋণ হিসাবেই দিয়ে থাকে। এ ঋণ থেকে ব্যাংক একটা নির্ধারিত হারে সুদ পায়। অবশ্য ব্যাংক এটাকে বিনিয়োগও বলে। ঋণ গ্রহীতা ব্যাংক যে হারে সুদ দেয় তার অনেক বেশি লাভ করেন। লাভ না করলেও তাকে ব্যাংকের নির্ধারিত আসল ও সুদ পরিশোধ করতে হয়। ঋণের পিছনে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক থাকে। বিষয়টি গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখার জন্য পাঠকদের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

হজের হাকিকত

রাসূল (সা.) বললেন] হে উমর, দৃঢ় বিশ্বাস রেখো যে, ইনসানের দেল খানায়ে কাবা এবং মোমিনের দেল আল্লাহ্‌র আরশ। এ দেল-কাবার হজ করা প্রয়োজন। হজরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল, দেল-কাবার হাজ কিভাবে সম্পন্ন করতে হয় ? উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, 'ইনসানের অজুদ দরজা বিশিষ্ট (আব, আতশ, খাক ও বাদ)। এ চারটা দরজা থেকে সকল প্রকার সন্দেহ, গোমরাহি ও গায়রুল্লার পর্দা দূরীভূত করলে দেলরূপ আয়নায় আল্লাহ্ জাতের জলোয়া প্রত্যক্ষ নজরে আসবে। এটাই খানায়ে কাবার হজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । এ রকম হাকিকী হজের আরো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য হলো-ইনসান স্বীয় হাস্তীকে এমনভাবে মিটিয়ে ফেলবে যেন হাস্তীর কোন নাম-গন্ধও অবশিষ্ট না থাকে। এ পর্যায়ে তার জাহের ও বাতেন সমভাবে পবিত্র হয়ে যাবে এবং তার দেল আল্লাহ্‌র গুণে (সিফাতে) গুণান্বিত হবে। হজরত উমর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা স্বীয় হাস্তী কেমন করে নিস্‌ত করবো? উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, মাহবুবে হাকিকী অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আশেক হলেই আপন হাস্তী ফানা করা সম্ভব। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আশেক হয়েছে সে ফানা ফিল্লাহ্ প্রাপ্ত হয়েছে এবং সে খোদার জাতের মাযহার হয়ে গেছে।

এরপর হজরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "মোমিনের দেলকে খানায়ে কাবা ও আরশে এলাহি কেন বলা হয়েছে ? উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, 'পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র বলেছেন, আমি তোমাদের নফসের সাথে মিশে আছি, তোমরা কি দেখতে পাও না (৫১২২)। হে উমর, থাকার স্থানকে ঘর বলে এবং যেহেতু আল্লাহ্ দেলে অবস্থান করেন। সেহেতু দেলকে খানায়ে খোদা বা আরশুল্লাহ আখ্যা দেয়া হয়। হজরত উমর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এ খাকজাত দেহে কে কথা বলে, কে শ্রবণ করে এবং কে-ই বা সবকিছু অবগত হয়, আর সে কিরূপ ?" রাসূল (সা.) উত্তর করলেন, খাকজাত দেহে একমাত্র খোদাই বাক্যকারী, শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও সর্ব বিষয়ে জ্ঞান দানকারী।" এবার হজরত উমর (রা.) বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনিই কি সে-ই পাক জাতের মাযহার নন?" উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, 'আনা আহমাদু বিলা মিম' অর্থাৎ আমি "মিম ব্যতীত আহমদ।

এরপর হজরত উমর (রঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "কাবায়ে দেলের হজ কে সমাধা করে?" রাসূল (সা.) উত্তরে বললেন, "কাবায়ে দেলের হজ একমাত্র খোদ মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র সত্তা সমাধা করে থাকে। অর্থাৎ বান্দা যখন নফসের বন্দেগিরূপ পর্দা দূর করে দেয় এবং আবেদ ও মাবুদের মধ্যে যখন কোন পর্দা অবশিষ্ট থাকে না তখন সে সিফাতে এলাহিতে সামিল হয়ে যায় এবং তখন তার দেলে জাতে এলাহি প্রকাশ পায় । বান্দার দেলে আল্লাহ্‌র জাতের প্রকাশ হওয়াই কাবায়ে দেলের হজ বা হাকীকি হজ। হজরত উমর জিজ্ঞেস করলেন, "যখন সবকিছুই ওই এক পবিত্র জাতের মাযহার তখন এ রাহনামাযড় (পথ প্রদর্শন) কার জন্য এবং কেন?" রাসূল (সা.) উত্তর করলেন, "তিনি নিজেই রাহনামা এবং নিজেই নিজের রাহনামায়ি করছেন।" হজরত উমর (রা.) পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "তা হলে দুনিয়াতে এত বিচিত্র রঙ ঢঙ ও গুণ-গরিমার প্রকাশ কেন?" উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, "রাহনামার উপমা সওদাগরের সাথে তুলনীয়। সওদাগরের কাছে খদ্দের (ক্রেতা) যে জিনিস চায় সওদাগর ঠিক সে জিনিস তাকে দেবে। গমের খদ্দেরকে যব কখনো কোন সওদাগর দেবে না। হে উমর, পয়গম্বরগণের মেছাল চিকিৎসকগণের ন্যায়। চিকিৎসক রোগী ও রোগের বিচার করে উপযুক্ত ঔষধ দেয় এবং তাতে রোগী আরোগ্য লাভ করে। একইভাবে পয়গম্বরগণও মানুষের রুহানি ব্যাধি স্বীয় বাতেনি জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করে মারেফতেরূপ উপযুক্ত ঔষধ প্রদান করেন;

যার বরকতে মানুষ রুহানি ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করে আরেফে এলাহি হতে পারে। হে উমর, সালেকানে তরিকতকে চারটি দলে বিভক্ত করা যায়। এ চারটি দলের মধ্যে জ্ঞানে-গুণে পরস্পরকে বিচার করলে আকাশ-পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম দল হলো- আওয়ামুল আলম বা আম (সাধারণ) মুসলিম। এরা জাহের পরস্ত এবং এরাই রাহে শরিয়তের সিঁড়িতে চলার দাবিদার। এশকে এলাহির পথে চারটি সিঁড়ির প্রথম সিঁড়িতে এদের অবস্থান। এরা যদি পরবতী মারেফাতের সিড়ি অতিক্রম করার চেষ্টা না করে তবে দ্বিন-দুনিয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহেরপরস্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। এ দলকে আহলে শরিয়ত বলা হয়। দ্বিতীয় দল হলো। আওয়ামুল খাস। এ দলে আওয়াম ও খাসউভয়বিধ গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। এরা রুহানিয়াতের দিকে আকৃষ্ট, কিন্তু রমুজে রুহানিয়াত সম্পর্কে অজ্ঞ। এরা কখনো দুনিয়ার দিকে আবার কখনো দ্বিনের দিকে আকৃষ্ট হয়। এজন্য এদের বাতেনি চক্ষু নুরে বাতেনি দ্বারা পরিপূর্ণভাবে আলোকিত হয় না। এরাই আহলে তরিকত বলে পরিচিত। তৃতীয় দল হলো খাস ব্যক্তিগণ। এরা শুধু দ্বিনের প্রতি আকৃষ্ট এবং এদের বাতেনি চক্ষু নুর দ্বারা আলোকিত। এরাই আহলে হাকিকত। চতুর্থ দল হলো অতি খাস। এদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্র পবিত্র জাতের মজুদ এরা সর্ব অবস্থায় দর্শন করে এবং মনে-মুখে-দোলে বিশ্বাস করে। সর্বপ্রকার কলুষতা, গরুরি ও গায়রুল্লার পর্দা এরা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। দুধের মধ্যে চিনি মেশানো হলে তা যেভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, এরাও সে রকম আল্লাহ্র জাতে ডুবে স্বীয় হাস্তীকে ফানা করে বাকাবিল্লাহ প্রাপ্ত হয়। এরাই আহলে মারেফাত । হে উমর, তালেবের গ্রহণ ক্ষমতা ও যোগ্যতা বিবেচনা করেই রাহনামাযড় ও হেদায়েত করতে হয়। আসরারে এলাহিরূপ মহা-নিয়ামত সাধারণ্যে দান করা যায় না। সাধারণ মানুষ এ নিয়ামতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে পারবে না এবং তারা এর গুরু দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম হবে না। ফলে এর অসম্মান ও অপব্যবহার হবার সম্ভাবনা বেশি এবং অবশেষে মানুষ গোমরাহিতে পতিত হতে পারে। হজরত উমর (রা.) এবার জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, জাতে রহমান কী, আর বস্তুই বা কী? রাসূল (সা.) উত্তরে বললেন, যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্র মায্হার। হাকিকতে সবকিছুই এক; কিন্তু প্রকাশের সিফাত ভিন্ন ভিন্ন। যেমন কোন একটা বিষয় সম্বন্ধে মতলব বা উদ্দেশ্য এক, কিন্তু তা কার্যে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার পন্থা অবলম্বন করা হয়। একইভাবে জাত এক হলে জাতের মায্হাব সহস্রভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। কিন্তু তিনি ইনসানকে সমস্ত মাখলুকের ওপর বুজুর্গি ও সম্মান দান করেছেন।" আল্লাহ্ আরো বলেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে নিজ সুব্রত, নকশা, পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী সৃজন করেছেন। হজরত উমর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যখন আল্লাহ্ ইনসানকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করেছেন এবং তাকে সম্মান ও বুজুর্গ দান করেছেন তখন তাদের মধ্যে খাস, আম, কাফের, মুসলিম হবার কারণ কী? রাসূল (সা.) বললেন, এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন যে, আমি তাদের পরস্পরকে পরস্পরের ওপর ফজিলত দান করেছি এবং প্রত্যেক নফসই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিন্তু তাদের মৃত্যু এমনভাবে হওয়া চাই যেন মৃত্যু একটা পুল এবং আল্লাহ্ সন্ধানী এ পুল অতিক্রম করে ওয়াসেলে (মিলন) এলাহি প্রাপ্ত হয়। হে উমর, মোমিন হিসাবে গণ্য হবার দরজা হলো ইসলামের পাঁচ রোকন। এ রোকনগুলোর হাকিকত ব্যাখ্যা করে তোমাকে বললাম। বর্তমান অবস্থায় তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট। তুমি আরো অধিক অগ্রসর হলে তোমার ভেতরেই তুমি যাবতীয় সিফাত এবং আসরারে মাযহার ও মজুদাত দেখতে পাবে। যে ব্যক্তি নিজকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকেও চিনতে সমর্থ হয়েছে।

প্রিয় কুতুব উদ্দিন, রাসূল (সা.) হজরত উমরকে (রা.) প্রদত্ত এসব অমূল্য উপদেশাবলী আজ পর্যন্ত রাজে মাখফির (রহস্য জগতের) অন্তর্গত পুশিদা (রহস্যাবৃত) ছিল। আমি রাজে মাখফির হুকুম মোতাবেক সবকিছু তোমাকে লিখে দিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তুমি এগুলোর ওপর এতেবার ও একরার (আস্থা ও স্বীকার) করে তদনুযায়ী আমল করবে। জাহেরি উলামাগণের সাথে এসব নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করো না। তাদের এলাজ (চিকিৎসা) খোদ আল্লাহ্ই করতে সমর্থ। কারণ সমস্ত কিছুর ওপর আল্লাহ্ শক্তিশালী। তাঁর বিনা হুকুমে কোন কিছুই নড়া-চড়া করতে পারে না। এর ওপর সকল মুসলিমের এতেকাদ (বিশ্বাস) থাকা প্রয়োজন এবং এটাই ইমান। বাদ আস্সালাম।

টীকা:

১। হজ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। এটা শুধুমাত্র তার জন্য অবশ্য কর্তব্য যে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রাখে। কুরবানি হজের একটা বিশেষ মানসিক বা করণীয় বিষয়। পবিত্র কুরআনে হজ ও কুরবানি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

১. সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং কেউ এ ঘরের (কাবা) হজ অথবা উমরা করে এ দুটির মধ্যে যাতায়ত করলে তার কোন পাপ নেই (২ঃ১৫৮);

২. তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ ও উমরা সুসম্পন্ন কর; কিন্তু যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও তবে সহজ লভ্য কুরবানি করো এবং যে পর্যন্ত কুরবানির পশু স্বস্থানে না পৌছে সে পর্যন্ত মাথা মুন্ডন করো না। যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা মাথায় ক্লেশ থাকে। তবে সিয়াম কিংবা সদকা অথবা কুরবানি দ্বারা ফিদয়া দেবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যে ব্যক্তি হজের সাথে উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানি করবে। কুরবানি পাওয়া না গেলে হজের সময় তিন দিন এবং গৃহে ফিরে সাত দিন–পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করবে। এটা তাদের জন্য যাদের পরিবার পরিজন মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয় (২:১৯৬);

৩. হজের মাসগুলো সুবিদিত। এরপর যে এ মাসগুলোতে হজ করা স্থির করে তার জন্য হজের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর আল্লাহ্‌ তা জানেন। তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে কোন পাপ নেই। যখন তোমরা আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। তখন মাশারুল হারামের কাছে পৌছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে। এরপর অন্যান্য লোক যেখানে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এরপর যখন হজের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে। তখন আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করবে। যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতৃ-পুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা অধিকতর (২৪.১৯৮-২০০);

৪. তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। যদি কেউ দু দিনে চলে আসে। তবে তাতে কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তাতেও কোন পাপ নেই। এটা তার জন্য যে তাকওয়া করে (২ঃ২০৩);

৫. মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, ওটা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। ওতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্রাহিম এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ।। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাবার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌ উদ্দেশ্যে ওই গৃহের হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য। কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্‌ বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নন (৩ঃ৯৬-৯৭);

৬. হে আমানুগণ,.....ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করবে না। তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানির পশুর (কুরবানির চিহ্ন স্বরূপ) গলায় মালা পরানো এবং রবের সন্তোষ লাভের আশায় বায়তুল হারাম অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করো না। তোমরা ইহরাম মুক্ত হলে শিকার করতে পার..... (৫ঃ১-২);

৭. হে আমানুগণ, তোমরা ইহরামে থাকা কালে শিকারের জন্তু বধ করো না, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বধ করলে তার বিনিময় হবে অনুরূপ চতুষ্পদ জন্তু যা কুরবানিরূপে কাবা পর্যন্ত পৌছতে হবে এবং সে ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক। অথবা তার কাফফারা হলো মিসকিনকে খাদ্য দান কিংবা সম সংখ্যক সিয়াম পালন করা। তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে। তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। পবিত্র গৃহ কাবা, পবিত্র মাস, কুরবানির জন্য কাবায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে আল্লাহ্‌ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন... (৫ঃ৯৫-৯৭);

৮. এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহিমের বসবাসের জন্য নির্ধারণ করেছিলাম এ গৃহের স্থান তখন বলেছিলাম, 'আমার সাথে কোন শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তওয়াফ করে, (সালাতে) দাঁড়ায়, রুক করে ও সিজদা করে। মানুষের কাছে হজের ঘোষণা করা যেন তারা তোমার কাছে পদব্রজে, শীর্ণকায় উটে চড়ে ও দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে আসে এবং যাতে তারা কল্যাণময় স্থানসমূহে উপস্থিত হতে পারে। এরপর তোমরা তা থেকে আহার করো, দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও (২২ঃ২৬-২৮);

৯. এরপর তারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে ও মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে। কেউ আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করলে তার রবের কাছে তার জন্য এটাই উত্তম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, নিশ্চয় তার এ কাজকে আন্তরিক তাকওয়া বলে গণ্য করা হবে। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এসব আনআ'মে (কুরবানির পশু) তোমাদের জন্য উপকার আছে। এরপর তাদের কুরবানির স্থান প্রাচীন গৃহের কাছে (২২ঃ২৯-৩০ ও ৩২-৩৩);

১০. আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানির নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছি যেন তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে সেগুলোর ওপর যা জীবনোপকরণ স্বরূপ চতুষ্পদ জন্তু থেকে দান করা হয়েছে (২২ঃ৩৫);

১১. এবং উষ্ট্রকে করেছি আল্লাহ্ নিদর্শনসমূহের অন্যতম; ওগুলোতে তোমাদের জন্য মঙ্গল নিহিত আছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায় ওদের ওপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর । যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা ওটা থেকে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্ত ও যাচনাকারী অভাবগ্রস্তকে। ওগুলোর মাংস ও রক্ত আল্লাহ্র কাছে পৌছায় না। বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া (২২ঃ৩৬-৩৭);

১২ (ইব্রাহিম বললো) "হে আমার রব, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান কর।" তখন আমরা তাকে এক ধৈর্যশীল ও প্রতিভাবান পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। যখন সে পিতার সাথে প্রচেষ্টা গ্রহণের বয়সে উপনীত হলো তখন ইব্রাহিম বললো, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি। এখন তুমি চিন্তা করে তোমার অভিমত বল।" সে বললো, "হে আমার পিতা, আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা করুন; ইনশাল্লাহ। আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।' যখন তারা উভয়ে আত্মসমর্পণ করলো এবং ইব্রাহিম তাকে জবাই করার জন্য কপালের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দিল তখন আমরা তাকে আহবান করে বললাম, 'হে ইব্রাহিম, তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যে পরিণত করেছো।" এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা এবং এক মহান কুরবানি দ্বারা তার ফিদয়া (মুক্তিপন) দিলাম এবং আমরা পরবতীগণের মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করলাম (৩৭ঃ,১০০-১০৮) ।

হজ ও কুরবানি বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ ওপরে উল্লেখ করা হলো। পবিত্র কাবাকে কেন্দ্র করেই হজ অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে, হজরত ইব্রাহিম (আ.) কাবার প্রতিষ্ঠাতা। পবিত্র কুরআন (৩৪৯৬) ও হাদিস মতে হজরত ইব্রাহিম কাবার পুনঃনির্মাতা। তিনি এ স্থানে গৃহ নির্মাণের পূর্বেও এখানে গৃহাকারের একটা কাঠামো মজুদ ছিল এবং গৃহটি ধ্বংস প্রাপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। ইব্রাহিম (আ.) তাঁর শিশু পুত্র ইসলামইল ও স্ত্রী হাজেরাকে মক্কায় রেখে বিদায়ের প্রাক্কালে বললেন, "হে আমার রব, আমি আমার বংশের একাংশকে তোমার পবিত্র গৃহের কাছে অকৃষিযোগ্য উপত্যকায় ছেড়ে গেলাম' (১৪ঃ৩৭)। এতে বুঝা যায় যে, পবিত্র গৃহটি ওই সময় সেখানে ছিল যা কিছুদিন পর ইব্রাহিম (আ.) সংস্কার করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণের অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কাবা ঘর হজরত আদম (আ.) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল এবং এটাই পৃথিবীর বুকে নির্মিত প্রথম উপাসনালয়। কালের আবর্তনে এটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ্র ওহি দ্বারা অবগত হয়ে তাঁর পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে এ পবিত্র ঘর সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে কাবার বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা নির্দেশক বেশ কটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- আমার গৃহ (২ঃ১২৫; ২২ঃ২৬), পবিত্র গৃহ (১৪ঃ৩৭; ৫ঃ২), পবিত্র মসজিদ (২ঃ১৫০; ১৭:৪১), এ গৃহ (২২ঃ২৯,৩৩), সদা আবাদ গৃহ (৫২ঃ৪), পুন:পুন: মিলন কেন্দ্র (২ঃ১২৫), নিরাপদ স্থান (২ঃ১২৫)।

হজের বাহ্যিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আমরা কম বেশি অবগত আছি। হজ মুসলিম উম্মার সব চাইতে বড় সম্মেলন। এ সম্মেলনে মুসলিম উম্মার মিথস্ক্রিয়ার (Interaction) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধমীয় সুফল অপরিসীম। কিন্তু হজের বাতেনি (inner) উদ্দেশ্য হলো আত্মদর্শন। এ আত্মদর্শনের চূড়ান্ত পর্যায়ে তত্ত্বদর্শনের সৌভাগ্য ঘটে। এ চূড়ান্ত পর্যায়টি হলো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান মুর্শিদ মুহাম্মদের (সা.) কাছে হাজির হওয়া। তাই তো খাজা মুঈনউদ্দিন চিশতি বলেছেন যে, মানুষের মন থেকে সকল প্রকার সন্দেহ, গোমরাহি, গায়রুল্লার পর্দা ও খুদি দূরীভূত করলে অন্তরে আল্লাহ্রজাতের জলোয়া প্রতিভাত হয়। আমরা আগেই বলেছি যে, আমাদের সপ্ত ইন্দ্রিয় পথে বিষয়রাশি (Phenomena) প্রবেশ করে। এর মধ্যে কু বা মন্দ বিষয়রাশি আমাদেরকে-আমাদের অন্তর ও আত্মাকে কলুষিত করে তোলে। ফলে আমরা পাপে জড়িয়ে পড়ি এবং রসাতলে চলে যাই। এ বিষয়রাশি আমাদের মধ্যে প্রবেশের প্রাক্কালে তাকে যাচাই-বাছাই করা হলো সালাত, তাকে প্রতিরোধ করা হলো সিয়াম, তাকে বিতাড়িত করা হলো জাকাত। কিন্তু বিতাড়িত হলেও কু বিষয়রাশি আবার আসতে পারে। তাই হজ বা আত্মদর্শনের মাধ্যমে তত্ত্বদর্শনে উন্নীত হয়ে কু বিষয়রাশিকে চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করে জবাই করে দেয়া হলো কুরবানি। এতে কু বিষয়রাশি আর আগমন করতে সক্ষম হবে না। সে কারণে হজের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হলো কুরবানি এবং সে কারণেই আমরা পশু কুরবানির সময় যে দোয়া পড়ি তার অর্থ হলো ঃ "হে আল্লাহ্, অমুকের পুত্র/কন্যা অমুকের (নিজে জবাই করলে বলতে হয় 'আমার) সালাত, ভালোবাসা, কুরবানি তোমারই জন্য। এ পশু কুরবানির মাধ্যমে সকল কু প্রবৃত্তিকে কুরবানি করা হলো। তুমি কবুল কর। পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে জবাই করছি আল্লাহু আকবর।"

হজরত ইব্রাহিমের (আ.) সময় হতে কুরবানির প্রচলন হয়। এর পূর্বে কুরবানি ছিল কিনা জানা যায় না। ইব্রাহিমের (আ.) কুরবানি সূরা সাফফাতের ১০০-১০৮। আয়াতে (৩৭ঃ১০০-১০৮) বিবৃত হয়েছে। হজরত মুসার (আ.) কুরবানি সূরা বাকারার ৬০-৭১ (২ঃ৬০-৭১) আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ইব্রাহিমি দ্বিনের অন্যান্য নবিরাও কুরবানি

করতেন বলে তাওরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য নবিদের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। তবে কুরবানির দর্শন পরিপূর্ণরূপে ইসলামে বিকশিত হয়েছে। ইসলামি জিন্দেগির সকল কর্মকান্ড ও আমল কুরবানির দিকে প্রধাবিত। কুরবানি বা উৎসর্গ ইসলামের চূড়ান্ত রূপ এবং মানব জীবনের উৎকর্ষ। ইসলামের সকল শিক্ষা, আমল ও ইবাদত
মানুষকে একটা কেন্দ্রবিন্দুর দিকে নিয়ে যায়; আর তা হলো খুদি বা হাস্তী বা আমিত্বকে, সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তি বা ষড়রিপুকে জবাই বা কুরবানি করা। এ কুরবানির ফলে মানুষ হয়। সত্যিকারের মুসলিম। আর মুসলিমের সমাজ হয় শান্তিময়, সুখময় ও পরমানন্দের যাতে মানুষ স্বর্গ সুখ ভোগ করে।

পত্রাবলী

পত্র-১

আমার প্রাণ ও হৃদয়ের বন্ধু, আমার ভাই খাজা কুতুবুদ্দিন দেহলবি,

আল্লাহ্ তোমাকে দোজাহানের সৌভাগ্য প্রদান করুন। বান্দা মিসকিন মুঈনুদ্দিনের সালাম জানবে। পর সমাচার এ যে, আসূরারে এলাহি (আল্লাহ্তত্ত্ব) সমন্ধে যা কিছু লিখছি তা তোমার সত্যিকার মুরিদগণকে ও সত্যপথ অনুসন্ধানকারীদের বেশ ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবে। তারা যেন ভুল পথে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রেখো। আজিজেমান (আমার প্রিয়), যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে চিনতে সক্ষম হয়েছে সে কখনো কোন সওয়াল জবাব ও খাহেশ বা আরজু, পেশ করবে না। যে ব্যক্তি এখনো আল্লাহ্কে জানতে সক্ষম হয় নি সে ব্যক্তি এ কথার ভেদ উপলব্ধি করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত হেরেস ও হাওয়াকে (লোভ ও লালসা) যে ব্যক্তি দূরীভূত করতে পেরেছে সে সফলকাম হয়ে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছতে পেরেছে। এ রকম ব্যক্তির জন্যই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "যে স্বীয় নাফসকে যাবতীয় খাহেশ থেকে নির্লিপ্ত করেছে সে বেহেশতে তার স্থান করে নিয়েছে। যাদের হৃদয়কে মহিমান্বিত আল্লাহু বিমুখ করে দিয়েছেন তাদেরকে খাহেশে শাহওয়াতের (কাম প্রবৃত্তি) নর্দমায় চির নিমজ্জিত করেছেন। সুলতানুল আরেফিন খাজা বায়জিদ বোস্তামি বর্ণনা করেছেন যে, এক রাতে তিনি স্বপ্নযোগে মহিমান্বিত আল্লাহ্র দিদার লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্ তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হে বায়জিদ, তুমি কী চাও? উত্তরে বায়জিদ বলেছিলেন, "তুমি যা চাও হে আমার রব, আমিও তা-ই চাই।" তখন মহিমান্বিত আল্লাহ্ বললেন, "হে বায়জিদ, তুমি যেভাবে আমার হয়ে গেছ, আমিও সেভাবে তোমার হয়ে গেলাম।"

কুতুবুদ্দিন, যদি তাসাওফের মহাজ্ঞানে জ্ঞানী হতে চাও তবে বাহ্যিক সুখ-সম্পদের আশা পরিত্যাগ কর এবং মহাসম্পদশালী চিরশান্তি ও আরামদাতা পরম সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা লাভ করার উদ্দেশ্যে একাগ্র চিত্তে অবিশ্রান্ত কোশেশ কর। যদি তুমি এটা করতে পোর তবে জেনো, তুমি তাসাওফের আলেম হয়েছ। নফসজাত আরাম আয়েশের আকাঙ্খা করা তালেবে মাওলার পক্ষে একেবারেই অনুচিত। তালেবে মাওলার হৃদয়ে এ খেয়াল বিদ্যমান থাকলে সে শয়তানের ধোকা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে এবং এতে তার লক্ষ্যে পৌছা সহজ হবে।
একদিন আমার পির দস্তগির খাজা উসমান হারুনি বললেন, "মুঈনুদ্দিন, তুমি কি অবগত আছে, সাহেবে হুজুর কাকে বলে? সাহেবে হুজুর হলো ওই ব্যক্তি, যে সর্বদা মাকামে অবুদিয়াতে মশগুল থাকে এবং যাবতীয় ঘটনাবলী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সংঘটিত হচ্ছে বলে বিশ্বাস করে এবং তাতেই রাজি থাকে।" যা কিছুই সংঘটিত হোক না কেন তা আল্লাহ্ তরফ থেকে রহমত স্বরূপ সে মনে করে। সকল এবাদতের উদ্দেশ্য এটাই। যে ব্যক্তি এ রকম মানসিক ও আত্মিক অবস্থা অর্জন করতে পেরেছে সে দোজাহানের বাদশাহ-এমন কি দোজাহানের বাদশাও তার মোহতাজ। অন্য একদিন আমার রওশন জামির (বাতেন আলোকদাতা) পির দস্তগির খাজা উসমান হারুনি বললেন, 'অনেক দরবেশ আছে যারা বলে যে, তালেবের কামেলিয়াত হাসিল হলে তার কোন ভয় থাকে না। এ কথাটা ভুল। আবার অনেক দরবেশ বলে যে, তালেবের কামেলিয়াত হাসিল হলে তার এবাদত করার প্রয়োজন হয় না। তাদের এ কথাটিও ভুল। কারণ সরোয়ারে কায়েনাত রহমাতাল্লিল আলামিন রাসূল (সা.) সদা সর্বদা আল্লাহ্র এবাদত ও ধ্যানে মশগুল থাকতেন।" এতো অবিশ্রান্ত কামাল (পরিপূর্ণ) এবাদত করেও তিনি বলতেন, "আমি তোমার সে রকম এবাদত করতে সক্ষম হই নি যে রকম করা উচিত ছিল।" শাফিয়ে রোজে মহাশার হয়েও তিনি নেহায়েত আজিজি ও এনকেসারি সহকারে সমগ্র মাখলুকের উদ্ধারের মহামন্ত্র কলেমা তৈয়াবা (লা-ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লা) শয়নে-স্বপনে-জাগরণে শত কাজের ভেতরও সর্বদা পাঠ করতেন।"
কুতুবুদ্দিন, স্মরণ রেখো, যথাযোগ্য এবাদত ও রিয়াজত ব্যতীত কোন আরেফ কামেলিয়াতের দরজায় পৌছতে পারে না। বিশেষ করে সত্যিকারভাবে নামায আদায় না করলে আল্লাহ্র হুজুরি ও আগাহি (সীমাপ্য ও তত্ত্ব) বৃদ্ধি পায় না। আর এ নামাযই হলো প্রকৃত অর্থে মিরাজ। যে ব্যক্তি এ গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করে সিন্দুক দেলে প্রকৃতভাবে নামায আদায় করে তার এমন পিপাসা অনুভূত হবে যেন সে আগুনের উত্তপ্ত পেয়ালা

পান করেছে। এ রকম -পেয়ালা পানকারী এশকের জলোয়াতে উনমত্ত হয়ে জামালিয়তের (সৌন্দর্যের) অপার সমুদ্রে সর্বদা সন্তরণ করতে থাকবে। এ সময় তার সকুন (শান্তি) বেসকুনি এবং আরাম বে-আরাম হয়ে যায়। ওয়াসসালাম।

খাজা মুঈনউদ্দিন চিশতি বলেছেন;

হারু ব'র কে দার নাম'ন্য মশগুল শাভাম
চোন দূস্ত হোয়ুর নীসূত আন নীসূত নামায ।

(অর্থঃ প্রতিবার নামাযে আমি মশগুল হই, নামাযে বন্ধু উপস্থিত না থাকলে তা নামায নয় (চিশতি ৩৬, পৃ: ২৭)

আউলিয়াদের জীবনী গ্রন্থে দেখা যায় কোন বিশেষ কারণে তাঁরা কখনো হয়তো শরিয়তের সামান্য ব্যত্যয় করেছেন। কিন্তু এ ব্যত্যয়ের যে কাফফারা তারা দিয়েছেন তা কোন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; যেমন-খাজা বায়জিদ বোস্তামি এক রমজান মাসে তাঁর পিছনে পিছনে ধাবমান জনতাকে বিতাড়িত করার জন্য দোকান থেকে খাবার নিয়ে প্রকাশ্যে খেতে লাগলেন। জনতা এটা দেখে ছিছি। করে তার কাছ থেকে সরে পড়েছিল। এ একটা রোজার জন্য তিনি তিন মাস ক্রমাগত রোজা রাখেন এবং কখনো এক সেহেরিতে তিন দিনও ছিলেন। বায়জিদের এ কাজটির অর্থ এ নয় যে, তিনি শরিয়ত মানতেন না। এটা ছিল তার একটা কৌশল। অথচ ভন্ডগণ এ কৌশলকে পুঁজি করে রোজা রাখে না। আবার কিছু কিছু সংসার ত্যাগী মজ্জুব দরবেশ রয়েছে যারা শরিয়াত পালন করে না। এরা তো স্বাভাবিক মানুষ নন। এরা আল্লাহ্ ও রাসুলের প্রেমে দেওয়ানা (পাগল) হয়ে গেছে। পাগলের জন্য শরিয়তের বিধান শিথিল করা হয়েছে। যার আত্ম জ্ঞান নেই-ভালো-মন্দ বুঝার জ্ঞান লোপ পেয়েছে তার জন্য শরিয়তের বিধান শিথিল। তাইতে রাসূল বলেছেন "লা-ইফতা আলাল আশেকিন' অর্থাৎ আমার প্রেমিকদের জন্য তোমরা ফতোয়া দিয়ে না। ব্যতিক্রম সব সময় ব্যতিক্রম। এটা Generalise হতে পারে না। তাই এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, শরিয়তের কোন ব্যত্যয় করা যাবে না। শরিয়তের ব্যত্যয় করার কথা যারা বলে তারা ভন্ড-তারা মানুষকে গোমরাহির দিকে আকর্ষণ করে। এদেরকে প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

পত্র-২

দরদমান্দ তালেব (ব্যথিত অন্বেষণকারী), আরজুমান্দ ওয়া এস্তিয়াকে শওকে দিদারে এলাহি (আল্লাহ্র দিদারের আগ্রহী ও আশাবাদী), দরবেশে জাফাকেশ (অত্যাচারিত দরবেশ), ভাই খাজা কুতুবুদ্দিন দেহলবি, আল্লাহ্ তোমাকে দোজাহানের সৌভাগ্য দান করুন। - আমার সালাম জানবে। পর সমাচার এ যে, একদিন আমার হাদিয়ে রওশন জামির খাজা উসমান হারুনির খেদমতে খাজা নজমুদ্দিন ছোগরা, খাজা মুহাম্মদ তারেক ও এ অধম উপস্থিত ছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এটা কী করে অবগত হওয়া যায় যে, কার কোরূবে এলাহি (আল্লাহ্র নৈকট্য) হাসিল হয়েছে?" খাজা উসমান হারুনি জবাবে বললেন, 'নেক আমল করার ক্ষমতা লাভ করাই এর বড় দলিল।" নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, যে ব্যক্তি নেক আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে তার সামনে কোরূবে এলাহির দরজা খুলে গেছে। এক ব্যক্তির একটা ক্রীতদাসী ছিল। ক্রীতদাসীটি প্রতিদিন গভীর রাতে জাগরিত হয়ে অজু করে দুরাকাত নফল নামায আদায় করতো। এটা তার প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল। নামায শেষে সে মোনাজাত করে বলতো, "হে খোদা, আমি তোমার নৈকট্য লাভ করেছি। আমাকে তোমার এ নৈকট্য থেকে কখনো দূরে সরিয়ে দিয়ো না।" একদিন ক্রীতদাসীটির প্রভু তার এ রকম প্রার্থনা শুনে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কিভাবে অবগত হলে যে, তুমি খোদার নৈকট্য লাভ করেছো।" জবাবে সে বললে, "যখন খোদা আমাকে প্রতিদিন অর্ধরাতে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিয়ে দুরাকাত নামায আদায় করার তৌফিক দান করেছেন তখন এটা বেশ উপলব্ধি করতে পারি যে, আমি তাঁর নৈকট্য লাভ করেছি।" একথা শ্রবণ করার পর লোকটি তার ক্রিতদাসীটিকে আজাদ করে দিয়েছিল। অতএব ইনসানের একান্ত কর্তব্য হলো, সে দিবারাত্র আল্লাহ্ এবাদত বন্দেগিতে মশগুল থেকে নেক বান্দাগণের দফতরে স্বীয় নাম সন্নিবেশিত করে লয় এবং নফস ও শয়তানের ধোকাবাজি থেকে রক্ষা পায় । ওয়াসসালাম।

পত্র-৩

ওয়াকেফে আসরারে আল্লাহুস সামাদ (অদ্বৈতের রহস্য সম্পর্কে অবহিত), মাহেরে আনোয়ারে লাম ইয়ালিদ ওয়া লামইউলাদ (লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদের নূরে অভিজ্ঞ), ভাই খাজা কুতুবুদ্দিন দেহলবি, আল্লাহ্ তোমার মাদারেজ (মর্যাদা) বর্ধিত করুন। ফকীর মুঈনুদ্দিন সঞ্জরির খুশি, শওক, জওক ও মহব্বত ভরা সালাম জানবে। জাহেরি সিহাতের (বাহ্যিক সুস্থতা) দরুণ মশকুর (কৃতজ্ঞ) আছি। আল্লাহ্ তোমাকে সিহাতে দারায়েন (উভয় জগতের সুস্থতা) বখশিশ করুন।

ভাই, আমার শায়েখ খাজা উসমান হারুনি বলেছেন যে, আহলে মারেফাত ব্যতীত অন্য কাউকে রুমুজে এশক (প্রেমের রহস্য) সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা অনুচিত। একদিন শেখ সাদী আমার হাদিয়ে রওশন জামির পিরে দস্তগিরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আহলে মারেফাতকে কী উপায়ে চিনতে পারা যায়?" উত্তরে তিনি বলেছেন, "আহলে

মারেফাতের পরিচয় হলো তরক (ত্যাগ)।" কুতুবুদ্দিন, মনে রেখো, যে ব্যক্তি তরক এখতিয়ার করতে পেরেছে সে মারেফাত দলভুক্ত হয়েছে এবং সে খোদাতত্ত্ব হাসিল করেছে। যে তরক এখতিয়ার করতে সক্ষম হয় নি, তার ভেতরে মারেফাতের নাম-গন্ধও নেই। দৃঢ় বিশ্বাস রেখো, কলেমা শাহাদত ও নফি-ইসবাত (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) আল্লাহ্‌র মারেফাত । দুনিয়ার ধন-দৌলত ও সম্পদ এক বড় বুৎ এবং এটা অসংখ্য ব্যক্তিকে সৎপথ থেকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। এ ধন-সম্পদ আবার অনেকের মাবুদের স্থান অধিকার করেছে। কারণ তারা শুধু ধন-সম্পদের পূজা-অর্চ্চনা করে থাকে। যে দুনিয়ার ধন-সম্পদের মহব্বত দেল থেকে দূরীভূত করেছে, সে প্রকৃত নাফি করেছে। যে মারেফাতে এলাহি হাসিল করেছে সে পরিপূর্ণভাবে ইসবাত করেছে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ শুধু মুখে উচ্চারণ নয়; প্রকৃত আমলে পরিণত করলে উক্ত মঞ্জিলে পৌছা সম্ভব হয়। কলেমা শাহাদত আমলে পরিণত না হলে খোদাতত্ত্ব হাসিল হয় না। ওয়াসসালাম ।

পত্র-৪

ওয়াকেফে হাকায়েক ও মা-আরেফ (মারেফাত ও হাকিকত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল), আশেকে রাব্বুল আলামিন, প্রিয় ভাই খাজা কুতুবুদ্দিন দেহলবি, স্মরণ রেখো, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ওই ফকির যে দরবেশি ও না-মোরাদি (অনাকাঙ্খা) এখতিয়ার করেছে। কারণ প্রতিটি মুরতের না-মুরত আছে এবং না-মুরতের মুরত আছে। কিন্তু এর বিপরীত আহলে গাফেলগণ প্রকৃত সিহাতকে (সুস্থতা) জহমাত (পীড়া) এবং জহামাতকে প্রকৃত সিহাত ধারণা করে নিয়েছে। উপর্যুক্ত ওই ব্যক্তি যার দেলে কোন দুনিয়াদারির খেয়াল আসা মাত্র সে তা দূরীভূত করে না-মুরত ও তাওয়াকুল অবলম্বন করে। অতএব বান্দার একান্ত কর্তব্য যে, সে কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র মহব্বতের রঙ সর্বদা আপন দেলে জমিয়ে রাখবে। কারণ একমাত্র আল্লাহ্‌ই অনাদি ও অনন্ত। যদি আল্লাহ্‌র রহমতের দরজা সৌভাগ্যক্রমে বান্দার সম্মুখে খুলে যায়। তবে সে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করবে। সে দিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা ব্যতীত অন্য কিছু দেখবে না। সে দোজাহানের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করবে। সে দিকেই আল্লাহ্‌র হাকিকত প্রত্যক্ষ করবে। কাজেই নিজের চক্ষুদ্বয়কে এ রকম কামাল আনোয়ারে পরিপূর্ণ করতে কোশেশ কর। কামাল আনোয়ারে পরিপূর্ণ চক্ষু দ্বারা লক্ষ্য করলে প্রতিটি ধূলি-কণাতেও অনাদি অনন্ত, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ নিদর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। জাহেরি সাক্ষাতের আকাঙ্খা ব্যতীত অধিক আর কি লিখবো। ওয়াসসালাম।

পত্র-৫

বারগুজিদায়ে ওয়াসেলিন, (নির্বাচিত মিলনকারী) আশেকে রাব্বুল আলামিন, প্রিয় ভাই খাজা কুতুবুদ্দিন দেহলবি, মাবুদের হাকিকী রহমতের ছায়াতলে সর্বদা শাদাব (আনন্দিত) থাক। পর সমাচার এ যে, একদিন আমি আমার হাদিয়ে রওশন জামির খাজা উসমান হারুনির খেদমতে হাজির ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "শেখ সাহেব, আমি অগাধ বিদ্যা অর্জন করেছি, কঠোর জোহদ ও রিয়াজত করেছি, কিন্তু মঞ্জিলে মকসুদে পৌছতে সক্ষম হলাম না।" উত্তরে পিরে দস্তগির বললেন, "একটা বিষয়ের ওপর আমল কর; তুমি আলেম ও জাহেদ উভয়ই হতে পারবে এবং তা হলো দুনিয়াকে তরক (পরিত্যাগ) করা।" রাসূল (সা.) বলেছেন, "দুনিয়াকে তরক করা যাবতীয় এবাদতের মস্তিষ্ক স্বরূপ এবং দুনিয়াকে মহব্বত করা যাবতীয় অসৎ আচরণের মূল।" যদি কেউ এ হাদিসের ওপর আমল করে তবে তার জন্য কোন এলেমের প্রয়োজন হয় না। কারণ এলেম একটা নুকতা (বিন্দু) মাত্র। এটা অর্জন করা অতি সহজ কিন্তু এলেমের ওপর আমল করা বড় কঠিন। দুনিয়া তরক ততক্ষণ পর্যন্ত হাসিল হবে না যে পর্যন্ত মহব্বত দরজায়ে কামালে না পৌছে এবং মহব্বত ওই সময় পয়দা হয় যখন আল্লাহ্ কাউকে হিদায়েত করেন। আল্লাহ্‌র হিদায়েত ব্যতীত মকসুদ হাসিল হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ্ যাকে হিদায়েত করেন সে-ই হিদায়েত প্রাপ্ত হয়"। অতএব ইনসানের একান্ত উচিত, সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং মূল্যবান সময়কে দুনিয়ার বৃথা খাহেশাতে বিনষ্ট না করা। সময়কে অমূল্য মনে করে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও সংযোগ লাভের পথে জীবন অতিবাহিত করবে এবং নিজের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত গুনার শরমে মস্তক অবনত করে রাখবে। যে কোন অবস্থায় দেলে ও ব্যবহারে আজিজি ও এনকেসারি (অনুতাপ ও অনুশোচনা) ভাব বজায় রাখতে হবে। কারণ এবাদত ও বন্দেগির চেয়ে আজিজি ও নেয়াজি (আনুগত্য ও অনুরাগ) শ্রেষ্ঠ । এ সম্বন্ধে খাজা উসমান হারুনি একটা ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। হাতেম আসেম খাজা শফিক বলখির মুরিদ ছিলেন। একদিন বলখি হাতেমকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে হাতেম, তুমি কত দিন ধরে আমার মহব্বত ও খেদমতে মশগুল থেকে আমার আদেশ-নিষেধ পালন করে আসছে? এ সময়ে কি কিছু হাসিল করতে পেরেছে এবং কোন ফায়দা কি অর্জন করছো?" উত্তরে হাতেম বললো, "আমি তিরিশ বছর যাবত একনিষ্ঠভাবে আপনার খেদমত করে আসছি। এ সময়ে আমি আটটা ফায়দা অর্জন করেছি"। বলখি। আবার জিজ্ঞেস করলেন, "হে হাতেম, এর পূর্বে কি তুমি এ রকম ফায়দা লাভ করেছিলে?" হাতেম উত্তরে বললো, "যদি আপনি সত্যিকারভাবে জিজ্ঞেস করে থাকেন তবে বলবো, আমি এর পূর্বে আরো অধিক

ফায়দা অর্জন করেছিলাম। কিন্তু এখন আর সে সব ফায়দার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার সংস্পর্শে থেকে যতটুকু এলেম অর্জন করেছি ততটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট। কারণ দ্বিনি ও দুনিয়ার নাজাত এ আটটা ফায়দার মধ্যে নিহিত আছে।" তার জবাব শুনে খাজা বলখি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, "হাতেম, আমি আমার জীবনের বৃহদাংশ তোমারই জন্য অতিবাহিত করেছি। আমি চাই না যে, তুমি এর অধিক অর্জন কর। এখন তোমার অর্জিত আটটা ফায়দা বর্ণনা কর।" হাতেম বর্ণনা করতে লাগলেন?

প্রথম ফায়দা

আমি যখন মানুষের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম তখন দেখলাম যে, তারা কোন না কোন কিছুকে নিজের মাহবুব ও মাশুক বলে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। তাদের এসব মাহবুব ও মাশুকের কতেক মৃত্যু পর্যন্ত এবং কতেক কবরের সন্নিকট পর্যন্ত তাদের সাথে থাকবে। এদের কেউ কবরে প্রবেশ করে তাদের দুঃখের সমব্যথী হবে না। এতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে যে, সে-ই শ্রেষ্ঠ বন্ধু যে মানুষের সাথে কবরে প্রবশ করে দুঃখের সাথী হয়। আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, এ রকম গুণ সম্পন্ন বন্ধু হলো আমলে সালেহা (সৎকর্ম)। কাজেই আমি আমলে সালেহাকে আমার মাহবুব ও মাশুক রূপে গ্রহণ করলাম। এটা যেন সর্ব অবস্থায় আমার সাথী হয় এবং কখনো যেন আমাকে পরিত্যাগ না করে সেদিকে মনোনিবেশ করলাম। -

দ্বিতীয় ফায়দা

আমি মানুষের প্রতি লক্ষ্য করে অনুভব করলাম যে, তারা সকলেই হেরেস ও হাওয়ার (লোভ ও লালসা) তাবেদার এবং নফসের খাহেশাতের অনুসন্ধানকারী তখন আমি পবিত্র কুরআনের এ আয়াত স্মরণ করলাম ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে নফসের খাহেশাতকে দমন করেছে সে বিলক্ষন তার স্থান বেহেশতে করে নিয়েছে।" পবিত্র কুরআন প্রকৃত সত্যের প্রকাশ। তাই আমি নিজের নফসের খেয়ালের সর্ব প্রকার আকাঙ্খাকে অপূর্ণ রেখেছি। তাই আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগিতেই আমি শান্তি অনুভব করি। যখন আমি মানুষের হালত সম্বন্ধে মোশাহেদা করলাম তখন দেখলাম যে, প্রত্যেকেই দুনিয়া অর্জন করার জন্য অশেষ পরিশ্রম করছে। শত প্রকার লাঞ্চনা ও মুসিবত সহ্য করে দুনিয়ার বাদশাহগণের কাছ থেকে আরাম আয়েশের সামগ্রি সংগ্রহ করে আনন্দ লাভ করছে। তাদের এ অবস্থা দেখে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত আমি স্মরণ করলাম, "যা কিছু তোমাদের কাছে আছে তা ধ্বংসশীল এবং যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা-ই একমাত্র স্থায়ী।" কাজেই আমার কাছে যা কিছু ছিল তার সবই দান করে দিয়ে আমি নিজেকে আল্লাহ্‌র ওপর সোপর্দ করে দিয়েছি। এটা বরগাহে এলাহিতে মজুদ থাকবে এবং আখেরাতে আমার নাজাতের উপকরণ হবে।

তৃতীয় ফায়দা

যখন আমি মানুষের হালত সম্বন্ধে মোশাহেদা করলাম তখন দেখলাম যে, প্রত্যেকেই দুনিয়া অর্জন করার জন্য অশেষ পরিশ্রম করছে। শত প্রকার লাঞ্ছনা ও মুসিবত সয্য করে দুনিয়ার বাদশাগণের কাছ থেকে আরাম আয়েশের সামগ্রী সংগ্রহ করে আনন্দ লাভ করেছে। তাদের এ অবস্থা দেখে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত আমি স্মরণ করলাম "যা কিছু তোমাদের কাছে আছে তা ধ্বংসশীল এবং যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে তাই একমাত্র স্থায়ী। কাজেই আমার কাছে যা কিছু ছিল তার সবই দান করে দিয়ে আমি নিজেকে আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করে দিয়েছি। এটা বরগাহে এলাহীতে মজুদ থাকবে এবং আখেরাতে আমার নাজাতের উপকরণ হবে।

চতুর্থ ফায়দা

আমি মানুষের অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে হৃদয়ঙ্গম করলাম যে, অনেকে মানুষের সম্মান ও প্রশংসাকে বুজুর্গ বলে ধারণা করে এবং এতে তারা গর্ববোধ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। আবার অনেকে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে সম্মানের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করে এর জন্য গর্ব করে। তখন পবিত্র কুরআনের এ আয়াত আমার স্মরণ হলো, "তোমাদের মধ্যে সে-ই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত যে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকি।" পবিত্র কুরআনের এ উক্তি অতীব সত্য বলে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হলো এবং মানুষ যা ধারণা করে নিয়েছে তা ভুল। সুতরাং আমি আল্লাহ্‌র দরবারে সম্মানিত হবার জন্য তাকওয়া এখতিয়ার করেছি।

পঞ্চম ফায়দা

যখন আমি মানুষের অবস্থা প্রত্যক্ষ করলাম তখন বুঝতে পারলাম যে, মানুষ পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করে পরস্পরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। তাদের এ ফাসাদের কারণ হলো সম্পদ, ক্ষমতা (মর্তবা) ও এলেম। তখন আমি পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলাম, "আমরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের রুজি-রোজগার ও রেজেক নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।" যেখানে রোজে আজলে মহিমান্বিত আল্লাহ্ সকলের অদৃষ্ট নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং এর ওপর কারো কোন হাত নেই সেখানে এসব বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা বৃথা। কাজেই আমি সর্বপ্রকার হাসাদ-ফাসাদ পরিত্যাগ করে সকলের সাথে সততা ও সদ্ভাব অবলম্বন করেছি।

ষষ্ঠ ফায়দা

আমি দুনিয়াকে প্রত্যক্ষ করে বুঝলাম যে, এ দুনিয়াতে অনেকেই পরস্পরের প্রতি দুশমনি করছে। কোন বিশেষ কাজে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে এ দুশমনি আরো প্রকট হয়ে ওঠে। যখন আমি পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম, "হে বনি আদম, আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করি নি যে, তোমরা শয়তানের তাবেদারি ও অর্চনা করো না; কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" তখন থেকে আমি শয়তানকে দুশমন হিসাবে চিহ্নিত করে তার সর্ব প্রকার কুহকজালের আবেষ্টনী থেকে নিজেকে দূরে রেখেছি এবং আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম একাগ্রচিত্তে পালন করছি।

সপ্তম ফায়দা

আমি মানুষের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম যে, প্রত্যেকেই রুজি রোজগারের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিবারাত্র পরিশ্রম করছে। এতে তার হারাম ও সন্দেহজনক রুজিতে জড়িয়ে পড়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা এ বিষয়ে বেখেয়াল। তখন আমি পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলাম, "পৃথিবীতে এমন কোন জীব নেই যার জন্য আল্লাহ্ রেজেক নির্দিষ্ট করে দেন নি।" আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, পবিত্র কুরআনের বাণী সত্য কাজেই আমি আল্লাহ্‌র খেদমতে মশগুল হয়ে গেলাম এবং হৃদয়ে একিন করলাম যেহেতু আল্লাহ্ রুজি প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন সেহেতু তিনি অবশ্যই আমাকে রুজি পৌছাবেন।

অষ্টম ফায়দা

আমি মানুষের অবস্থা প্রত্যক্ষণ করে দেখলাম যে, প্রত্যেকেই কোন না কোন জিনিসের ওপর ভরসা করে আছে। কেউ স্বর্ণ-রৌপ্যের ওপর, কেউ বিষয় সম্পত্তি ও ধন-দৌলতের ওপর, আবার কেউ বা সন্তান-সন্ততির ওপর ভরসা করছে। যখন আমি পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের প্রতি খেয়াল করলাম, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।" তখন থেকে আমি আল্লাহ্‌র ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে লাগলাম। আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষক ও অভিভাবক।

এসব কথা শ্রবন করে খাজা বলখি বললেন, "হাতেম, মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র এসব কালামের ওপর আমল করার তৌফিক তিনি তোমাকে দান করুন। আল্লাহ্ প্রেরিত প্রধান গ্রন্থ চতুষ্টয়-তাওরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন বিশ্লেষণ করে আমি এ আটটা ফায়দা পেয়েছি। যে ব্যক্তি এগুলো আমল করে সে চারখানা গ্রন্থের ওপরেই আমল করলো।

প্রিয় কুতুবুদ্দিন, এ বর্ণনা থেকে তুমি অবশ্যই অবগত হয়েছ যে, তালেবে মাওলার পক্ষে অধিক এলেমের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু আমলের। ওয়াসসালাম।

টীকা ঃ

১। ওপরের সপ্তম ফয়াদায় বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ অবশ্যই রুজি পৌছাবেন"। ঈসা (আ.) হাত বাড়িয়ে খাঞ্জা ভরা স্বগীয় খাদ্যদ্রব্য পেয়েছিলেন। কোন কোন আউলিয়ার বেলায়ও এমন হয়েছে। এটা ছিল তাদের মোজেজা ও কেরামত। মহিমান্বিত আল্লাহ্ সকল প্রাণীর জীবিকার নিশ্চয়তাদানকারী ও ব্যবস্থাপক-এতে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র (১১ঃ৪৬)। কিন্তু তিনি জীবিকার নিশ্চয়তাদানকারী অর্থ এ নয় যে, মানুষ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে, আর তার জীবিকা স্বর্গীয়ভাবে মানুষের মুখের মধ্যে ঢুকে যাবে। বরং তার নিশ্চয়তাদানকারী অর্থ হলো, তিনি প্রত্যেকের জন্য জীবিকা উপার্জনের পথ করে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকের জন্য বনে, পর্বতে, খনিতে, নদীতে তথা বিশাল পৃথিবীতে জীবিকা মঞ্জর করে রেখেছেন। তিনি প্রত্যেককে তার নেয়ামত ভোগ করা অধিকার দিয়েছেন। এমন কি যে তার চরম অবাধ্য তার জন্যও জীবিকার পথ অবারিত রেখেছেন। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "তোমার রব তাঁর নেয়ামত দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের নেয়ামত অবারিত' (কুরআন-১৭ঃ২০)।

যদি কোন ব্যক্তি অলসতা ও আরাম-আয়েশের কারণে নিঃচেষ্ট হয়ে বসে থাকে। তবে জীবিকা কখনো তার দরজায় পৌছবে না। আল্লাহ্ বিবিধ খাদ্য সামগ্রী ছড়িয়ে রেখেছেন; এগুলো পেতে হলে হাত-পা সঞ্চালন করতে হবে। তিনি সমুদ্রের তলদেশে মুক্তা সঞ্চিত রেখেছেন। এ মুক্তা পেতে হলে ডুব দিতে হবে। তিনি পর্বতকে চুনি ও মূল্যবান পাথর দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। কিন্তু খনন না করলে এগুলো পাওয়া যায় না। তিনি ফসল ফলানোর সকল উপাদান মাটিতে দান করেছেন। কিন্তু বীজ বপন না করলে এসব উপাদানের সুফল ভোগ করা যায় না। খাদ্যদ্রব্য পৃথিবীতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে কিন্তু শারীরিক কসরত করে সংগ্রহ না করলে খাদ্যদ্রব্য দৈবভাবে আয়ত্বে আসবে না। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ কর" (কুরআন-৬৭ঃ১৫)।

আল্লাহ্ জীবিকা দানকারী। এর অর্থ এ নয় যে, জীবিকা অন্বেষণের জন্য কোন চেষ্টার প্রয়োজন নেই বা ঘরের বাইরে যাবার কোন প্রয়োজন নেই; জীবিকা নিজের থেকেই অনুসন্ধানকারীর কাছে হাজির হবে। আল্লাহ্ জীবিকা দানকারী, একথার অর্থ হলো-তিনি মাটিকে উৎপাদনের সকল গুণাগুণ দান করেছেন, অঙ্কুরিত হবার জন্য বৃষ্টি দিয়েছেন, শস্য-কণা, ফল-ফলাদি ও শাক-সবজি সৃষ্টি করেছেন–এসব কিছুই আল্লাহ্

প্রদত্ত। কিন্তু এগুলো সংগ্রহ করা মানুষের চেষ্টার সাথে সম্পৃক্ত। যে সংগ্রহে চেষ্টা করবে। সে তার চেষ্টার ফল পাবে; আর যে চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকবে সে তার অলসতার ফল ভোগ করবে। মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "চেষ্টা করা ছাড়া মানুষ কিছুই পায় না" (কুরআন-৫৩ঃ৩৯)। বিশ্বের সকল মানুষ একটা প্রবাদের শৃঙ্খলে বাঁধা; প্রবাদটি হলো-"যেমন কর্ম তেমন ফল।" বপন না করে অঙ্কুরের আশা করা বা চেষ্টা ছাড়া ফলাফলের আশা করা একটা ভ্রমাত্মক আশা। মানুষকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেয়া হয়েছে তা কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করার জন্য বা কর্মঠ রাখার জন্য। মহিমান্বিত আল্লাহ্ মরিয়মকে সম্বোধন করে বলেন, "তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও; সেটা তোমার ওপর সুপক্ক খেজুর ফেলবে। তখন আহার কর, পান কর ও চক্ষু শীতল কর" (কুরআন-১৯ঃ২৫-২৬)। আল্লাহ্ মরিয়মের জীবিকার সংস্থান করেছিলেন। কিন্তু তিনি খেজুর পেড়ে তার হাতে তুলে দেন নি। তিনি গাছকে সবুজ রেখে খেজুর উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন এবং তা সুপক্ক হবার ব্যবস্থাও করেছেন। কিন্তু যখন খেজুর পাড়ার প্রয়োজন হলো তখন আর হস্তক্ষেপ না করে মরিয়মকে তার কাজ মনে করিয়ে দিলেন অর্থাৎ মরিয়মের হস্তদ্বয় সঞ্চালন করে খাদ্যের ব্যবস্থা করার আদেশ দিলেন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে মরিয়মের সামনে খেজুর রেখে দিতে পারতেন বা তার হুকুমে খেজুর মরিয়মের সামনে ঝরে পড়তে পারতো; কিন্তু তিনি তা করেন নি। এরূপ করলে মানুষ কর্ম বিমুখ হয়ে পড়বে বলেই তিনি হস্তক্ষেপ করেন নি।

আবার, আল্লাহ্ জীবিকার সংস্থান করেন বলতে যদি আমরা বুঝি যে, যা কিছু দেয়া হয়েছে, যা কিছু গৃহীত হয়েছে, মানুষ যা কিছু উপার্জন করে ও আহার করে তা আল্লাহ্ থেকে প্রাপ্ত তাহলে হালাল ও হারামের প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়ে। এ রকম ভ্রান্ত ধারণার ফলে চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, লুট, নিপীড়ন– যেভাবেই পাওয়া যাক না কেন তা আল্লাহ্র কাজ বলেই নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে এবং অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত বস্তু আল্লাহ্ কর্তৃক সংস্থান করা হয়েছে বলেই বুঝা যাবে। এতে মানুষের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই বলেই মনে করা হবে। প্রকৃত অবস্থা কিন্তু তা নয়। যেহেতু কর্মে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। সকল সম্ভাবনা আল্লাহ্ কর্তৃক চালিত এবং সে সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা মানুষের দায়িত্বও ইচ্ছাধীন। এ বাস্তবায়নে হালাল ও হারামের প্রশ্ন জড়িত। হালাল উপায়ে বাস্তবায়নকৃত এবং হারাম উপায়ে বাস্তবায়ন পাপে জড়িত যার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। প্রাণী যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন তার প্রয়োজন মতো খাদ্য আল্লাহ্ তাকে পৌঁছে দিচ্ছেন। কিন্তু মায়ের গর্ভ ছেড়ে পৃথিবীর আলোতে আসা মাত্রই ঠোঁট দিয়ে না চুষলে খাদ্য পায় না। আবার বয়ঃপ্রাপ্ত হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার না করলে খাদ্য যোগাড় করতে পারে না। কাজেই এ কথা স্পষ্ট যে, খাদ্যের সংস্থান আল্লাহ্ করে রেখেছেন। মানুষকে নিজের চেষ্টা দ্বারা হালাল কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্র সংস্থানকে কাজে লাগিয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। খাদ্য আপনা আপনি মানুষের হাতে এসে পৌছায় না।

প্রকৃতপক্ষে হযরত হাতেম (রহঃ) এর এ ধরণের সাধারণ ধারনা ও বিশ্বাসের অনেক ঊর্ধ্ব জগতের ইমান ও আমলের বিষয়টি তাঁর মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন আর এই ধরনের দৃঢ় ইমানদার আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে রয়েছেন।

পত্র-৬

মাখজানে আসরারে ইয়োজদানি (খোদায়ি রহস্যের ভান্ডার), মা-আন্দানে ফয়ুজতে সোবহানি (আল্লাহ্র ফয়েজের খনি), প্রিয় ভাই খাজা কুতুবুদ্দিন দেহলবি, আল্লাহ্ তোমাকে সহি সালামতে রাখুন।

একদিন আমার হাদিয়ে রওশন জমির খাজা উসমান হারুনি নফি ও ইসবোত সম্বন্ধে কী সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে, নফি হলো নিজেকে নিজে না দেখা এবং ইসবাত হলো কেবলমাত্র আল্লাহ্কে দেখা। কারণ কোন খোদবি খোদাবি হতে পারে না। খোদবি অর্থ হলো নিজেকে নিজে দর্শনকারী, ব্যাপক অর্থে স্বীয় হাস্তীর মওজুদাতে বিশ্বাসী এবং খোদাবি অর্থ খোদাকে দর্শনকারী। মানবের বাহ্যিক অস্তিত্ব বা হাস্তী অনিত্য ও ধ্বংসশীল। কাজেই এটা এক নফি। এ নাফিরও নফিকারী হওয়া প্রয়োজন, তা না হলে নফির কোন ফায়দা নেই। যদি এটা খেয়াল করা যায় যে, যাবতীয় হাস্তী শুধুমাত্র আল্লাহ্র তা হলে উদ্দেশ্য সমাধা হয়ে যায়।

মনে রেখো, কলেমা শাহাদত, নামায, রোজা ইত্যাদির বাহ্যিক সুরতে আছে এবং এগুলোর বিশেষ হাকিকতও আছে। এ হাকিকতকে বাদ দিয়ে জাহেরি সুরত নিয়ে লাখো আমল করাও বৃথা। যে ব্যক্তি হাকিকতে পৌছে নি সে নিতান্ত আহম্মক। মহিমান্বিত আল্লাহ্র অনাদিকাল থেকে মজুদ আছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত মজুদ থাকবেন। সালেক প্রথমে চক্ষুহীন হয়। তারপর যখন সে আল্লাহ্ তরফ থেকে চক্ষুপ্রাপ্ত হয় তখন সে তদ্বারা সমস্ত কিছু দর্শন করতে সমর্থ হয় এবং সমস্ত কিছু শ্রবণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। তখন সালেক একেবারে নীরব ও নিচুপ হয়ে যায়। যখন সালেকের এরূপ অবস্থা হয় তখন সে চিরকালের জন্য জিন্দা হয়ে যায়। অধিক আর কী লিখবো। ওয়াস্সালাম।

পত্র-৭

আরেফে মাআরেফ (আরেফের জ্ঞান ভান্ডার), আগাহে হক (হকতায়ালা সম্পর্কে অবহিত), আশেকুল্লাহ, প্রিয় ভাই খাজা কুতুবুদ্দিন, আল্লাহ্ তোমার ফিকির বর্ধিত করুন। দোওয়াগোর পক্ষ থেকে খুশি ও মহব্বত ভরা সালাম বাদ মারেফাতের অধিকারী হবার জন্য প্রার্থনা করি।

আজিজেমান, স্বীয় মুরিদগণকে অবশ্যই অবগত করিয়ে দিয়ো যে, ফিকির ও মুর্শিদ কামেলের মুরাদ কী, তাদের আলামত কী এবং কিভাবে তাদেরকে চেনা যায়। তরিকতের মাশায়েখগণ বলেছেন, "ফকির ওই ব্যক্তি যে প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তারা কোন কিছুর প্রতি খেয়াল রাখে না; এমন কি নিজের চেহারার খেয়াল থাকলে অন্য মকসুদ এসে পড়ে। মানবের এ চেহারা যাবতীয় মখলুকাতের আয়না স্বরূপ। কাজেই এতে মকসুদের বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবি। আবার অনেক বুজুর্গ ব্যক্তি এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, কামেল ফকির ওই ব্যক্তি যার দেল থেকে আল্লাহ্ ব্যতীত সব কিছু দূরীভূত হয়ে যায়; তখন তার মকসুদও হাসিল হয়। অতএব সর্বদা সেই মতলব ও মাকসুদের অনুবর্তী ও অনুগত থাকা তালেবের একান্ত প্রয়োজন। এখন বুঝার বিষয় হলো মতলব ও মকসুদ কী? স্মরণ রেখো, মতলব ও মকসুদ প্রাপ্তি ব্যথা বা বেদনা প্রাপ্তির অনুরূপ। তবে এটা হাকিকী ও মাজাজী হয়ে থাকে। মাজাজীর জন্যই শরিয়তের প্রাথমিক হুকুম-আহকাম। ওয়াস্সালাম।

তথ্যসূত্র: দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্তি (রঃ) অনুবাদ, সম্পাদনা ও টিকাভাষ্য জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০০৩ ISBN: 984-32-0821-2 পৃ-৪২১-৪৬৪।